রোদ-বৃষ্টি-ঝড়

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত মারাঠি উপন্যাস

রোদ-বৃষ্টি-ঝড়

আনন্দ যাদব

অনুবাদ

নীতা সেন সমর্থ

সাহিত্য অকাদেমি

Rod-Bristi-Jhad : Bengali translation by Neeta Sen Samarth of Dr. Anand Yadav's Akademi award-wining Marathi autobiographical novel *Zombi.* Sahitya Akademi, New Delhi,

ISBN : 81-260-1207-2

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

সাহিত্য অকাদেমি
রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
বিক্রয় কেন্দ্র : স্বাতী, মন্দির মার্গ, নতুন দিল্লী ১১০ ০০১
জীবনতারা, ২৩ এ/৪৪ এক্স, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা ৭০০ ০৫৩
সি আই টি ক্যাম্পাস, টি টি টি আই পোস্ট, তারামণি, চেন্নাই ৬০০ ১১৩
১৭২ মুম্বাই মারাঠি গ্রন্থ সংগ্রহালয় মার্গ, দাদার, মুম্বাই ৪০০ ০১৪
সেন্ট্রাল কলেজ ক্যাম্পাস, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী বিল্ডিং, ড. আম্বেদকর বীথি, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১

অক্ষর বিন্যাস : আই. ই. আর. ই, ২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : মিত্র প্রেস, ৮১বি, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

কৃতজ্ঞতা

ঝোম্বির পাণ্ডুলিপি পড়ে সর্বশ্রী গ. না. যোগলেকর, অরবিন্দ বামন কুলকর্ণী, সুধাকর কে ভোসলে, শারদ ফটাঙ্গরে আমায় কিছু কিছু মূল্যবান পরামর্শ দেন। এগুলো আমায় খুবই সাহায্য করেছে। এই সব বন্ধুদের কাছে আমি ঋণী।

ঝোম্বির কিছু অংশ 'রসিক' (১৯৬০-৬১) এবং 'বাগেশ্রী'র (১৯৬২) দীপাবলী সংখ্যাতে পূর্বে প্রকাশিত। সুন্দর ও ঝকঝকে করে ছেপেছেন কল্পনা মুদ্রণালয়, শ্রীনন্দকুমার ভাগবৎ যত্ন ও আগ্রহ সহকারে প্রুফ দেখে দিয়েছেন এবং শ্রী অনিল কুমার মেহতা গ্রন্থটি প্রকাশনের দায়িত্ব নিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। সবশেষে মাননীয় ভাই শ্রী পু. ল. দেশপাণ্ডে ও শ্রীমতী সুনীতা তাই -এর ঋণ আমি কখনই শোধ করতে পারব না। আমার ক্ষেত্রে এ ঋণ ক্রমে বেড়েই চলবে।

আনন্দ যাদব

অনুবাদিকার কথা

মারাঠি 'ঝোম্বি' কথাটির খুব কাছাকাছি অর্থবহ বাংলা কথা বলা যেতে পারে ঝটাপটি, সংগ্রাম। ঝোম্বির মুখ্য চরিত্র আনন্দ 'কুনবি' বা 'কুলম্বী' অর্থাৎ চাষীর বাড়ির ছেলে। আনন্দের জন্ম থেকে এস.এস.সি পরীক্ষা পাশ করা অবধি সতের/আঠার বছরের জীবনযুদ্ধের স্মৃতিচারণ এই ঝোম্বি। পটভূমিকা হিসেবে রয়েছে আনন্দের পূর্ব পুরুষদের একটি রেখাচিত্র এবং ওর জন্মের বহুপূর্বে ওর মার সাথে বাবার বাল্যবিবাহের দিনটি। সেদিনের স্মৃতিচারণ করেই এ লেখার শুরু। কাহিনীর স্থান মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর জেলার কাগল গাঁ। কাল, ত্রিশের দশকের প্রায় মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ এবং পাত্রপাত্রী প্রধানত সে গাঁয়েরই অধিবাসীরা যারা মারঠী ভাষাতেই আহার বিহার, শয়ন স্বপন সমাধা করে, যদিও শিক্ষিতে অশিক্ষিতে বা এ গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীতে কথ্য ভাষায় পরিবর্তন মূল রচনায় স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছে। এই স্থান কাল পাত্রের সাথে পাঠকের পরিচয় সীমাবদ্ধ হতে পারে মনে করে গোড়া থেকেই সেই অপরিচিত পটভূমিকার একটু পরিচয় দিয়ে দিলে লেখার রসাস্বাদনে সহায়ক হতে পারে ভেবেই এ বক্তব্যের অবতারণা।

মহারাষ্ট্রে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার অত্যাচারে ও দারিদ্র্যের অসহনীয় কষাঘাতে তথাকথিত একটি দলিত জাতির বালকের বাল্য থেকে কৈশোরে উত্তরণ এবং নানাবিধ প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজের অদম্য আগ্রহে ও প্রাণশক্তিতে সব বাধা কাটিয়ে ভালভাবে এস.এস.সি পাশ করার জীবনযুদ্ধের যে বর্ণনা লেখক দিয়েছেন, তা পাঠককে একদিকে যেমন দুঃখী ও বিষণ্ণ কবে তোলে অন্যদিকে তেমনি বালকের অনমনীয় ও অপরাজিত মনোভাব পাঠককে কেবল বিস্ময়াভিভূতই করে না, শ্রদ্ধাপ্লুতও করে, উদ্দীপনাও জাগায়। অত্যাচার ও লাঞ্ছনায় যারা তাঁর জীবনের প্রথম সতের আঠারটি অমূল্য বছর নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল তাদের প্রতি শেষ অবধি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না, লেখক এদের যেন সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে চরম প্রতিশোধ নিলেন। আর, কে না জানে অবজ্ঞার চেয়ে বড় শাস্তি, বড় অপমান আর কিছুতেই হয় না?

শ্রদ্ধেয় পু. ল. দেশপাণ্ডে মহাশয় লেখকের পরিচয় দিতে গিয়ে সমকালীন মহারাষ্ট্রের জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং দলিত সমস্যার কথাও বলেছেন। বাঙালি পাঠকদের এখানে বলে রাখা ভাল যে বাংলাদেশে (প্রাক্-স্বাধীনতাকালে অবিভক্ত বাংলা এবং তারপরে পশ্চিমবাংলা) জাতিভেদ বা বর্ণভেদের আকার এবং তা থেকে উদ্ভূত সমস্যাগুলোর সাথে মহারাষ্ট্রের জাতিভেদ এবং তজ্জনিত সমস্যার আকাশ পাতাল তফাত। এই প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের কিছু 'দলিত' জাতি ও গোষ্ঠীর কথা এখানে বললে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 'কুনবি' বা 'কুলম্বীরা' চাষী, চাষ করেই ওরা জীবিকা নির্বাহ করে, তেমনি 'সনগর'রা তাঁত বা ভেড়ার লোম দিয়ে কম্বল বা 'ঘোঙরি' বোনে, যারা ছাগল-ভেড়া চরায় ওরা হোল 'ধনগর'।

'চাম্ভার' বা চামাররা চামড়ার কাজ ও জুতো সেলাই করে থাকে। আর আছে 'মাহার'রা, 'মাঙ্গ'রা—ওদেরই সমগোত্রীয়। এ তালিকা দীর্ঘতর করা যেতে পারে, কিন্তু তা থেকে নিবৃত্ত হলাম কারণ এ গ্রন্থে সে সব জাতি বা গোষ্ঠীর উল্লেখ নেই। মহারাষ্ট্রের 'দলিত' জাতির এরা বাস করত গাঁয়ের শেষ প্রান্তে, ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চ বর্ণের লোকেদের বাসস্থান থেকে অনেক দূরে। হাতে থাবড়ে আর উনুনের আঁচে সেঁকে বাজরা বা জোয়ারের রুটি, যাকে মারাঠীতে বলে 'ভাখরি', তাই এদের প্রধান খাদ্য। ভাখরির সাথে থাকে রসুনের চাটনি, সামর্থ্যে কুলোলে ডাল ও সবজি। আর বিশেষ কিছুই থাকে না। শীতবর্ষা এরা কাটিয়ে দেয় 'ঘোঙরি' গায়ে চাপিয়ে। সনগরদের হাতে তৈরী মোটা বুনোটের কম্বলের একদিকটা ভাঁজ করে মাথায় টুপি হিসেবেও ব্যবহার করে থাকে, ওটাই আবার গাটাও ঢেকে রাখে।

মহারাষ্ট্রের অনেক জায়গার মতোই কাগলেও চাষের জমিতে জল সেচন হয় কুয়োর জলে। বাংলাদেশের মতো অত নদী, খাল, বিল, পুকুর ওদেশে নেই। কুয়ো থেকে চাকা দিয়ে জল তুলতে কাজে লাগানো হয় মোষ বা ষাঁড়েদের। এরা একবার সামনে হাঁটে, আরেকবার পেছনে, আর চাকায় লাগান থাকে জল তোলার পাত্র বা 'ভিস্তি'। কুয়ো যত গভীর, জল উঠতে তত দেরী। জল তোলা তাই সময় এবং শ্রমসাপেক্ষ। কুয়োর কাছে কাটা থাকে নালা, জল উঠে এলে চলে যায় ক্ষেতে সে নালা বেয়ে।

দেশ স্বাধীন হবার আগে মহারাষ্ট্রের অনেক জায়গাই ছোট বড় রাজার শাসনাধীন ছিল। কোলহাপুরের শাহু মহারাজ, বাল মহারাজের রাজত্বের কথা মারাঠীদের অবিদিত নয়। এ রাজাদের দৌলতে তাদের রাজ্যে ছোট ছোট গ্রামগুলোর অনেকগুলোই শহরের কিছু কিছু সুখ সুবিধে ভোগ করত। তাই বলে মহারাজের কাগলে ভাল প্রাইমারি ও হাইস্কুল, কোর্ট, কাচারি, থানা, জেলখানা, ডাক্তারখানা সবই ছিল। স্থানীয় অধিবাসীদের পানীয় জলের অভাব দূর হত বড় বড় চৌবাচ্চার জলে। কোলহাপুরের রাজাদের নানাবিধ শখের প্রভাবও পড়েছে কাগল গাঁয়ে। মাঝেমাঝেই কাগলে কুস্তির নানা প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য খেলার আয়োজন তারই সাক্ষ্য বহন করে।

এ গাঁয়ে হিন্দুদের পুজো পার্বণের সাথে সাথে মুসলমানদের পরবেও সবাই যোগ দিত, আনন্দ করত। কাগল গাঁ যেহেতু মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের সীমান্তে তাই কর্ণাটকের প্রভাবও পড়েছে এদের জীবনযাত্রায়। শিবাপ্পা, রত্নাপ্পা নামেই তার পরিচয় মেলে। তাছাড়া, মহারাষ্ট্রে মামাতো পিসতুতো অথবা মাসতুতো ভাইবোনেদের বিয়ের প্রচলন আছে, কিন্তু মামা ভাগ্নীর বিয়ে বোধ করি এসেছে কর্ণাটক থেকে।

মহারাষ্ট্রের তথাকথিত 'দলিত' জাতির ভেতর থেকে বেশ কিছুদিন হল যে কয়েকজন প্রতিভাবান লেখক ও কবি সাহিত্যের আসরে নিজেদের স্থান পাকা করে নিয়েছেন, আনন্দ যাদব তাঁদের অগ্রণী। এই পেছিয়ে থাকা লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত সমাজের অনেক লেখকই আজ 'দলিত' সাহিত্যকে পত্রে পুষ্পে আকর্ষণীয় করছেন। 'ঝোম্বি'র মূল রচনায় লেখকের

ভাষা ও ভাষান্তরে অনুবাদিকার ভাষা প্রয়োগ ও অনুসৃত বর্ণনা শৈলীর কিছু ব্যাখ্যা প্রাসঙ্গিক হবে ভেবে শেষের এই অনুচ্ছেদের অবতারণা। লেখক মূলত শুদ্ধ মারাঠী ভাষা ব্যবহার করেছেন, যদিও অনেক জায়গায় 'কুনবি'দের ভাষায় প্রয়োগ (যা মারাঠি ভাষারই অপভ্রংশ) লক্ষণীয়। সংলাপে লেখক সর্বদাই কাগল এলাকার 'কুনবিদের' ভাষাই ব্যবহার করেছেন। মূল রচনায় মহারাষ্ট্রের কোন একটি অঞ্চলের কথ্য ভাষা বাংলাদেশের অন্য বিশেষ একটি অঞ্চলের ভাষায় ভাষান্তর হাস্যকর হতে পারে এবং এটাই ঠিক কিনা তাই নিয়ে তর্কের অবকাশ থাকতে পারে· ভেবেই আমি বাংলাদেশের বিশেষ কোন একটি অঞ্চলের ভাষায় ভাষান্তর না করে মোটামুটি প্রামাণ্য কথ্য বাংলা ভাষায় ভাষান্তরের রীতি গ্রহণ করেছি, তা সে লেখকের কথাই হোক বা পাত্রপাত্রীদের কথোপকথনই হোক। কতগুলো উপমা বা কথোপকথন ঠিক যথাযথ উপমা বা কথোপকথনে ভাষান্তর করা যায় নি, তার কারণ হল সে সব উপমা বা কথোপকথন দেশাচারোদ্ভব, বাঙালি পাঠকের কাছে যার কোন আবেদন থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে হয়ত খুব কাছাকাছি অর্থবহ বাংলা উপমা বা কথোপকথনের সাহায্য নেয়া হয়েছে। ভাষান্তরে এ রীতি মোটামুটি স্বীকৃত বলেই জানি। আর বর্ণনাশৈলীতে অনুবাদিকা মূলত যা অনুসরণ করেছেন তা হল লেখক যেন গল্পচ্ছলে শ্রোতার সামনে স্মৃতিচারণ করে যাচ্ছেন। তাতে ভাষা হয়েছে কথ্য এবং অনেক সময়ই ইংরেজি শব্দের ব্যবহারকে তর্জমা করে গল্প বলার আমেজটাকে অস্বাভাবিক করতে বা থমকে পড়তে দেয়া হয় নি।

নীতা সেন সমর্থ

আমার চোখের সামনে আজও ভেসে ওঠে ত্রিশ বছর আগেকার গোগটে কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সেই আনন্দ যাদবকে। ওর অধ্যাপক য. দ. ভাবে নিজেও কবি। তিনিই এই গরীব ছেলেটির ভেতর সুপ্ত কবিকে আবিষ্কার করেন, কলেজের ফি মকুব করে দিয়ে কলেজে ভর্তি করিয়ে নেন ও কোনো এক সময় ওকে আমার কাছে রত্নগিরিতে পাঠান। হাতে কাচা পাজামা আর শার্ট পরে এই কমবয়সী রোগা ছেলেটি ভয়ে ভয়ে আমার হাতে ওর কবিতার খাতাটি তুলে দিলে। আমার মত জানবার জন্য আমার দিকে কাঁচুমাচু হয়ে তাকিয়ে রয়েছে কবিযশঃপ্রার্থী এক তরুণ— বড়ই মর্মস্পর্শী সে দৃশ্য। আমার কাছে এটা একটা ধর্মসঙ্কটও বলতে পারেন। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা হয়ে থাকে "তিরঙাপতাকাকে প্রণাম" "আমার ভারতমাতা" "শিবের চরণে তিন বন্দনা", কিংবা এরই মধ্যে ঢুকে গেছে নিঃশব্দে "জ্যোৎস্নার আলো" এসবেরই কিছু নমুনা দেখব ভেবেই খাতাটি খুলেছিলুম। খুলে দেখি পু. সি. রেন্দের কবিতার মাপের নাতিদীর্ঘ সব কবিতা। একটার পর একটা কবিতা পড়ে গেলুম আর একটি প্রতিভাবান উদীয়মান কবির সন্ধান পেয়েছি বুঝে হঠাৎই "ইউরেকা" বলে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করল। ছেলেটির খাতাটি রেখে দিয়ে ওকে তো তখনকার মতো বিদায় করলুম। পরে আমার স্ত্রী ও আমি দুজনে মিলে কবিতাগুলো আবার পড়লুম। না, এগুলো তো ছাপাবার ব্যবস্থা করতেই হয়। আরম্ভ হয়ে গেল আমাদের প্রকাশক খোঁজা। পাণ্ডুলিপিটি আমি ইতিমধ্যে সর্বশ্রী পু. ভাগবৎ ও ম. বি. রাজাধ্যক্ষকেও পড়তে দিয়েছিলুম। তিনি জানালেন কবিতাগুলো তাকে গ্রামের কবি রবার্ট বার্নস এর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। আমার তখন আরো মনে হল এত ভাল কবিতা একটা ভাল জায়গাতেই ছাপা হোক। সেকালে "পরচুরে" নামে একটি মাসিক পত্র আরম্ভ করেন গ. পা. পরচুরে। এই মাসিক পত্রটিতেই "তলার ভাখরি" কবিতাটি প্রথম ছেপে বেরোল। আনন্দ যাদবের এটাই প্রথম প্রকাশিত কবিতা।

ওগো শুনছ? দেরী করে খেও জলখাবার।
তার আগে খেয়ে নিক ঠাকুরপো আর শ্বশুরমশাই
তাদের বেড়ে দেবে'খন বড় জায়েরা।
কেউ ভাল ব্যবহার করে না আমার সাথে
তারা স্বামী স্ত্রীতে খাক আপন মনে

তুমি যেও সেথায় ধীরে সুস্থে
তলার ভাখরি তুলবে ধীরে ধীরে
তার কড়মড়ে সেঁকা পিঠে আছে মাখন লাগানো
তাই খেয়ো আগে ভাগে
কেউ জানে না সে কথা

শাশুড়ি মাকে একথা বলো না যেন।
তিনি তো দেন এসব ঠাকুরপো আর ঠাকুরঝিকে।
আমার জন্য আনবে তো বেনারসী এ দেওয়ালীতে?

দিবাকরের নাটকের সাথে এ কবিতাটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। কাব্যরসিক পাঠক-পাঠিকারা আনন্দ যাদবের দিকে ভাল করেই নজর দিলেন যখন যাদবের কবিতা ছাপা হয়ে বেরোল "সত্য কথা"তে। রাজাদের ঘরে নিমন্ত্রণ পেলে সেকালে যেমন আনন্দ হত, তেমনি এই পত্রিকার পাতায় নিজের লেখা গল্প বা কবিতা ছাপা হলে সেরকম আনন্দই হত। আনন্দ যাদবের কবিতা, গল্প ও রম্যরচনা সংগ্রহ তার লেখার ক্রমবর্ধমান মানেরই সাক্ষ্য বহন করে। সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করা যে তরুণ আনন্দ যাদব আমার কাছে একদিন এসে দাঁড়িয়েছিল সে যে কী ভয়ানক আর্থিক, সামাজিক ও পারিবারিক কষ্ট ও বাধাবিঘ্নের ভেতর দিয়ে জীবনের এতটা রাস্তা পার হয়ে এসেছে তখন তা বুঝতে পারি নি, পরে ওর আত্মজীবনীটি পড়ে তার আঁচ পাওয়া গেল। তখন বুঝলুম কষ্টের একটা অদৃশ্য ভারের বোঝা ওর পিঠে বাঁধাই ছিল। যে পরিবেশে আমিও বড় হয়েছি সেখানেও দারিদ্র্যের সাথে পরিচয় আমার হয়েছে বৈকি, তবুও অভাব অনটনের এ নিদারুণ ভয়ঙ্কর রূপের সাথে আমার পরিচয় ছিল না।

আনন্দর বেশির ভাগ লেখাই ওর নিজস্ব অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে লেখা। সাহিত্য জীবন শুরু হল কবি হিসেবে, কবিমানস চাইল তিক্ত ও মধুর সব অভিজ্ঞতারই গান গাইতে। তারপর কবি যখন গদ্য লেখায় মন দিলেন, তাতেও আমরা খুঁজে পাই সেই একই সুরের রেশ। সেখানেও তার কবি সত্তাই ফুটে উঠেছে। এ লেখাটি কেবলমাত্র আত্মচরিত না আত্মচরিত লিখতে গিয়ে একটি উপন্যাসই লেখক লিখে ফেললেন সে তর্কে গিয়ে কাজ নেই। সাহিত্যের এ চুলচেরা বিচার করতে এখানে আমি বসিনি, তার শ্রেণীভাগে এ লেখাটা কোন শ্রেণীতে পড়বে সে বিচারের ভারও আমার ওপর নেই। এখানে আমার কেবলি লুই পাস্তুরের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন, "তোমার ধর্ম কি সেটা জানার কোনো ইচ্ছে নেই, কোন মতবাদে তোমার আস্থা তাও নয়, আমি শুধুই জানতে চাই তোমার দুঃখটা কি?" যে বই পড়ে মনে আনন্দ পাওয়া যায় তাই আমার ভাল লাগে। কিন্তু তারি সাথে সাথে একটা অস্বস্তি যে লেখা বয়ে নিয়ে আসে তাও আমি বছরের পর বছর আমার সঙ্গে রেখে দিই। 'ঝোম্বি' পড়ার পর আমার প্রবল ইচ্ছে হল যাদবের পরবর্তী জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের কথা জানতে। হয়ত সেখানে গেঁয়ো আনন্দ ও শহুরে আনন্দের একটা সঙ্ঘর্ষ দেখতে পাব। আজ থেকে বহু বছর আগে যাদব "কাপড় কাচো" কবিতাটি লেখেন। একটা ছুটিতে কলেজ থেকে গাঁয়ে নিজের বাড়িতে ছেলে ফিরে আসছে। মা তার অন্য ভাইবোনদের কাপড় জড়ো করেছে কাচবে বলে।

কিন্তু কলেজে পড়া ছেলের কাপড়চোপড় মা অন্য ছেলেমেয়েদের জামাকাপড় থেকে আলাদা করে রাখে। কখনো এ দৃশ্য আনন্দ লক্ষ্য করে থাকবে, তা থেকেই "কাপড় কাচো" কবিতাটির সৃষ্টি। কবিতার ক'টি লাইন—

এভাবে কাপড় কেন এনেছিস, আমার কাপড় আলাদা রেখেছিস
রুমালে বেঁধে ভাঁজ করে করে?
প্যান্ট জামা পাঞ্জাবি।
অন্যদিকে ব্লাউজ শাড়ি নিংড়ানো সব
ভাইবোনদের শুকনো কপড় যত।
এসব এনেছিস কেন ন্যাকড়ায় বেঁধে?
সেই ছেঁড়া ন্যাকড়ায়, মাগো, বাঁধ না আমারও কাপড়
তাতে রিঠে লাগা, লাগা বেলের ফল
রাখ না আমার কাপড় সবার সাথে একত্রে
আমি কলেজে পড়ছি বলেই করিস নে মাগো
এমন ভেদাভেদ
মনটা আমার যায় যে ভেঙে এ ভেদাভেদ দেখে।

কবিতাটি আমার খুব ভাল লাগল। ছেলে তার ভিন্ন পরিবেশে পড়ছে, বেড়ে উঠছে, সে পরিবেশের সাথে তাদের অশিক্ষিত গ্রাম্য সমাজের কোনো মিল নেই, কেমন করে জানি ছেলেটির নিরক্ষর মা বুঝতে পেরে গেছে। ড. আনন্দ যাদব নামে খ্যাতনামা লেখকটি কিন্তু কাউকে ফেলে দেয় নি— তার বাবা মা, এক গাদা ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, ভালমন্দ সবই তার স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে রেখে দিয়েছে, বাল্যকালের ছোটখাটো খুঁটিনাটি ঘটনার বিবরণ পড়লেই সেটা বোঝা যায়। সেখানে শুধু যে আনন্দ যাদবের কথাই বলা হয়েছে সেটা মনে করবার কোনোই কারণ নেই, চিরদিন যারা পদানত, অসহায়, শোষিত ও অবহেলিত, দারিদ্র্যের সাথে অহরহ যুদ্ধ করে চলেছে যে সব চাষাভুষোরা, তারা সবাই এক একটা আনন্দ যাদবেরই ছবি। আনন্দের মতো অসংখ্য ছেলে এ কষ্ট ভোগ করে এসেছে, আজও আসছে। তারপর এ কষ্টের মধ্যে একদিন তারা হারিয়েও যায়। এরই মধ্যে ছিটকে বেরিয়ে আসা আনন্দ যাদবের ইচ্ছে হল শরীরে যতই মারের দাগ থাক, কষ্ট যতই ভয়াবহ হোক, সে কবিতা লিখবে, গল্প লিখবে, প্রবন্ধ লিখবে। মাথায় চেপে বসে বই-এর জগতে ঘোরাফেরা করা, তাতে ডুব দেয়া। যে জগতে যে পরিবেশে বই-এর কোনো স্থানই নেই, সেই শিক্ষাহীন বইহীন জগতে আনন্দ যাদবের মাথায় ভূত চেপে বসল সে পড়বে, বই-এর জগতের স্বাদ পাবে। তার ফলস্বরূপই আমরা যাদবের সাহিত্যভাণ্ডার পেলুম। আজ যাদব যে উচ্চাসনে সমাসীন সেখানে তিনি বসেই ক্ষান্ত হন

ন। যে অন্ধকার জগৎটাকে ছেলেবেলায় উনি দেখেছেন সেখানকার তারই মতো ড়ার ভূতে ভর করা ছেলেমেয়েদের আলোর জগতে টেনে আনতে সাহায্যের তও বাড়িয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, যে পাঠকসমাজের এই অন্ধকার গৎটা এতকাল অপিরিচিত ছিল, হঠাৎ তার মুখোমুখি হয়ে সেই পাঠক সমাজ ঞ্চল ও অস্থির হয়ে উঠছে। মারাঠি সাহিত্যে এর প্রতিফলন এতদিন না হওয়াতে য অসম্পূর্ণতাটা ছিল, আনন্দ যাদবের বা তার সমগোত্রীয় লেখকদের লেখায় স অসম্পূর্ণতা কেটে যাচ্ছে। এর প্রয়োজন ছিল, কারণ আজকের মহারাষ্ট্রের গ্রামীণ জীবনেও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এনে দিয়েছে এমনি এক অস্থিরতা ও শ্বাসরোধকারী অস্বস্তি। আর, সাহিত্য তো জীবন থেকে আলাদা নয়। তাই তো আমরা দেখতে পাই ঝোম্বির মতো লেখাগুলো সমাজজীবনে অস্বস্তি ও অস্থিরতাই কেবল এনে দেয় না, সেই সাথে সাহিত্যকে সমৃদ্ধও করে দিয়ে যায় শুধু এ দেশেই নয় বিশ্বের সর্বত্র।

পু. ল. দেশপাণ্ডে

প্রথম ভাগ

এক

তারার যে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তাই সে জানতে পারলে না। তার যখন মাত্র এক বছর বয়স তখনই যে ওর বিয়ে হয়। বিয়ের মুকুট, এদের সমাজে যাকে 'বাশিঙ্' বলে, তা তারার দোলনারই এক পাশে বাঁধা হয়েছিল। রতনুর বয়স তখন বড় জোর আট কি নয় হবে। সে বলে বরযাত্রীদের সাথে বর সাজিয়ে তাকে যে আনা হয়েছিল তখনকার কিছু স্মৃতি তার মনে আছে। ঘোড়ায় একা একাই সে লাগাম ধরে বসেছিল। এ ছাড়া অবশ্য তার আর কিছুই মনে নেই।

রতনুর বাবা আর তারার বাবা দুই বন্ধু ছিল। রতনুর বাপের দশ বারটি সন্তানের মধ্যে আটটিই ছিল ছেলে। এরা কেউই বেশীদিন বাঁচে নি। বছর খানেক বা বেশী হলে বছর দুই ঘুরতে না ঘুরতেই মরে যেত। স্বামী-স্ত্রীর মনে সন্দেহ জাগে। নিশ্চয়ই ভায়েরা কিছু তুকতাক করে। মন্ত্র দিয়ে লেবু মেরে ওদের সন্তানদের মেরে ফেলছে। ভাই বলতে গেলে চারজন। রতনুর বাপের চার সহোদর ভাই, আর আছে তাদের বউরা। বাপ মারা যাবার সাথে সাথেই ভায়েরা বালী সুগ্রীবের রূপ ধারণ করে খেয়োখেয়ি লাগিয়ে দিলে। খুনখারাপি, ঝগড়াবিবাদ ছাড়া এ পরিবারের যে একদিনও কাটতে চায় না।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। এদেরই কোন এক পূর্বপুরুষ কর্ণাটক থেকে ওর এক বিধবা বোনকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেয় কোলহাপুরের এই কাগল গাঁয়ে। না পালিয়ে ওর উপায় ছিল না। ও যে কর্ণাটকের সে গাঁয়ের মোড়লকে কোতল করে এসেছে। মোড়লের অপরাধ? সে নাকি ওর বোনকে নিয়ে টানাটানি করেছিল। কাগল কর্ণাটকের সীমান্ত থেকে দু মাইল দূরে। এ তল্লাটে গাঁয়ে গাঁয়ে খুন খারাপি প্রায়ই লেগে থাকে।

এ বংশেরই পাঁচ সিড়ির পর রতনুর বাপের জন্ম। রতনুর বাপেরা ছিল পাঁচ ভাই। বাপ যতদিন বেঁচেছিল ভায়েরা এক সাথেই ছিল। এ গাঁয়ে সকলের ওপর এরা বেশ জোর জুলুম চালাত বলে এদের সবাই চিনতও। কাগলের গবাদি পশুর হাটে কর আদায় করত এদের বাপ। এটাই ওর পেশা ছিল। বাপের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে এ পেশা ছেলেরা নিয়ে নেয়। অবশ্য কাজটি খুব সোজা ছিল না। মহারাষ্ট্র আর কর্ণাটকের সীমান্তে গ্রামটি হওয়ায় কর আদায় করতে বেশ বেগ পেতে হত। গরীব অশিক্ষিত সব গাঁয়ের লোক, কর না দিতে পারলেই বেঁচে যায়। কর না দিয়েই পিট্টান দেবার তক্কে তক্কে থাকত সবাই। যখন যা দেয় তার চাইতে দু-এক পয়সা লুকিয়ে চুরিয়ে কম দিতে চায়। এ নিয়ে ঝগড়া বিবাদ, মারামারি নিত্যকার ব্যাপার। রতনুর বাপেরা পাঁচ ভাই এই পরিবেশেই বড় হয়েছে। এ কালেই কোন এক সময় খদ্দবরা হয়ে যায় যকাতে। যকাত কথাটার অর্থ হল কর।

রতনুর ঠাকুরদা মারা যেতেই ছেলেরা যে যার মতন আলাদা হয়ে গেল। একটি ভাই ছিল নিঃসন্তান। সেজন্য অন্য চারজন তাকে সম্পত্তি দিতে নারাজ। সে-ও ছাড়বার পাত্র নয়। ঝগড়া করে তার ভাগের অংশ সে ঠিকই আদায় করে নেয়। সে আমলে কাগজের টাকার চাইতে রুপোর টাকার প্রচলনই ছিল বেশী। নিঃসন্তান ভাই তার অন্য চার ভাইদের ওপর রাগ করে একটা ছেঁড়া বস্তায় তার ভাগের টাকা ভর্তি করে মোষের পিঠে বেঁধে সারা গাঁয়ে সে মোষকে ছোটায়। বস্তার টাকা গাঁয়ের রাস্তায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পড়ুক। সে তার সম্পত্তি গাঁয়ে বিলিয়ে দেবে তবুও এই হারামজাদা ভায়েদের এক পয়সাও দেবে না। এই তার প্রতিজ্ঞা। কর আদায় করে টাকা তার ভালই হয়েছে।

কাগলের গোরু বাছুরের হাটটি কিন্তু আর রইল না। এরপর হাট উঠে গেল কোল্হাপুরে, তার সাথে সাথে কর আদায়ের পেশাও গেল উঠে। শুধু নামের পেছনে যকাতে পদবীটা রয়েই গেল। তাতে অবশ্য গ্রামবাসীদের কোন সুবিধেই হল না। পাঁচ ভাই তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুললে। একজন স্রেফ জুলুমবাজি আরম্ভ করলে। আরেকজন সরকারের বনজঙ্গল নিলামে কিনে ভাগ ভাগ করে বেচে দেয়, তাতে ভালই মুনাফা থাকে। দুজন ধরলে চাষ। আর রতনুর বাপ চাষ ছাড়াও ধান কেনাবেচার ব্যবসা আরম্ভ করে দিলে। এক গাঁয়ে ধান কিনে অন্য গাঁয়ে বেচার ব্যবসা। এ কাজে যথেষ্ট সাহসের দরকার। বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে আসতে হয়, ডাকাতি, লুটমার লেগেই থাকে। গাঁয়ে পরদেশী এলেই তার টাকা লুঠ হবে। সঙ্গে পালোয়ান, বর্শা, কুড়ুল এসব অস্ত্রশস্ত্র না নিয়ে যাওয়াই যায় না। প্রথম প্রথম রতনু ওর বাপের সঙ্গে এসব মুলুকে যেত। পরে ওর বাপ আর ওকেও নিত না। রতনু যে ওর একমাত্র ছেলে। এত খুন খারাপির মধ্যে ছেলের জীবন বিপন্ন করতে রতনুর বাপের মন সায় দিত না। ভেবে চিন্তে তাই ছেলেকে সে চাষে লাগিয়ে দিয়েছে। পাঁচ ভাই যে যার মতো নিজের ডেরায় বাস করলে কি হবে এক মুহূর্তের জন্যও এক জন আরেকজনের প্রতি বৈরীভাব ভুলতে পারে না। ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতায় জ্বলে পুড়ে মরে। এক ভায়ের ক্ষেতে ফসল পেকেছে কাটবে বলে তৈরীও হল, অমনি অন্য এক ভাই লুকিয়ে ফসল কেটে নিয়ে গেল। কখনও বা অন্যভায়ের পোষা গোরু বা ছাগলকে লাথি মেরেই শেষ করে ফেলল। তাতেই আনন্দ। প্রত্যেকের মনেই একে অন্যের প্রতি সন্দেহ আর সংশয়। রতনুর বাপ মার তো সর্বক্ষণ ভয়।

ভায়েদের ঝগড়াবিবাদের মধ্যে তাদের একটি সন্তানও বুঝি আর বেঁচে থাকবে না। রতনুর বাপ তাই এদের থেকে অনেক দূরে চলে যায়। মাঙ্গদের বসতির কাছাকাছি চাষের জমি কেনে সে। সেখানেই একটা সাধারণ ঘরও তোলে থাকার জন্য। সে ঘরেই তার তিন ছেলেমেয়ে বেঁচে রইল এ বংশের সব দোষ ও গুণের উত্তরাধিকারী হয়ে। রতনুই এদের মধ্যে বড়, তার পর পিঠোপিঠি দু বোন— কস্তলা ও আকণী।

দিন গড়িয়ে মাস, মাস গড়িয়ে বছর। রতনুর বাপের বয়স যত বাড়তে লাগল, শরীরের বল ততই কমতে লাগল। বার্দ্ধক্যে চাষবাসই তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হয়ে

উঠল। তার চাষের জমিতে সারি-সারি আখ, লঙ্কা, গম, ছোলা— যখন যেটার সময় তাই সে ফলায়। জমিতে যা ফলে সম্বৎসর তাতে চলে যায়। বাড়তি কিছু আয়ের জন্য কখনো সখনো সে আশেপাশের গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে চাল, জোয়ার কিনে গাড়ি করে কোলহাপুরে বেচে দেয়। এতে কখনও কিছু বাড়তি থাকে, কখনও থাকে না। কখনো এভাবে চারদিনের খোরাকও জুটে যায়। নিজেরও পেট ভরে, গোরুর গাড়ির ভাড়াও উঠে আসে। বাড়িতে বসে বসে অন্ন গেলার চেয়ে এ ঢের ভাল। বউকে এ সান্ত্বনাই সে দেয়। তারপর একটা সময় আসে যখন কেনাবেচার এ ব্যবসাও তাকে বন্ধ করতে হয়। এখন শুধুমাত্র সে তার সন্তানদের নিয়ে নিজের ক্ষেতেই খাটতে থাকে। তার ভায়েদের ঝগড়া-বিবাদে কিন্তু ভাঁটা পড়ল না। এদের মধ্যে মাঝের ভাইটিই সবচেয়ে হিংসুটে। রতনুর বাপের জমির পাশেই একটা খালি জায়গা পড়ে ছিল। সে সেখানে একটা বড় বাড়িই তুলে ফেললে হিংসের চোটে।

তারার দুভাই। একজন তারার বড়, অন্যজন ছোট। রামা আর লিঙ্গাপ্পা। রামা তারার চাইতে ছ'সাত বছরের বড়। লিঙ্গাপ্পা তারার চাইতে বেশ কিছুটাই ছোট। তারার বাপ শিবাপ্পা যাদব বর্ষার শুরু থেকে মকর সংক্রান্তি অবধি ক্ষেতে খাটে। যখন আখের রস মাড়াই হয়, গুড তৈরীর মরশুম লেগে যায়, তখন শিবাপ্পা ছোটখাটো জোগাড়ের কাজ জুটিয়ে নেয়। তা থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে যা পাওয়া যায় তাতে তার বছরের খাবারের গুড়ের সংস্থান হয়ে যায়। গ্রীষ্মে সে কুলী মজুরী খাটে। ধান কাটার সময় হলে নিজের ক্ষেতের ফসল চট করে কেটে নিয়ে বাড়ির গোলায় তুলে অন্যের ধান, চাল, জোয়ার কাটতে চলে যায়। পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু ফসল সেও পায়। বর্ষার দিনে মাঝে সাঝে বামুনদের বাড়ির ছাতের টালি মেরামত করতেও লেগে যায়। এ সব কাজ করে দু'পয়সা উপরি উপার্জন যা হত, রোজ রাতে মদ গিলে মদের আড্ডায় চলে যেত সে পয়সা। তারার বাপ শিবাপ্পার জমির লাগোয়া জমিটাই ছিল রতনুর বাপ আপ্পাজীর, তাই কোন এক সময় ওরা বন্ধু হয়ে যায়। একে অপরের প্রয়োজনে সাহায্য করে, কাঁধ বাড়িয়ে দেয়।

দেখতে দেখতে রতনু সাত আট বছরের হল। চারপাশে পারিবারিক ঈর্ষা, কলহ, মারামারি। এর মধ্যেই রতনু বড় হচ্ছে। ওই একটি মাত্র সন্তান বেঁচে আছে বলে একটু বেশী আদর যত্নই জুটছে তার কপালে। বাড়ির মোষের দুধের সবটাই সে একাই খায়। সাত বছর বয়সেই সে যায় কুস্তি শিখতে। হালকা রঙের সবুজ সবুজ চোখ, তরবারির মতো তীক্ষ্ণ নাসা, ফোলা ফোলা নাসারন্ধ্র, তামাটে রঙ, গোলগাল ভরাট চেহারা, রোদে ঘুরলে গাজরের মতো দেখায়। শাহু মহারাজের কাগলের এই তামাটে মাটিতে লুটোপুটি খেতে খেতে চকচকে তামার কলসীর মতো চেহারা হয়। সে যখন কথা বলে মনে হবে যেন তেড়ে আসছে। তার গমগমে গলার আওয়াজে পশুরাও যেন থমকে পিছিয়ে যায়। কুস্তিতে তালিম দিতে দিতে সে এমন তৈরী হয়েছে যে কোন মুহূর্তে সে যেন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কাগল তো শাহু মহারাজেরই গ্রাম। প্রতি বছর গৈবীর উরসে মস্ত বড় কুস্তি প্রতিযোগিতা

হত মাঠে ময়দানে। আর হত গোরুর গাড়ির দৌড়, মোষে-ছাগলে টক্কর, আর ওজন তোলার প্রতিযোগিতা। স্বয়ং শাহু মহারাজ পিঠে হাত চাপড়ে বাহবা দেন। প্রত্যেক চাষীর মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা শাহু মহারাজের হাত যেন তার ছেলের পিঠে পড়ে এভাবে। তার বলদের গায়ে মহারাজের ছোঁয়া যেন লাগে, তার ছাগলের মুখে মহারাজের হাতে এগিয়ে দেয়া এক মুঠো ডাল যেন পড়ে। সারাবছর এ চিন্তায় গাঁয়ের লোকেরা মশগুল হয়ে থাকে। অলিতে গলিতে, এ পাড়ায় ও পাড়ায়, এখানে সেখানে, তারই মহড়া চলে। ভোর হতে না হতেই ছোট ছোট বাচ্চারা লাল মাটিতে পড়ে ধুলো মেখে লুটোপুটি খায়। গাঁয়ের পূব দিকে গোরুর গাড়ি ছোটাবার একটি ভিন্ন পথ তৈরী করাই ছিল। ফি বছর বর্ষার পরই একটা দুটো গাড়ি সেখানে মহড়া দেবেই। কচি ছেলেরা দিনভর ছাগল ও মোষের লড়াই বাধাত। আবার এই ছেলের দলই লাল মাটির জমিতে কুস্তি দেখিয়ে নিজেরা কিছু পয়সাও কামিয়ে নিত। শাহু মহারাজের এই সব শখ ও খেয়ালের খেলাতে সারাটা গাঁই যেন মুখর হয়ে থাকত।

রতনুকেও এই শখে পেয়ে বসল। ছেলের শখ হয়েছে, বাপ আর বাধা দিলে না। নিজের জমিতেই ছেলের তালিমের ব্যবস্থা করে দিলে সে। আরো ক'টি ছেলেও আসত সেখানে। শিবাপ্পার রাম, পাশের বস্তির গণপা, মিশালাদের লক্ষু, আরো কত না ছেলে এখানে তালিম পেতে লাগল।

গাঁয়ে অন্য ভাইদের ছেলেরাও বড় হচ্ছে। রতনুর বাপ ভাবে আমার ছেলেকে এদের সঙ্গেই তো পাল্লা দিয়ে চলতে হবে। শরীরে, রক্তে জোর রাখতে হবে। তা না হলে দেখতে দেখতে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। তাই তো সে নিজের ক্ষেতেই ছেলের এই কুস্তির তালিমের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

পরের বছর গাঁয়ে কি এক শক্ত ব্যামো মহামারীরূপে দেখা দিলে। গাঁয়ের লোক বমি করত, চাল ধোয়া জলের মতো পাতলা পায়খানার পিচকিরি ছোটাল। হাতে পায়ে খিল ধরত, সারা শরীরের তাকত এক নিমেষে চলে যেত। মুখ শুকিয়ে কাঠ হত, চোখ সাদা হয়ে এদিক ওদিক তাকিয়েই ঢলে পড়ত। একবার এ ব্যামো ধরলে কেউ বড় একটা রক্ষে পেত না। রতনুর দুই কাকা এই কাল ব্যাধিতেই গেল, দুই কাকী মরতে মরতে কোনরকমে বেঁচে গেল। তিন চার মাস এ রোগে গাঁয়ে শোকের ছায়া পড়ল।

সারা গাঁয়ে ওষুধ ছড়ানো হল। তারপর বর্ষাও এসে গেল। ব্যস্, গাঁ থেকে রোগও পালাল। এদিকে রতনুর বাপ কাশির টানে কাহিল। হাঁপানির টান, একবার আরম্ভ হলে থামতে চায় না, বাড়তেই থাকে। সে ভাবে একমাত্র ভগবানের দয়াতেই সে এই মহামারীতে প্রাণে বেঁচেছে। তবে ভায়েদের হিংসে এখনও আছে। তার নিজের শরীরেও আর সে জোর নেই। সবেধন নীলমণি ঐ ছেলে। সে চোখ বুজলে তাকে কে দেখবে তার নেই ঠিক। ভায়েদের হাত থেকে তার ছেলে বাঁচলে হয়। সে মরে গেলে তার পিণ্ড দেবারও তো একজন দরকার। ঝগড়া, মারামারি, কাটাকাটি সব কাটিয়ে তার মধ্যেই বেড়ে উঠতে হবে। তার শরীরের কি ভরসা? হয়ত একদিন

পাখির মতনই পরাণটা ঝট্ করে উড়ে যাবে। এই নিয়ে রতনুর বাপ-মাতে সলা পরামর্শ চলে। শেষ পর্যন্ত ওরা স্থির করলে ছেলের বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। ব্যাটার বয়স তখন সাত কি আট সেয়ানা হতে আরো বারো চৌদ্দ বছর দেরী। সেও জোয়ান হবে আর মেয়েটিও এদিকে সেয়ানা হবে। এমনটি হলেই তো সোনায় সোহাগা। শিবাপ্পা যাদব পাশেই থাকে। তার সঙ্গে কথা হল। একে পড়শি, তার ওপর স্বজাত। শিবাপ্পা বেয়াই হলে মন্দ কি? তাদের এ দু'ঘরের চাষের জমিও তো লাগোয়া গায়ে গায়েই। জমি জায়গা যতদিন থাকার থাকবে— তার চেয়েও বড় কথা দুঘর এক হবে। এটা কি কম হল? দু বাড়ির ছেলেপিলেরা মিলে মিশে যাবে এটাই তো দরকার। শিবাপ্পার বড় ছেলে রামা রতনুরই সমবয়সী, কুস্তি লড়ে একই সঙ্গে, একই আখড়ায়।

শিবাপ্পাও এতে খুশী। সে ভাবে আপ্পা যকাতের মতো এমন একজন মাতব্বর ডাকসাইটে লোক নিজে থেকেই যখন কথাটা পেড়েছে তখন মন্দ কি! এ কুটুম্বিতা হয়ে গেলে গাঁয়ে তাকে চোখ রাঙায় কার সাধ্যি? দুঘরের সম্পর্কটা পাকা হলে আপদে বিপদে আরো বেশী সাহায্য পাওয়া যাবে।

বিয়ে স্থির হয়ে গেল। কনে একদম শিশু, এক বছরেরও হয় নি। বরকনের বাপ মায়েরাই আমোদ আহ্লাদ হৈ চৈ করে নিজেদের শখ মেটাতে ব্যস্ত। রতনুরও মহা আনন্দ, তার যে বিয়ে। বেশ মজাই লাগছে।

বিয়ের দিনে সারাটা বেলা তারা দোলনায় শুয়ে শুয়ে বিয়ের রঙচঙে মুকুট যাকে বলে বাশিঙ্ দেখলে ওর বড় বড় কাজল দেয়া চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অবাক দৃষ্টিতে। দোলনায় বাঁধা বাশিঙ্ দেখছে আর হাত পা ছুঁড়ছে। এরই মাঝে তারার এক কাকী ওকে দোলনা থেকে তুলে নিয়ে চলল গায়ে হলুদ মাখাতে বিয়ের মণ্ডপে স্নানের জন্য। এক বছরের এই কনেটির গলায় কাল পুঁতির মঙ্গল সূত্রের কাল সারি কি অদ্ভুতই না দেখাচ্ছিল!

তারার কাকী তারার কপাল শুকনো কুমকুমে ভরিয়ে দিলে যত্ন করে, চোখে কাজল দিতে দিতেই একটা কাল ফোঁটার টিপও পরিয়ে দিলে পাছে নজর লাগে। সে হিসিতে গা ভেজালে। পরনের নেকড়ার টুকরো পাল্টাতে পাল্টাতে সেই কাকীটি বৌকে সাজাবার জন্য যে বেনারসী এসেছে তত্ত্বে সেই পোটলা কনের দোলনার ওপর রাখলে। কুড়ি বছর বাদে এই 'কনে' বেনারসীটি প্রথম গায়ে দেবে। একটা মঙ্গলঘটে কাল পুঁতির মালা বেঁধে রতনুর হাতে ধরতে দেয়া হয়েছে। সে তাই নিয়ে একাই ঘোড়ার পিঠে বসে বরযাত্রীদের সাথে গেল বিয়ে করতে। তারার শ্বশুর শাশুড়ি যখন একদিকে বেয়াই বেয়ান নিয়ে নিজেদের শখ আহ্লাদ মেটাতে ব্যস্ত, এক বছরের তারা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

দুই

তারপর তারা যখন একটু বড় হল, একটু বুদ্ধিশুদ্ধি হল, তখন ওকে শ্বশুর বাড়ি পাঠানো হল। একদিন কে যেন ওকে দূর থেকে চিনিয়ে দিলে ওর বরকে, 'ঐ দেখ তোর বর।' 'একেই বলে বর?' ওব শিশুমন খুব যে বুঝল তা নয়। তবে ওর মা যখন ওর বরকে চিনিয়ে দিলে তখন তারা স্বামী বলে ওকে মেনে নিলে। কিন্তু স্বামীর ঘর বলে যে বাড়িটা তারাকে দেখান হল তাতে থাকতে সে মোটেই রাজী হল না। ওকে রেখে মা যখন ফিরে যাচ্ছে তখন হঠাৎ ওর খেয়াল হল। 'মা আমি তোমার সঙ্গে যাব' বলে মার পিছু ধরলে। অবশ্য তক্ষুনি ওর শাশুড়ি এসে হাতটি ধরে এক হ্যাঁচকা টানে ওকে নিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে— কসাইখানায় বলির পাঁঠাকে যেমন টেনে নিয়ে যায়। চ্যাংদোলা করে শাশুড়ি ওকে তুলে রান্নাঘরের অন্ধকারে পুরে দিয়ে খট করে ওর মুখের ওপর ছিট্‌কিনিটা দিলে তুলে। আর তখন থেকেই শুরু হয়ে গেল ছোট্ট তারার শ্বশুরবাড়ির ঘর করা। তারাব তখন বয়স কত হবে? বড়জোর ছয় কি সাত। শ্বশুরবাড়িতে না ছিল তার বাপ, না ছিল মা। একদিকে শাশুড়ি কচি বৌকে যেমন খাটিয়ে নিত, তেমনি অন্যদিকে দু'ননদ কথায় কথায় খালি ঝগড়া বাঁধিয়ে বসত। বৌ বাড়িতে পা দিতে না দিতেই শুরু হয়ে যায় সবার ফাই ফরমাস— যার যেটা যেখানে দরকার রকমারি সব কাজ নতুন বৌকে দিয়েই করান আরম্ভ হল। ঐটুকু ছোট্ট মেয়ে তারা ক্লান্ত হয়ে যায়। যখনই সুযোগ পায় ছুট্টে চলে যায় মার কাছে।

মার কাছে পালিয়ে যাবার আরেকটা কারণও অবশ্য ছিল। রতনুর সঙ্গে তারার বয়সের তফাৎ ছিল আট ন' বছরের। তার ওপর রতনু ছিল পালোয়ান— তারার কাছে মনে হত মস্ত এক দানব। শুধু পালোয়ানই নয় রগচটাও— বাপমায়ের চোখের মণি। যখন তখন বাপ মায়ের ওপর মেজাজ দেখায়। দেখে শুনে তারা ভয়ে কাঁপে। পালিয়ে গেলে স্বামী রতনুকেই পাঠানো হয় পলাতকা স্ত্রীকে ধরে আনতে। একটা পাতলা ছড়ি দিয়ে মারতে মারতে রতনু তারার হাত ধরে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ফিরিয়ে আনে তাকে। কিছু না করলেও রতনুকে দেখলেই তারার হাত পা ভয়ে সেঁধিয়ে যেত।

বছর খানেক পরের কথা। তারা এখন রোজ সকালে রতনুর খাবার নিয়ে যায় ক্ষেতে। নিজের বাপের বাড়ি যাবার পথেই পড়ে— রোজ সে একবার এ বাড়ি হয়ে তারপর যায়। যতক্ষণ থাকে প্রাণভরে একটু কেঁদে নেয়। ওর মা হাতে মুখে কিছু গুড় আর চিনে বাদাম গুঁজে দেয়— পথে যেতে যেতে তারা সেটা খেয়ে নেয়। সেখানে পৌঁছুলে অন্য জিনিস পাওনা আছে কিনা।

প্রথমেই রতনু প্রশ্ন করে, "খাবার আনতে এত দেরী হল যে বড়?" ভাখরি

বা বাজরার রুটি নিয়ে যায় সে রতনুর জন্য।

"রাঁধতে দেরী হল যে," সে জবাবে বলে।

"তোর মাথা। ভাখরি করতে আবার দেরী হয় নাকি? সত্যি কথা বল্, তোর মার কাছ থেকে আসছিস্ তাই তো?"

"না," তারা ভয়ে ভয়ে বলে।

"ফের মিথ্যে কথা বলছিস্?" কাঁধে ঝোলানো চাবুক হাতে নিয়ে রতনু তারার পিঠে সপাং করে মারে। পিঠে দাগ ফুটে যায়। রোজই এমনতর হয়। একটা চাবুকের ঘা পিঠে পড়তেই ভয়ে তারার ঘাগবা ভিজে যায়। সত্যি কথা বললে আর পিঠে চাবুক পড়বে না এই ভেবে সে ভয়ে চিৎকার করে বলে ফেলে, "আর যাব না।"

"আগে বলিস নি কেন, হারামজাদী কোথাকার? খালি খালি মিথ্যে কথা বলছিস," বলেই রতনু তারার ওপর আবার স্বামীত্ব ফলায়। বৌ-এর পিঠে পড়ে সপাং সপাং পাঁচ ছ' ঘা। শেষে যখন মাটিতে নেতিয়ে পড়ে তারা তখন রতনুর হাত থামে।

খাবার দিয়ে আসার পালা শেষ হলে তারাকে যেতে হয় আখের ক্ষেতে জল ছাড়তে। সেখানে আবার আরেক বিপদ। বুনো শুয়োর আর শেয়াল এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়। সামনে তাকিয়ে একটা শুয়োর দেখলেই সে ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠে ছুটে ক্ষেতের বাইরে চলে আসে।

"আমি আর ক্ষেতে জল দিতে যেতে পারব না।"

"কেন রে?"

"আমার ভয় করে। ক্ষেতের ভেতর বুনো শুয়োর আছে।"

"মিছিমিছি ভয় পাস নি। তুই কিছু না করলে ওরা তোকে কিছু করবে না, খাবেও না," রতনু একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ও যেন দেখায় তারাকে।

রতনুর গলার আওয়াজে আর হাতে চাবুক দেখে শুয়োরের ভয় নিমেষে দূর হয়। তারা মন শক্ত করে। জঙ্গলের শুয়োর আর ডাঙায় চাবুক হাতে রতনু। ছোট্ট তারা এদিক ওদিক ভাল করে তাকিয়ে ফের আখের ক্ষেতে জল দিতে ঢোকে। কোথাও খসখস শব্দ হলেই দৌড়ে আবার বাইরে চলে আসে।

"এত ভয় কিসের শুনি?" বলেই রতনু সপাং করে বেত লাগায় তারার পিঠে।

এই আখের ক্ষেতে জল দিতে যাওয়া তারার জীবনে একটা শাস্তির মতো ছিল। সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফেরার পথে মার কাছে গিয়ে বেঁকে বসে।

"আমি যাব না, যাও। বুনো শুয়োর আমাকে ছিঁড়ে খাবে।"

পরের দিন তারার মা রতনুর মার কাছে গিয়ে কাকুতি মিনতি করে, "বাড়িতে যত পার কাজ করিয়ে নাও। কচি মেয়ে তো, একটু সামলে নিতে দাও। বড় হলে ও আপনি যাবে আখের ক্ষেতে জল দিতে।"

তখনকার মতো সায় দিয়ে কথাটা কাটিয়ে দেয় রতনুর মা। কিন্তু তারাকে আবার পাঠায় ক্ষেতে রতনুর খাবার নিয়ে।

রতনু তারার খবর নেয়, "দাঁড়া, তোর পালিয়ে যাওয়া বার করছি। ঠ্যাঙ ভেঙে

দেব, তাহলে আর মার কাছে যেত পারবি না," বলে সে বৌএর পায়ের হাড়ের ওপর ছড়ি দিয়ে দেয় দু'ঘা বসিয়ে।

এভাবেই তারার শ্বশুর বাড়ির জীবন চলল এগিয়ে। বুনো শুয়োরের ভয় যেমন বাড়তেই থাকে, ক্ষেতের বাইরে পালিয়ে এলে তেমনি রতনুর চাবুকের মারও সমানে চলতে থাকে। তার মা রতনুর মাকে এ ব্যাপারে বলেও তেমন সুবিধে করতে পারে নি। ক্ষেতে রাজত্ব করে রতনুর মা নয়, রতনু। আর, তারার শ্বশুরও সেখানে থাকে না। সে বেচারার মাঝে মাঝে জিনিসপত্তর কেনাবেচা করে দু পয়সা রোজগারপাতি করার শখ জাগে। গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে ধানের দরদস্তুর করে। তাই তাকেও পাওয়া যায় না।

তারার দু'ননদ তো তারাকে কেবলি খাটিয়ে মারে। যেমন ঘরের বাইরে, তেমনি ঘরের কাজে।

এভাবে শেষে একদিন আর তারা পারলে না। বাপমার কাছে পালিয়ে এল। শ্বশুর বাড়ি সে আর যাবে না। কিছুতেই স্বামীর ঘর সে আর করবে না। তার বাপমাও বুঝেছে কাজের চাপে ঐ ছোট্ট প্রাণটি যেন মরতে বসেছে। ওরাও আর মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠাতে খুব আগ্রহী নয়।

এর মধ্যে আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। শিবাপ্পা ওর ধানি জমি, ক্ষেত সব খুইয়ে বসেছে। সে বছর গরমের সময় ওর বাড়িতে আগুন লাগে। গোরু ছাগল যে যেখানে খুঁটিতে বাঁধা ছিল সবই মরে গেল। পুরো সংসারই বলতে গেলে ছাই হয়ে গেল। সেই থেকে শিবাপ্পা চেষ্টা করে চলেছে এ বিপদ কাটিয়ে উঠে মাথা তুলে দাঁড়াতে। ব্যাপারটা তেমন সহজ নয়। ভাগে চাষ করাও সে ছেড়ে দিয়েছে—শুধুই দিন মজুরি করে। তাতে সংসার চালানো দায়, তার ওপর আবার নেশা দিন দিন বাড়ছে। শিবাপ্পার বেয়াই বেয়ান পুরোনো হয়ে গেছে, ওদের আসল রূপ বেরোচ্ছে এখন। আগের সে দিনগুলি আর নেই।

তারা বাপের বাড়িতেই থাকে। পাঁচ ছ'মাস ধরে সেখানেই আছে। এমনি একদিন ওর বাপ ও দাদা দুজনই ক্ষেতে কাজে বেরিয়েছে। তারা চলেছে ওদের জন্য বাজরার রুটি তৈরী করে মাথায় নিয়ে। রামমন্দিরের ঠিক কোণায় যেই না আসা অমনি রতনু ওর পথ আটকে দাঁড়ালে। ও আগেভাগেই ঠিকঠাক করেই এসেছে। এক হেঁচকা টানে মাথার খাবারের পুঁটলিটা নর্দমায় টেনে ফেলে দিয়ে অন্য হাতে সে তারার খোঁপা ধরে দিলে এক টান। তারপর বেদম মার। চাবুকের হাতল দিয়ে মাথায় মেরে রক্ত বার করে দিলে। তবুও রতনু থামে না। রক্তে ব্লাউজ ঘাগরা ভিজে সারা। শেষে ওর শাশুড়ি ওকে ছাড়িয়ে নেয়, মাথার জখম ধুয়ে টোট্‌কা ওষুধ লাগিয়ে দেয়।

"ফের যদি পালাস তবে জানে মেরে দেব। আসুক তোর বাপ মা, কি করে দেখি," রতনু আস্ফালন করে।

এমনি করে দিন গড়িয়ে যায়। তারা সব কষ্ট সহ্য করে। এদিকে তারার মা একদিন ইহলোকের মায়া কাটিয়ে ওপারে পাড়ি দেয়। টোটকা ওষুধ পত্তরে কোন কাজ হল

না। কোলের শিশুটি তখনও এক বছরেরও হয় নি। সে মরা মায়ের বুকে পড়ে শেষ বারের মতো দুধ খেল। বৌরা তারাকে বললে, "দে মা ওকে খেতে দে। সে আর দুধ পাবে কোথা থেকে?" স্তন টিপে শেষ দুধের ফোঁটা বার করে মরা বার করা হল।

মা চলে যাবার পর তারার বাপ ও ভাইদের বড়ই দুরবস্থা হল। শিবাপ্পাকেই প্রথম প্রথম রাঁধতে হত। পরে অবশ্য ওর বড় ছেলে রাঁধতে শিখে ফেলে। স্বামীর ঘরে থাকলেও তারার মন পড়ে থাকে বাপের বাড়ির দিকে, অসহায় বাপ ও ভাইদের জন্য মন কেমন করে। ভায়েরা নিজে নিজে কিই বা রাঁধছে আর কিই বা খাচ্ছে। ওদের এই দুর্দশা তারা সইতে পারে না। ক্ষেতে যাওয়া আসার পথে এক মুঠো এটা সেটা ভায়েদের জন্য সে নিয়ে যায়। ছোট ভাই লিঙ্গাপ্পা দুধের শিশু, ওর জন্য তারার মন কাঁদে, কিন্তু সে কিছুই করতে পারে না।

সময় বয়ে যায় এমনি করেই। তারার বাপ দিন দিন মদে আরো যেন চুর হয়ে থাকে। এখানে সেখানে পড়ে থাকে, হুঁস থাকে না। দুই ছেলে খালি পেটেই ঘুমিয়ে পড়ে। কখনো সখনো তাদের জ্ঞাতিরা একটু আধটু ভাখরি বা রুটি দিয়ে যায়। ভায়েরা নিজেরাও এখানে সেখানে কাজ করে মাঝে মধ্যে। সময় কাটছিল এমনিভাবেই।

এর মধ্যে আরেকটা কাণ্ড ঘটে গেল। তারার বাপ বিয়ের সময় তাবাকে যে গলার হার দিয়েছিল অভাবের তাড়নায় সেটাকে সে বেচে দেয়। রতনুর বাপ তা জানতে পেরে শিবাপ্পার কাছে গয়নাটা ফেরত চায়। শিবাপ্পা সেটা এখন আর কোথায় পাবে? রতনুর বাপ চেয়ে চেয়ে হয়রান হয়ে গেল— সে হার আর ফেরত পেলেনা। এমনি যখন অবস্থা তখন তারার বাপ একদিন মদের নেশায় চুর হয়ে তারার কাছে কিছু খাবার চাইতে আসে। ওকে দেখেই রতনুর বাপের মাথায় রক্ত উঠে গেল। সে তখন ক্ষেত থেকে এসে সবেমাত্র তামাকটি ধরিয়েছে একটু দম নিয়ে। তারার গলার হার বারবার চেয়েও কোন লাভ হয়নি— হার পায় নি। বছর ঘুরে এল শিবাপ্পা সেটা ফিরিয়ে দেবার নামও করে না। গয়নাটা বেচে দিয়ে হতভাগা মদ খেয়ে মাতলামি করে বেড়াচ্ছে, সেটা কি আর রতনুর বাপ জানে না? কখনো সখনো তার সঙ্গে শিবাপ্পার দেখা হয়ে যায় গাঁয়ের পথে এখানে সেখানে। তখন তার কাছে হাত পেতে মাঝে মাঝে পয়সাও চেয়ে নেয়। পাঁচজনের সামনে চাইলে রতনুর বাপ আর কি করে? না দিয়ে কি পারা যায়? দিতেই হয়। সে ভেবেছিল এক, হল আর এক। এখন হাত কামড়ানো ছাড়া উপায় কি?

নেশায় শিবাপ্পার পা দুটো টলছে, দাঁড়াতেও পারছে না ভাল করে। চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে না ঢুকতেই রতনুর বাপ গর্জে উঠলে, "ঘোড়ার মুত খেয়ে এখানে এলি কেন?"

"কেন আবার, আমি আমার মেয়ের কাছে এয়েছি, তুই জিজ্ঞেস করবার কে?" মদে জিভ ভারী হয়ে আছে, কথাগুলি জড়িয়ে যাচ্ছে।

"আমি কে? হারামজাদা, দেখাচ্ছি আমি কে। বেরো এখান থেকে," শিবাপ্পার হাত ধরে রতনুর বাবা বার করে দিল তাকে। শিবাপ্পা রাস্তায় গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল।

"ফের যদি কোনদিন ভেতরে দেখি তোকে তবে জুতোপেটা করব।"

"আমাকে পেটাবে কে? কে পেটাবে? আমার মেয়ের বাড়িতে আমি আসব, বেশ করব। তারা, আমার থালা আগে বেড়ে দে, কাল থেকে পেটে এক দানাও পড়েনি," বলতে বলতে শিবাপ্পা আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল।

"শালা! দিনভর মদ খেয়ে হল না, এখন এসেছ এখানে খেতে। নিজের ঘরদোর বেচে এখন আমার ঘরে এসেছ আমার সর্বনাশ করতে। আমাকে দেউলে করার মতলব করিছিস্। দে, আগে আমার হার দে।"

"ও আমার মেয়ে, ওর গলার হার নিয়ে আমার যা খুশি করব, তুই খবরদারি করবার কে?" শিবাপ্পা তখনও তড়পে যাচ্ছে।

এর পরেও কারো মাথা ঠিক থাকে? এত দিন রাগ পুষেছিল আপ্পাজী, আজ আর পারলে না। জুতো খুলে সে শিবাপ্পাকে পেটাতে শুরু করলে। তৎক্ষণে শিবাপ্পা রাস্তায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে। আপ্পাজীর রাগ তাতেও পড়ে না। জুতোর যেদিকটায় লোহার নাল লাগানো আছে সেদিকটা দিয়ে সে শিবাপ্পাকে মারতে লাগল।

তারার চোখের সামনেই এসব ঘটেছে। এতক্ষণ সে মুখে কাপড় গুঁজে টুঁ শব্দটি না করে শুধু দেখেই যাচ্ছিল। আর থাকতে পারল না। তার ছোট্ট প্রাণটি ভয়ে চিৎকার করে গলির লোকজনকে জমা করাল, "ওগো তোমরা কে কোথায় আছ আমার বাপকে মেরে ফেলছে, আমার বাপকে বাঁচাও। ওকে মেরে ফেলবে, তোমরা ওকে বাড়ি পৌঁছে দাও। ওকে ছেড়ে দাও মেরো না। সে মদ খেয়ে বেঁহুঁস হয়ে আছে, তাকে অমন করে কি মারতে আছে?" শ্বশুরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে ভীষণ কান্না জুড়ে দিল তারা। একসময় বাপকে ছাড়িয়েও দিলে।

পাঁচ সাত মাস কেটে গেল। গলার হার আর পাওয়া গেল না। আপ্পা আরো ক্ষেপে গেল। তার মনে হল ও জিনিস সে আর পাবে না। ফিরে পাবার আশাই ছেড়ে দিলে। ভেবেই নিলে আড়াই ভরি সোনা তার গেছে। তবে তার মাথায় আর একটা বুদ্ধি এল। সোনা গেছে যাক মেয়েটা তো আছে। সে তার ছেলের বৌকে আরো জ্বালাতন করতে আরম্ভ করলে। তাকে আরো বেশী খাটানো শুরু হল। প্রচুর খাবার থাকলেও তাকে বাসি খাবার খেতে দিত। মারের চোটে পিঠে দাগ পড়ে গেল। তার স্বামীও তাকে উঠতে বসতে মারে আর বলে, "যা, বাপের বাড়ি যা, গয়নাটা নিয়ে আয়।"

তারা বেচারা কিন্তু কোনদিন গলার ঐ হারটা চোখেও দেখে নি। সে যখন ছোট ছিল তখন তাকে গয়না পরতে দেয়া হত না, পাছে কেউ টান মেরে খুলে নেয়। যখন তার বোঝবার বয়স হল তখন সেগুলো দোকানে বন্ধক দেয়া হয়ে গেছে। তারপর তো দেনার দায়ে বন্ধক ছাড়ানোও হল না, জিনিসটাই গেল। কিন্তু তারি জন্যে মেয়েটার মার খেতে হল সারাটা জীবন। গুণ্ডার জাত বলে হাত ওদের সহজেই ওঠে। তাই দিয়ে ওদের সবাই চেনে। রতনুর হাত সব সময় নিশপিশই করত মারধোর করার জন্যে। বোনেদের তো প্রাণ ভরে মারধোর করতে পারত না। তার ওপর বিয়ে থা হয়ে গিয়ে ওরাও তো যে যার শ্বশুর বাড়ি চলে গেল। রান্নাবান্নার সমস্ত কাজ এখন তো তারাই সামাল দেয়।

তারার যখন তের বছর বয়স তখন ওর বাপ মারা যায়। খালি পেটে মদ খেতে খেতে শিবাপ্পার শরীরে আর কিছু ছিল না। বাপ মারা যাবার পর বাপের বাড়ি বলে তারার আর কিছু রইল না। শিবাপ্পার তিনটি সন্তানই এখন অনাথ। কাকা, কাকীরা আছে, তবে না থাকারই মতন। শ্বশুরবাড়ি ছাড়া তারার তাই আর কোন গতি নেই। ওর ভাই দুটো এদিক সেদিক গোরু ছাগল চরিয়ে পেট চালায়। কখনো সখনো লুকিয়ে চুরিয়ে তারার কাছে এসে একটা দুটো রুটি খেয়ে যায়। গাঁয়ের মোড়লের ছাগল চরায় ছোট ভাই লিঙ্গাপ্পা। ওর জন্যে তারার মন কাঁদে। হু হু করে। কিন্তু কি করবে সে? তার হাত পা বাঁধা। বড়জন রামা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তার জন্যে চিন্তা নেই। পনের ষোল বছর বয়সে তারা সেয়ানা হল। আঠারোতে তারাব প্রথম সন্তান এল, মেয়ে। তারা নাম রাখলে অনসূয়া।

বছর দুই বাদে দ্বিতীয়বার সন্তান হবার সময় পাশের বাড়ির বালা এল। সে সব প্রসূতির সন্তান প্রসবে দাই-এর কাজ করে। সারা পাড়া তাই তাকে চিনত। বালা আবার রতনুর মার সই। আতুরঘর থেকে রান্নাঘরে সে ঢুকতেই রতনুর মা আগে ঠাকুরের নাম নিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, "কি হল, ছেলে না মেয়ে?"

"নাতনী হয়েছে রে নাতনী। সুন্দব এক জোড়া মেয়ে হল রে তোর ছেলের।"

খবর শুনে বালাব সইয়ের কান্না আর থামে না।

"ওরে এবার আমার খোকার কপালে এক পাল মেয়েই হবে রে! আমার একমাত্র ছেলের একি হল রে! কত যত্ন করে মানুষ করেছি খোকাকে, আর বুঝি বংশ রইল না। আর বৌটাই বা কি, না আছে মুখের ছিরি না আছে রঙ, মেয়েমানুষ তো নয় যেন শুকনো শেকড়, আর গায়েব রঙ যেন বাজরার মতন।"

রতনুর মা তার বৌয়ের শরীরে কোমলতার অভাব বোঝাতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের পাহাড় অঞ্চলে ঘোরপড় বলে একরকম বেশ বড় টিকিটিকি থাকে তার সঙ্গে তুলনা দেয়।

"মুখে তো নাক দেখাই যায় না। মেয়েও ঐ রকমই হবে। আমার রতনুর খনিতে যেন কয়লা মিশে গেছে রে!" বলে সে আবার চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিলে।

তারার কি অবস্থা! তার আর যেন কোন আশা আকাঙ্ক্ষাই রইল না। নবজাত শিশুটির ঐ এক ফোঁটা শরীরের দিকে সে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল। শিশুটি এমন কি চোখও খোলে নি এখনও। সন্তানের কপালের রেখার দিকে তাকিয়ে রইল তারা। মেয়ে দুটিই কিন্তু তাদের বাপের রঙই পেয়েছে— ফর্সা হয়েছে, সুন্দর হয়েছে।

বাইরে বালাবাঈ তখন তারার শাশুড়িকে বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে, "এসব কি আরম্ভ করেছিস বল তো? এখন কি কান্নাকাটি করার সময়? কুকুরের মতন কেঁই কেঁই করছিস? তোর নাতনীরা তো তোর ছেলেরই মতন সুন্দর হয়েছে। ঠাকুরের কাছে যে পিদিম জ্বালাস সেই পিদিমের মতনই সুন্দর হয়েছে রে তোর নাতনীরা। ওদের বিয়ের চিন্তা আর তোকে করতে হবে না। ভগবান তোর ঘরে নতুন প্রাণ পাঠিয়েছে তাকে মাথায় করে তুলে নে। অলক্ষুণে কান্না থামাতো, যা জল গরম করে আন গে, তোর বৌ চান করবে।"

কিন্তু এসব কথা না বুঝল তারার শাশুড়ি না ওর শ্বশুর। ওরা হাহুতাশ করেই

খাচ্ছে। ওদের সাত আটটি ছেলেকে ওরা বাঁচাতে পারে নি। একটাকে অতি কষ্টে বাঁচিয়ে রেখেছিল। হাতের চেটোর ফোঁড়ার মতন তাকে যত্ন করেছে, শরীর পাত করে তাকে অসুখে বিসুখে সব রকম বিপদ আপদ থেকে আগলে রেখেছে। এখন বংশের ঐ সলতের খালি যদি পর পর মেয়েই হতে থাকে তবে বুড়োবুড়ির বংশ থাকে কি করে? অশিক্ষিত দুটি নরনারী কেবলমাত্র এই চিন্তাই করতে থাকে। বুড়ো বুড়িকে বলে, "তোর পেটে একটার পর একটা করে সাত আটটা ছেলে ধরলি তুই, তারপর হলো দুটো মেয়ে। এখন দেখ, তোর বৌয়ের সাত আটটা মেয়ের পর ছেলে হয় কিনা। ততদিনে তো আমরা পুড়ে ছাই হয়ে গেছি। আমাদের কপালে কি আর নাতি দেখা আছে?"

তারপর দু'বছর কেটে গেছে। রতনুর বাপ মা দুজনেই গত হয়েছে। রতনুর মনে হয় মাথার ওপর থেকে যেন আমগাছ আব তেঁতুল গাছেব স্নিগ্ধ ছায়া সরে গেল। ও ভাবে ওর বৌ পেটে দুটি মেয়ে ধরেছে সেই দুঃখে ওর বাপ মা প্রাণ ছাড়লে। এই ডাইনি ওর বাপ মাকে গিলেছে। বৌ-এর ওপর ওর ভীষণ আক্রোশ হয়। যখনই দেখা হয় নেকড়ে বাঘের মতো বৌয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

পাড়াপড়শী মাঝেসাঝেই খোঁজ খবর নেয়, একথা সে কথার পর জিজ্ঞেস করে,

"ছেলেপুলে কটি?"

"দুটি।"

"ছেলে?"

"না, ছেলে আর হল কৈ? দুটিই মেয়ে।"

যারাই শোনে মুখ বেজার করে মাথায় হাত দেয়। রতনুর মন খারাপ হয়। কখনো কখনো কোন এক বৃদ্ধ তার মনের অবস্থা বুঝে তাকে সাহস দেয়,

"তোরও ছেলে হবে। এত ভাবছিস কেন? ছেলেপুলে হবার বয়স কি তোব চলে গেছে?"

রতনুর মন মানে না, ভাবে এরা মিছিমিছিই তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। ভালমন্দ খেয়ে রতনু বেশ দৈত্যের মতন চেহারা করেছে। একরকমের জঙ্গলী তেজ আছে তার চেহারায়। এই অল্পবয়সে তার মাথার ওপর আর কেউ রইল না। মাঠে ঘাটে জঙ্গলে বেড়েছে ছেলেটা, শহরের কিই বা জানে? পঁচিশের পর গুণতেই জানে না বেচারা। এদিকে সংসারের পুরো দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। তাইতেই বেচারা নাকানিচোবানি খেয়ে মরছে।

শ্বশুর শাশুড়ি মারা যেতে তারারও ঐ একই অবস্থা। গুরুজন থাকতে তবুও তো মাথার ওপর একটা আশ্রয় ছিল। বুড়োবুড়ি অনেক সময় তাকে রতনুর মারের হাত থেকে বাঁচাত। সংসারও যে ওরা একেবারে সামলায় নি তা নয়। এখন এই বিরাট সংসার তাকেই সামলাতে হবে।

সংসারের হেপা সামলাতে সামলাতেও তারা এরই মধ্যে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে লাগল। সে বোঝে এই সংসারের কর্ত্রী এখন সে। তার মেহনত করা না করার ওপর সংসারের চাকার চলা না-চলা নির্ভর করছে। রতনুরই কি এখন কোথাও যাবার

জায়গা আছে? বাপ মায়ের হোটেলে থেকে তাদের কাঁধে ভর দিয়ে এতদিন তো খুব রোয়াব দেখিয়েছে, তারাকে বাপ মার সামনে ঠেঙিয়ে খুব কর্তাগিরি ফলিয়েছে। এখন ঠেঙিয়ে সুবিধে হবে কি? তাহলে খাবে কি?

যতই এসব ভাবে, ততই ভয় তারার মন থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যেতে থাকে। মার খেয়ে খেয়ে ওর এখন সয়ে গেছে। তারার মনে আছে কখনো সখনো রতনু হুমকি দিত সে নাকি আবার বিয়ে করবে। ঐ হুমকিগুলো এখন থেমে যাবে। বাপ মা নেই, কে দেবে এখন ওর বিয়ে? কিছুটা নিশ্চিন্তবোধ করে তারা। মনের আনন্দেই এখন সে অনসূয়া ও ছোট্ট সেবন্তীকে বড় করে তুলছে।

এর মধ্যে রতনুর বোনেব এক বিপদ এসে উপস্থিত। কম্বলা রতনুর চাইতে দু বছরের ছোট। সে তার সন্তানকে নিয়ে একা দিন কাটাচ্ছে। স্বামী কোথায় চুরির দায়ে জেল খাটছে তিন চাব বছবের মেয়াদে। মা সন্তান অতি কষ্টে আছে।

রতনু বোনের কষ্ট নিজের চোখে দেখে এসেছে। স্বামীর জেল হয়েছে বলে কম্বলা গাঁয়ে কোথায়ও মাথা উঁচু করে যেতে পারে না, কাজও পায় না। রতনু তাকে বলে, "জামাই বাবাজীর কবে খালাস হবে কে জানে? তুই কি এতদিন এই হতচ্ছাড়া গাঁয়ে একা পড়ে থাকবি নাকি? এখানে না আছে জমি, না ফসল। রোজগার করেই যদি খেতে হয় তাহলে আমাব সঙ্গে কাগলেই থাক। আমাবই আর কে আছে বল? সংসার চালাতে হাত তো তেমন পাকে নি। আমার তো কিছু জমি জায়গা আছে ভাগচাষে, তাতে ফসলও হচ্ছে কিছুকিছু, সবাই মিলে গতর খেটে যা হয় দুমুঠো আমাদের জুটে যাবে। বাপ মা বেঁচে থাকতে তো আমার কোন চিন্তা ছিল না। এখন ওরা নেই— নানাবকম ঝঞ্ঝাট ঝামেলা সব ঘাড়ে পড়ছে— একা মানুষ কি করে সামলাই, তুইই বল?"

রতনুর কথায় কম্বলা তখুনি চারপাঁচ বছরের ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে উঠে এল রতনুর সংসাবে। সে রতনুকে সামাল দেবে। ভাইবোন এক জোট হল। কম্বলা হয়ে গেল বাডির কর্ত্রী, বাড়ি সামলায়, রতনু সামলায় ক্ষেত খামার। বাড়ির ধরন ধারন কখন যে পাল্টে গেল তা আর টেরই পাওয়া গেল না। আসল শাশুড়ি গিয়ে ননদের বেশে আর এক শাশুড়িই এল তারার জীবনে। সকালে উঠে ঘর নিকোনো, চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে আনা, পাঁচ ছ'জনের বাজরার রুটি তৈরী করা, তাব ওপর নিজের দুটি মেয়ে তো আছেই। এসব সময়মত সামলে ক্ষেতে রতনুর খাবার নিয়ে তারাই যেত। সকালের খাবারের সঙ্গে সঙ্গে সে দুপুরের খাবারটাও নিয়ে যেত। মাথায় থাকত খাবারের পুঁটলি, এক কাঁখে একটি মেয়ে থাকত, আর একটি মার পিছু পিছু আসত হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে।

এদিকে কম্বলা আর ওর বড় ছেলে ভাই-এর বাড়িতে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছে। কম্বলা ওর ছেলেকে ঠিক সময় স্কুলে দিয়েছে। মা ব্যাটা ছাউনির ঘরেতে থাকে আরামে। তারার মেয়েরা অভাগার মতো রোদে রোদ্রে মার পিছু পিছু ঘুরে ঘুরে ক্রমেই শুকিয়ে যেতে লাগল। তাদের বাড়িতে রেখে আসলে ওরা সময়মত খেতে পায় না। তারার তো সারাটা দিন ক্ষেত খামারেই কেটে যায়। মেয়েদের বড়ই অবহেলা হয়। কম্বলা

ওর ছেলেকে যখন দুধ ভাত মাখন ভাত খাওয়ায় তারার মেয়েদের তখন কিছুই জোটে না। মেয়ে বলে কম্বলা ওদের সব কিছু থেকেই বঞ্চিত করে। তারা সংসারের কর্ত্রী হলেও তারার মেয়েরা খাবারের কাছাকাছি মাছির মতো ভন ভন করে— খাবার পায় না। দেখতে দেখতে মেয়ে দুটি ওদের মায়ের মতনই শুকনো কাঠ হয়ে গেল। তার ওপর ননদ ভাজের ঝগড়া তো ছিলই। কম্বলা রতনুর কাছে প্রায়ই তারার নামে চুকলি কাটে। তাই তারার কপালে মাঝে মাঝে স্বামীর হাতে মারও জোটে। তারা আর কি করতে পারে? সে আর তার বড় মেয়ে রান্না করে, রান্না সারতে সরতেই তারা তার বড় মেয়েকে খাইয়ে দেয়। এসব দেখে কম্বলা তারার ওপর আরো রেগে যায়। বদলা নেয় রতনুর কাছে তারার নামে সত্যি মিথ্যে নানা ভুলভ্রান্তির কথা রঙ চড়িয়ে ফলাও করে নালিশ করে। ভাইকে খুশী রাখতে সে রতনুকে তোষামোদও করতে ছাড়ে না, "দাদা, এ ডাইনিকে এখুনি তাড়িয়ে দিই। এ শুকনো শেকড়ে কি তোকে মানায়, শুকনো কাঠ কোথাকার। এ তো বছর বছর শুধু মেয়েই বিয়োবে— জানাই কথা। তোর গলায় পাথরের মতো ঝুলবে রে, দাদা। তুই তো কিছুই পেলি না। এর না আছে বাপ, না আছে মা, না আছে বাপের বাড়ি। চার দিক দিয়ে ডাইনী তোকে ডোবাবে। একে খাইয়ে পরিয়ে কি হবে?"

রতনুর মনে পড়ে ওর চোখের সামনেই ওর বৌ এই চার দেয়ালের মধ্যেই ছোট থেকে বড় হয়েছে। বৌকে যে ওর খুব একটা পছন্দ তা নয়। বাপ মার ভয়ে আর সমাজে মান রাখতে গিয়ে সে তারাকে বৌ বলে কোনরকমে মেনে নিয়েছে। তার বদলে ঘরের কাজে ওকে রতনু রাতদিন খাটিয়েও নেয়। তাছাড়া লুকিয়ে লুকিয়ে দুটি মেয়েছেলের বাড়িতেও সে যায়। একটি মালীর বাজা বৌ। আরেকটি থাকে পাশের গলিতেই। বাপ মা মরে যাবার পর রতনুর যাতায়াত বেড়ে গেল মেয়েদুটির সঙ্গে গোপন অভিসারে। কম্বলার কানে ফুসফুসানিতে বাইরের এ মেলামেশাতে রতনুর উৎসাহ আরো বেড়ে গেল।

এসব কাণ্ড যখন চলছে, এদিকে তখন তারা আবার মা হতে চলল। রতনুর কানে খবরটা যখনই পৌঁছুল তখনই সে গাঁয়ের মোড়ল যেভাবে গাঁয়ের সবচেয়ে নীচু ও দরিদ্র গ্রামবাসীদের চোখ রাঙিয়ে কথা বলে সেই ঢঙে তারাকে শাসালে, "দেখ মাগী, এবার যদি তুই মেয়েছেলে বিয়োস তবে তক্ষুণি আমি তোদের দূর করে দেব। তুই আমার সংসার রসাতলে দিবি, না? এই জন্যেই তোকে ঘরে বিয়ে করে এনেছি?"

তারার না আছে বাপ, না আছে মা, না আছে ভাই। রতনুর গলার আওয়াজ শুনে তাই তারা খুব ভয় পেয়ে গেল। সে জানে তার কেউ কোথাও নেই, কেউ তার খোঁজ খবরও নেবে না, দেখবেও না। এক ভাই তো পেটের জ্বালায় পিসির বাড়ি চলে গেছে। ছোটজন গাঁয়ের মোড়লের ছাগল চরায়। এতটুকু প্রাণ তার, এক চাপড়ে শেষ হয়ে যাবে। স্বামী ত্যাগ করলে দু তিনটি মেয়ে নিয়ে সে তখন কোথায় দাঁড়াবে? তখন তাকে এক টুকরো ভাখরি দেবারও তো কেউ থাকবে না।

তারা মানত করতে আরম্ভ করে দিলে। দিনরাত ঠাকুরের কাছে তার একটিই প্রার্থনা তার যেন একটি খোকা হয় এবারে। তাদের কুলদেবতা জ্যোতিবার দিন রোববার।

সে দিন সে উপোস করে। দিনের পর দিন শুধু জল খেয়েই কাটিয়ে দেয়, "ঠাকুর আমার কপালে মারধোর, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা যত জুটুক তার জন্য চিন্তা করি না, কিন্তু এবার তুমি আমার কথা রাখ, আমার কোলে একটি খোকা দাও, দেখো এবার আর মেয়ে দিও না। যদি তুমি ফের আমাকে মেয়ে দাও তবে আমি আর মেয়ে দুজনেই তোমার সামনেই এ জীবন শেষ করে দেব। তোমার সামনেই মাথা ঠুকে মরব," বলে সে গাঁয়ের মন্দিরে দেবীর সামনে দণ্ডি কাটে।

মনের যখন এ অবস্থা তখনও তারা তার ছোট ভাইকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারে না। তার মন ওদিকেই পড়ে থাকে। তারার যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় তখন তাকে কে দেখবে? পিসি তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে আর তার সাথে সাথে পেটও ভরবে এই ভেবে বড়টি গেছে পিসির বাড়ি। ছোট ভাইটিই পড়ে আছে। তারার মনে হল ভালই হয়েছে, ছোট ভাইটি তার একমাত্র সহায় হবে। একে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে' দিদি ছাড়া আর তার কেই বা আছে?

আসা যাওয়াব পথে তারা তাই ভাইয়ের জন্য লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু খাবার নিয়ে যায়। কখনো দুটি চিনে বাদাম আর গুড়, কখনো বা এক টুকরো ভাখরি। যখন যা জোটে। তাদেব ক্ষেতের পথ ছোট ভাইটির যাতায়াতের পথ, তাই ক্ষেতের এক কোণে ওর জন্য খাবাব রেখে দেয় কিন্তু ভগবান বিরূপ। এ সামান্য সুখও তাই তারার কপালে বেশীদিন সইল না। কম্বলা কেমন করে জানতে পেরে গেছে ব্যাপারটা। ভাইয়ের বৌকে শায়েস্তা করবে ভেবে একদিন সে ভাখরিগুলি গুণে গুণে পাঠালে আর অন্যপথ দিয়ে আগে ভাগেই ক্ষেতে গিয়ে বসে রইল। তারা আসতেই, সে বলে, "দাদা, আগে দেখ তো পুঁটলিতে নটা ভাখরি আছে কিনা।" রত্নু গুণে আটখানা পেলে। সে তারাকে তৎক্ষণাৎ জেরা শুরু করে দিলে, "বল ক'টা রুটি এনেছিলি বাড়ি থেকে?"

ওদিক কম্বলা কিছু না জানার ভান করে ভালমানুষের মতো কাপড় কাচতে লেগে গেছে। তাকে দেখে তারা সবই বুঝল এবং সত্যি কথাই বললে, "ন'টা ছিল।"

"একটা কোথায় গেল? কাকে দিলি?"

"ভাইকে দিয়েছি।"

"এরকম কতদিন চলছে?"

"আজই দিয়েছি।"

"মিথ্যে কথা বলছিস," বলেই সাঁ করে এক ঘা চাবুক তারার পিঠে বসিয়ে দিলে। তারপর চলল সমানে চাবুকের ঘায়ের পর ঘা। মারছে আর বলেই যাচ্ছে ওর বিয়ের কথা, ওর বৌয়ের হার ওর শ্বশুর কেমন করে নিয়ে গেল, আরো কত কি! কথার পিঠে পিঠে চলল চাবুকের মার। হাত আর থামে না। বাচ্চা মেয়ে দুটিও মা ঐ মার খাচ্ছে দেখে চিৎকার জুড়ে দিলে, বিছে কামড়ালে মানুষ যেমন চিৎকার করে সেরকম। কাছে পিঠে কোথায়ও কেউ নেই যে তারাকে বাঁচাবে। মার খেতে খেতে তারা কখন যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল কেউ জানতেই পারলে না।

সন্ধের সময় তারা যখন বাড়ি ফিরেছে তখন ওর পিঠে চাবুকের দাগে দাগে কালশিটে

পড়ে গেছে। ওর বাপ নেই মা নেই— কাকে ও বলবে? শাশুড়ির সই বালাবাঈকে মা মনে করে সে ওর কাছেই গিয়ে গোড়া থেকে সব কথা খুলে বললে। রতনু কেন ওকে কষ্ট দেয়, কেন মারধোর করে, সবই যে ওর ননদের কারসাজি, সেসবও বললে।

বালাবাঈ ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে জামা খুলতে বললে। ওর জখমে রক্ত চন্দনের প্রলেপ দিয়ে ঠাণ্ডা করা দরকার। কিন্তু জামা খুলবে কি করে সে? মার খেয়ে গা ফুলে ঢোল হয়ে গেছে যে। বালাবাঈ রতনু আর তার বোন কম্বলাকে লাখখানেক চোখা চোখা গাল দিয়ে কাঁচি দিয়ে তারার জামাটা পটপট করে কেটে ফেললে। গলিতে যে সব মেয়েরা ছিল ওরা সবাই তারার অবস্থা দেখেছে। মাতৃসমা বৃদ্ধারা আর স্থির থাকতে পারল না। রতনুকে সবাই খুবই গালমন্দ করলে।

রাত্রে রতনু খাবার সময় বাড়িতে ফিরেছে। বালাবাঈ তারাকে টানতে টানতে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। তারা তো পথেই ভীষণ কান্না জুড়ে দিয়েছে, "আমাকে কুয়োতে ফেলে দাও আমি ডুবে মরব, সংসার আর সইতে পারছি না" বলে ওর কি কান্না। গলির বাসিন্দা সব মেয়ের দল রতনুব বাড়িতে এসে হাজির। ওদের সামনেই বালাবাঈ রতনুকে আবার আচ্ছা করে সেই সব চোখা চোখা গালাগাল দিলে, যা নাকি একমাত্র পুরুষরাই মুখে আনে এবং দিয়ে থাকে। সে রতনুকে বোঝালে বৌ-এর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত। তারা এখন ছ'মাস পোয়াতি। রতনুর নিশ্চয়ই ছেলে হবে। আজ না হোক কাল হবেই। তাছাড়া, তারার একমাত্র ছোটভাইকে এক টুকরো ভাখরি খেতে দিলে কি বাড়ির সব খাবার শেষ হয়ে যাবে? খাবার তো কত ফেলেও দেয়া হয়। তারার বড় ভাই যখন এখানে নেই তখন ছোট ভাইটাকে তারা দেখবে না তো কে দেখবে? বালাবাঈ এও রতনুকে বোঝালে সে যে ছ'মাস পোয়াতি বৌকে এমন মারধোর করেছে পাড়ার সবাই তো তা জেনে ফেলেছে, এখন ওকে কি আর কেউ মেয়ে দেবে? স্ত্রী সন্তানদের ফেলে দিলে শেষে যে তাকেই ভিক্ষে করে খেতে হবে তো কি সে জানে না? এসব উপদেশ শুধু যে বালাবাঈ রতনুকে দিয়ে গেল তা নয়, পাড়ার যত মেয়েরা এসেছিল তারাও এক তরফা এমন বলে যেতে লাগল যে রতনু আর মুখ খোলবার বা নিজের সাফাই গাইবার সুযোগই পেলে না। রকমসকম দেখে সে একদম চুপ মেরে গেল। বালাবাঈ হল গিয়ে তার মার সই—মারই মতন। সে গালাগাল দেবার সময় অশ্রাব্য গালাগালও যেমন দেয় তেমনি লোকের বিপদে আপদে এগিয়েও আসে, যথেষ্ট বুদ্ধিও ধরে, দরকারে দাই-এর কাজও করে। সব মিলিয়ে ওর কথা তাই কেউ ফেলতে পারে না। বালার কথা রতনুর মনে দাগ কেটেছে। তার পরে দিন পনের ধরে যেতে আসতে তারার শরীরের কালসিটে ও বেঢপ ফোলা দেখে মনে মনে ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। তার বৌ ছ'মাস পোয়াতি আর সে নাকি তাকে মেরেছে? কাজটা মোটেই ভাল হয় নি।

তারা তো রোববারের ব্রত করছেই। সে দেখাদেখি রতনুও বার দু'এক অমাবস্যায় হলসিদ্ধ আপ্পার থানে ঘুরে এল। ওর বাপ মায়ের এই থানের ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

এবার কিন্তু সত্যি সত্যি তারার কোলে ছেলে এল। পর পর দুটি মেয়ের তিন বছর পর এই ছেলে। এখন আর কেউ ওকে দূর করে দেবে না এই ভেবে তারা খুব খুশী। ওর মনে হয় রতনু তো বিয়ে করে ওকে ধন্য করেছে। বৌ হয়ে সে কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে একটি ছেলে এ পরিবারকে উপহার দিয়ে সে যেন কিছুটা ঋণমুক্ত হল। তাছাড়া নিজেও একটা মস্ত বড় সঙ্কটের হাত থেকে বাঁচল। কিছুদিন অন্তত সে রেহাই পাবে একথাই তারার বারবার মনে হল।

ছেলে হয়েছে তাই ছেলের বাবা খুব খুশী। বাপ মরে যাবার পর মানত করে ছেলে হয়েছে। রতনুর মনে হল তার বাপই যেন ফিরে এসেছে তাঁর ঘরে ছেলে হয়ে। হলসিদ্ধ আপ্পা প্রার্থনা শুনেছেন। বাপের পুণ্যের ফলেই হয়ত সে আজ ছেলের বাপ হয়েছে। ছেলে হওয়ার আনন্দে রতনু গলির সবাইকে গুড় দিলে। এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দুহাত তুলে নাচ শুরু করে দিলে। দেখে শুনে মনে হবে হলসিদ্ধ আপ্পাই যেন ওকে ভর করেছেন।

গুড়ের টুকরো পেয়ে সবাই জিজ্ঞেস করে, "কি হয়েছে?"

অমনি জবাব আসে, "ছেলে হল যে গো।"

"কার ছেলে হয়েছে বাপ?"

"রতনু যাকাতের ছেলে হয়েছে গো।"

"বেশ, বেশ," যাদের মুখ মিষ্টি হল তারা বললে। ছেলের মা মনে মনে ভাবলে যাক রতনুর এবার তাহলে সত্যি সত্যি ছেলে হল। আমার তো তাতে কোন কৃতিত্ব নেই, ছেলে বইবার হাড়ি মাত্র, হলসিদ্ধ আপ্পা খুশী হয়েছেন বলেই না তার কোলে ছেলে দিয়েছেন।

ছেলের নামকরণের দিন অর্থাৎ 'বারস' মানে জন্মের বার দিন পরে ঘটা করে সবাইকে খাওয়ালে রতনু। ভাণ্ডারার দিন দশ মাইল দূরে আপ্পার মন্দির থেকে পালকিতে ঠাকুর বসিয়ে সারা গাঁয়ে ঘোরানো হল। গাঁয়ে ঢোকার অনেক আগে থেকেই ঠাকুরের আসার পথ সাজিয়েছে রতনু। ঠাকুরকে নিয়ে যাবে বলে। জায়গায় জায়গায় ছাতা, পতাকা এসব লাগানো হয়েছে। চামর দোলানোর ব্যবস্থাও ছিল। পালকি ঢাকা হয়েছে পশমের ঢাকনা দিয়ে— না হলে ঠাকুরের মান থাকে? ভেতরে পেতেছে ঠাকুরের তোষক। বাজনা বাজিয়ে, ঢোল করতাল বাজাতে বাজাতে ঠাকুরকে নিয়ে চলেছে রতনু।

"ওরে, সাত সকালে আজ আবার কি এলরে?"

গাঁয়ের লোক বাজনা শুনে ছুটে এল দেখতে গাঁয়ের প্রান্তে। হলসিদ্ধ আপ্পার পালকি ও শোভাযাত্রা দেখতে পেয়ে সবাই সমস্বরে জয়ধ্বনি দিলে, "হলসিদ্ধ আপ্পার জয় হোক, সকলের মঙ্গল হোক।"

পুরুত মশাই চলেছেন সবার আগে, খালি পায়ে, আবীরের থলে বগলে। যারা ঢোল করতাল বাজনা বাজাচ্ছিল ঠাকুর মশাই তাদের সবাইকে আবীর ছড়ালেন — সকলে রঙে রাঙা হল। গাঁয়ের বৌরা সব কলসীকাঁখে ছুটছে— ঠাকুরের পায়ে জল দেবে। আঁচল হাতে ধরে ঠাকুর মশায়ের পায়ে মাথা নোয়াচ্ছে। অসুস্থ ছেলেপুলেকে

নিয়ে এসে তাঁর পায়ে এনে শুইয়ে দিচ্ছে— গায়ে মাখিয়ে নিচ্ছে ঠাকুরের পুজোর আবীর।

গাঁয়ের বৃদ্ধরা গায়ে আবীর মেখে জিজ্ঞেস করলে, "ঠাকুর কোথায় চলেছেন?"

"রতনু যাকাতে মানত করেছিল, সে ফল পেয়েছে। তার ছেলে হয়েছে যে। তারই মঙ্গলের জন্যে ভাণ্ডারা হচ্ছে কিনা। হলসিদ্ধ আপ্পার নামে গাঁয়ের সবার মঙ্গল হোক।"

রতনু চলেছে সবার পেছনে, গোরুর গাড়ির সঙ্গে। আনন্দে তার মন ভরে গেছে। আগে আগে চলেছেন পেতলের চকচকে ঠাকুর। ঠাকুরের ডাগর ডাগর চোখ, টিকোলো নাক, বড় পাকানো গোঁফ। চারিদিকে ঠাকুরের গা থেকে যেন জেল্লা বেরোচ্ছে। সোনার মতো ঝকঝকে ঠাকুর। রতনুর চোখে জল এসে গেল— আনন্দে। আশে পাশে দশ বিশটা গাঁয়ের মানুষেরা এই হলসিদ্ধ বাবারই আশ্রিত। ঠাকুরের আদেশ এরা সারা বছর মেনে চলে।

রতনুর বাড়িতে আজ ভাণ্ডারা। গলির সকলে দীন দুঃখী, ছোট বড়, ধনী দরিদ্র মিলে দু'শ মতন পাত পেতে খেলে। নতুন সবুজ ছোলা আর গমের চার পাঁচটি বস্তা শেষ হয়ে গেল। চারিদিকে উৎসব আনন্দেব আমেজ ছড়িয়ে পড়ল। সব্বাই সে আনন্দের ভাগ পেলে। যার জন্য এই আনন্দের ফোয়ারা তার নামই রাখা হল আনন্দ।

যথাসময়ে স্কুলে আনন্দর জন্মমাস, সন লিখে দেয়া হল ১৯৩৫ নভেম্বর। রতনুর বাড়িতে এর কোন লেখাপড়া যদিও রইল না।

তিন

রতনুর ছোট বোন আকনির শ্বশুরবাড়িতে প্রথম থেকেই গোলমাল লেগেছিল। তার এখনও কোন ছেলেপুলে হয় নি। বাপ মরে যাবার পর আকনি প্রায়ই রতনুর কাছে চলে আসত। রতনুই আবার বুঝিয়েসুঝিয়ে বোনকে শ্বশুরবাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিত। দিন পনের থাকত কি থাকত না, আকনি আবার ভায়ের কাছে ফিরে আসত।

"শ্বশুরবাড়িতে আমাকে খালি একটা বাসি রুটি খেতে দেয়। খালি খালি মারে। উঠতে বসতে রাত দিন শাশুড়ির খোঁটা। আমি যাব না," আকনি বলে।

"তাই কি হয়, এখন শ্বশুরের ঘরই তোর ঘর। মেয়েদের জাত এছাড়া তোর গতি নেই। শাশুড়ি একটু আধটু শাসন তো করবেই। কিন্তু ভেবে দেখ, সে চোখ বুজলে তুই তো মালকিন হবি, তোরই ঘর তোরই সংসার," রতনু বোঝাতে চেষ্টা করে।

"তা হোক গে, আমাকে তারা খেতে দেয় না, আমি আর সেথায় যাব না।"

কিন্তু যেতে তাকে হয়ই। জোরজার করে ওকে শ্বশুড়বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। শাশুড়ি আর ওর ছেলেকে রতনু দুএকবার ধমকেও দিয়ে এসেছে। কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হয়নি, বোন মার তেমনি খায় যেমনটি খেত আগে। বোনকে মারের হাত থেকে মাঝেসাঝে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে রতনু। আসল ব্যাপারটা যে কি সেটা সঠিক বোঝা যায় না। কার দোষ কে জানে। আকনি কিন্তু শ্বশুড়বাড়িতে টিকতে পারে না, বারে বারেই পালিয়ে আসে। এই তো সেদিনকার কথা। রতনু বোনকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছে দিয়ে সেখান থেকে সোজা চলে যায় মেলায়। দুদিন মেলা দেখে বাড়ি ফিরে এসে বোনকে দেখতে পেলে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত উঠে গেল। বোনকে দিলে বেদম মার— মনে হবে মানুষ যেমন জন্তু জানোয়ারকে নির্দয়ভাবে ভাবনাচিন্তা না করেই মারে অনেকটা সেরকম।

এত মার মেরেও কিন্তু আকনিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো গেল না। বোনকে অশ্রাব্য গালাগাল দিতে থাকে রতনু, "দাঁড়া, তোকে হাত পা বেঁধে কুয়োতে ফেলে দিয়ে আসি। তুই ডুবেই মর," রতনু বোনকে শাসায়। রতনুর ধারণা, আবহমান কাল ধরে বাপ পিতামহের আমল থেকে যা হয়ে এসেছে তাই হবে। মেয়েদের জাত শ্বশুরবাড়ির গালিগালাজ, মুখঝামটা, চড়চাপড় তো সইতেই হবে। সোয়ামী যদি মরতে বলে তাহলে মরতেই হবে এটাই ঠিক। শ্বশুরশাশুড়ি যদি মারধোরও করে খেতে নাও দেয়, তবুও তাদের সেবাযত্ন করতে হবে এটা তাদের ন্যায্য পাওনা। শ্বশুরবাড়িতে লক্ষ্মী হয়ে সবার মন জুগিয়ে বাপের বাড়ির মান রাখতে হয়— এটাকেই সে নিয়ম বলে জানে— এটাই ঠিক বলে তার ধারণা। যা চিরকাল হয়ে এসেছে তাই তো হবে।

তাছাড়া রতনুর মনে আরেকটা ভয়ও বাসা বেঁধেছে। এবং তার কারণও আছে। কম্মলা এখন বাপের বাড়িতেই আছে। তার স্বামী বছর দেড়েক জেলের ঘানি টানবার পর ধনুষ্টঙ্কার হয়ে মরেছে। সেখানেই। আবার আরেক বোনও আসার তাল করছে। গতিক সুবিধের নয়! এটা সে কিছুতেই হতে দিতে রাজী নয়। এতে তার নাক কাটা যাবে।

কিন্তু বোনকে বুঝিয়ে সুঝিয়েও কোন লাভ হচ্ছিল না। খেপে গিয়ে একদিন রতনু বোনকে টানতে টানতে নিয়ে গেল তাদের গাঁয়ের কুয়োর ধারে। সেখানে বোনের কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে কুয়োর চাকার ওপর দিয়ে দিলে কুয়োতে ঝুলিয়ে। কুয়ো বেশ গভীর, তাছাড়া অন্ধকারও। বোন তো সেই থেকে চিৎকার লাগিয়েছে, হাত পা ছুঁড়ছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার জুড়ে দিলেও রতনু তাকে ঝুলিয়েই রেখেছে, রেহাই দেয় না। কিছুক্ষণ পরে দড়ি আরেকটু নীচে নামিয়ে তাকে কুয়োর জলের মধ্যে ডোবায় আর ওঠায়।

"বল, শ্বশুরবাড়ি থেকে আর আসবি পালিয়ে?"

আকনি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে চিৎকার করেই যায়।

এদিকে এসব কাণ্ডকারখানা, চিৎকার শুনে গাঁয়ের আর পাঁচজন রতনুর পিছু পিছু ছুটে আসে। শেষে দুজন বুদ্ধিমতী বয়স্ক গোছের বউ চেপে ধরাতে আকনি দাদাকে কথা দেয় সে শ্বশুরবাড়ি যাবে আর পালিয়ে আসবে না। বউরা কেউই রতনুকে শাসন করলে না, বরং আকনিকেই অনেক সলাপরামর্শ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলে। রতনুর ভরা যৌবন, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, তার হাতের দড়ি তাই তার হাতেই রয়ে গেল, কেউ টেনে নেবার দুঃসাহস দেখালে না। তার হাতের সেই মালিক, যা ইচ্ছে তাই করবে।

আকনি এবারকার মতন শ্বশুরবাড়ি ফিরল ঠিকই, কিন্তু দু তিন মাস পরে আবার যে কে সেই। এবার তার অন্যরকম শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে, তার হাতে পায়ে খুন্তি গরম করে ছেঁকা দেয়া হয়েছে। শ্বশুরবাড়িতেও তাকে ছাড়লে না, তার কষ্ট সেখানেও বেড়েই গেল। এবার ওরাও বুঝে গেছে আকনির বাপের বাড়ির জোর নেই।

আকনি নিজে ছিল বুদ্ধিশুদ্ধিহীন, অবুঝ। ছেলেমানুষী করত, বুদ্ধি করে চলতে পারত না। শাশুড়ি তাকে দেখতে পারত না, তার ধারণা ছিল ছেলের গলায় বউ যেন একটা ভারী পাথর হয়ে ঝুলছে। শাশুড়ি বৌকে জানোয়ারের মতো খাটাতে আরম্ভ করলে, খাওয়াও দিলে কমিয়ে। আকনির শরীর অর্ধেক হয়ে গেল। আকনি আর পারল না, আবার পালাল। এবার তার সোয়ামী তাকে চাবকাতে চাবকাতে গাঁয়ের বাইরে থেকে বাড়ি অবধি টানতে টানতে নিয়ে এসে অন্ধকার ঘরে পুরে দিলে। দুদিন তার খাওয়াই জুটল না। রতনুকে সে খবর পাঠালে। আকনির স্বামীর এক কথা, "আমার বিয়ের খরচ ফেরত দাও, যা গয়না দিয়েছিলুম ফিরিয়ে দাও, তোমার বোনকে তুমি নিয়ে চলে যাও, ল্যাঠা চুকে যাক। চারদিনের মধ্যে এলে ভাল, নইলে তোমার বোনকে জ্যান্ত পাবে কি মরা পাবে বলা যাচ্ছে না। আমাদের আর তখন কোন দায় দায়িত্ব থাকবে না, সাফ কথা বলে দিলুম।"

এসব কথা শুনে রতনু তো রেগে আগুন। একজনকে সঙ্গে নিয়ে সে গেল আকনির শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে। সেখানে ওদের সঙ্গে খুব ঝগড়াঝাটি করলে, মেলা কথা কাটাকাটি হল। এবার কিন্তু রতনু আর ওদের সঙ্গে পেরে উঠল না। গাঁয়ের আর দশজন ওকেই দাবড়ে দিলে, তার বোনের পাগলামির কাণ্ড কারখানা তাকে জানালে। "আমাদের গাঁয়ের ছেলেকে ঠকিয়েছ তোমরা," বলে ওকে বেশ দু'কথা শুনিয়েও দিলে।

রতনু আকনির দিকে তাকিয়ে একবার দেখল। শুকনো জোয়ার গাছের মতো লিকলিকে হয়ে গেছে। চারদিন না খেয়ে তার আর কথা ফুটছে না। যে ঘরে তাকে আটকে রাখা হয়েছে তার বাইরে দাঁড়িয়ে রতনু তার সঙ্গে কথা বললে। একটা দারুণ হতাশা আকনির

গলায়। একদিকে তার আর বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছে নেই যেমন বলছে, তেমনি আবার আক্রোশও ফুটে উঠছে তার কথায়।

রতনু সোজা থানায় গিয়ে হাজির হল। সে গাঁয়ের প্রধানকে গিয়েও নালিশ করলে। তার বোনকে না খেতে দিয়ে বন্দী করে রেখেছে তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। কিন্তু কোন লাভ হলো না। পুলিশ তার কথার তেমন আমলই দিলে না।

শেষ অবধি রতনু আকনির স্বামীকে বিয়ের খরচ, শ্বশুরবাড়ি থেকে দেয়া বিয়ের সময়কার গয়না সবই ফেরত দিতে বাধ্য হল। তারপর তার আধমরা বোনকে নিয়ে ট্রেনে করে নিজের গাঁয়ে ফিরে এল। এর পর আর রতনু কোনদিন আকনির গায়ে হাত তোলেনি।

বছর খানেক গড়িয়ে গেল। আকনির আবার বিয়ের সম্বন্ধ এল। এবার রতনু বোনকে আরও গরীব ঘরে বিয়ে দিলে। জামাই অল্প বিস্তর চাষ করে। তিন চারবার জিজ্ঞেস করলে একবার জবাব দিতে সাহস করে।

রতনুর কথা অমান্য করার সাহস তার নেই।

এ সংসারে তারার ছেলে এখন দশ মাসেরটি হল। কম্বলা আর তারা ননদ বৌদি কেউ কাউকে দেখতে পারেনা। তারা এখন গিন্নীবান্নী হচ্ছে। ছেলে কোলে আসার পর থেকেই ভাল করে ঘর সংসার করার একটা চাড় এসেছে ওর মনে। তাছাড়া, ছেলের দৌলতে সংসারে ওর মান মর্যাদা বেড়েছে, একটা সসম্ভ্রম স্থান হয়েছে। রতনুরও সংসারে আগ্রহ বেড়েছে। ছেলেকে সে খুব ভালবাসে। সে চায় তারা বেশী করে দুধ, নারকোল, শুকনো ফল এসব খায়। তাহলে ওর বুকের দুধ বাড়বে— ছেলেটা মায়ের দুধ পেট ভরে খেয়ে বেড়ে উঠবে। সে চায় ছেলের পেছনেই তারা বেশী সময় দিক, ওকে ফেলে রেখে সংসারের কাজ করুক আর এদিকে ছেলে ওর কাঁদতে থাকুক এটা রতনুর মনঃপূত নয়।

তারাও ওর ছেলেকে নিয়েই বেশী সময় কাটাতে চায়, সে চায় ওর ননদ এখন একটু সংসারের কাজ সামলাক। ঘর দোর সামলানো, রতনুর খাবার নিয়ে যাওয়া। গোবর দিয়ে ঘুঁটে দিক, কাপড় কাচাকাচি করুক। রান্নাবান্না একটু সামলাক। কিন্তু তারার ননদ এসব কিছুই করে না। যখন থেকে ও এ বাড়িতে বৌ হয়ে এসে ঢুকেছে তখন থেকেই কম্বলার ঘরের কোন কাজ করতে হয় নি। এসব কাজের অভ্যেসই তার চলে গেছে।

ধীরে ধীরে একজনের প্রতি আরেকজনের বৈরীভাব ক্রমশ বেড়েই চলে। তারা রতনুর কাছে নালিশ করে কচি ছেলেটার জন্য খাবার আনা হল, তার সবটাই ননদের ছেলে খেয়ে ফেলল। কচি বাচ্চার জন্য খাবার আসে আর বুড়োরা তা খেয়ে শেষ করে দেয়। রতনুর আর এসব সহ্য হয় না।

যখন কোন সুরাহাই হচ্ছে না তখন তারা ঠিক করলে এ ব্যাপারে সে রতনুর দুজন বান্ধবীকে দলে নেবে। একজন মালীর বউ তার ছেলেপুলে হয় নি, আরেকজন তারাদের গলিতেই থাকে তার নাম রখমা। সে একরকম যোগিনীই বলা চলে। প্রত্যেক শুক্রবার চান সেরে সে যায় পাঁচটা বাড়িতে ভিক্ষে চাইতে। তার সঙ্গে থাকে একটি গরীব চাষী। সে একটা ক্ষেতে পাঁচ ছ'মাস মজুর খেটে যা রোজগার করে তাতে সারা বছর চলে যায়। তাই বছরের বাদ বাকি দিনগুলি দুজন বসে বসেই খায়। তাদেরও কোন ছেলেপুলে

নেই। রতনু তাদের ওখানে জুটে যায় প্রায়ই।

এরা দুজনেই তারার চেয়ে বয়সে অনেক বড়— রতনুর বয়সকালের বান্ধবী। ওরা রতনুর বৌ বলেই তারাকে খুব খাতির করে চলে। তারাও এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে।

এদের দুজনকে তারা ধীরে ধীরে সব বলতে থাকে। ননদ এ সংসারে থাকার ফলে ওর কচি ছেলে কেমন করে বঞ্চিত হচ্ছে, ক্ষেতে রতনুর খাবার নিয়ে যাবার ফাঁকে কেমন করে কম্বলা ঘরের ধান, ঘুঁটে, লঙ্কা, দুধ, ঘোল, মাখন, চিনেবাদাম বার করে সরিয়ে রাখে, বেচে দেয়, সবই তারা তাদের বলে। ওরা সব শোনে। তারপর ক্রমশ কথাগুলো রতনুর কানে তুলে দেয়। শুনে রতনুর খুব রাগ হয়। এখন সে সংসারে মন দিয়েছে, তার সংসার বড় হচ্ছে, হবেও।

কিছুদিন পর রতনু কম্বলাকে হেঁসেলটা সামলাতে বলে, "সকালে তুই রান্নার দিকটা দেখ। উনুনের তাপে বেশীক্ষণ বসলে মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। তারার তো এখন কোলে বাচ্চা এসেছে, তোর বোঝা উচিত।"

কম্বলা ফোঁস করে ওঠে, "এতদিন ছেলেপুলে হয়েও বুকের দুধ শুকোয় নি, আর আজ অমনি শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি কিছু বুঝতে পারি না, ভাবছিস?"

"তারার এখন ছেলে সন্তান হয়েছে। অত খাটাখাটি করলে বুকের দুধ থাকে কি করে?"

"দুধ থাকবে না কেন? খাটাখাটিতে কারুর বুকের দুধ কমে যায় না।"

"এত বক বক না করে তুই যদি হেঁসেলে ঢুকিস আর তোর বৌদি যদি অন্য কাজ করে তবে কি তুই মরে যাবি?"

"নে, আমাকে দিয়ে খাটিয়ে নে। আর বউকে রাখ সাজিয়ে গুজিয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে পটের বিবি করে। বাপ মা থাকতে আমি রান্নাঘরে কোনদিন পা দিই নি, আজ দেব ভাবছিস?"

রতনুও ছাড়ার পাত্র নয়। সে বলেই যাচ্ছে, "এ কি তোর নিজের বাড়ি পেয়েছিস যে বসে বসে গিলবি? এখানে থাকতে গেলে খেটে খেতে হবে। কাল থেকে ক্ষেতে যাবি খাবার নিয়ে, ও বাড়ি সামলাবে। তুই ক্ষেতের কাজ সামলাবি।"

"বা, চমৎকার! তোর কানে কে মন্তর দিয়েছে রে? আমরা ভাই বোন বাগানে খেটে মরব আর এখানে এই ডাইনী বাড়ির সব বার করে বেচে দিক। ওর গুষ্টি আমাদের ঘর সংসার সব সাফ করে দিক। ওরে, কালে কালে কত কি দেখব? আমার কি দায় পড়েছে? এতদিন চুপ করে ছিলুম। ভায়ের ঘর ভাঙতে চাই নি। ওরে দাদা, তুই ওকে চিনলি না, ও তোকেও বেচে খেয়ে নেবে রে! আর আজ কিনা তুই ওর হয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিস? ছি ছি!!"

কম্বলা আর রতনুর এভাবে কথা চলতে থাকে। রতনু বেচারা দোটানায় পড়ে গেল। সে শেষে মনে মনে বৌকেই দুষছে ভাবছে নিশ্চয় তারাই একটা চাল চেলেছে। সে হয়তো ননদকে তাড়িয়ে নিজে ঘরের কর্ত্রী হয়ে বসবে। ওর নিজের গুষ্টিকে তখন এটা সেটা পাচার করবে। তাই ননদকে পথের কাঁটা মনে করে সরিয়ে ফেলতে চায়। আবার অন্যরকম চিন্তাও করে। রতনু তো ছেলের ভালই চায়। ছেলের ভাল চাইতে গেলে মার ভালও চাইতে হয়। বোনের ছেলে তো আর তাদের দেখবে না। আজ আছে কাল নেই। বড়

হওয়া অবধি থাকবে তারপর আলাদা হবেই। ওর নিজের ছেলের ভালমন্দ তো ওকেই দেখতে হবে। রতনুর দুই মেয়ে বন্ধু রতনুকে তাই বুঝিয়েছে। ওরা রতনুর বৌকে এভাবেই খুশী করে যাবে ভেবে রেখেছে। আস্তে আস্তে রতনু সবই বুঝতে পারল। কম্বলা ক্ষেতের ভারী কাজ কিছুই করে না। রান্নাবান্নাও করে না। এদিকে সংসারেব ভাঁড়ারের চাবি তার হাতে। সে তো পাবেই কিছু কিছু জিনিস বেচে দিতে, কিছু জিনিস সরিয়ে নিজের আখেরটা গুছিয়ে নিতে। রতনুর ঘরে ছেলে এসেছে তাই তার বোন আজ কিছুটা দূরে সরে গেছে, অতটা আপন নয়।

যতই দিন যেতে লাগল রতনুর সন্দেহ বাড়ল বই কমল না। তারা এখন পাকা গিন্নী হয়েছে। চাল, ধান, লঙ্কা মাপে কম দেখলে কম্বলাকে সে প্রশ্ন করে। কম্বলাও তো আর ছোটটি নেই— সে তারার চাইতেও বড়। সেও স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। কোন-না-কোন দিন সে আলাদা হবেই। তার কাছে কারা আসে যায়, কোথায় কি নেই তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কবলে তার রাগ হয়। তার ব্যাপারে কেউ নাক গলাক সেটা তার পছন্দ নয়।

বেশ কিছু কম বয়সী ছোকরা কম্বলার কাছে যাতায়াত করছে, তাকে আলাদা হয়ে যাবার বুদ্ধি দিচ্ছে। ওবা বলে কম্বলাকে ওরা জমি দেবে। ইচ্ছে করলে সে মোষের দুধের ব্যবসা বা অন্য কোন ব্যবসাও করতে পারে।

শেষ পর্যন্ত কম্বলা আলাদাই হয়ে গেল। রতনু পঞ্চায়েতের কথায় ওকে পুরোনো বাড়িটা লিখে দিয়েছে। বছর খানেকের খোরাকি ধানও দিয়েছে, খরচপত্রের জন্য চারশ টাকাও দিয়েছে। আর দিয়েছে একটি মোষ। কম্বলার একটা লোহার ট্রাঙ্ক ছিল, তার চাবিগোছা সব সময় কম্বলার কোমরে ঝোলান থাকত। সে ট্রাঙ্কটাও বন্ধ অবস্থায়ই কম্বলার সঙ্গে গেল।

কম্বলা আজকাল মাঝে মাঝে কাজে বেরোয়। মোষের দুধও বেচে। এক টুকরো জমিও ভাগে চাষ করছে। সে একটু একটু করে পয়সা জমিয়েছিল— ওটা এখন কাজে লেগে গেল।

এদিকে তারার সংসারে ননদ দুজন যেতেই তারা যেন নিজের ঘরের মালিকানা নতুন করে ফিরে পেলে, আর নতুন করে সব কাজে উৎসাহও পেলে। বাড়ির কাজকর্ম রান্নাবান্না তাড়াতাড়ি সেরে সে কচি কচি ছেলেপুলেদের সঙ্গে নিয়ে ক্ষেতে রওনা দিত। নিশ্চিন্ত মনে সে এখন ছেলেপুলে মানুষ করছে। ছেলে একটু বড় হয়েছে। তারার কোল থেকে নীচে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি পা পা করে। ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় বসে খেলা করে। সে মা বাবার কাঁধে চড়ে এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। ক্রমে সে তাদের বাড়ির গলিতেও ঘোরাফেরা করতে শিখে গেল, মুখে একটু একটু কথা ফুটল মাকে মা, বাবাকে দাদা বলে ডাকতে লাগল। কম্বলা আর আকনি রতনুকে দাদা তো বলতই, কম্বলার ছেলে বাবুও রতনুকে দাদা বলে ডাকত। ওদেরই দেখাদেখি আনন্দও রতনুকে দাদা বলেই ডাকতে লাগল। সে এখন নিজের বাড়ির লোকেদের, তাদের চলন বলন চলতে বলতে শিখেছে। রতনু ও তারার যে জগৎ তাদেরই উত্তরাধিকারী হিসেবে আনন্দ সে জগতে মিশে গেল। তাদের সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, উত্থান পতনের নানা টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা আমার অর্থাৎ আনন্দর জীবন কাহিনী।

ছোটবেলার একদিনের কথা আমার এখনও মনে আছে। আমার দিদি আনসী মা আর আমি চলেছি। আমার আর এক দিদি সেবন্তী তার আগে মারা গেছে যখন, তখন তা বোঝার বয়স আমার হয়নি। মার মাথায় ছিল খাবার পুঁটলি আর দিদির হাতে ছিল ছাগলের দড়ি। আমার দুধের জন্য একটি কালো ছাগলও আমাদের সঙ্গে যেত। ছাগল সঙ্গে থাকত বলে গাছপালার ভেতর দিয়ে আমাদের যেতে দেয়া হত না। বৃষ্টিবাদলে বনের মধ্যে রাস্তা কাদায় কাদা হয়েও থাকত। এমনিতে বাদলার দিনে দেশাইদের বাগানের মোটরের পথ ধরেই আমরা যেতাম, তবে মাঝখানে কিছুটা বনের মধ্যে দিয়েও যেতে হত।

আমি মার হাত ধরে চলেছি। একটু পরেই দেখি মোটরের রাস্তা ধরে খাকি রঙের গাড়ি সারি সারি যাচ্ছে লাইন করে, একের পর এক। নানা আকারের, অনেক চাকার, অনেক গাড়ির মিছিল। গাড়ির ভেতরে গাদাগাদি করে বসে আছে খাকি পোশাক পরা অনেক, অনেক লোক। হাতে তাদের বড় বড় বন্দুক।

"মা, এ গাড়িগুলো কিসের ?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম।

"এবা যুদ্ধ করতে চলেছে। এখন যুদ্ধ লেগেছে," মা বলেছিল।

"যুদ্ধ মানে কি, মা ?"

"মারামারি ! হাতে বন্দুক নিয়ে মানুষ মানুষকে মারে।"

"কেন মারে ?"

"এক দেশে অন্য দেশের লোক ঢুকলেই তাদের মারে। আমাদের দেশের মানুষ সেখানেই চলেছে।"

"কোথায়, মা ?"

"সারা পৃথিবীর কোণায় কোণায়।"

"সারা পৃথিবীতে মানুষ মারছে ?"

"হ্যাঁ, কচি খোকারা কাঁদলে তাদেরও ধরে নিয়ে যায়," মা আমাকে অবশেষে বকে থামালে।

"কেন নিয়ে যায় ?"

"কেন আবার ? তাদের বড় করে তাদের দিয়েই বন্দুক চালাবে।"

আমি বড় বড় চোখে অবাক হয়ে খাকি পোশাকপরা মানুষগুলোকে দেখতে লাগলুম। ওরাও আমাকে দেখলে। কেউ আমাকে দেখে হাত নাড়ালে, কেউ আবার রেগে রেগে তাকালেও। আমি ভয় পেলুম। পাছে আমায় ওরা নিয়ে যায়। আমার কান্না পেয়ে গেল। মা আমাকে অনেক বোঝালে, কিন্তু আমার ভয় গেল না। শেষ পর্যন্ত মা আমাকে কোলে তুলে নিলে আর তার আঁচল দিয়ে আমায় চেপে রাখলে। মার আঁচলের তলায় আমি মার কাঁধে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত হলুম। আমার ভয় কাটল। তবু গাড়ি চলার ঘর্ঘর আওয়াজ যায় না। বুকে ধড়াস করে উঠত। সেই দিন থেকে আমি মার সঙ্গে ও রাস্তা দিয়ে আর যেতে চাইতুম না। মনে ভয় ধরে গিয়েছিল।

ক্রমশ অনেক কথাই জানা গেল। মিলিটারীতে ভর্তির জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ছেলে-ছোকরাদের নিচ্ছিল বেছে বেছে। এজন্য ছেলে-ছোকরারা ভয়ে জঙ্গলের ঝোপে লুকিয়ে বেপাত্তা হয়ে

যেত। আমাদের ছোটমামা একবার ঘুঁটের ঢিবির পেছনে ঘাপটি মেরে বসেছিল। সাত আট দিন ধরে একটানা এরকম ভর্তি চলত। সারা গাঁয়ে সে কদিন শুধু তাই নিয়ে কথাবার্তা হত। তারপর হত যুদ্ধের কথা। আমি ভয় পেয়ে যেতুম। তবু মন যুদ্ধের গল্প শুনতেও চাইত। চোখ বড় বড় করে কান খাড়া করে আমি সব শুনতুম। কখনো সখনো মিলিটারী গাড়িব দল জঙ্গলে এসে থাকত। কখনো বা গোরা সাহেবরাও এসে যেত, সঙ্গে তাদের থাকত মিলিটারী, সাহেবরা মুর্গী, মাংস, ডিম, ফল কিনত। তাদের আস্তানায় যোগিনীরা যেত, গান গাইত। মেথর পাড়ার, মাঙ্গ পাড়ার ছুকরী মেয়েবা সেখানে গিয়ে তিনটে পাথর পেতে উনুন তৈরী করে সে উনুনে ওদের রান্না করে দিত। এরকম করে ঐসব ছুকরীরা দু তিন দিন বেশ কামিয়েও নিত। তবে এভাবে যাতায়াতে যা হবার মাঝে মাঝে তাও হত। যোগিনীদের ফর্সা টুকটুকে বাচ্চা জন্মাত। একবার এক যোগিনীর দুটি যমজ মেয়ে হল— ফর্সা টুকটুকে ঠিক গোরা সাহেবদের মতো। তাবা কিন্তু মারাঠি বলত। তাদের দেখলে আমার খুব মজা লাগত।

আমার ছোটবেলায় দেখেছি কানের দুধারে ছেলেরা লম্বা চুল রাখছে। আমারও লম্বা জুলপি রাখা ছিল। সেই চুল দিয়ে সরু সরু লম্বা বিনুনি করা হত। তাতে সোনার ফুল গুঁজে দেয়া হত। আমার মাথার বিনুনিতে, আমার মনে আছে, দুটো সোনার ফুল ছিল। পুজো পার্বণে আমার মা আমার কানের পাশে সরু সরু দুটি বিনুনি ঝুলিয়ে দিত, তাতে গুঁজে দিত দুটি সোনার ফুল। অন্য সময় অবশ্য চুল খোলাই থাকত। আমার তালুর ওপর চুল ছিল চার আঙুল চওড়া। মা আমাকে কানে আবার মাকড়িও পরিয়ে দিত। মেয়েদের মতো। আমার এসব মোটেই পছন্দ হত না। আমাদের পাড়ায় কোন ছেলেই বিনুনি বাঁধত না। ছেলেগুলো তাই আমার পেছনে লাগত, "আন্দা, তুই বিনুনি বাঁধিস কেন রে মেয়েদের মতন?"

"আরে, ও তো মেয়েই। কাঁনে দেখছিস না, মাকড়ি পরেছে?"

আমি খুব লজ্জা পেতুম ওদের এসব টীকা-টিপ্পুনি শুনে। একবার আমার একটি দুল কি জানি কোথায় হারিয়ে গেল। অমনি মা ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। ভাবলে, আমাকে হয়তো কেউ কিছু খাইয়ে একটা দুল কেড়ে নিয়েছে। বাবার কানে কথাটা গেলে হয়েছিল আর কি!

"বল, একা একা কোথায় ছেড়েছিলি ছেলেকে?" বলে মাকে যা একচোট মারত, হয়ত আস্তই রাখত না। এসব ভেবে মা-ই আমাকে মারতে মারতে মাটিতে শুইয়ে দিলে। মুখে সেই একই কথা, "দুল কে কেড়ে নিল, বল, তোকে বলতেই হবে।" দুল তো আর সত্যি সত্যি কেউ কেড়ে নেয় নি, এমনি হারিয়েছে, তাই মার ঐ প্রশ্নের জবাব আমার জানা ছিল না। "আমি জানি না, আমি জানি না," মার খেতে খেতে চিৎকার করে বলছি আর এ মাথা সে মাথা দৌড়ুচ্ছি। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় আবার ঘুমিয়েও পড়লুম।

সকালে উঠে রোজকার মতো রাস্তার ওপর উঠে খেলতে লেগেছি, দেখি সেই হারানো মাকড়ি বস্তায় আটকে আছে। আমি দুল নিয়ে মার কাছে গেলুম, "মা, এই দেখ দুল।"

"কোথায় ছিল?"

"বস্তায় আটকে ছিল।"

"হায়, আমার কপাল," বলে মা আমাকে বুকে টেনে নিলে।

মনে আছে স্কুলে ইনফ্যান্ট ক্লাস অবধি আমার কানে দুল ছিল। আমার পছন্দ না হলেও মা বলত, "থাকুক।" স্কুলে উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা নীচু ক্লাসের ছোট ছোট ছেলেদের ওপর মস্তানি করত, মারধোর করত। আমার খুব লাগত। মাথার তালুর ওপর ওরকম অদ্ভুত চুল তার সঙ্গে দু কানের দুপাশে লম্বা জুলপি দেখে ওরা ধরে টান দিত। এমনিতে মারামারিতে আমিও খুব একটা কম যেতুম না, তবে জুলপি ও মাথার তালুর চুলের ঝুঁটি একসঙ্গে ধরে টানাটানি করলে একটু বেকায়দায় পড়ে যেতুম। এদিকে যতক্ষণ না যন্ত্রণায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠছি ততক্ষণ ওরাও চুলের ঝুঁটি টেনেই যেত। কখনো বা একটা দুটো লম্বা চুল টানের চোটে ওদের হাতে উঠেও আসত। ওদের হাতে আমার মাথার চুল দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারতুম না। আরশোলার ঠ্যাং টান মেরে ছিঁড়ে নিলে যেমন যন্ত্রণায় ছটফট করে আমিও তেমনি অস্থির হয়ে ছটফট করতুম। ক্লাস ওয়ানে উঠে কোনরকমে আমি মাকে রাজী করিয়ে ঐ সব লম্বা চুল কাটিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। তারপর থেকে আমার পেছনে আর কেউ লাগত না। এখন আমি ছেলেদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারি। বরং আমিই এখন ওদের পেছনে লাগি। আমার সাহস বাড়ছে।

দেশাইদের বাগানে তিনটে কুয়ো ছিল। নীচের দিকের কুয়োটা বেশ গভীর, আশেপাশে বেতের ঝোপ, আগাছা আর জঞ্জালের স্তূপ, আর ছিল বড় বড় গাছের ঘন ছায়া। জলের দিকে ঝুঁকে তাকালে কুয়োর জল কুচকুচে কালো মনে হত। জল অনেক নীচে ছিল বলে পাথর ফেললে বেশ কিছুক্ষণ পরে তার শব্দ শোনা যেত। আমার কেবলি মনে হত এ কুয়োর জল যেন অনেক নীচুতে, অনেক গভীরে বয়ে যাচ্ছে। তাকাতে খুব ভয় হত। কুয়োটার এক ধারে নুয়ে পড়া একটা জামগাছ— ঠিক যেন একটা কুঁজো বুড়ো, বয়সের চাপে ঝুঁকে পড়েছে। থোকা থোকা টসটসে পাকা কালোজামগুলো দেখে মনে হত কোন গেছো ডানপিটে ছেলের অপেক্ষায়ই রয়েছে। অবশ্য ওদের হাত থেকে রেহাই পেলেও জামগুলো শেষ পর্যন্ত কুয়োর মধ্যেই পড়ে যেত। আমার মনে হত কালো কালো পাকা টসটসে ছোট বিচিওয়ালা জামগুলো সব সময় জলের মধ্যে পড়ত বলেই বোধহয় কুয়োর জল অত কালচে বেগুনি। কুয়োর জলের সঙ্গে এই জামগাছটির একটা যেন নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

মনে পড়ে একবার কুয়োর গায়ে একটা দুটো পাকা কালোজাম দেখে চুপি চুপি ঝুঁকে সেগুলো তুলতে গিয়েছিলুম। তুলতে পারি নি, তার আগেই পা পিছলে পড়ে গেলুম। ভাগ্যিস একটা ডালের ঝোপ টেনে ধরতে পেরেছিলুম। তারপর সেই ঝোপটি ধরে মা মা বলে চিৎকার জুড়ে দিলুম। কাছাকাছি কোন নালার ধারে মা বসে কাপড় কাচছিল। ছুটে এসে আমার হাত ধরে টেনে তুললে।

"বাছারে!" বলে মা বুকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না! একটাই ছেলে তো পেটে ধরেছিল তাও কতবার মানত করে পেটে এল। আমি যদি কুয়োতে পড়ে মরতাম তাহলে বাবা মাকে জ্যান্ত রাখত না।

এর পর থেকে মা আর আমাকে কুয়োর ধারে কাছেই যেতে দিত না। ছোটবেলার

সেই কালো জামের গাছ সেই দিন থেকে ক্রমে ক্রমেই আমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যেতে লাগল। আমি কিন্তু সেই কুয়োটাকে এখনও ভুলতে পারিনি।

মাঝের কুয়োটি পরিষ্কার হচ্ছিল। কুয়োর তলাটা ছিল সরু। অনেকটা লাট্টুর তলার মতন। নীচের দিকটা ছুঁচলো হয়ে গেছে। বাবার কোলে বসে দেখছি কুয়োর নীচে কুয়াতিরা কাজ করে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "ওরা কি করছে, বাবা?"

"কুয়োটা বড় করছে রে। মাটির পেট কেটে জল বার করবে, তাই গর্ত বড় করছে।"

"আমাকে দেখাও," বলে আমি বাবার কাছে আব্দার জুড়ে দিলুম।

"সে অনেক নীচে, তুই সেথায় নামতে পারবি নাকি?" কিন্তু আমি কি আব ছাড়ি? বাবার কাঁধে বসে সেই গভীরে নেমে গেলুম। মাটির গহ্বরে আমি যেন পিঁপড়ের মতন এঁকে বেঁকে পথ কাটতে কাটতে নেমেই চলেছি, নেমেই চলেছি।

নীচে এসে সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। জল কল কল করছে। আমি হাত দিয়ে জল ছানতে লাগলুম। জল আমার হাতে যেন কাতুকুতু দিয়ে গেল। সেখান থেকে একবার ওপরের দিকেও তাকালুম। মনে হল পৃথিবীটাকে সেই ওপরেই ফেলে এসেছি— সেখানে তার আকাশে বাতাসে মেঘ সাঁতরে বেড়াচ্ছে। নীচে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানকার ঘোলাটে জলে মাছগুলো মনের আনন্দে সাঁতার কাটছে, কিলবিল করছে। আশে পাশে পাথরের ভেতর থেকে এখানে সেখানে ঝর্ণার মতো জল ঝরে পড়ছে। আমার মনে হল জলেরও যেন প্রাণ আছে। মাটির পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে কুয়োর মধ্যে।

একদিন বিশু বুড়োর গণপা ছুটে এল আমাদের বাড়িতে। সে-ই খবরটা দিলে। বললে, ওপরের কুয়োটাতে নাকি আমাদের বড় বলদটা পড়ে গেছে। আমার বুক ধড়ফড় করে উঠল, বলদটাকে বোধহয় আর বাঁচানো গেল না। আমিও ক্ষেতের দিকে দিলুম এক ছুট। কম্বলা পিসির ছেলে বাবুও ছুটল আমার সাথে সাথে।

কুয়োর কাছে গিয়ে দেখি বেশ ভীড় জমে গেছে। জন পঞ্চাশেক তো হবেই। সাতাপ্পা নীচে গিয়ে বলদটাকে ধরে কুয়োর মুখের কাছে টেনে এনেছে। সরু একটা হাঁটা পথ কুয়োতে নেমে গেছে কিন্তু সে পথ বেয়ে বলদ ওপরে আসতে পারে না। তার বিরাট দেহ। বলদ বার করার জন্য পথ কাটা হচ্ছে। এদিকে অবলা জীবটি জলে সমানে সাঁতার কেটে যাচ্ছে আর ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। আমি এই দৃশ্য দেখে আর থাকতে পারলুম না। ভ্যাঁ করে কাঁদতে শুরু করে দিলুম। আমার এক কাকা আমাকে চুপ করিয়ে দিলে, বললে, "কাঁদছিস কেন, ও মরবে না। দেখ্, উঠল বলে।" সবাই পথ কাটার জন্য অবশ্য তোড়জোড় করছিল। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক খোঁড়াখুঁড়ির পর পথ বার হল। বলদ উঠে এল ওপরে— আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সে কি আজকের বলদ আমার জন্মের আগে থেকেই ও আমাদের সঙ্গে আছে পরিবারের একজন হয়ে।

ক্ষেতের আখ বুড়ো হবার আগেই কি করে তা চুরি করে খেতে হয় সে বিদ্যেটা আমাকে যে শিখিয়েছিল সে হচ্ছে চিখল্যাদের ধোণ্ডা। বয়সে আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। আমার ছোটবেলার হীরো। আমি ওর পিছু পিছু ঘুরতুম। ওতে আমাতে মিলে খুব খেলতুম। দেশাইদের আদ্ধেক জমিতে চিখল্যারা খাটত। বাকি আদ্ধেকটাতে আমরা। গাছে চড়ার বিদ্যেটাও ওই ধোণ্ডার কাছ থেকেই শেখা। মাঝের কুয়োর ধারে চিখল্যাদের ঝুপড়ি।

ধোণ্ড্যা সেখানেই শোয়। সে ঘুমের মধ্যে হাঁটত। একবার মাঝরাতে ধোণ্ড্যা কুয়োর ধারে হাঁটতে হাঁটতে বেশ আঁকা বাঁকা পথ ধরে পৌঁছুল সেই আখের ক্ষেতে। আখের গাছে পাতা নড়ার শব্দ হল। আশেপাশের ঝুপড়িতে যারা ছিল, গভীর রাতে আখের গাছে পাতা নড়ার শব্দ তাদের কানেও গেছে। আমাদের ক্ষেতের কাজের লোকটাও উঠেছে। "ওখানে কে রে?" বলে জোরে এক হাঁক দিলে। সে হুঙ্কারে ধোণ্ড্যার ঘুম গেল ভেঙে। সে জবাব দিলে, "আমি গণপুদা।" তখন তাকে ধরে এনে আবার ঝুপড়িতে ঢোকানো হল। চিখল্যাদ্রের তুকা এবার দরজায় ভাল করে খিল দিয়ে কষে বেঁধে ধোণ্ড্যাকে ঘুম পাড়ালে। সেই গল্পের খেই ধরে আমি এর পর বেশ কিছুদিন ধোণ্ড্যার পেছনে লাগতুম। আমার অনেক দিনের মজার খোরাক।

ফলের বাগানে যে কতরকমের ফল খেতুম— তার সবটাই কি মনে আছে! রামফল, আতা, কালো জাম, কচি ডাব, পাকা তেঁতুল। বুনো আমই তো ছিল কত রকমের, কত রঙের। হলুদ, টিয়া রং, কেশর, লাল, মধু রং— আরো কত কি! নারকোলের মতো বড় আমও যেমন ছিল লবেঞ্চুসের মতো ছোট ছোট আমও তেমনি ছিল। নানা রকমের আম আর তাদের আলাদা আলাদা স্বাদ আর গন্ধ। আমের আঁটি চুষতে যে কি মজা! হলুদ আঁশ দিয়ে আরম্ভ করে এক্কেবার সেই ন্যাড়া আঁটি অবধি চুষেই যেতাম। আমগাছে ভর্তি ছিল বাগান। তাদের ছায়াতে সারা বাগান ঠাণ্ডা হয়ে থাকত। সারা জীবনের আম হয়তো আমি এই বাগানেই বসে খেয়েছি। আমার সবচেয়ে বেশী পছন্দের সেই কালো কালো আখের গোছাগুলো তারপর আর আমি চোখেই দেখিনি।

আমার যখন সাত বছর বয়স তখন এই বাগান আমরা ছেড়েছি। কিন্তু সেই বাগানের ছবি এখনও আমার মনের মাঝে নিখুঁতভাবে ধরা পড়ে। দুদিক দিয়ে ঝোরার জল কলকল করে বয়ে যাচ্ছে— ধারে ধারে তেঁতুল গাছ ছাড়াও কত বাঁশ আর বেতের গাছপালাই না সেই ঝোরার জলকে যেন তাদের মায়ামমতা দিয়ে ঘিরে রাখত। তেঁতুলগাছের তেঁতুল, কাঁচা আমের গুটি খেয়ে খেয়ে দাঁত যেত টকে।

ছোট্ট ঝোরাটির পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকত দেশাইদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচিহ্ন সেই সব সমাধি—উঁচু উঁচু মন্দিরের মতন। আমি ছোটবেলায় সেখানে কত লুকোচুরিই না খেলতুম। অনেক কাল পরে স্কুলে পড়তে গিয়ে যখন বাল কবির নির্ঝরিণী কবিতাটি পড়তে গেলুম, তখন আমার মনে হল এই নির্ঝরিণীই আমার সেই ছোটবেলাকার অতি কাছের, অতি পরিচিত ছোট্ট ঝোরাটি।

চার

স্কুলের প্রথম দিনটি আমার বেশ ভালই মনে পড়ে।

গুড়ীপারওয়া* অর্থাৎ নতুন বছরের দিনপনের আগে স্কুলে যাবার তোড়জোড় আরম্ভ হল। কাল্লু আন্নার ওপর ভার পড়ল আমার কুর্তা আর পাজামা সেলাইয়ের। নতুন রঙিন ডোরাকাটা থলে কেনা হয়েছিল। বাবার হাত ধরে বাজারে গিয়ে আমি কাটক্যাদের দোকান থেকে নতুন স্লেট আর পেন্সিল কিনে আনলুম। পারওয়ার আগের দিনই নারকোল আনা হয়েছিল। থলে ভর্তি লম্বা লম্বা বাতাসাও এনে এগুলোকে একটা পুঁটলিতে করে ঘরের সামনে পেরেক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হল। মা আগে থেকেই নতুন জামাকাপড় এনে রেখেছিল। নতুন জিনিসে আমাকে মা আর বাবা হাত দিতে দিলে না। বছরের কোন এক সময় মোটে একটিবার নতুন জামাকাপড় পেতুম। দর্জির দোকান থেকে সেগুলো পাওয়া মাত্রই গায়ে উঠে যেত। তারপর আর কি! সেগুলো পরে মনের আনন্দে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরতুম। এবার আমার মুস্কিল হল, এবার আর আমি এসব পরতে পারলুম না। বাতাসা বাড়িতে খুব কমই আসত। ন'মাস ছ'মাসে হয়তো একবার। সে কি আর পেট ভ'রে খাওয়া যেত? আনামাত্রই তো নিমেষেই গোগ্রাসে ওগুলোর সদ্ব্যবহার হয়ে যেত। জোয়ারের মতো ছোট কণাও থালায় পড়ে থাকার জো ছিল না। সেই বাতাসা কিনা আজ চোখের সামনে পেরেকে ঝুলছে! তাছাড়া, স্লেট পেন্সিল? তার আকর্ষণই কি কম? সেই রঙচঙে থলের মালিক কিনা আমি আর তার ভেতরে নাকি সব আমারই জিনিস! আসতে যেতে বারবার আমি কেবল সেইটেই দেখে ফিরতুম। থলেটি নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা! খালি ভাবছি বাতাসা যে কখন খাব, নতুন জামাকাপড়ই যে কখন পরব, আর আমার নতুন স্লেটে কখন যে আঁচড় কেটে ছবি আঁকব। আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। পারওয়ার আগের দিনটি যেন কাটতেই চায় না।

কিন্তু পারওয়া এল। সকালে সাত তাড়াতাড়ি মা আমাকে ঘুম থেকে তুলে চান করালে। এক রাশ তেল মাথায় আচ্ছা করে মাখিয়ে দিলে। তাতেও যেন হল না। সেই তেলমাখা হাত মা আমার মুখে হাতে পায়ে বুলিয়ে দিলে। নতুন জামা কাপড় পরলুম। মাথায় চেপে বসল নতুন একটি কালো টুপি। ততক্ষণে বাবা পতাকা উঠিয়েছে। পতাকা ওঠাবার জন্য সেদিন আমি একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। তারপর আমাকে নিয়ে বাবা রওনা দিল স্কুলের দিকে। আমার থলেটি বাবার হাতেই ছিল। থলের ভেতর স্লেট আর বাতাসা। বাবাকে আজ খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছে। থলেটা দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাচ্ছে। কে জানে, হয়ত মনে মনে কিছু মজার কথা ভাবছে।

"খুব পড়তে হবে রে, বুঝলি?"

"হ্যাঁ," আমি খুশী হয়ে উত্তর দিলুম।

* পয়লা চৈত্র। গুড়ী অর্থাৎ পতাকা তুলে নতুন বছর আরম্ভ হত।

"দেওয়ানজী হতে হবে বুঝলি?"
"হ্যাঁ।"

আমাদেরই গলিতে বিঠোবা সনগর নামে বাবার এক বন্ধু ছিল। ক্লাস ফাইভ অবধি তার বিদ্যে। দেবনাগরী আর মোডী দুটো লিপিই সে জানে। বেশ তরতর করে সে সব পড়তে পারত। বাড়ির যে কোনো কাগজ, চিরকুট চাষীদের দরকারী বা মিউনিসিপ্যালিটির কাগজ আরও কত কি— সব কিছু পড়বার দরকার হলেই এই দেওয়ানজী না হলে চলতই না। সারাপাড়ার কাগজপত্র পড়ে দেবার ওই একটিই লোক ছিল। তাই সবাই তাকে দেওয়ানজী বলে ডাকত।

বাবার কোন কিছুই পড়ার ক্ষমতা ছিল না। শুধু বাবাই নয়, এ বংশে কেউই কোনো কালেও পড়তে জানত না। কিন্তু এখন সময় পালটেছে। বাবার মতন আজকের ছেলেমেয়েরাই এখন স্কুলে পড়াশোনা করছে। এ পাড়ারই সনগর সমাজের সবাই, যারা এতদিন ঘোংরী বা কম্বলের ভেতর জবু থবু হয়ে বসে কাটিয়ে দিত, তারাও যখন তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়তে পাঠাচ্ছে তখন আমাদের ছেলেমেয়েরাই বা না পড়বে কেন? গাঁয়েব ছেলেমেয়েরা যাতে বেশী করে পড়াশুনা করতে পারে তার জন্য শাহু মহারাজ মহা উৎসাহে রাজপ্রাসাদের মতো বড় বড় স্কুল বাড়ি খুলেছেন। না হয় চারটে ক্লাস অবধিই পড়তে পাবে, তাতেই বা ক্ষতি কি? ছেলে কোথায়ও দেওয়ানজী হতে পারলে পাঁচটা নামী দামী লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় তো হতে পারে। একটা মোটামুটি ভাল জমি ভাগে চাষ করতে পেলেও তো কিছু আনাজপাতি খেতে পাবে। এটাই বা কম কিসে? বাবাব মনটা আজ যেন হাতের রঙিন থলেটার মতোই রঙিন আশায় দুলছে। আমার কেবলি মনে হতে লাগল নতুন একটা কিছু যেন হতে চলেছে।

আমরা পৌঁছুবার আগেই স্কুল বসে গিয়েছিল। স্কুল বসত রাম মন্দিরে। আমি এর আগে সেখানে কোনোদিন যাই নি। যেমন মস্ত বড় দরজা, তেমনি তার মস্ত বড় পাথরের চৌকাঠ। আমি প্রথমে তারই ওপর কিছুক্ষণ উঠে বসলুম। তারপর ভেতরের দিকে পা ঝুলিয়ে নেমে পড়লুম। ওপরে যাবার কালো কালো সিঁড়ি। বেশ বড় বড় ধাপ। আমি হাত দিয়ে ধরে আস্তে আস্তে এক পা এক পা করে উঠে গেলুম। সিঁড়ি যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে সেখানে বেশ অনেকটাই খোলামেলা জায়গা রয়েছে। মাস্টার মশায়ের টেব্‌ল চেয়ার এক ধারে— পড়ুয়ারা তিনটি সারি করে বসেছে। বেশ জোরে কি যেন হচ্ছিল। ছাত্রবা স্লেট হাতে কি সব বলছিল। দেয়ালে একটা কাপড়ের ছবির মতন ঝুলে আছে। কালো ডুরে কাটা একটা কোট আর সাদা ধুতি পরা একটু কুঁজো মতন কে একজন ছাত্রদের সারিগুলোর মাঝখানে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে, হাতে একটা সবুজ ডালের ছড়ি। সেটা সে ঘোরাচ্ছে আর হেঁটে বেড়াচ্ছে।

স্কুলে আমার মতন একদম আনকোরা ছাত্রও ছিল। এদলের প্রায় দশ পনের জন

এক ধরনের মারাঠি লিপি। এখন অপ্রচলিত।

দেয়ালের এক কোণে বসে বসে ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল। মাঠে ভেড়ার দল চরাতে নিয়ে গিয়ে ভেড়ার বাচ্চাদের আলাদা আটকে রাখলে ওরা যেমন চিৎকার জুড়ে দেয় এদেরও অনেকটা যেন তেমনি অবস্থা। আমার অবশ্য একটুও কান্না পায় নি, বাবা সঙ্গে ছিল কিনা।

স্কুলে ভর্তি তো হলুম। প্রথমে 'শ্রী'' লিখতে হয়। আমাকে তাই লেখানো হল। মাস্টারমশাই তাঁর খরখরে হাতে প্রথমে "শ্রী" শব্দটা লিখলেন। ওরকম খরখরে হাতে পেনসিল তুলে দিতে আমার মন চাইছিল না কিন্তু কি করব মাস্টারমশাই আমার স্লেট আর পেনসিল নিলেন। তারপর অকারণেই "শ্রী" শব্দটা বেশ জোরে উচ্চারণ করলেন। ঐ অত বড় বড় গোল গোল চালশে পড়া চোখে চশমা আর কপালের ফাঁক দিয়ে ছাত্রদেব দিকে তাকালে একটু ভয় করত বৈকি।

শ্রীরামচন্দ্রজীর নাম স্মরণ করে বাবা নারকোল ভেঙে চিনির প্যাকেটটা খুললে। একটু মুড়ি, চিনি তাতে সেই কাঠি বাতাসা মিশিয়ে সেই মেশানো মাখাটা ছেলেদের মধ্যে জনে জনে ভাগ করে দিলে। আমার হাতেও বাবা একটা বাতাসার কাঠি গুঁজে দিলে। এতক্ষণ আমি কান্নাকাটি করি নি কিন্তু এবারে আমি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললুম। কাঁদব নাই বা কেন? এসব ভাল ভাল জিনিস বাড়িতে যখন এসেছিল তখন মা-ই তো বলেছিল, "স্কুলে গেলে এসব জিনিস তুই-ই তো পাবি।" তাই শুনেই না আমার স্কুলে যাবার এত আগ্রহ! বাবার হাতের থলেকে ভরসা করেই তো আমার স্কুলে আসা— তাই নয় কি? তবে কেন বাবা সব এভাবে ছেলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিলে? আমার কান্নার বহর দেখে মাস্টাবমশাই সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হলেন, একটা চকের কাঠিও ধরিয়ে দিলেন হাতে। যেন চকের কাঠির জন্যই আমি কাঁদছি, আর চকের কাঠি দিলেই আমার কান্না থেমে যাবে। খড়ির কাঠিটি দেখতে বাতাসার কাঠির মতনই— তবে বাতাসা তো আর নয়।

প্রথম দিন বলেই হয়ত সেদিন সবচেয়ে কম ক্লাস হল। সে ক্লাসে পরীক্ষা টরিক্ষা ছিল না। পরীক্ষা হত পরে— হয়েই গরমের ছুটি হয়ে যেত। গুড়ী পারওয়ার দিন ছেলেপুলেদের স্কুলে ভর্তি হবার রেওয়াজ ছিল বলেই ছুটিটা পরের দিন দেয়া হত। বোধহয় সেজন্যই আমি ছুটি পেলুম পরের দিনই।

তারপর আবার আমার স্কুল যেতে যেতে সেই বর্ষা হয়ে গেল, সব ঠিকঠাক মতন চলতে আরম্ভ করল, দিনের পর দিন কেটেও যেতে লাগল। সময় দাঁড়িয়ে নেই কারো জন্যে।

একদিন সকেকার মাস্টার হাতের সবুজ ছড়িটা দেয়ালের গায়ে ঠেকিয়ে নানারকম জিনিস দেখিয়ে অক্ষর পরিচয় করাচ্ছিলেন। যে সব জিনিসের নাম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন তার কিছু কিছু আমার চেনা। কিন্তু 'আ' দেখাতে গিয়ে যখন আনারসের ছবি দেখালেন— তখন জিনিসটা যে কি বুঝতেই পারলুম না— এর আগে আনারস দেখি নি যে। রেলগাড়ি দেখে আমি প্রায়ই গাড়ির সামনের দিক কোনটা আর পেছনের দিকই বা কোনটা বুঝতে পারতুম না— গুলিয়ে যেত। এভাবে কয়েকটা জিনিস, কোনটা কি, বুঝতে আমার গোটা বছরই লেগে গেল। কিন্তু স্কুলে পড়তে গেলে

এসব যে শিখতে হবেই তা আমি ভালভাবেই বুঝে গেলুম। স্কুলে পড়ার প্রথম বছরের অনেক ঘটনাই এখন আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমরা পড়ুয়ারা যেখানে বসতুম সেই মেঝেটা বছরে মোটে একবার গোবর দিয়ে নিকোনো হত গরমের ছুটিতে। তাই তো সে মেঝেতে একরাশ ধুলো জমে থাকত। ছুটির ঘণ্টা বাজলে মাঠে গোরুর দল ছোটালে যেরকম ধুলো ওড়ে সেরকম ধুলো উড়ত। একরকম ধুলোর ঝড়ই বয়ে যেত বলা চলে। মাস্টারমশাইরা তাই ক্লাস শেষ হতে না হতেই নাকে ধুতি গুঁজে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে পড়তেন। সারা গায়ে চূণ মাখলে যেমন হয় তেমনি ধুলো মাখা হাত পা নিয়ে বাড়ি ফিরতুম। মা ধরে ধরে আমার হাত পা ধুয়ে দিত। কিছুদিন এসব দেখে মা স্কুলে যাবার আগে একটা বস্তা দিয়ে দিত— আসনের মতন করে বসবার জন্যে। সেই বস্তা বগলে করে আমি স্কুলে হাঁটা দিতুম। ধুলো কিন্তু তাতে আটকাত না, বাড়িতে এসে সেই হাত পা ভাল করে ধুতেই হত।

শ্রীরামচন্দ্রজীর মন্দিরের মূর্তির সামনে যে মস্ত বড় ঘণ্টাটি ছিল তা প্রথম বছরের মধ্যে বাজাবই বাজাব স্থির করলুম। এত বড় ঘণ্টা আগে কোনদিন দেখি নি। ঘণ্টাটির পাশে যে বড় থামটি ছিল তাই জড়িয়ে বাঁদরের মতন উঠে যেত সবাই। তারপর পা দিয়ে থামটা কষে ধরে রেখে হাতে স্কেল নিয়ে ডান হাত দিয়ে ঘণ্টা বাজাত। ঘণ্টাটার মধ্যে যে নোলক ঝুলত তা যদি বা নাও নাড়াতে পারত তাহলেও ঘণ্টার গায়ে জোরে জোরে স্কেলটা দিয়ে পেটাত। শব্দ বেশ জোরদারই হত। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার প্রতিধ্বনি শোনা যেত। নীচে দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করেও স্কেল ঘণ্টা অবধি পৌঁছুত না। লাফালেও হাত যেত না। যখন পনের মিনিটের ছুটি পাওয়া যেত ক্লাসে বা মাঝখানের ছুটিতে আমরা থামে উঠে পড়ে ঘণ্টা বাজাতুম। যারা এভাবে উঠে ঘণ্টা বাজাতে পারত তারা অন্যদের চোখে হীরো বনে যেত বই কি! আমার অবশ্য এভাবে হীরো হবার সৌভাগ্য কখনও হয় নি। থাম বেয়ে বেয়ে ওঠা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব হত না। আমাকে উঠতে হলে তলা থেকে কাউকে ঠেলে ধরে দাঁড়াতে হত। তাছাড়া, এভাবে ওপরে উঠেও হত না, কেননা উঠতুম তো দাঁতে স্কেল চেপে। সেটা হাতে বার করে ধরতে গেলেই মনে হত এই বুঝি পড়লুম। আর, সাহস করে যদি বা থাম ছেড়ে একটা হাতে স্কেল বাড়াতুম সেটাও বেশীদূর তো আর যেত না। যতবার হাত লম্বা করে বাড়াতে গেছি ততবারই হড় হড় করে পিছলে নীচে নেমে গেছি। একসময় স্কুলের সবচেয়ে নীচু ক্লাস থেকে পরের ক্লাসে উঠলুম। কিন্তু হায়! ঘণ্টা বাজাতে পারলুম কই? আমার হাতে রামচন্দ্রজীর মন্দিরের ঘণ্টা বাজবে, তার শব্দে মন্দির গম গম করে উঠবে এ আমি মনে প্রাণে চাইতুম। মন্দির তো নয় যেন একটা বিরাট প্রাসাদ।

স্কুলের প্রথম অর্থাৎ সবচেয়ে নীচু ক্লাসটি কবে যে পাশ করে ফেললুম বুঝতেই পারলুম না। মনে আছে মাস্টারমশাই একদিন সবাইকে ডেকে বললেন এবারে ওপরের ক্লাসে বোস্ গিয়ে তোরা। ওপরে মানে ওপরতলায় এটুকু বোঝা গেল। দুটো দেয়ালের মধ্যে দিয়ে একটা সরু সিঁড়ি ছিল। সেটা দিয়ে একজন মানুষই উঠতে পারত। যখন প্রথম শ্রেণীতে ছিলুম তখন চুপি চুপি সিঁড়ি অবধি গিয়ে ওপরটা উঁকি মেরে দেখে

এসেছি কতবার। বেশীদূর যেতে পারতুম না, অন্ধকার দেখে ভয়ে পালিয়ে আসতুম। এখন সেই সিঁড়ি দিয়েই ওপরে উঠতে হচ্ছিল। এক ধাপ এক ধাপ করে আস্তে আস্তে স্লেট পেন্সিলের থলে সিঁড়িতে ঠেকাতে ঠেকাতে ওপরে উঠে যেতুম। প্রথমে একা একা যেতে ভয় হত, পরে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল। সেই সিঁড়িতে বেশ উঁচুতে একটা ছোট্ট জানালা ছিল। কোণের দিকে একটা ধাপে পা দিয়ে ক্লাস ওয়ানের ডানপিটে ছেলেরা টিকটিকির মতন আঁকড়ে আঁকড়ে চলে যেত আর জানালার শিক ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকত। সেই সরু ধাপে জানালার দিকে মুখ করে শুয়ে শুয়ে রাস্তা দেখতে বোধ হয় খুব মজাই হত। এভাবে অনেক ছেলেই ওপরে যেত। যারা উঠতে পারত না, তাদের তলা থেকে পাছায় ঠেলে ধরত অন্যরা, যাতে ওরাও দেখতে পায়। এরকম করে দুচারজনের দল সিঁড়িতে উঠে এ সব কাণ্ড করত।

পরের ক্লাসে উঠেই আমিও একটা দলে ভিড়ে পড়লুম আর এভাবে ওঠাব মহড়া শুরু হল। আমরা চারজনে জানালার কাছে এলুম। আমার পা দুটো ধরে ছেলেরা আমাকে ওপরের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। ওপরে উঠতে বেশ ভয় করছিল, জানতুম নীচে নামা সোজা হবে না। সেই ঘেঁষটে ঘেঁষটে নামতে হবে। এত সরু জায়গাটা যে একজনই ঘেঁষটে যেতে পারে। আচ্ছা, এত সরু জায়গায় যদি আটকে যাই? যা হয় হবে। এভাবে ওঠার আগ্রহ তো কম ছিল না। সবাই যদি উঠতে পারে, দেখতে পারে আবার নামতেও পারে, আমিই বা কম কিসের? তাই আঁকড়ে আঁকড়েই উঠে গিয়ে জানালার শিক হাতের নাগালের মধ্যে আসতেই খপ করে ধরে ফেললুম। এর আগে তো আর কখনো এত উঁচুতে উঠিনি। এদিকে নীচে যারা আমাকে ধরে দাঁড়িয়েছিল তারা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। কি সাংঘাতিক দৃশ্য দেখলুম জানালা দিয়ে! রাস্তার মানুষগুলোকে খুব ছোট দেখাচ্ছে। পথ দিয়ে যাচ্ছে যে মোষগুলো তাদের পিঠ এই প্রথম চোখে দেখলুম। গাড়ির ওপরটা, বাড়ির ছাত, গাছের মাথা— সবই প্রথম দেখছি উঁচু থেকে। কি আশ্চর্য লাগছে সব কিছুই। এত উঁচুতে উঠে ভয়ও করছিল না যে তা নয়। ভাবছিলুম গাছের বাঁদরগুলো তো দুনিয়াটা তাহলে এভাবেই দেখে।

শিক ধরে ঝুলতে ঝুলতে এদিকে হাতে কড়া পড়বার উপক্রম। এবার নীচে নামতে হয়। সঙ্গীদের হাঁক দিলুম, "ওরে। আমি নামছি কিন্তু।" কিন্তু কেউ কোথায়ও নেই। আমার পা ধরার কেউ না থাকলে তো নামতেই পারব না। একবার দুবার ডাক দিলুম কিন্তু কেউ সাড়া দিলে না। আমার ঘাম ছুটে গেল। হাত ছেড়ে দিলে তো সিঁড়ি দিয়েই গড়িয়ে পড়ব। উঁচুতে ঝুলে রয়েছি। খুপরিতে আটকে ছিলুম বলে পেছন ঘুরে যে দেখব তারও উপায় নেই। এখন কি করি? মরিয়া হয়ে মা মা করে দিলুম এক বিকট চিৎকার। বিছে কামড়ালে যেমন লোকে চিৎকার করে অনেকটা সেরকম। সেই সঙ্গে কান্নাও জুড়ে দিলুম। আমার দলের তিনজন ততক্ষণে "যকাতেদের আন্দ্যা সিঁড়ির জানালায় উঠে আটকে রয়েছে" এই বলে খবর দিয়ে দিয়েছে। এই সিঁড়ির জানালার কথা সবাই জানত। ছেলেরা এখানে উঠে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে দেখলেই কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করেছিলেন আর আমি তো একেবারে জানালায় আটকে বসে

হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছি। নিম্বলকর মাস্টারমশাই তো হাতে ছড়ি নিয়েই ছুটে এলেন। তাঁর পিছু পিছু এক দঙ্গল ছেলে দৌড়ে এল মজা দেখতে। মাস্টারমশাই কোনো কথা না বলে প্রথমেই আমার পাছায় লাগালেন পাঁচ-সাতটি ছড়ির ঘা। মনে হল পেছনে যেন অনেকগুলো কালো পিঁপড়ে একসঙ্গে কামড়াল। হট্টগোলের মধ্যে কখন যে আমার হাত জানালার শিক ছেড়ে দিয়েছে টেরও পাইনি। আমি ধপ করে পড়লুম ঠিক মাস্টারমশায়ের সামনে। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে বেতের ঘা পড়ল পিঠে তিন-চারটি। ঘা খাবার পর কোনো একসময় ছুটে পালিয়ে গেলুম।

আমাদের ইনফ্যান্ট ক্লাসের লাগোয়া বাঁদিকের ঘরে বসত ক্লাস ওয়ান। ডানদিকে পড়ত রামমন্দির— সেই দিকটার আদ্ধেকটা বন্ধ ছিল আর তাতে চারটে দরজা ছিল। পুরোনো কাঠের তক্তা পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে ঐ দরজাগুলো তৈরী করা হয়েছিল। দরজা এক দিকেই খুলত। তার বড় বড় কড়াগুলোতে তালা লাগানো থাকত। কড়াগুলো ছিল বিরাট বিরাট সে তুলনায় তালাগুলো একেবারেই পল্‌কা, ফলে কড়াগুলো দিব্যি আলগা করা যেত তালাগুলো থেকে। রামমন্দিরের সেই বড় বাড়িটা অনেক বছর ধরে ব্যবহারই হয়নি। দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে অন্ধকারে বাদুড় উড়ত দেখতুম, একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরুত। যেটুকু আলো দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকত তাতে দেখা যেত মাকড়সার জাল। কাঠের অনেক পুরোনো জিনিসও এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিল। বাদুড়গুলো চিক চিক আওয়াজ করে কখনও উড়ত, কখনও বা বসত।

এ অন্ধকার রাজ্যে যে ভূত প্রেত রাজত্ব করত তা আমরা ছেলের দল মনে প্রাণে বিশ্বাস করতুম। এদের নিয়ে আমাদের মধ্যে অনেক কথাও হত। আমরা জানতুম এসব ভূতেদের জন্যে গাঁয়ে অনেক জায়গাই ছিল— ভাঙা মসজিদ, পুরোনো ভাঙা বসতি, ব্যবহার হয় না এমন সব ভাঙা কুয়ো— এসব তো ওদেরই জায়গা। এসব জায়গায় ভূতেরা বাস করত। ভূত যখন আছে, তখন গাঁয়ে ওঝাও ছিল চার-পাঁচ জন। মাঝেসাঝে কয়েকজন মেয়েকে নাকি ভূতে ভর করত। তখন ওঝারা ঝাঁড়ফুক করত। ওই মেয়েদের গাছের সঙ্গে বেঁধে বেদম পেটানো হত। তাতেই ভূতেরা পালিয়ে যেত।

ভূতের গল্প আমাদের মধ্যে খুবই হত। ভূতের নানারকম বর্ণনা হত— শুনতে বেশ মজাই লাগত। গায়ে কাঁটাও দিত— ভয়ে হাত পা সেঁধিয়ে যেত। ভূতের একটা দুটো গল্প আমার মনে ছিল যেমন ভূতেরা কালো হয়, কিন্তু ওদের চোখ ধবধবে সাদা হয়। তাদের পা উল্টো হয়। কখনো কখনো ওরা মানুষের মতো দেখতে হয়ে মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সুন্দরী মেয়ে দেখলে ওরা ওদের ওপর ভর করে। কখনো কোন লোককে অদ্ভুত দেখলে বা সে অদ্ভুত ব্যবহার করলে তাকে আমার ভূতই মনে হত।

নিম্বলকর মাস্টারমশাই যিনি আমাকে মেরেছিলেন তাঁর পা কিছুটা বাঁকা ছিল। তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুল একটু বেঁকে থাকত। হাতের আর পায়ের আঙুলের সামনের দিকটা চিনেবাদামের খোসার মতন গোলগাল মোটাসোটা দেখতে ছিল কিন্তু নখগুলো ছিল চওড়া বাঁকানো। যখনই স্কুলে যেতুম দেখতুম তিনি চেয়ারে বসে কিছু-না-কিছু

করছেন। মনে হত তিনি ঐ অন্ধকার প্রাসাদ থেকেই বেরিয়েছেন। চোখ পিটপিট করে তাকালে তাঁর মুখ হাঁ হয়ে যেত। বড় বড় দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ত। আমার খুব সন্দেহ হত উনি ভূতেদেরই একজন নয় তো? ভাবতুম মানুষের চেহারা নিয়ে এসেছেন, দাঁতের আর আঙুলের গড়নে যা একটু ভুল হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম আমি তাঁকে শুধু চেয়েই দেখতুম, খুবই ভয় করত।

আমার ওপরের ক্লাসে বাগানের মালীর ছেলে পড়ত। মিশমিশে কালো, চোখগুলো ফ্যাকাসে সাদা, মনে হত যেন ঠেলে বার হচ্ছে আর মুখটা অনেকটা ঘোড়ার মতো। ভীষণ দুষ্টু ছিল ছেলেটি, ক্লাসে মোটেই থাকত না, প্রায় সময়ই বাইরে বাইরে কাটাত। ছেলেদের সঙ্গে খেলা করেই যাচ্ছে— কখনও পেন্সিল নিয়ে, কখনও বোতাম নিয়ে কখনও বা কোনো কিছুর বিচি নিয়ে। পকেটটা তার সব সময় ভর্তি থাকত। মারামারির সময় প্রথমেই সে তার ঘোড়ার মতন মুখ দিয়ে কামড়াবার চেষ্টায় থাকত। আর, ভূতের কথা জিজ্ঞেস করলেই সে বলত, "ওরে ভূতেরা আমার বন্ধু জানিস?" কখনও কখনও সে বড় বড় দরজার কড়া টান মেরে খুলে ফেলত আর অন্ধকারে ঢুকে হারিয়ে যেত। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎই হাজির হয়ে যেত অন্য একটা দরজা দিয়ে। হাতে ঝুলছে একটা চামচিকে। ছোঁড়া ওটা দেখিয়ে আমাদের বলত, "জেনে রাখ্ এরাও ভূত। আরে, মানুষ ভূত হলে দিনের বেলায় চামচিকে হয়ে অন্ধকারে ঝুলে থাকে, বুঝেছিস? এই দেখ ওর দাঁত এই ওর কান আর এই ওর মুখ।" চামচিকেগুলোর দাঁত কান দেখতে দেখতে আমাদের সত্যি সত্যি মনে হত আগের জন্মে ওগুলো মানুষেরই দাঁত কান ছিল। চামচিকেগুলোর চোখের দিকে তাকিয়ে কেন জানি না মনে হত মানুষকে ম্যাজিক করে ছোট করে যেন রাখা হয়েছে। এই ছোকরার ধারে কাছে আমি বড় ঘেঁষতুম না। ওকেও আমার ভূতের ছানা ছাড়া আর কিছুই মনে হত না।

সে বছর ইনফ্যান্ট ক্লাসে আমরা ভূতের গল্পই শুধু করেছি। শেষে এমন হল যে ছেলেরা স্কুলে আসতে রীতিমত ভয় পেতে লাগল। এরই মধ্যে নিম্বলকর মাস্টারমশাই একদিন আমাদের চুপ করিয়ে ভূত আর ভগবানের বিষয়ে অনেক কথাই বললেন। সব কথা আজ আর মনে নেই তবে এটুকু মনে আছে উনি বলেছিলেন ভূতেরা ভগবানকে ভীষণ ভয় করে। আর রাম নাম নিলে তো তারা সটান দৌড়ে পালিয়ে যায়। আমাদের স্কুল তো সেই রামের মন্দিরেই বসে। এখানে কি ভূতেরা ঠাঁই পায়? তারা শ্রীরামচন্দ্রজী থেকে একশ' হাত দূরে থাকারই কথা। তাই এখানে ভূতের ভয় করলে তো স্রেফ বোকামিই হবে। মাস্টারমশায়ের কথা শুনে আমাদের সাহস এল, আমরা বুকে বল পেলুম। আমি বাড়িতে মার কাছে নিম্বলকর মাস্টার মশায়ের পায়ের কথা আর ঐ ছেলেটার কথা বললুম। মা তো শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলে। নিম্বলকর মাস্টারমশাইকে মা চিনত। আমার জন্মের আগে নাকি তাঁদের কাছে দুধ দিতে যেত। মাস্টারমশায়ের স্ত্রী নাকি মাদের গলির কোনো এক বাসিন্দের বোন হয়। মা আমাকে বুঝিয়ে দিলে যে ওরা ভূত নয়, মানুষই। এর পর থেকে ওদের সম্বন্ধে আমার ভয়টা আস্তে আস্তে কমে যেতে লাগল।

রামমন্দির থেকে এক ফার্লং-এর মধ্যে ছিল একটা মোটরের আড্ডা। "কোথায়

গিয়েছিলে?" জিজ্ঞেস করলেই বলত মোটর আড্ডায় গিয়েছিলুম। মোটর সার্ভিস ছিল কাগল-কোলহাপুর আর কাগল-নিপ্পানি এ দুটো রুটে। সেই মোটর আড্ডার ঠিক মাঝখানটিতে একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ ছিল। বিরাট উঁচু, ওপরে সব সময় শব্দ হত, কি যেন নড়ত। গাছটার চারধারে বেদী দিয়ে বাঁধানো ছিল। সে বেদীতে বসে একটা বুড়ি ভুট্টা বেচত। হাতে একটা পাখা, ভুট্টাতে হাওয়া দিচ্ছে। তারই কাছাপাছি পাওয়া যেত চিনে বাদাম আর মুড়ি। এক পয়সার মুড়ি আর বাদাম কিনলে জামার কোঁচড় ভরে যেত। খেয়ে শেষ করা যেত না। বন্ধুদের মুঠো মুঠো করে বিলোতুম। তাতেও আমার অনেক থাকত। এই খেয়ে আর তারপর জল খেলে পেট ফুলে ঢোল হত, দুপুরে টিফিনের ছুটিতে চাপ চাপ লাগত। ভুট্টা আমাদের ক্ষেতে অনেক হত, তাই ওতে বেশী মজা পেতুম না। বাদুড়গুলো অশ্বত্থ গাছে বসে পাশের গাছের ফল খেয়ে তার বিচিগুলো ফেলত নীচে। সেই বিচি দিয়ে খেলতে যে কি আনন্দই হত! বিচি কুড়োবার জন্য ছুটি পেলেই আমি দৌড়ে চলে আসতুম এই মোটর আড্ডায়। কাছেই খাল দিয়ে জল বয়ে যেত। মাঝেমাঝেই খাওয়াটা যখন একটু বেশী হয়ে যেত তখন সেই খালের ধারে যাবার দরকার পড়ে যেত আমার। পেটটা খালি করে বেশ হালকা হয়ে ফিরে আসতুম। আড্ডাতে যারা আসত তাদের অনেকেই এই খালের ধারে পেট ও মন দুই-ই খোলসা করে আসত। নামই ছিল তাব ফুলের খাল, আসলে ফুল ধারে কাছে তো ছিলই না (পরে জেনেছিলুম ওটা ফুলের খাল নয়, পোলের খাল) বরং যা বদ্ গন্ধ মা গো! খালের শেষের দিকে আরও এক ফার্লং দূরে যেখানে তারের বেড়া আরম্ভ হয়েছে সেখানে হলুদ কেওড়া গাছ ছিল। গাঁয়ে যখন সত্যনারায়ণ বা অন্যদেবতার পুজোআচ্চা হত বা বিয়ে-থা হত তখনই সেই কেওড়ার ফুল এনে সেখানে ঝুলিয়ে রাখা হত। বামনীদের খোঁপায় দেখতুম তীরের মতন সোজা কেওড়ার পাতা তিনকোণা ভাঁজ করে গোঁজা রয়েছে।

মোটর আড্ডার নামটা আড্ডা হলে কি হবে জায়গাটা ছিল একেবারেই নিরিবিলি, চুপচাপ। চারিদিকে স্নিগ্ধ মানুষের ছায়া। আমাদের পরীক্ষার সময়, মনে আছে, মাঝখানে ঐ অশ্বত্থ গাছটার গা কটি কচি পাতায় ভরে যেত। রোদে ঐ লালচে কচি কচি পাতাগুলো যেন রেশমের মতো চকচক করত। তার সঙ্গে বাদুড়ের পাল ঘন জঙ্গল করে রাখত। সে সময় সারা গাঁয়ে তিনটি বিরাট অশ্বত্থ গাছ ছিল। একটি এই মোটর আড্ডায়, আরেকটি ছিল বিঠোবার মন্দিরের সামনে, আর তৃতীয়টি ছিল কাছারীর সামনে। এই তিনটি গাছের ওপরেই ছিল বাদুড়দের আড্ডা। রোদে জামাকাপড় শুকোতে দিলে হাওয়ায় যেমন ফরফর করে তেমনি বাদুড়দের ফিনফিনে ডানা ফরফর করত। অনেকে বাদুড় মেরে কবিরাজী তেল বানাত।

একবার মনে আছে বাবা আমাদের সবাইকে গোরুর গাড়ি করে হলসিদ্ধ আপ্পার মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল। মাঠের ভেতর দিয়ে যাবার সময় গোরুর গাড়ি থেকে দূরে এক পাল হরিণ চরে বেড়াতে দেখলুম। ঐ আমার প্রথম হরিণ দেখা। এর আগে দেশাইদের বাগানের মালিকের বাড়িতে দেয়ালে টাঙানো হরিণের মাথা আর শিঙ ঝুলতে দেখেছি।

যতদিন দেশাইদের ক্ষেত ছিল ততদিন তাদের আগের বাড়িটাও ছিল। পুরোনো সেই বাড়ি। বেশীরভাগ ভাল বাড়িগুলিই ছিল একতলা। আমরা যেখানে ঘুরতুম, ফিরতুম, খেলতুম সেই অতি পরিচিত গলিটার কাছাকাছি মোটে দুটো দোতলা বাড়ি ছিল। দোতলাবাড়িগুলো নিয়ে গাঁয়ের সবাইর একটা কৌতূহল ছিল বৈ কি! দুটো দোতলা বাড়ির একটি দত্তু সাওকারের, অন্যটি য়ল্লু যোগিনীর। য়ল্লু দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল। তার আপ্লাই তাকে সেই বাড়িটি বানিয়ে দিয়েছে। কালে কালে দত্তু সাওকার তার বাড়ি থেকে নিজের পরিবারকে বার করে দিয়ে একটি বাইজী এনে পুষেছিল। বাইজীটির মা ও চার চারটে ভাইও একই সঙ্গে ও-বাড়িতে থাকত। বাড়ির সামনের দিকে ছিল দুটি জানালা ও একটি দরজা। সেই জানালায় রঙিন ছিটের পর্দা নড়ত। সকালে ওদের বাড়ির নালা দিয়ে যে জল বয়ে আসত তাতে বেশ সুন্দর গন্ধ বেরত। আমরা বাইরে খেলতে খেলতে সেই সুন্দর গন্ধ পেতাম। বাইজীকে অবশ্য বলতে গেলে দেখাই যেত না। আমার জীবনে পরিষ্কার শাড়ি পরা মেয়েমানুষ তখন পর্যন্ত ঐ একটিই দেখেছি। কপালে তার ছোট্ট একটি টিপ, ব্লাউজের হাতগুলো ঝালর দেয়া, শাড়ি রঙিন নক্সা কাটা। চুলের সামনের দিকটা ফোলানো, পেছনে একটা বিনুনি দুলত। আমার ধারণা ছিল এ ধরনের মেয়েদের ছবিই হয়তো খবরের কাগজে ছেপে আসে। বাড়িতে খবরের কাগজের ঠোঙায় মেয়েদের ছবি দেখেছি। দোকানে, হোটেলে, কালেভদ্রে সুন্দর মেয়েদের ছবি দেখে ভেবেছি এত সুন্দর মেয়েও কি হয়? বাইজীকে দেখার পর মনে হয়েছে সুন্দর মেয়েও সত্যি সত্যি রক্তমাংসে দেখা যায়। সেই বাইজীর দাদা আমাদের বাচ্চাদের রূপকথার গল্প বলত আর কোঁচড় ভরে ভরে চিনেবাদাম আর গুড় খাওয়াত। সে গল্প শোনার জন্য আমি ওর কাছে চলে যেতাম, আশে পাশে অন্য কিছুতে আমার হুঁশই থাকত না। জাদুকরের বাণ, খাঁচার সেই টিয়েপাখি, পাথরের মূর্তি হয়ে যাওয়া মানুষ, ধনরত্নের সেই ভাণ্ডার আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে দেখা দিত। আমি ভাবতুম ওসব দেশে যদি যাওয়া যেত! বড় হয়ে খুঁজে বার করব।

য়ল্লুর বয়স অল্প ছিল। সেও বাইজীরই মতন সেজেগুজেই থাকত। তার আপ্লা অর্থাৎ যে তাকে রক্ষিতা রেখেছিল সে ছিল একজন ডাক্তার। তাকে অবশ্য কখনই য়ল্লুর বাড়িতে দিনের বেলায় দেখা যায় নি। ডাক্তারখানায় দেখা যেত ডাক্তার সাহেবকে—মুখে জ্বলন্ত সিগারেট। রুগীর পর রুগী দেখেই চলেছে। সুন্দর, সুপুরুষ ফর্সা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ডাক্তার যে ধনগর সমাজের একজনকে এরকম রক্ষিতা রেখেছে, বাড়ি করে দিয়েছে তা দেখে আমার ভারি মজা লাগত।

আমাদের গলিতে চার পাঁচজন বুড়ো ছিল, তাদের মধ্যে বাপুদের বুড়োকে সবাই একডাকে চিনত। তার এইয়াঁ বড় পাকানো গোঁফ ছিল, মুখ থেকে একেবারে থুতনি অবধি নেমে গেছে। তাকে রোজই দেখতুম বাড়ির দরজার এক পাশে হাঁপানির কষ্ট নিয়ে বসে আছে। অনেকটা হাওয়া একবার ভেতরে টেনে নিত, আবার মুখ বন্ধ রেখেই ফুরফুর শব্দ করে হাওয়াটা বার করে দিত। দেখে কেবলি মনে হত সে যেন নিজেকে নিয়ে আর পারছে না, কিছুই ভাল লাগে না তার। চোখের সামনে

মাটির দিকে সর্বদা তাকিয়ে থাকত বাপুদের বুড়ো। এই বুড়োকে রকে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় মরতেও আমি দেখেছি। একদিন সবাই মিলে খেলছি এমন সময় কানে এল 'ছোট রে ছোট। বাপুদের বুড়ো মরতে বসেছে।' ছুটে গিয়ে দেখি আগে থেকেই অনেক মেয়ে বুড়োকে ঘিরে রেখেছে। নাক মুখ বন্ধ করে দিলে যেমন অবস্থা হয় তেমনি হয়েছিল বুড়োর। বোঝা গেল দম বন্ধ হয়ে আসছে, আস্তে আস্তে মুখের দুদিক পড়ে গেল, টান টান ভাবটা শিথিল হয়ে গেল। এতদিন পর সে যেন যথার্থই শান্তি পেল। কে যেন বলে উঠল, 'বুড়োর নাকের সামনে সুতো দিয়ে দেখ।' সুতো নড়ল না। সব শান্ত নিষ্কম্প হয়ে গেছে। বাড়ির সব্বাই যখন এর পর কাঁদতে শুরু করে দিলে তখন আমারও ভীষণ কান্না পেয়ে গেল। বুড়ো আমার কেউ নয়, তবুও আমার কান্না পেল এই ভেবে যে ঠাকুর আমাকেও একদিন এভাবে বুড়ো করবে আর আমি মরেও যাব। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, না,, ঠাকুর আমাকে বুড়ো করবেই না। আমি কি ঠাকুরের কোনো ক্ষতি করেছি? এসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে সেখানে আর থাকতে পারলুম না। কি এক অজানা ভয় ঢুকেছিল মনে। ছুটে পালিয়ে এলুম।

সিন্ধু মালকার ছিল আরেকজন বুড়ো। দরজায় বসে বটুয়া থেকে পান বার করে খেত আর কাশতে কাশতে দরজার গোড়ায় মুখ থেকে পানের রঙিন ছিবড়ে বার করে ফেলত। মাছি তাই সারাক্ষণ দরজায় ভণ ভণ করত। রোগা দুটো পায়ে কোমবের ল্যাঙ্গট আলগা হয়ে অনেকটাই নেমে যেত। দরজায় বসে বসে বুড়ো সারাক্ষণ তার বউকে গালাগালি দিত। আমরা যখন ওর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতুম আমাদের চোখে পড়ত ঐ একভাবে বসে থাকা বুড়োর ঢিলে ল্যাঙ্গটটি। নিজেদের মধ্যে চাওয়াচাওয়ি করে আমরা খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়তুম। শুধু বউকেই নয়, বুড়ো আমাদেরও গালাগাল দিতে ছাড়ত না। আমার গালাগালের শব্দকোষ এভাবেই ক্রমশই বাড়ছিল। ঝগড়া করার সময় ঐসব জুৎসই গালাগাল আমিও ঝেড়ে বলতে লেগে যেতাম। এভাবে আমার যা মুখ হয়েছিল আমার সঙ্গে বড় একটা লাগতে তাই কেউ আর আসত না।

লক্ষু বুড়ো ছিল বাবার কাকা। থাকত সামনের গলিতে। নিজের গলি ছেড়ে সে আমাদের গলির মোড়ে বসত। গায়ে পরত একটা ছেঁড়া ঢিলেঢালা কোট, গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, মাথায় ছেঁড়া কাপড়ের পাগড়ি। সেই যে সকালে এসে মোড়টাতে গেড়ে বসত, উঠত বারটায়। আমি যদি বাড়িতে থাকতুম তাহলে বুড়োর ছিলিমের আগুন আমাদের বাড়ি থেকে এনে দেবার ফরমাস আমাকেই খাটতে হত। মা একটা জ্বলন্ত খণ্ড রেখে যেত। সে আগুন বুড়োর বারটা অবধি চলত। রোদ চড়লে সেও চলে যেত তার গলির দিকে— খাবার সময় হয়েছে। সে নিজের মনে একা একাই বক বক করে কথা বলে যেত। হয়তো তার আগের জীবনের ঘটনা, কত লোকের কথাই হয়তো তার মনে আসত। ছিলিমে টান দিয়ে আপন মনেই সে বিড় বিড় করে যেত! তাদের কোনো ভুলত্রুটি হয়তো মনে পড়ে গেছে অমনি তাদের গালাগালও দিয়ে যেত আপন মনে। কোনো সন্ধ্যায় বাবাকে বাড়ির সামনে বসে থাকতে দেখলে আর রক্ষে নেই অমনি দাঁত খিঁচুনি শুরু হয়ে যেত, "অত তাড়াতাড়ি ক্ষেত ছেড়ে ঘরে ফিরে এয়েছিস

কেন রে ?”

বাবা অবশ্য কিছু মনে করত না, হেসেই উড়িয়ে দিত কথাটা। বুড়োটা যে কেন দিনের পর দিন রোদে বসে কাটিয়ে দিত তা জানার আগ্রহ আমার কম ছিল না। কোথায়ও কোনো মেলার সঙ্গী জোটাতে না পারলে আমি ঠিক সেই বুড়োর গা ঘেঁষে বসতুম গিয়ে, “কি দাদু, আগুন লাগবে না ? এনে দেব নাকি ?”

“না, না আছে। তারা এনে দিয়েছে।”

একবার কথা আরম্ভ করতে যা দেরী। তারপর দাদু কোথা থেকে সব পুরোন দিনের গল্প শুরু করে দিত। একই কথা, একই ঘটনা নানা ভাবে, নানা রঙচঙে করে বলে যেত। আমার গুষ্টির খবর আমি তো দাদুর কাছেই জানতে পেলুম। তার কাছেই জানতে পারলুম আমার ঠাকুর্দা ঠাকুরমার চলন-বলন। সেই আমাকেই বলে কিনা তারার বাপের পেটাইর কথা। আকনি আর তারাকে রতনু কত জ্বালাতন করেছে। কিভাবে করেছে সবই আমার জানা হয়ে গেল। পাঁচ-পাঁচটা ভাই কিভাবে এ-ওর টুঁটি চেপে ধরত তার খুব মজাদার বর্ণনা দাদু দিত। এসবই আমার মনের কোণে জমা হতে লাগল। ক্রমে ক্রমে গল্পের ঐ মানুষগুলো যেন জীবন্ত হয়ে আমার সামনে ধরা দিত। ঘোরাফেরা করত।

এই ছিল পাড়ার থুড়থুড়ে বুড়োদের রকমসকম। একাই বসে থাকত। জোয়ানরা চটপট নড়াচড়া করত, কথা বলত, কাজ করত। বুড়োগুলো ছিল শকুনির মতন। এরাও যে কোনোকালে জোয়ান ছিল কেউ কি এখন তা ভাবতে পারবে ?

বাড়িগুলোও তো কম পুরোন ছিল না। সরু সরু গলিগুলির দুধারে ঐ সব পুরোন বাড়ি। পেছনে একটু উঠোন থাকত কি থাকত না, সামনেটা ফাঁকাই ছিল। বাড়িগুলোর দেয়াল ভেঙে ভেঙে পড়ছে। গলিগুলো আঁকাবাঁকা। একেই তো সরু গলি, তার ওপর আবার মানুষে পেচ্ছাব করত। আশপাশের বাড়িগুলোতে তাই সমসময় পেচ্ছাবের গন্ধই পাওয়া যেত। এই নিয়ে অবশ্য কারো কোন অভিযোগ ছিল না। তারপর গলিতে পড়ত সবার বাড়ির জঞ্জাল— চিনেবাদামের খোসা, ভাঙা শিশি বোতল, ভাঙা বালতি, আমের আঁটি আরও কত কি! খেলতে খেলতে আমরা এ জঞ্জালের গাদার আড়ালেই লুকিয়ে পড়তুম। লুকোচুরি খেলতে খেলতে এই আবর্জনার রাশি নাড়াচাড়া করেছি কতবার। খেলার জন্য তো আমের আঁটি লাগতই। বাড়ির পেছন দিকগুলোতে ভীষণ জঞ্জাল পড়ে থাকত। সেইসব নোংরার ভেতরের আঁটিগুলো থেকে আমগাছ বেরোত। সেই আঁটিই আমরা গাছসুদ্ধ উপড়ে ঘষে ভেঁপু করতুম। আঁটিগুলোর ওপরে কচি আমপাতাগুলো কি সুন্দরই না দেখাত! এই আমআঁটির ভেঁপু বাজিয়েই তো আমি দিনের পর দিন কাটিয়েছি।

বাড়ির পেছনটা বিড়ি ফুঁকবার জন্য সেরা জায়গা ছিল। আমি সাত বছর পেরোতে না পেরোতেই বিড়ি ধরেছি কিনা তাই আমি জানি। শিরপ্যাকে একদিন বিড়ি ফুঁকতে দেখেছিলুম। তাছাড়া, আমার ছোটমামার বিড়ির ভীষণ নেশা। ছোটমামার বিড়ি আমাকেই আনতে হত কিনে। আমাদের গাঁয়ে বিড়ি পাকাত। সে বিড়ি উনুনের আঁচে গরম করা হত। ভারি ভাল লাগত আঁচে দেয়া বিড়ির ঐ গন্ধ। মামার বিড়ি কিনে ফেরবার

সময় বিড়ির ঐ গন্ধ শুঁকতে শুঁকতেই তো ফিরতুম। মামা কি সুন্দর করেই না বিড়ি টানত! খালি মনে হত আমিও ঐরকম বিড়ি ফুঁকে মুখ থেকে ভুরভুর করে ধোঁয়া বার করি। মনে আছে একবার বিড়ি কিনে ফিরছি। সাহসে ভর করে বিড়ির বাণ্ডিল থেকে একটি বিড়ি নিজের পকেটে রেখে দিয়ে বাণ্ডিলটা মামাকে দিলুম। বাড়ি ফাঁকা দেখে উনুনের কাছে গিয়ে বিড়িটা ধরালুম আর দিলুম দু তিন টান। বিড়ি জ্বলে উঠল দপদপ করে। ছুট্টে বাড়ির পেছনে গিয়ে মুখের ধোঁয়া নাক দিয়ে বার করবার চেষ্টা করলুম। কাশতে কাশতে গলায় লেগে গেল, চোখ জ্বালা করতে লাগল। চোখে জল বেরিয়ে গেল। চোখ কচলাতে কচলাতে আবার ফুঁকলুম। তেতো ধোঁয়া কি আর ভাল লাগে? কিন্তু বড়দের মতো হাবভাব করতে পারছি দেখে নিজেকে খুব হীরো মনে হল। বিড়ি ফুঁকবার সময় আমি খুব গম্ভীর চালে বড়দের মতো হাবভাব করতুম। গোঁফে তা দেবার ভান করতুম। বিড়ির তেতো ধোঁয়ার স্বাদ দূর করতে জোরে পিক ফেলার ভঙ্গীতে থুতু ফেলতুম। কিন্তু একা একা বিড়ি ফুঁকতে কি ভাল লাগে? সঙ্গী চাই। সঙ্গী জুটে গেল। গলির চার-পাঁচজন ছেলেকে দলে টানলুম। তখন আর মামার বিড়ির বাণ্ডিল থেকে সরানো একটা বিড়িতে কি কুলোয়? বাজারে বাজারে রাস্তায় রাস্তায় পড়ে থাকা খেয়ে ফেলে দেয়া বিড়ির টুকরোগুলো জোগাড় করার ধূম পড়ে গেল। সে কাজে কি আনন্দ! দল ক্রমেই ভারী হল। কিন্তু দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের অভাব হল না। বাবাকে কেউ গিয়ে নিশ্চয়ই নালিশ করলে। বাবা একবার দুবার ধমক দিলে, "চুরি করে বিড়ি ফুঁকিস না কিরে আন্দ্যা?"

"না তো।"

"গলির ছেলেরা কি তবে মিছিমিছি নালিশ করছে?"

"ওরা আমাকে শুধু শুধু মার খাওয়াতে চায় তাই বানিয়ে বলে ওসব কথা। ওরাই তো ফোঁকে, আমি তো কেবল বসে বসে দেখি। ওরা ভেবেছে আমি ওদের বাপেদের নালিশ করব। তাই তো আমি নালিশ করার আগেই ওরা তোমার কাছে চুকলি করছে।"

মিথ্যে কথা বানিয়ে বলতে আমার জুড়ি ছিল না, বেশ ভালই রপ্ত করেছিলুম ও কায়দাটা। অবশ্য তাছাড়া উপায়ও ছিল না।

কিছুদিন পরের কথা। বাবা খাওয়া-দাওয়া সেরে দাওয়ায় বসে হুঁকো টানছে। খেলাধুলো সেরে তেতে পুড়ে ফিরে সোজা বাড়ির ভেতর ঢুকলুম। চৌকাঠ পেরোবার সময় বাবা হাঁক দিলে, "এদিকে আয়।"

"কি?" বলে আমি এগিয়ে গেলুম।

"তোর প্যান্টে ওটা কি?"

"কোথায়?" আমি কাছে গেলুম।

বাবা সোজা আমার হাত ধরে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলে। প্রায় পাঁচিশটা পোড়া বিড়ির টুকরো আর একটা দেশলাই-এর বাক্স বেরোল পকেট থেকে। জিনিসের চাপে পকেট টোপলা হয়েই ছিল— দূর থেকে দেখেই বাবার সন্দেহ হয়েছে।

"এগুলো কি?"

"তামাকের ছাই করব এই দিয়ে তোমার জন্য," আমি তখনও হাল ছাড়ি নি।

বাবা তামাকের ছাই ব্যবহার করত, তাই আমি সহজেই এটা বানিয়ে বলতে পারলুম।

সাত বছর বয়স অবধি আমাদের এই আঁকাবাঁকা গলিগুলোতে আমি মনের সুখে ঘুরেছি, খেলেছি। একটা লাঠির ডগায় একটি চাকা লাগিয়ে সারা গাঁ ঘুরে আসতুম। বাড়িতে যে ঠোঙা আসত তা দিয়ে ঘুড়ি বানিয়ে ওড়াতুম। আমাদের গলির সবার এটাই ছিল প্রিয় খেলা। কম্বল মানে ঘোঙ্‌রীতে লাগাবার জন্য ভাতের ফেন তৈরী করা হত। সেটা চুরি করে আনতুম। ঘুড়ি ওড়াবার জন্য বাড়ি থেকে সুতো না দিলে বা সুতো কেনার পয়সা না দিলে সনগরদের বাড়ির সামনে শুকোবার জন্য মেলে দেয়া সুতো চুরি করে টেনে আনতুম। তবেই না আমার ঘুড়ি ওড়ান হত। যে সুতো দিয়ে ঘোঙ্‌রি বোনা হোত সেই সুতোতে ভাতের মাড় দিয়ে বেশ শুকিয়ে আরও পোক্ত করা হত। সুতো তখন হাজার টানলেও ছেঁড়ার নয়। এভাবে শুকোতে মেলে দিয়েছে দেখলেই আমার হাত নিশপিশ করত। কেউ দেখে ফেলছে কিনা লক্ষ্য করারও হুঁশ থাকত না।

একবার হল কি সুতো তো আমি অভ্যেসমত এ ভাবে সরালুম। তারপর যার সম্পত্তি চুরি কবেছিলুম তার কাছ থেকেই একটি খুঁটির বদলে একটু মাড় এনে ঘুড়িতে লেজ লাগিয়ে মহানন্দে ওড়ালুম। তবে এবারে একটু মুস্কিল হল। যার সুতো পাচার করেছিলুম সে তো তার পরদিনই টের পেয়ে গেল। আমি পোড়ো বাড়ির কাছে ফাঁকা জায়গায় ঘুড়ি ওড়াচ্ছি এমন সময় সে এসে আমাকে ধরে হিড়হিড় করে বাবার কাছে টেনে নিয়ে গেল। বাবা তো দিলে পিঠে এক কিল। সুতোর আশা তো ছাড়তেই হল। উপরি পাওনা এই জুটল যে এরপর থেকে ঐ লোকটার যখনই যা কিছু খোয়া যেত আমাকেই সে সন্দেহ করত।

আমের আঁটি বা খেজুরের বিচি দিয়ে বছরের বিশেষ বিশেষ সময় খেলা খুব ভালই জমত। এ আঁটি আর বিচি বামুনপাড়ায় প্রচুর পাওয়া যেত। কাগল বেশ বড় গাঁ ছিল, অবস্থাপন্ন বামুনদের বেশ কয়েকঘরের বাস ছিল এ গাঁয়ে। তাদের জমির আম কুড়িয়ে বামুনপাড়ায় জমা হত। বামুনদের ছেলেরা তো আর আমের আঁটি দিয়ে খেলত না। তারা আম আর খেজুর খেয়ে পেট ভরাত। রাস্তায় পড়ে থাকত ফেলে দেয়া আমের আঁটি আর খেজুরের বিচি। সেগুলো অন্য জাতের ছেলেরা কুড়িয়ে নিয়ে যেত। শ্রাবণ মাস বা কোনো ব্রত পার্বণের দিন আঁটি আর বিচিতে রাস্তা ভরে যেত। এত চমৎকার গন্ধ বেরোত যে অজান্তে অনেক সময় আমরা মুখে দিয়ে চুষেই ফেলতুম। মুখে জল এসে গেলে ওগুলোই চুষে আমরা যেন বেশ তৃপ্তিও পেতুম। রাস্তার ধারে এই সব ফেলে দেয়া আমের আঁটি আর খেজুরের বিচি ছিল আমাদের সাতরাজার ধন— এসব দিয়ে খেলতে আমরা নিজেদের খুব কৃতার্থ মনে করতুম। তাছাড়া, দেশলাই বাক্সের ছবি, পেন্সিলের ছোট ছোট টুকরো, বোতাম দিয়ে আমরা খুবই খেলেছি। ফলের বিচি কুড়োতে মোটর আড্ডায়ও যেতুম খুব ভোরে। অশ্বথ গাছের ছোট ছোট ফল খেয়ে বিচিগুলো নীচে ফেলত চামচিকেগুলো, সেগুলো আমাদের সম্পত্তি হত। গাঁয়ের বাইরে নানান বাগানে, কুয়োর ধারে, নদীর পারে এক রকম ফলের গাছ প্রচুর ছিল। এ গাছের ফলের বিচিরও রেহাই ছিল না আমাদের

হাত থেকে। ওগুলো নিয়েও আমরা খেলতুম। এই বিচি বা 'কালা' গণ্ডা গণ্ডা করে গুণতুম। একটা ছক এঁকে আমরা এই বিচি ছকে ফেলে একটা খেলা খেলতুম। এ কালাগুলিই ছিল আমাদের ছেলেদের ধনদৌলত। যার কাছে সবচেয়ে বেশী কালা থাকত তার বাড়ির দরজার সামনে খেলা হত। রাতে খাওয়াদাওয়ার আগে আলোর নীচে বসে বেনেরা যেমন টাকার হিসেব করে তেমনি আমরা এগুলোর হিসেব করতুম। কার কাছে কত কালা আছে। এল কত, গেল কত, এ হিসেব আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে করতুম। খেলাতে খেলতে কালা হাত ছাড়া হতে থাকলে, দান ঠিক মতন দিতে না পারলে, কান্না পেয়ে যেত, ঘাম ছুটে যেত, বুকের ভেতর ধড়ফড়ানি হত। জমিজমা সম্পত্তি হাতছাড়া হলে যেমন দুঃখ হয় তেমনি হত। এ খেলা সে বয়সে আমাদের সুখ-দুঃখের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিল।

পাঁচ

ক্লাস ওয়ানের পড়া বেশ জমে উঠেছে— মন্দির খুব পরিচিত স্থান হয়ে গেছে— তার আনাচে-কানাচে লুকোচুরি খেলে সব সড়গড় হয়ে গেছে। আমাদের ক্লাসঘর থেকে একটা সিঁড়ি অন্ধকারে নীচে নেমে গেছিল। নীচের দরজাটা বন্ধই থাকত। সিঁড়িতে পুরোনো কাঠের তক্তা লাগানো ছিল। ঠিক এক হাত তফাতে। অন্ধকারে বসে বসে ওরই একটি তক্তা আমাদের মালীর ছেলে ভেঙে ফেলেছিল। লুকোচুরি খেলার সময় ছেলেটি সেখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকত। তাই সে কোনদিনই আর ধরা পড়ত না। ক্লাস ওয়ানে পড়বার সময় আমাদের সাহস ভয়ানক বেড়ে গিয়েছিল। নাম ডাকার পর মাস্টারমশাই পিঠ ফেরাতে না ফেরাতেই আমরা তিন-চারজন ডেঁপো ছেলে নীচের সিঁড়িতে নেমে যেতুম। অন্য ছেলেদের আমরা চেপে রাখতুম। ওরা যদি কখনও নালিশ করত তাহলে আর রক্ষে নেই। খবর ঠিকই চলে যেত। তারপর আর কি, "দাঁড়া, তোদের মজা দেখাচ্ছি— ছুটি হোক," এই ডেঁপো ছেলেগুলো পনের মিনিটের ছুটিতে ক্লাসে এসে বসত আর স্কেল হাতে নিয়ে দাদাগিরি ফলাত। সন্ধেবেলায় ছুটির পর বেচারীরা চুকলি কাটার জন্য বেশ ভালরকম ধোলাই খেত।

স্কুলে আসতে দেরী হলে আমি এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতুম। ঘাড় উঁচু করে দেখে নিতুম মাস্টারমশাই আছেন কিনা। অঙ্ক শেখাতে শেখাতে যেই দেয়ালের দিকে ফিরতেন অমনি ক্লাসের মধ্যে গিয়ে বসে পড়তুম। অবশ্য দুতিনবারের বেশী এই চালাকি করতে পারি নি। একবার মাস্টারমশাই থাকতেই টক করে ঢুকে পড়ে ভাবলুম ধরা পড়ি নি। কিন্তু সেদিন সত্যি সত্যি ধরা পড়েছিলুম আর ক্লাস ভর্তি ছেলেদের সামনে এমন বেত খেয়েছিলুম যে সারাদিন আর মুখ তুলে কথাই বলতে পারি নি।

আমার প্যান্টের ঠিক পেছনদিকটায় পাছার দিকে ছেঁড়া ছিল। প্যান্ট ছিল মাত্র দুটো, তাই ছেঁড়াটাও পরতে হত— না পরে উপায় ছিল না। ছিঁড়েছিল এমন যে তাপ্পি না দিলেই নয়। জেদ করে মাকে বলেছিলুম একই কাপড়ের তাপ্পি দিতে। দর্জির কাছ থেকে সেলাই করে আনতেও বলেছিলুম। বাড়িতে মোটাসোটা সুতো দিয়ে সেলাই করে দিলে সেটা আমি পরব না বলে মাকে ভয়ও দেখিয়েছিলুম। অন্য কাপড়ের তাপ্পি লাগালে তো বোঝা যাবেই। ছেলেরা বলবে, "দেখ, দেখ আন্দ্যা তাপ্পি দেয়া প্যান্ট পরেছে।" নতুন জামাকাপড় দশেরা বা পারওয়াতেই কেনার রেওয়াজ ছিল কিনা। এ দুটো পরব ছাড়াও যে নতুন জামাকাপড় কেনা যেতে পারে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। এ দুদিন বাদে কেউ নতুন জামাকাপড় পরে এলেই আমি জিজ্ঞেস করতুম সে মুসলমান কিনা। মজহারের পীরজাদার ছেলেপিলেরা তো তাদের ঈদের পরবে নতুন জামাকাপড় পরেই আসত। পরব তাদের মাঝে মধ্যে আসতই।

আমাদের ক্লাসে মেয়েরাও পড়ত। অনেকসময়ই ওরা আমাদের খেলার সাথী করত। "সোনা" নামে একটা ফর্সা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পড়ত, গলায় বড় বড় ঝলমলে

পুঁতির হার। মেয়েটি ও তার নামটি দুটিই আমার বেশ পছন্দ ছিল। চকচকে গায়ের রং, পরিষ্কার জামাকাপড়, সোনাকে দেখেই মনে হত যেন এক্ষুণি সে চান করে এসেছে। মেয়েটিকে ভাল লাগার আরও একটি কারণ হল সে আমার সঙ্গে কথা বলত, ঠাট্টা ইয়ারকি করত। লুকোচুরি খেলার সময় লুকোবার জায়গা দেখিয়ে দিত। আমি খেলতে খেলতে বসে পড়লেই পেছনে পাছার ছেঁড়া দিকটা বেরিয়ে পড়ত। তখন মেয়েটি টিটকিরি দিতে শুরু করে দিত, "এ্যা মা, আন্দ্যা, তোর প্যান্ট ছেঁড়া—কি সব দেখা যাচ্ছে।"

তারপর অবশ্য এ-ও জুড়ে দিত, "মাকে বলিস না কেন ছেঁড়া জায়গাটা সেলাই করে দিতে?"

আমার পেনসিল না থাকলে নিজের পেনসিল একটু ভেঙে এক টুকরো আমাকে দিত। তার গা থেকে একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোত, আমার মন ভরিয়ে দিত। নিশ্চয়ই রোজ চান করত। রোজ চান করার রেওয়াজ আমাদের কুনবিদের সমাজে ছিল না। তিনদিন অন্তর চান করতুম আমি। বাবা করত চার দিন অন্তর। আর সুগন্ধি সাবান? সে আমরা কোথায় পাব? আমাদের বড় জোর জুটত গা ঘষার পাথর। প্রতি শুক্রবার আমাদের স্কুলে সরস্বতী পুজো হত আর তার জন্য প্রত্যেককে মাসে এক পয়সা করে দিতেও হত। ঐ একটি পয়সার জন্য মার কাছে কিছু না-হোক পঞ্চাশ বার অন্তত চাইতে হবেই। এত কষ্ট করে চেয়েটেয়ে মাস্টারমশাইকে দিতে আমার মন চাইত না। ঐ দিয়ে মুচমুচে মুড়ি নয়তো ছোলা কিনেও তো খেতে পারতুম। কিন্তু ঐ এক পয়সা না দিলে মাস্টারমশাই স্কুল থেকেই তাড়িয়ে দেবেন, বলবেন, "যা, ঘর থেকে নিয়ে আয় পয়সা" তাই ঐ পয়সাটা না দিয়ে পারা যেত না।

সরস্বতী পুজোর দিন ছোট ছোট মেয়েরা ঘুরে ঘুরে গান গাইত আর নাচত। "কলসী মাথায় গোপিনীরা হাটে যায়" অনেকটা এ ধরনের কথাই যেন থাকত গানগুলোতে। মেয়েরা নিখুঁত সুরে আর মিষ্টি গলায় গানটি গাইত আর অভিনয় করে নাচত। অত মেয়ের মধ্যেও সোনার গলা আমি ঠিক ধরতে পারতুম, হাসলে সোনার দাঁতগুলো ঝলমলে সাদা দেখাত। মেয়েরা ছোলা হাতে হাতে দিয়ে যেত। যখন সোনা আসত দিতে, তখন আমার ভাগে ঠিক চারটে ছোলা বেশী পড়ত। এর জন্য কেউ আমাকে মারধোর করলে সোনা উল্টে তাকেই শাসাত, "ওকে মারছিস কেন রে? দাঁড়া মজা দেখাচ্ছি। মাস্টারমশাইকে বলছি গিয়ে।"

আমার কাছে এগুলো খুবই নতুন অন্যরকম ঠেকত। আমার দিদি আমাকে তেমন আদর টাদর করত না। যেমন অন্য পাঁচজন বোন হয় অনেকটা তেমনি ছিল আর কি! প্রায় সময়ই তো ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। আমাদের পাড়ার মেয়েরা পুজো পার্বণের দিন ঠাকুরকে ঘিরে এক সঙ্গে নাচতে নাচতে গান গাইত। তবে তাদের সুর ছিল আরেকরকম। ঠিক অত মিষ্টি লাগত না কানে।

তাছাড়া ওদের অত শ্রীই বা কোথায়? স্কুলের বাচ্চা মেয়েরা ঠিক যেন পরীর মতন নেচে বেড়াত। ওদের হাসিও তেমনি পরীদের মতোই সুন্দর ছিল। আমি ভাবতুম সোনা আমার দিদি হলে বেশ হত, হয়তো আমার ছেঁড়া প্যান্ট দর্জিকে দিয়ে সেলাই

করিয়ে আনত। হয়তো বা যেসব অঙ্ক আমি কষতে পারি না সেগুলো কষে দিত, হয়ত আরো কিছু করেও দিত।

ক্লাস ওয়ানে উঠে ছেলেমেয়েরা আলাদা হয়ে গেল। আমরা স্কুলের পেছনের দিকটায় বসতুম। সে বছর থেকেই আমাদের সেই সুন্দর সরস্বতী পুজোও উঠে গেল। সামনে মেয়েদের সারির মিষ্টি কিচিরমিচির আর শোনা যেত না। সোনাও সেই এক ঝাঁক চড়াইয়ের সাথে কোথায় উড়ে গেল। সোনা যদি আমার ক্লাসে থেকে যেত তাহলে কিন্তু আমার চলন-বলন অনেক শুধরে যেত। যতদিন মেয়েরা ক্লাসে ছিল ততদিন আমাদের মধ্যে মারপিটগুলো তবু একটা সীমার মধ্যে থাকত, তার বাইরে যেতে পেত না। মেয়েরা চলে যাবার পর ছেলেদের ক্লাসে আরম্ভ হয়ে গেল গালাগাল, মারামারি, ঝুটোপুটি আরো কত অসভ্যতা। বলতে গেলে একরকম হিংস্রই হয়ে গেলুম আমরা। তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়ে দিতুম— এটাই ছিল আমাদের কাজ। তার ওপর আমি আবার কুনব্যাদের ঘরের ছেলে। একটা জংলী, কোনো ভাল সংস্কারই ছিল না। আর আমার বাবা আমাকে যা পেটাত তার কাছে আমার মাস্টারমশায়েব মার তো কিছুই নয়।

স্কুলের আসল দালানের পেছনে দুটো ঘর ছিল। সেই পেছন দিকের ঘরেই আমাদের ক্লাস বসত। আসল দালানটিতে হত ক্লাস টু থেকে ক্লাস সেভেন অবধি। এই দুটো স্কুলের মাঝখানে ছিল বিরাট উঠোন। আমাদের খেলাধুলোর পক্ষে যথেষ্ট বড়ই বলা যায়। স্কাউটের ড্রিল, স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠান, দুপুরে টিফিনের বিরতি— এই সব সময়ে আমরা জনে জনে চলে আসতুম এ মাঠে। কেলাস ওয়ানের ছেলেরা কড়ে আঙুল উঁচু করে মাস্টারমশায়কে দেখিয়ে পেচ্ছাব করতে আসত। কখনও বা জল খেতেও ক্লাসের বাইরে চলে আসত। আসল দালানটার নীচের তলার জানালায় ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে দেখত ভেতরে কি হচ্ছে। জানালাগুলো যেমন বড় ছিল, তার শিকগুলোও তেমনি বড় ছিল। ভেতরে দেখা যেত এক সারি ছেলের দল বসে আছে— টুঁ শব্দটিও হচ্ছে না। এত চুপচাপ ছেলেদের দেখে আমার বুক কেঁপে উঠত। নিশ্চয়ই মাস্টারমশাই মারেন, নয়তো নীচু হয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল ধরে থাকতে বলেন। এরই মধ্যে কখন মাস্টারমশাই আমায় দেখে ফেলেছেন, জানালা থেকে সরে যাবার জন্য হাতের বেত তুলে ইঙ্গিত করতেন। আমি দৌড় লাগাতুম। এই ক্লাস দেখে আমার ঠিক জেলখানার কথা মনে হত, ছেলেগুলোকে মনে হত জেলখানার কয়েদী, কারাভোগের মেয়াদ শেষ করছে।

কাগলে পুরনো একটা বড় বাড়িতে ছিল জেলখানা। সেখানে যাদের রাখা হত তাদের আমরা চোরই মনে করতুম। ভাবতুম ওবা ডাকাতি করতে গিয়ে নয়তো ঘুমন্ত বৌদের গা থেকে গয়না চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এই পুরোনো বাড়িটাতে একটা চৌবাচ্চা ছিল। এরকম কয়েকটা চৌবাচ্চার জলেই গাঁয়ের জলের চাহিদা মিটত। আমাদের পাড়ার কাছাকাছি চৌবাচ্চাটাতে জল ফুরিয়ে গেলে আমি কখনো সখনো মার সঙ্গে এ চৌবাচ্চাটা থেকে জল নিয়ে যেতুম। মেয়েরা কিন্তু এই বাড়িতে যেত না। তার কারণ হল সামনেই ছিল পুলিস চৌকি আর তার পাশেই ছিল জেলখানাটি।

পাশের বড় বাগানটিতে পায়ে বেড়ী সমেত কয়েদীদের ছেড়ে দিয়ে খাটিয়ে নেয়া হত। তাইতো ঘরের মেয়ে, বৌদের ওখানে যেতে সঙ্কোচ হত। ওখানকার থানাদার আবার খামকা মেজাজ দেখাত, "এখান থেকে জল নিবি না।" এসব সময় মা আমাকে এগিয়ে দিয়ে জল তুলে নিয়ে আসতে বলত, "কেউ বকাবকি করলে চলে আসিস, নইলে কলসীটা ভর্তি করে আসবি, আমি তোর পেছনেই আছি।" কলসি ভরতে ভরতে আমি জেলখানাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতুম জানালার শিকগুলোর ভেতরটা কি অন্ধকার। মাঝে মাঝে জানালায় কয়েদীদেরও দেখা পেতুম, আবার পায়ে বেড়ীপরানো কয়েদীদের খোলা বাগানেও দেখতে পেতুম। তাদের গোঁফদাঁড়ি দেখে খুব ভয় লাগত। সেখানকার অশ্বত্থ গাছটায় চামচিকেগুলোও মাথা নীচু করে ঝুলে যেন ভয়ে ভয়ে ঐ কয়েদীগুলোর দিকেই তাকিয়ে রইত।

স্কুল আরম্ভ হত এগারটায়। পুরনো বাড়ি পেছনে ফেলে সোজা রাস্তা ধরে এগোলেই স্কুলে যাওয়া যেত। স্কুলের কাছেই ছিল আমাদের কাগলের সরকারী ডাক্তারখানা। দশবারটা কয়েদী রোজই আসত এ ডাক্তারখানায় চিকিৎসার জন্য। জেলখানাটি বেশ বড়ই ছিল— মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে জড়িত কয়েকজন সত্যাগ্রহীও এ জেলখানাটায় ছিলেন। চারজন বন্দী, পায়ে বাঁধা শেকল, পেছনে সে শেকল ধরে চলত এক সেপাই, আর বন্দীদের দুধারে দুটো বন্দুকধারী ওদের নিয়ে চলত। যে কয়েদীদের পায়ে শেকল থাকত তাদের পেছনে মোটা লাঠি নিয়ে একজন চলত। রোজ স্কুলে যাবার পথে এই মহড়া দেখতে দেখতে আমার মনে ওদের সম্বন্ধে অনেক কৌতূহল জমা হত। কত বছর শস্তি পেতে হবে ও বেচারীদের? এদের কি ফাঁসি হবে? হাত পা কেটে ফেলে দেবে? ওষুধ না দিয়ে ডাক্তাররা এদের কি বিষ দেয়? হয়তো বা অসুখ বাধিয়ে ওদের আস্তে আস্তে মেরে ফেলবার তাল করছে। কে জানে হয়তো ওদের ইচ্ছে করেই এমন ওষুধ দেয় যা খেয়ে ওরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে আর পালাতে পারবে না। ওদের দেখে, আর যাই করি চুরি কখনই করব না এ ঠিকই করে ফেললুম।

আমাদের স্কুলের পেছনে রামমন্দিরে স্কুলের অংশটা আমার ভারি পছন্দ ছিল। বড় স্কুলের বড় দালানের জানালাগুলো যেমনি জেলখানার জানালাগুলোর মতনই মনে হত, তেমনি ওখানকার পড়ুয়াদেরও কয়েদীদের মতো লাগত।

ক্লাস ওয়ানে আমাদের মানে মাস্টারমশাই ছিলেন মোটাসোটা, চেহারাটা ছিল ঠিক যেন একটা পালোয়ানের মতো। ছেলেদের মারামারি আরম্ভ হয়ে গেলে মাঝে মাঝেই সেটা কুস্তিতে দাঁড়িয়ে যেত তখন আমরা ওদের স্লেট পেনসিল ধরার কাজ পেতুম। কুস্তিতে সবচেয়ে বাহাদুর পালোয়ান সাজত মানে মাস্টার আর রোগা ছেলেটি সাজত সাকেকার মাস্টার।

একবার মাস্টারমশাইকে খোসমেজাজে দেখে সাহসে ভর করে আমি জিজ্ঞেসই করে ফেললুম, "আপনার শরীরটা এমন লোহার মতো শক্ত হল কি করে?"

জবাবে তিনি বললেন, "আমি যে রোজ ভোরে উঠে ব্যায়াম করি। আমার কোনো নেশা নেই, সুপুরি পর্যন্ত খাই না। চা তো আমি ছুঁই-ই না। তাছাড়া রোজ সকাল

সঙ্গে আমি দুধ খাই। তুই এভাবে চললে, তোর শরীরও লোহার মতো শক্ত মজবুত হবে।"

আমি মাথা নেড়ে আবার জিজ্ঞেস করলুম, "আপনি কুস্তি করেন না কেন?"

"মাস্টারদের কুস্তি করতে হয় না। যা মেলা বকিস নে, নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ো তো বাপধন," বলে আমাকে চুপ করিয়ে দিলেন।

আমি একটু ধাঁধায় পড়লুম। ভাবছি, কুস্তিই যদি না করবেন তাহলে পালোয়ানের মতো শরীর রেখে লাভটা কি? শুধু ব্যায়াম করে কুস্তি না করে কি চলে?

মাস্টারমশায়ের চুল ছিল ধবধবে সাদা। চারপাঁচ দিন একনাগাড়ে দাড়ি কামাতেন না, ফলে তাঁর গোঁফ দাড়িও বেরোত সাদা ধবধবে।

একবার মানে মাস্টারমশায়ের সঙ্গে ওঁব ছেলেও স্কুলে এল। ছেলেটিকে আমার বেশ পছন্দই হল। আমারই মতো ওবও কানে দুল ছিল। আর মাথায়ও আমারই মতন টুপি সে পরত। সবে স্কুলে এসে ভর্তি হয়েছিল। আমাদের ক্লাসে এসেই বসল। আমরা একসঙ্গেই খেলা করতুম। ওকে একটা ছোট্ট পেনসিলও উপহার দিলুম। কিন্তু একটা ব্যাপার নিয়ে আমি আবার ধাঁধায় পড়ে গেলুম। আচ্ছা, মাস্টার-মশায়ের এত পাকা চুল— দেখে তো মনে হয় ওঁর ছেলেরা সব আমার চেয়ে অনেক বড়ই হবে। কিন্তু এ ছেলেটি তো একদম ছোট—এটা কি করে হল?

একদিন মাস্টারমশায়ের মেজাজ ভাল দেখে আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করেই ফেললুম, "মাস্টারমশাই আপনার চুল এত পাকা কেন?"

মাস্টারমশায় বললেন, "ওরে, আমি বুড়ো হয়েছি বয়স তো পঞ্চাশ ধরে ধরে।"

"তাহলে আপনার ছেলে এত ছোট কেন?"

"বাঁদর, তুই যা খুশী তাই বলবি? বেরো," বলেই মাস্টারমশায় আমার পিঠে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলেন। খুব লেগেছিল। তাছাড়া, আমি অন্যায়টা কি করলুম কিছুই বুঝতে পারলুম না।

আমাদের ক্লাসে শির্প্যাকে দেখে আমার খুব ভাল লাগত। সে রোজ ওর বাপের কোটটি পরে আসত। ওর বাপ তো আগেই মারা গেছে। মা তার মাঠে ঘাটে দিন মজুরি করে পেট চালাত। সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, জোগাড়ের কাজ করত। ছেলেটাকে মানুষ করতে হবে তো। শির্প্যার পরনে ছিল একটা পুরোনো ছেঁড়া সার্ট আর তার চেয়েও বেশী পুরোনো ও ছেঁড়া প্যান্ট। প্যান্টটা প্রায় ছিঁড়ে কুটিপাটি হয়ে ঝুলে থাকত। ছেলের এই দুর্দশা আর লজ্জা ঢাকবার জন্য মা তাই তার মৃত স্বামীর কোটটা ছেলের গায়ে চড়িয়ে দিয়েছে। বাপের কোট ছেলের হাঁটু অবধি এসে যায়। কোটটার পকেট দুটো যেন বড় বড় থলের মতন, তাতে থাকত নতুন মালিকের খেলার যত সরঞ্জাম, অনেক অরূপরতন, সাত রাজার ধন। ছেলেটিকে দেখতুম স্লেটের টুকরো ভেঙে কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে। এই বিদঘুটে ব্যাপারটা ওর অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ক্লাসে বসে বসেই সে স্লেটের ভাঙা টুকরোগুলো সুপুরি চিবোবার মতন মুখে দিয়ে চিবোত। পেচ্ছাব করবার জন্য যতটুকু ছুটি আমরা পেতুম সেই সময়টুকুতে যখন অন্য ছেলেরা খেলায় মেতে থাকত, ও তখন সারা উঠোনে হন্যে হয়ে খুঁজে

বেড়াত কোথায় ভাঙা স্লেটের টুকরো পড়ে আছে। টুকরোগুলো মটমট করে যখন খেত তখন আমার জিভে কিন্তু জল এসে যেত। আমার কাছে বসে এই কাণ্ড করলে আমার নিজেরই লোভ সামলানো দায় হত। একবার আমি ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একটা টুকরো খেয়েও ফেলেছিলুম। কেমন যেন বিস্বাদ লেগেছিল।

"কি বিচ্ছিরি খেতে? মাগো, তুই খাস কি করে রে?"

"খুব কম করে খেলি তো তাই ওরকম লাগছে। টানা আটদিন খেয়ে দেখিস, মেওয়ার মত্নে স্বাদ।"

এই শুনে আমিও ভাঙা স্লেটের টুকরো কুড়িয়ে জমাতে লাগলুম আর পকেটে রেখে খেতে লাগলুম। ধীরে ধীরে আমারও বেশ নেশা ধরে গেল।

একবার মা কাপড় কাচতে গিয়ে প্যান্টের পকেটে একটা টুকরো দেখতে পায়,

"এটা রেখেছিস কেন?"

ঘাবড়ে গেলুম, যাহোক একটা কিছু জবাব দিতে হবে তো। বললুম, "পেনসিল ছিল না তো তাই এই দিয়ে লিখছিলুম।" টুকরোগুলো ফেলে দিয়ে একটা নতুন পেনসিল কিনে দিলে মা। সেই থেকে আমারও এই খারাপ অভ্যেসটি কেটে গেল।

একবার শির্প্যা কোন একজনের পয়সা চুরি করেছিল। যার জিনিস চুরি গেল সে ছেলেটি কান্না জুড়ে দিয়ে ওর নামে নালিশ করলে।

শির্প্যা বললে সে কারুর পয়সা নেয় নি। দরকার হলে তল্লাসী করো। চুরির জিনিস কি কেউ আর পায়? ওর কোটে কত যে পকেট ছিল তার ইয়ত্তা নেই। তাছাড়া, যে অংশগুলো ছেঁড়া ছিল সেগুলোর মধ্যেও সে কোথায় কি যে রাখত, কেউ কি আর খুঁজে বার করতে পারে?

শেষে মাস্টারমশায় নিজেই খুঁজতে লাগলেন। ওর পকেটে যেখানে যা ছিল সব বার করা হল। শির্প্যা বেচারা কি আর জানত অমনটি করে মাস্টারমশাই খুঁজবেন? এটা ওটার সঙ্গে দুটি বিশেষ বস্তুও বেরোল। বাইরের দিকের পকেট থেকে বেরোল মস্ত বড় স্লেটের একটি টুকরো আর ভেতরের দিকের পকেট থেকে বেরোল খান পাঁচিশেক বিড়ির টুকরো।

মাস্টারমশাই বলে উঠলেন, "এটা দিয়ে কি হবে?"

শির্প্যা এক্কেবারে চুপ মেরে গেল। মুখে রাটি নেই। "এগুলো পকেটে কেন রেখেছিস?" মাস্টারমশাই এবারে একটু একটু করে রেগে উঠছেন।

আস্তে আস্তে শির্প্যা বললে, "তামাক পুড়িয়ে ছাই করব তাই রেখেছি।"

মাস্টারমশাই সঙ্গে সঙ্গে ওর গালে দিলেন এক চড়। শির্প্যার মাথার টুপি গেল পড়ে।

"মিথ্যে কথা বলছিস! একরত্তি ছেলে। বিড়ি টানে?" মাস্টারমশায় আবার ওর কোটের পকেট হাতড়াতে লাগলেন।

"আর এই স্লেটের টুকরো দিয়ে কি করিস?" শির্প্যা ভয়ে একারেও চুপ মেরে গেল।

পাশে বসে আমিও ভয়ে কাঁপছি। মাস্টারমশায় যা ক্ষেপেছেন, মেরে হয়তো ছাতুই

করে দেবেন আজ ওকে।

আমি তাই খুব ফিসফিস করে মাস্টারমশাইকে বললুম, "ও স্লেটের টুকরো খায়, স্যার।"

"এ্যাঁ, বলিস কি রে?" মাস্টারমশায় অবাক হলেন।

"হ্যাঁ সার, ও তো আমাদের গলিতেই থাকে।"

মাস্টারমশায় ওকে আরো দু'ঘা দিলেন আর কোটের পকেটে ভেতরে বাইরে সব জায়গায় হাতড়াতে লাগলেন। শেষে প্যান্টের দড়ির সেলাই-এর ভেতর পাওয়া গেল পয়সা।

মাস্টারমশায় আর ওকে তখন ছাড়েন? বেদম পেটালেন। সে বেচারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্যান্ট ভিজিয়ে দিলে। মাস্টারমশাই তখনও থামছেন না, মেরেই চলেছেন। অনেক পরে বোধহয় একটু দম নিতে থামলেন আর শির্প্যার হাতে স্লেটটি ধরিয়ে দিয়ে ওকে স্কুল থেকে বার করে দিলেন। যাবার সময় দেখি ও প্যান্ট নোংরা করে দিয়েছে।

সেদিন আর ক্লাসে সারাদিন কারো মুখে কোনো কথা নেই। মানে মাস্টারমশায় কেমন পালোয়ান তা আমাদের আর অজানা রইল না।

এদিকে শির্প্যা সেই যে বাড়িমুখো হল আর কোনোদিন স্কুলে ফিরলে না। চিরদিনের মতো স্কুল থেকে ওর ছুটি হয়ে গেল। ওর হতভাগিনী মা আমাদের গলিতেই পনের দিন ধরে খুব কান্নাকাটি গালিগালাজ কবলে।

"আমার ছেলেকে মাস্টার এমন মারলে সে প্যান্টে হেগে মুতে ফেললে গো.... আমার পোড়া কপাল এই একটিই ছেলে তাকেও মাস্টার মেরে ফেললে রে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাক পোড়া স্কুল। আমরা গরীব লোক তার ওপর অত জুলুম সইবে না গো, সইবে না এই বলে রাখলুম. "

কাঁদতে কাঁদতে এক সময় সে থামলে।

শির্প্যার সঙ্গে মিশে আমিও দিন কতক ভাঙা স্লেটের টুকরো চুরি করে খেলুম, চুরি করে বিড়িও টানলুম আর পয়সা চুরি করে প্যান্টের সেলাই-এর ভেতর গুঁজে রাখতেও শিখলুম। আমাদের পাড়ার অন্য সব মজুর মজদুরদের মতো শির্প্যাও ধীরে ধীরে মাঠের গোবর কুড়োতে লাগল আর ওর মার সঙ্গে সঙ্গে কাজেও লেগে গেল।

ছয়

যে গ্রীষ্মে আমি ক্লাস ওয়ান পেরিয়ে গেলাম সেই গ্রীষ্মেই আমার দিদি আনসার বিয়ে হয়ে গেল আমার ছোটমামার সঙ্গে। আনসা তখন দশ-এগার বছরের মেয়ে আর মামা কম করে হলেও ওর থেকে চৌদ্দ পনের বছরের বড় হবে। তাই এ সম্বন্ধটা মোটেই মানাচ্ছিল না। পাড়ার সবাই মাকে অনেক করে বোঝাতে চাইলে।

বালা সনগারিন অনেক বোঝালে, "ওরে তারা, অমন ফুলের মতো মেয়ে তোর, দেখতেও কি সুন্দর। ওর কি আর পাত্রের অভাব হত রে। এই ধুমসো লিঙ্গার হাতে দিতে যাচ্ছিস কেন মা? তোর ভাই হলেই বা, কাজটা তোর ঠিক হয় নি।" আমার মা তার নিজের মতন করে চিন্তা করে।

মা বলে, "বিয়ে না দিয়েই বা কি করি বল, মাসি? আমার ভায়ের তাহলে কি গতি হবে? সে আজ এখানে, কাল ওখানে কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়ায়, বাজারের মেয়ের ঘরে যায়। ওর ঘর বেঁধে না দিলে ও কি কোনোদিন নিজে থেকে ঘর বাঁধবে, না সংসার করবে?"

বালা ঠাণ্ডা মাথায় উপদেশ দেয়, "বেশ তো, সে তো ভাল কথা। তা তারা মা, তুই ভাইয়ের জন্য একটা জোয়ান মেয়ে দেখ তাহলে।"

"ওকে কে মেয়ে দেবে মাসি? সে জন্ম থেকেই বলতে গেলে বাপ-মা হারা। ওর হাতে মেয়ে দেয়ার চেয়ে তো হাত-পা বেঁধে কুয়োতে মেয়েকে ফেলে দেবে মেয়ের বাপ মা। বাজে বাজে মেয়ে মানুষের পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে— তা কি কেউ দেখছে না? ওকে নিজের সন্তান হাতে ধরে কে দেবে বল?"

"তাই বলে, পাগলি, তুই তোর নিজের পেটের মেয়েকে এভাবে বলি দিবি?"

"শোনো, মাসি, হাজার হোক ও আমার নিজের মায়ের পেটের ভাই। পাশেই ওকে আর মেয়েকে বাস করাব, তারপর ক্ষেতের কাজে লাগিয়ে দেব। মেয়েকে দিয়ে ভাইয়ের নাকে দড়ি দিয়ে তাকে বাঁধব।"

"আর, রতনু? সে রাজী হয়েছে?"

"সে রাজী না হয়ে যাবে কোথা? মেয়েকে টাকা দেবে যে লিঙ্গু। পুরোটা এক বারে না দিতে পারলেও সাবা বছর জমিতে খেটে শোধ দেবে বলেছে। শোন বালা মাসি, তোমাকে একটা ভেতরের খবর দিই... আমার বড় ভাইটা পিসির গাঁয়ে চলে গিয়ে তাদের ঘর জামাই হয়ে বসে রইল। এখন পিসির ছোট মেয়ে বিয়ের যুগ্যি হয়েছে। পিসি আমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা, তোর মেয়ে দিবি না আমিই লিঙ্গাপ্লাকে জামাই করে নেব? এখন ভেবে দেখ তো, পিসি লিঙ্গুর সাথে তার ছোট মেয়ের সম্বন্ধ করলে সে কি আর এখানে পড়ে থাকবে? সে তো এ গাঁ ছেড়ে ওখানে উঠে যাবে। তখন আমার নিজের লোক বলে আর এ গাঁয়ে কে থাকল বল? ঐ ভাইটা ছাড়া তিনকুলে আমার আপন বলতে আর কে আছে?"

"ভগবান তোর মঙ্গল করুন বাছা। টাকার জন্য রতনু মেয়ে দিতে রাজী হল, তা সে টাকা তো অন্য কেউ খুশী মনেই দিত।"

"তা হয়তো দিত। কিন্তু আমার মরদেরই বা কে আছে পাশে দাঁড়াবার? জ্ঞাতিরা তো কেউ কারো মুখও দেখে না। সে তো তার বাপ মায়ের একমাত্র ছেলে, তাকে যদি কেউ মারতে আসে তাহলে তার হয়ে দাঁড়াবে এ গাঁয়ে এমন কেউ নেই আর এখন। তাই অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করিয়েছি ওকে। আমার ভাইকে মেয়ে দিয়ে ওকে এখানে মোষের মতন বাঁধব। তাইতেই সে শেষ পর্যন্ত রাজী হল।"

বালামাসিকে নিজের লোক মনে করে মা এসব কথা বলে ফেললে।

এদিকে গাঁয়ে বাবার বন্ধুরা সব খবর পেয়ে গেছে। "কি রতনু, শুনছি নাকি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"তা পাত্রটি কে?"

"লিঙ্গার হাতে মেয়েকে দিচ্ছি। সে নিজেও তো অনাথ। এখানে তাকে কে দেখে বল? বাপ মাও মরে গেছে। তাই ওর একটা হিল্লে করে দিয়ে সংসারী করে দেব আর কি! আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব আছে।"

"দে, দে বিয়েটা দিয়ে দে। শিবাপ্পা যাদব স্বর্গে স্বস্তি পাবে," সামনের ক্ষেতের মালিক আমার বাপকে সান্ত্বনা দেয়, উৎসাহও দেয়, "লিঙ্গার বাপ তো মদ গিলে গিলে প্রাণ ছাড়লে, ছেলেদেরও পথে বসিয়ে চলে গেল।"

"আমার বাপেরই বন্ধু ছিল সে," রতনু বললে, "যার ঠোঁট তারই দাঁত লাগলে তো বলার কিছু নেই। লিঙ্গা তো আমাদেরই একজন।"

"তা, বিয়েটা কোথায় দিবি? রামের মন্দিরে না অন্য কোথাও?"

"পাগল! বিয়ে হবে আমার দোরগোড়ায়। লিঙ্গা যাদবদের গুষ্টি হলেও, মেয়ে তো আমারই, ঠিক কিনা বল? মেয়ের বিয়ে আমি আমার নিজের বাড়িতে নিজের পয়সা খরচ করেই দেব," বাবা এসব বলে আনন্দও পায়।

লোকেরা খবরাখবর নিতে শুরু করে দিলে। খবর তো নিতেই হয়। বাবার কিন্তু এতে উৎসাহ বেড়েই যায়। আর মা? মার প্রাণে এত আনন্দ হল যে পাঁচ-পাঁচটা কলসীতেও মনে হল তো উপচে পড়বে।

দুদিন ধরে শুধু বিয়ের মণ্ডপই তৈরি হচ্ছে। এর কাছ থেকে বাঁশ, ওর কাছ থেকে বেত এনে কাজে লাগানো হচ্ছে। সানগারদের বিঠোবা দেওয়ানজী যাদের থেকে জিনিসপত্র আসছে তাদের নাম চিরকুটে লিখে সেঁটে দিচ্ছিল জিনিসগুলোর ওপর। কেনওয়াড়েকার জমিদারদের মস্ত বড় বাড়ি থেকে থামে জড়াবার জন্য লাল সবুজ কাপড় আনা হয়েছিল। ছাউনিটা বাবা নিজেই নিয়ে এসেছিল।

জমিদারদের বাগানবাড়ি হয়ে যেতে আসতে নিয়ম করে একদিকে চটিজোড়া রেখে জমিদারকে সেলাম ঠুকতে বাবার কখনই ভুল হত না। ফলে এ সুবিধেগুলো পাওয়া বাবার পক্ষে সহজ হল। এই যে জমিদারের বাড়িতে একটু যেতে পারছে, পাঁচটা লোককে বলছে এ যাওয়া-আসার কথা, এতেই বাবার বুক ফুলে যেত গর্বে। কুলম্বি

হলেই বা কি? আমার পূর্বপুরুষরা জমিদার বাড়িতে চাকরি করেছে তাই তো আজও আমাকে বৈঠকখানার দাওয়ায় বসে পান খেতে দেন কর্তামশায়। এসব নানা গল্প, কিছু সত্যি, কিছু বানানো, বলতে বলতে মণ্ডপের ছাত বাঁধছিল বাবা।

যারা শুনছিল তারা কাজ করতে করতে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিল। বিয়ের মণ্ডপ তৈরী করতে ঝেঁটিয়ে চলে এসেছে সবাই। প্রত্যেক বাড়ি থেকে কম করে হলেও একজন ঠিকই এসে একটা থাম জুড়ে দিয়ে গেছে। কোনো-না-কোনো কাজে হাত লাগিয়ে হাজিরাটা ঠিকই দিয়ে গেছে। এর মধ্যে কয়েকজন সত্যি সত্যি খেটে মরে যাচ্ছে, দম ফেলার ফুরসৎ নেই, আবার কেউ কেউ সমাজে মান রাখার জন্যই শুধু এসেছে। বাবা সবই দেখছে, সবই বুঝতে পারছে, কিন্তু জানে বিয়ে বা শ্রাদ্ধের মতো সামাজিক কাজে এসব দেখেও না দেখার ভান করতে হয়, এ নিয়ে গোল করা চলে না।

তিন চার দিন ধরে দেখে যাচ্ছি আইবুড়ো মেয়েকে সবাই উপহার দিয়ে যাচ্ছে। কেউ দিচ্ছে ব্লাউজের কাপড়, কেউ নারকোল, কেউ মুড়ি, কেউ বা বাতাসা। আর কলার কাঁদি? সে তো অনেক জমে এক ঢাঁই হয়ে গেল। পাড়াপড়শী চেনাজানা বাড়ির বৌরা তাদের এক পাল ছেলেপিলে নিয়ে এসে মার সঙ্গে দুদণ্ড বসে দুটো মিষ্টি কথা বলে যাচ্ছে। আইবুড়ো মেয়ের পাওয়া উপহারের বহর দেখে মার আনন্দ আর ধরে না। মা ভাবছে গাঁয়ের সবাই আমাকে কত মান্যিগন্যি করে। কত লোকবল আছে আমার, বউরা আমাকে কতই না খাতির করে। এ আনন্দ মা চেপে রাখতে পারছে না। কথায় কথায়ই সেটা বেরিয়ে পড়ছে।

বিয়ের আগের দিন অবধি মার আর বাবার দু তরফের জ্ঞাতি গুষ্টি কাতারে কাতারে এসে গেল। আমাদের বাড়ির উঠোনে দশ-বারোটা গাড়ি। আমাদের বাড়িটা গাঁয়ের শেষ প্রান্তে খোলার মধ্যে ছিল বলে জায়গার কোনো অভাব ছিল না। আশে-পাশের সাত আটটি গাঁ থেকে অনেক অতিথি অভ্যাগত এসে জড়ো হল। বাবার মামা-মামীদের, সেই সঙ্গে ওদের ছেলেমেয়েদেরও এ সুবাদে আমার দেখার সুযোগ হয়ে গেল। মার পিসির ছেলেমেয়েদের দেখলুম। ওদের খুড়তুতো ভাইবোনদেরও চিনলুম। মার মামা, বাবার খুড়তুতো ভাই ও তাদের বৌ ছেলেপিলেরা আমাদের এই ছোট গাঁয়েই বাস করত।

সব কিছু বানানোর শেষে দেখতে গেলুম কি রকম হল। দরজার সামনেই মস্ত বড় লম্বা মণ্ডপ তৈরী হয়েছে। থামে জড়ানো আছে রঙিন কাপড়। দুদিকের থামে পর্দা বাঁধা। ওপরে কচি কচি আমসমেত পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। বাগান থেকে নারকোল গাছের পাতা কেটে এনে দুদিকে রাখা হয়েছে। ঠিক যেন দুটো কামান।

বিয়ের দিনটিতে এত ভীড় হয়েছিল, দালানে পা রাখার জায়গা ছিল না। আমাদের আর পিসির বাড়িতে অতিথি অভ্যাগতদের ঠাসাঠাসি। এত লোক একজায়গায় আমি এই প্রথম দেখলুম। এই ভীড়ের মধ্যে আমি আসছি যাচ্ছি, ঘুরছি ফিরছি। সবার আদর খাচ্ছি, পিঠ চাপড়ানি পাচ্ছি। বৌ বাচ্চারা সব সেজেগুজে এসেছে, বড়রা নতুন কাপড় পরেছে, সোনা রুপোর গয়না চড়িয়েছে গায়ে, আর তারাদি, তারাদি

করছে। এদিক-ওদিক ঘুরে মার সঙ্গে খুব হৈ চৈ করে আলাপও জুড়ে দিয়েছে। আমিও সেজেছি, মাথায় কাল টুপি, পরনে নতুন প্যান্ট। কোথায় কি হচ্ছে, দেখছি সব ঘুরে ঘুরে বিয়ের মণ্ডপে।

এদিকে তখন বরকনেকে নিয়ে নানান অনুষ্ঠানের তোড়জোড় লেগে গেছে। ওদের চান করানো হল। মেয়েরা, বৌরা, গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে দেখছে, তারই মধ্যে ঠেলেঠুলে পথ বার করে চানের জায়গায় ঠিক ঢুকে পড়লুম। বাটি থেকে একটু হলুদ নিয়ে ছুটে গিয়ে দিলুম বাচ্চাদের গালে লাগিয়ে। একধারে দিদির বিয়ের তত্ত্বও সাজানো ছিল। একটা একটা করে সেগুলো খোলা হচ্ছে আর বউরা, শুধু বৌরাই বলি কেন, কিছু কিছু উৎসাহী বেটাছেলেরাও দেখি গান জুড়ে দিয়েছে। কেউ কেউ আবার নানারকম ধাঁধা বলতে লেগেছে। তত্ত্ব যা সব খোলা হচ্ছিল তা থেকে বেরোচ্ছিল নানা ধরনের মিষ্টি। রকমারি পুলি, রঙিন দরবেশ, সুজির লাড্ডু। নোনতার মধ্যে দেখতে পেলুম থালাভর্তি ঝুরি ভাজা। লম্বা লম্বা বাতাসা আর কলার কাঁদি, কত রকমের পাঁপড়ই না ছিল। গোলাপি রঙের পাঁপড়ও এরই মধ্যে নজরে এল। এত রকম জিনিস চোখের সামনে সাজানো দেখে চোখ আমার ছানাবড়া হয়ে গেল। মা যে কখন এসব তৈরী করল বুঝতেই পাবি নি। কলা, মুড়ি আর বাতাসা না হয় পাড়ার বৌঝিরা দিয়েছে আইবুড়ো মেয়েকে, কিন্তু অন্য সব মা কখন করল?

আমার খুশী আর ধরে না। সারা বাড়ি, বিয়ের মণ্ডপ লাফিয়ে বেড়াচ্ছি। বিয়েবাড়িতে আর যারা ছোটর দল ছিল তাদের কাছে আমার কি খাতির! নারকোল গাছের এক-একটি ডাল থেকে একটি করে পাতা ওরা আজ হাতে পেয়েছে। সে কার জন্যে? সে তো আমারই হুকুমে। আমার ইচ্ছে হলে কোনো কোনো বাচ্চাদের বিয়ের মণ্ডপ থেকে আমি বারও করে দিয়েছি। এ ভয়েই ওরা সব সময় আমার মন জুগিয়ে চলছিল। সেদিন আমার কি ডাঁট, দেখে মনে হবে শাহানশাহ।

বিয়ের মিছিল নিয়ে যাওয়া হল বিরুবার থানে। আমার খালি পা, রোদের তাতে ভাজা ভাজা হচ্ছিল। ধনগরদের রামা ছিল, আর ছিল মিশালাদের লক্ষ্ণ। নাচতে নাচতে যাচ্ছে দল। আমার সে কি শিহরন কি উৎসাহ! হাতে ধুনুচি নিয়ে তালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরা কতই না উঁচুতে লাফ দিতে দিতে এগোচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল ধরিত্রী মা ওদের কাঁপনের দাপটে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। তবুও ওরা নেচেই চলেছে, ঘুরে ঘুরে নাচছে। সঙ্গে বাজছে ঢোল, বাজছে ঢাক।

মার চান হয়েছে, ভেজা চুল পিঠে এলানো। দুহাতে হলুদ মাখা কাপড়ের টুকরো। মনে হচ্ছিল দুহাতে দুটো ভেজা ভাখারি ধরে আছে। মা চলেছে মামার সঙ্গে সঙ্গে। ওদের মাথায় বাবার ধুতি দিয়ে ছাউনি করা হয়েছে পাট করে। চার কোণায় চারটে এক হাত লম্বা সরু লাঠি বাঁধা আছে। চারজন চলেছে লাঠি ধরে, মা ও মামার মাথার ওপর ছাউনি করে ধরে আছে চারদিকে।

আনসা বিয়ের ব্যাপারটা তেমন বোঝে নি। সে কেবল সাজগোজ করে মণ্ডপে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কি সুন্দরই না ছিল আনসা! টকটকে ফর্সা রং, পিংলা চোখ। নাক

চোখ মুখ খুব পাতলার ওপর, গলার স্বর ভারি মিষ্টি। তাকে পরানো হয়েছিল বেশ ভারী ধরনের কাপড় আর গয়না। ওর গায়ে আজ হলুদ মাখিয়ে পুতুলের মতো সাজানো হয়েছে। হাজারোটা কাজ করে মামার হাতে কালি পড়েছে, কড়া পড়ে হাত হয়েছে খসখসে খরখরে। আনসার সুন্দর কচি ফর্সা ফুলের মতন হাতের কাছে মামার ঐ হাত একেবারেই মানাচ্ছিল না। তবুও আনসার সাথে কেউ কথা বলতে গেলে ওর মিষ্টি মুখটি লাজুক হাসিতে ভরে উঠছিল।

বিয়ের সময় মঙ্গল চিহ্ন শুকনো কুমকুম মাখানো চাল যখন পড়ছিল আনসার ওপর মা দেখি তখন একনজরে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। আনসা পর হয়ে যাচ্ছে। কোলে ছিল দেড় বছরের শিবা। মা আর চোখের জল চেপে রাখতে পারছে না, দু গাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। পরক্ষণেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মার সে কি কান্না!

এর একটু আগেই কি একটা ব্যাপার নিয়ে বাবার সঙ্গে মার কথা কাটাকাটি হয়েছে। প্রথম কন্যার গায়ে বিয়ের মঙ্গল চিহ্ন মানে অক্ষত পড়লে বাবা মা'র নাকি দেখা বারণ। বাড়ি তাই কমলা পিসির বাড়িতে গিয়ে বসেছিল। মার উদগাঁওয়ের পিসি মাকে টানতে টানতে বিয়ের মণ্ডপের বাইরে নিয়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ির ভেতর গিয়ে মা একজায়গায় বসে পড়ল। আজ আর মার কান্না বাঁধ মানল না, কান্না আর থামতেই চায় না। এসব দেখে শুনে আমিও কম অবাক হচ্ছিলুম না। মার দেখাদেখি তিন চার বছরের বোন হীরাও মাকে জড়িয়ে ধরে কুঁই কুঁই করে কাঁদতে শুরু করে দিল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মা আজ তার পিসির কাছে নিজের সংসারের সব ঘরোয়া কথা বলতে লেগে গেল। বাবা তাকে কেমন করে কষ্ট দিয়েছে, আরও কত কি! মার কথা থেকে আমি যেন বুঝতে পারলুম যে বিয়েটা যে কি মা যেন তাই কোনোদিন বুঝতে পারে নি। মেয়ের বিয়ে দেখে মার বোধহয় তার নিজের বিয়ের কিছু স্মৃতি আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। মধুর ভাব বা স্বামী স্ত্রীর গোপন সম্বন্ধ মুহূর্তের কিছু কিছু স্মৃতি অবশিষ্ট থাকার অবশ্য জো ছিল না, কারণ সব কিছুই তার সেই এক বছর বয়সেই যখন বাবার সাথে বিয়ে হয়েছিল তখনই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল। পিসি মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে থাকল আর এদিকে তার মেয়ের গায়ে শুকনো কুমকুম মাখানো চাল ছিটিয়ে দেবার সাথে সাথে সে আরেকজনের ধর্মপত্নী হয়ে গেল। মামা আর আনসার শোভাযাত্রা গাঁয়ের পাটিলের গাড়িতে ব্যবস্থা হয়েছিল। বাবা তাতে পেট্রল ভরে এনেছিল। আমার মামা সেই পাটিলের গোরু ছাগল চরাত এককালে। সেজন্যই সে তার গাড়িটা ড্রাইভারসমেত ব্যবহার করতে দিয়েছিল। আমারও জীবনে প্রথম এই মোটর গাড়িতে চড়ে বেড়াবার সুযোগ এসে গেল সেই সুবাদে। আমি মামার কাছে বসে গেলাম।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতেই পারি নি। হঠাৎ দেখি মা আমাকে ধাক্কা দিচ্ছে। ঘুম ভেঙে যেতে মা আমার চোখ মুখ ভাল করে ধুয়ে দিল।

"এই আন্দ্যা, ওঠ বাবা। বরযাত্রীরা সবাই এসে গেছে রে।"

"না, না, আমি এখন ঘুমোব, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।"

"ওরে পরে ঘুমোবি, বোকা। দেখ দেখ, তোর মামা আর আনসি তোকে ডাকছে।"

"কেন?"

"তা আমি কি করে জানব? ওই দেখ, ঠাকুর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবি আর মামা ও আনসিকে বলবি তোমাদের মেয়ে আমাকে দিলে তবেই তোমাদের ঢুকতে দেব।"

"যাও, আমি ওসব বলতে পারব না।" বলে লজ্জায় আমি ফিক করে হেসে ফেললুম।

"আরে শুধু মুখে বলবি, তাহলেই জামা, প্যান্ট, টুপি সব দেবে বলেছে।"

বিয়ে সুসম্পন্ন হল। বরকনে তাদের রং চঙে পোশাক খুলে রাখলে। বিয়ের টোপর যাকে বাশিং বলে সেও খুলে ছাতের কড়িকাঠে ঝুলিয়ে রাখলে। তারপর আর কি? যে যার কাজে লেগে গেল।

মামা আমাদের বাগানে সারা বছর খেটে গেল। যে টাকা সে বিয়েতে দেবে বলেছিল সেটা এভাবে সে শোধ করলে। যদিও বিয়ে করা বৌ, তবুও আনসা মামাকে এখনও মামা বলেই ডাকে। আমরা আনসার পেছনে খুনসুটি করতুম এ নিয়ে। আর আনসা মামার চেয়ে এত ছোট যে মামা নিজেও ওকে বৌ বলতে লজ্জা পেত। বাবা তো মাকে নাম ধরে ডাকত না। মাও তেমনি নাম ধরে না ডেকে বাবাকে ডাকত "ওগো শুনছ" এসব বলে। মামার আর আনসার মধ্যে এসবের বালাই ছিল না। আনসা মামা বলত আর মামা আনসে বলে ডাকত। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মামা কিন্তু ক্ষেতের কাজ করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেল। একদিকে বাবার রগচটা স্বভাব আর অন্যদিকে ক্ষেতের হাড়ভাঙা খাটুনি: মামা হয়রান হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত গুজরাতিদের জমিতে ট্রাকটারের ড্রাইভার হয়ে সে চলেই গেল।

সাত

বর্ষার শুরুতে আমাদের স্কুল খুলে গেল। আমি এখন ক্লাস টুতে পড়ি। এই ক্লাসেই মাস্টারমশাই একদিন এমন মারলেন সেটা আর তার পরের ঘটনা দুটোই সারাজীবন মনে রাখার মতো। মাস্টারমশাই একটা সরু লিকলিকে বেতের ছড়ি রাখতেন, যখন তখন চট করে তাঁর হাত উঠে যেত। আমার হাতের চেটোতে মাস্টারমশায় পাঁচ ছ'টা সপাং সপাং করে বেত মারলেন। পিঠ ঘোরানো থাকলে ওঁর বেত অন্য জায়গায় গিয়ে লাগত। অর্থাৎ যেখানে সেখানে উনি বেত লাগাতেন। জায়গা বদল হলে ব্যথা যতটা না হত একই জায়গায় বেতের ঘা পড়লে যন্ত্রণা তার চেয়ে বেশী হত। যাক গে, মারার ফলে হাতটা আমার টুকটুকে লাল হয়ে গেল।

শুধু তাই নয়, ব্যথাটা বগল অবধি গিয়ে পৌঁছল। যন্ত্রণায় আমার প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাবার অবস্থা। ঘাম ছুটে গেল, এক কোণায় গিয়ে কাঁদতে লাগলুম।

"কাঁদলে হবে? হিসেব কর্, অঙ্ক কর," মাস্টারমশাইয়ের হুঙ্কার শোনা গেল।

আমার হাত কি তখন আর লেখবার অবস্থায় আছে? পেনসিল ধরতেই পারছি না। সব ক'টা আঙুল ব্যথায় টনটন করছে। আমাদের গলির কাশীনাথ পাশেই বসেছিল। আমাকে দেখে ওর দয়া হল, খুব আস্তে আস্তে বললে, "যা বাড়ি গিয়ে বাপকে ডেকে নিয়ে আয়।"

আমি সোজা বাড়ি গিয়ে বাবাকে ডেকে নিয়ে এলুম। আমার হাতের অবস্থা দেখে বাবার মুখ আমার হাতের চেয়েও লাল হয়ে গেল। বললে, "চল দেখি মাস্টারের ঘাড়টা চেয়ারের ভেতব ধরে দুমড়ে দিয়ে আসি।"

ফের বাবার সঙ্গে স্কুলে ফিরে এলুম। বাবা আর মাস্টারমশায়ের সাংঘাতিক ঝগড়া হল। বাবার তো মুখ নয় যেন তোপখানা। বাবা বললে, "আবার হাত তুললে বলবি। মাস্টার ব্যাটাকে ছাতের ওপর থেকে ফেলে না দিতে পারলে আমার এ গোঁফই রাখব না। তারপর যা হবার হবে।"

যাই হোক, এ ঘটনার পর আর কোনোদিন মাস্টারমশায় আমার গায়ে হাত তোলেন নি, আর আমাকেও শির্প্যার মতো স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হয় নি।

ক্লাস থ্রীতে আমার মনে আছে বড় বড় অঙ্কের যোগ বিয়োগ শেখানো হত। এর মধ্যে একদিন আমি হাফ ডে ছুটি নিয়েছিলুম— আর সেদিনই কিনা এ লম্বা লম্বা যোগ বিয়োগ শেখানো হল ক্লাসে। পরের দিন মাস্টারমশাই যখন ঐসব অঙ্কের উদাহরণ ক্লাসে করে দেখাচ্ছিলেন আমি তার মাথামুণ্ডু কিছুই ধরতে পারছিলুম না। ফলে প্রথম দুটি অঙ্ক পরপর আমার ভুলই হতে থাকল। তিনবারের বারও যখন আবার সেই ভুলই হল তখন কাম্বলে মাস্টার আমার মুখে এক থাপ্পড় লাগালেন। এমন জোরে মেরেছিলেন আমার কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল, কিছুক্ষণ আমি কানে কোনো কথাই শুনতে পেলুম না। অঙ্কটাও মাথায় ঢুকল না। বাড়ি ফিরে কমলা

পিসির বাবুর কাছে গিয়ে বুঝে নিলুম। সে ক্লাস ফাইভ-এ পড়ত, সেই আমাকে ভাল করে শেখালে যোগ বিয়োগ কি করে করতে হয়।

এর পর কত বড় বড় যোগবিয়োগ শিখেছি ও করেছি। বেশ মজাও পেতুম, মনে হত কত বড় বড় হিসেব পারব করতে। করতুমও। কাম্বলে মাস্টারমশাই আমাদের হাজার অবধি যোগ করতে দিতেন, আমি করতুম কোটি অবধি যোগ বিয়োগ। নিজে নিজেই মন থেকে অঙ্কগুলো লিখে করে ফেলতুম। মাত্র দু' তিন দিনে আমি যে এতখানি শিখে ফেলতে পেরেছি তা দেখে কাম্বলে মাস্টারমশাই খুব খুশী। আর কোনদিন আমার গায়ে হাত তোলেন নি। যেটা পারতুম না, আটকে যেতুম, সেটা বাবু তো আমায় বুঝিয়েই দিত। সে নিজে ক্লাস ফাইভেই দুবছর কাটিয়েছে, ওর পড়ায় তেমন মন ছিল না। ওর মাও ওকে শাসন করত না। বাবু টাকা দিয়ে তাস খেলত। পিসতুতো ভাই বলে আমিও অনেক সময়ই ওর সঙ্গে সঙ্গে থাকতুম। পিসি সারাদিন বাইরে বাইরে কাজ করত। তাই বাড়িতে সে একাই থাকত। তাস খেলতে পয়সা কম পড়লে বাড়ি গিয়ে তোরঙ্গ থেকে পয়সা চুরি করে নিয়ে যেত। বড় মোটা ছুঁচ দিয়ে তালা টেনে খুলতে তো আমি নিজেই ওকে দুবার দেখেছি। আমিও একটু মদত দিয়েছিলুম। তাইতেই তো ও পেরেছিল। ওর মা ওকে খুব পেটাত। কিন্তু বাবু তাতে শোধরাল না, আরও ঠ্যাটা হয়ে গেল।

ক্লাস ফোরের কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে। সেটা খাটগে মাস্টারমশাইয়ের স্বভাবগুণে। কাগলের নামকরা ঘাটগো বাড়ির সাথে মাস্টারমশাইয়ের আত্মীয়তা ছিল। ও বাড়ির সবারই নামগুলো ইতিহাসের পাতা থেকে নেয়া।

আমাদের মাস্টারমশাই খুব সুন্দর গাইতে পারতেন। ক্লাসে যে কোনো একটি বিষয় বা কোনো পদ্য পড়াতে পড়াতে তিনি যেন সব কিছু ভুলে যেতেন। বইয়ের যে অংশগুলোতে সংলাপ থাকত সেগুলো উনি পড়ে যেতেন খুব নাটকীয়ভাবে, অঙ্গভঙ্গী করে। ইতিহাস পড়াতেন অভিনয় করে। ক্লাসের দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে ইতিহাসের যে অংশটুকু সেদিন পড়াবেন ঠিক করেছেন তার পাত্রপাত্রীদের কাল্পনিক কথোপকথন নিজের মন থেকেই তৈরী করে বলে যেতেন। দরকার পড়লে হাতে তলোয়ার আছে এমন ভঙ্গীও করতেন। ওঁর সবই একটু অন্য ধরনের ছিল। যেমন, পরনের চুড়িদারটি ভারি মজার ছিল। উরু থেকে হাঁটু অবধি বেশ কুঁচি দেয়া ঢিলেঢালা। তারপর থেকে ক্রমেই নীচের দিকে সেটা চোস্তের মতো আঁটো হয়ে যেত। বিশেষ বিশেষ দিনে স্কুলে আসতেন একটি কোলহাপুরী দরবারী জবরদস্ত পাগড়ি মাথায় দিয়ে। যদিও ঘাটগে মাস্টারমশাই বিড়ি খেতেন আর পড়ুয়াদের চোস্ত গালাগালিও দিতেন দরকার হলেই, তবুও তিনি ছিলেন সত্যিকারের আদর্শ শিক্ষক। প্রাণ দিয়ে সব শেখাতেন। এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে পড়ুয়াদের বাবা বা অন্য অভিভাবকদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ তিনি সব সময়ই রাখতেন। কাজের মেয়ে খুঁজতে কখনো সখনো মা আমাকে মাস্টারমশাইদের গলিতে পাঠাত। আমি কোনো কোনো সময় দেখেছি বাড়ির দরজা[illegible] বসে উনি কাঠ কাটছেন। ক্লাসে সব কিছুর জন্য নম্বর রাখার প্রথা উনিই [illegible] চালু করলেন। ক্লাসে গোলমাল করলে নম্বর কাটা যেত। প্রতি মাসেই [illegible] প্রথম

হল তা জানার দারুণ উৎসাহ ছিল আমাদের। ক্লাসে মন দিয়ে পড়তে শিখলুম আমরা সবাই। স্কুলে প্রতিদিন নিয়মিত পড়তে আসাটাও আমাদের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল। বাড়িতেও যে পড়াশোনা করতে হয় তা আমি এর আগে জানতুমই না, ভাবতুম কখন সখনো স্লেট পেন্সিল নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই বুঝি হয়।

খুব দুষ্টু ছেলেদের দেখলেই মাস্টার মশায় খেপে যেতেন। পাণ্ডু কাটকার আর গজানন মজুমদার ছিল ক্লাস ফোরে গত বছরের ফেল করা ভীষণ ডানপিটে দুটো ছেলে। খুনসুঁটি করা, এর ওর পেছনে লাগা এসবেও ছিল দারুণ ওস্তাদ। একবার হল কি, মাস্টারমশাই সেদিন ক্লাসে রাণা প্রতাপের গল্প বলে চলেছেন। ক্লাসের দরজা বন্ধ, যাতে করে তাঁর গলার স্বরে বাইরে অন্য কারো অসুবিধে না হয়। খুব জমেছে। আমরা দেখছি বাইরে কাঁচে মুখ দিয়ে ক্লাস ফাইভ-এর গুটি দুই ছেলে দাঁড়িয়ে গেছে মাস্টারমশায়ের অভিনয় করে পড়ানো দেখতে। অভিনয় দেখে ওরা আঁচ করে নিয়েছে ইতিহাসের কোনো ঘটনা পড়ানো হচ্ছে। আমারা তো এদিকে সব কিছু ভুলে মাস্টারমশায়ের অভিনয় হাঁ করে দেখছি আর গিলছি। হলদিঘাটের যুদ্ধ, রাণাপ্রতাপের ঘোড়দৌড়, আকবরের ছেলের সঙ্গে লড়াই, সবই যেন চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ধরা দিয়েছে। টুঁ শব্দটি কোথায়ও নেই। সবাই স্থির, পাথরের পুতুলের মতো নিস্পন্দ। রঙ্গমঞ্চে অভিনেতারা যেমন সংলাপ বলতে বলতে চলে চলে বেড়ান, মাস্টারমশাইও তেমনি সারা ক্লাসে ঘুরে ঘুবে ইতিহাসের সেই সব অজানা তথ্য আমাদের বলে যাচ্ছেন।

এদিকে গজা আর পান্তিয়া এরই মধ্যে কি একটা ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি শুরু করে দিয়েছে। ক্লাসে যা পড়ানো হচ্ছে তাতে ওদের মোটেই মন নেই। হয়তো বা গেল বছর এ গল্প বা অভিনয় ওরা শুনে থাকবে। আর কেউ দেখুক না দেখুক, মাস্টারমশাই ঠিকই লক্ষ্য করলেন।

একটু থেমে গেলেন, হয়তো ভাবলেন এত প্রাণবন্ত করে গল্প বলে যাচ্ছেন তিনি, আর এরা শুনছে না। চুপ করে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বলে উঠলেন, "আমি আর বলব না, গল্প বন্ধ।" এই বলে রাগ করে চেয়ারে বসে পড়লেন।

আমরা চার পাঁচজন মাস্টারমশাইয়ের টেব্‌ল্ ঘিরে দাঁড়ালুম।

"কেন স্যার, আমরা কি কোনো গোলমাল করেছি?"

"গল্প বন্ধ, আর বলা হবে না। যাও সবাই অঙ্ক করোগে যাও।"

অঙ্কের কথা বলতেই আমার মনটা ভীষণ দমে গেল।

"না স্যার, গল্পই চলুক। হ্যাঁ স্যার, গল্প বলতেই হবে, আমরা কি দোষ করেছি। শুধু শুধু কেন গল্প বলা বন্ধ করে দেবেন?"

টক করে চেয়ারটি ছেড়ে মাস্টার মশাই উঠে পড়লেন, "কাটকারদের এই ছোঁড়াটা আর বামুনদের ঐ ছোঁড়া এ দুটো ক্লাসে যখন তখন কিচির মিচির শুরু করে দেয়," বলেই ওদের পিঠে লাগিয়ে দিলেন কষে ঘা কতক। উপরি পাওনা হিসাবে দু'তিনটে লাথিও পড়ল ওদের ঘাড়ে। ছেলেদুটোর অবশ্য এতে কোনো লজ্জা নেই, ওরা যেন মার খাবার জন্য সব সময় তৈরী হয়েই থাকত। স্যারও এটা জানতেন। তাও তাদের ওপর বিরক্তিটা একটু ঝালিয়ে নিয়ে মাস্টার-মশাই গল্পের বাকিটুকু আরম্ভ করলেন,

কিন্তু বোঝাই গেল সেদিন গল্প আর তেমন জমবে না।

গল্প শেষ হতেই মাস্টারমশাই ছেলে দুটোর কাছে আবার গেলেন, "ওরে গজা 'রে, আর কত মার খাবি তুই আমার হাতে? তুই ব্যাটা বামুন, নিজের পৈতের কথাটাও তো একবার ভাববি? তোকে কি এসব মানায়? দিনদিন মস্তান হচ্ছিস। বাবা মায়ের কথা মনে করেও একটু লেখাপড়ায় মন দে বাপধন আমার।"

মাস্টারমশায় সত্যি সত্যি ওর জন্য আকুল হয়েই কথাগুলো যে বলছিলেন তাতে কোনো সন্দেহই ছিল না। এমনি আরেকদিনের কথা, স্কুলে সেদিন কি যেন একটা ফাংসন ছিল। ছেলেদের স্কুলে আসতে বলা হয়েছে যদিও ক্লাস হবে না। মাস্টারমশাইরা সব ভাল জামাকাপড় পরে ফিটফাট হয়ে এসেছেন। ছেলেদের কোনোরকমে ক্লাসে বসিয়ে রাখা হয়েছে। পাণ্ডু কাটকার যথারীতি ক্লাসের ধারে-কাছে কোথায়ও ছিল না। হঠাৎ ছেলেরা খবর আনল পাণ্ডু সিঁড়ির ওপর থেকে পড়ে গেছে। মাস্টারমশাই তক্ষুণি লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে সেখানে গিয়ে হাজির। সিঁড়ির তলায় মেঝেতে পাণ্ডু রক্তাক্ত দেহে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছে। মাস্টারমশায় খুব সাবধানে ওকে তুলে ধরে তক্ষুণি সরকারী ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে টেবলের ওপর শুইয়ে দিয়ে শুধোলেন, "ডাক্তার কোথায়?"

"বাড়িতে।"

সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশাই ছুটলেন ডাক্তারের বাড়িতে। আমরাও ছুটে চলেছি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে— স্কুল থেকে ডাক্তারখানায় আবার ডাক্তারখানা থেকে ডাক্তারের বাড়ি।

"ডাক্তারবাবু, তাড়াতাড়ি চলুন, আমাদের একটি ছেলে খুব জখম হয়েছে পড়ে গিয়ে।"

সেদিন মাস্টারমশায়ের সে দামী পোশাক রক্তে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। সে পোশাক মাস্টারমশাই কি আর কোনোদিন পরতে পেরেছিলেন? মনে হয় না।

এসব কাজে মাস্টারমশাই থাকতেন সবার আগে, তাই না তিনি ছিলেন আমাদের অতি কাছের লোক।

গাঁয়ে যেবার প্লেগের প্রাদুর্ভাব হল, সেবার গাঁকে গাঁ পালিয়ে গেল। আমরা গেলুম বাগানে। সেখান থেকেই স্কুল করতুম। এ রোগকে আমরা বলতুম ইঁদুর পড়ার রোগ। লোকেদের বাড়ির চেয়েও জঙ্গলেই অবশ্য ইঁদুর থাকত বেশী। গাঁয়েতে বাড়ির চালাগুলোতে ইঁদুর থাকত, মরলেই চটপট নীচে পড়ত। সবাই তাই জেনে যেত। জঙ্গলের ইঁদুরগুলো জঙ্গলেই গর্ত করে থাকত, নিশ্চয়ই গর্তেই মরত, তাই পড়ল কিনা কারো জানার উপায় ছিল না।

বাগানে থাকতে আমাদের বেশ মজাই লাগত। মাস্টারমশাই থাকতেন গাঁয়েরই বাইরে কোথায়ও। তাঁর কাছে কাজ চালানো গোছের ঘর তৈরী করে নেবার কোনোই সাজসরঞ্জাম ছিল না। তিনি ক্লাসের ছেলেদের ডেকে বললেন, "বাবারা শোনো। দেখছ তো, সবাই গাঁয়ের বাইরে চলে যাচ্ছে ভয়ে। তোমাদের গুরুমাও যেতে চাইছেন কিন্তু কোনোরকমে থাকার মতো ঘর বাঁধারও তো কিছুই জিনিসপত্র আমার নেই। তোরা কি আমাকে গাছের গোড়াটোড়া একটু দিয়ে সাহায্য করতে পারবি? যাদের

বাগান আছে, গাছ আছে, তারা বাবার কাছে গিয়ে বলবি আমাকে থাম করবার মতো একটা গাছ দিতে। পারবি না? প্রত্যেকে একটা করে গাছ দিলেই আমার কাজ চলে যাবে।"

মাস্টারমশাই কোনদিন কারো কাছে কিছুই চান নি। পরের দিন অনেকেই বললে এসে, ওদের বাবারা কথা দিয়েছে গাছ দিয়ে সাহায্য করবে। আমার বাবাও কুঁড়েঘরের ছাউনি করার জন্য কিছু ডালপাতা দেবে বলেছে। পিম্পলগাঁ থেকে গোটা দুই ছেলে আসত, ওরা প্রত্যেকে একটি করে গাছ দেবে বলেছে। পিম্পলগাঁ কাগল থেকে তিন সাড়ে তিন মাইল দূর। সেখান থেকে গাছগুলো বয়ে আনতে হবে। একটা গাছ বইতে জনা দুই লোক লেগে যাবে। তাহলে চারজন লোকের দরকার। মাস্টার মশায় আমাদের বললেন, "পিম্পলগাঁ থেকে গাছ বয়ে আনতে হবে। যাদের ওজন বইবার অভ্যেস আছে তারাই পারতে পারে। যারা যেতে চাও হাত তোলো। চার পাঁচটি পালোয়ান গাট্টাগাট্টা ছেলে চাই আমার।"

আমি হাত তুলে দিলুম। গাছ বইবার যে আমার একটা খুব অভ্যেস বা শখ ছিল তা নয়, মাস্টারমশায়ের জন্য কিছু একটা করব বলেই যে হাত তুলে দিলুম, ঠিক তা-ও নয়। আসল কথা হচ্ছে ক্লাস ফোরে উঠে অবধি আজ পর্যন্ত গাঁ ছেড়ে বাইরে আমি কোথায়ও যাইনি, অন্য কোনো গাঁই চোখে দেখিনি। দুতিন মাইল দূরে ছিল সিদ্ধনেলী, সেটা একবাব তাড়াহুড়ো করে দেখেছিলুম অনেকটা বুড়ি ছোঁয়ার মতো। আখের রস জ্বাল দেবার জ্বালানি কিছু ছিল না তখন, তাই সিদ্ধনেলীতে কিনতে যাওয়া হয়েছিল। সেই ছুতো করে গাড়িতে বসে আমার ছোট পিসি আকনিকে দেখে এলুম। বাবার অজান্তে এই ফাঁকে আমার পিম্পলগাঁ দেখা হয়ে যাবে সেই আনন্দেই ছিলুম। আমাদের গাঁয়েরই মতন যে আরও একটি গাঁ থাকতে পারে, সেখানেও যে ভিন্ন ধরনের লোকের বাস হতে পারে, আরেক রকম মন্দিরেও লোকে পুজো দিতে পারে, অচেনা পথ থাকতে পারে, অজানা গাছপালা গজাতে পারে, তা আমার ধারণার বাইরে ছিল।

গাঁয়ের ভেতরে ভেতরে একটা পথ দিয়ে গিয়ে অনেক মাঠ পেরিয়ে, অনেক গাছের ছায়ার তলা দিয়ে দিয়ে ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই আমরা পিম্পলগাঁ পৌঁছে গেলুম। কত রকমের গল্প করে করেই পথ কেটে গেল। অমুকের বাগান কেমন, সেখানে কি কি আছে, এ সব খোঁজ খবর নিতে নিতে চলেছি। আমাদের বাগানগুলো থেকে অন্য ধাঁচের বাগান বা ক্ষেত দেখলে আমার কৌতূহল হত। এসব নতুন নতুন জিনিস দেখব বলেই না বেরিয়েছি। বন্ধুবান্ধব মিলে বাপ মায়ের পাহারা ছাড়াই পরদেশে চলেছি। মনে হল আমরা যেন কত বড় হয়ে গেছি। যে যার মনের কথা প্রাণ খুলে বলতে পারছি বাবা মা সঙ্গে থাকলে আর রক্ষে ছিল? একটু পরেই "ওরে চুপ কর" এসব শুনতে হত। আমরা পাঁচ ছ'জন যারা এখন একসঙ্গে যাচ্ছি, তারা আমারই বয়সী, আমারই মতো মন, একই সঙ্গে বলতে গেলে, একই রকম কথা বলতে বলতে যাচ্ছি, যতই যাচ্ছি একটা নতুন জগৎ যেন আমাদের সামনে খুলে যাচ্ছে।

সেদিন যে কি একটা উন্মাদনার মধ্যে আমরা গেলুম ও শেষে ফিরেও এলুম তা বলার নয়। ফিরে এসে স্কুলের দোরগোড়াতেই গাছ দুটো ধপ করে ফেলে দিলুম। স্কুল তখন ফাঁকা, ক্লাসে কেউ নেই। সবচেয়ে ভয়ের কারণ আমার স্কুলের ব্যাগ ওখানে দেখতে পেলুম না।

"আমার ব্যাগ, আমার ব্যাগ?" বলে আমার বন্ধুরাও একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিলে। ওদেরও একই অবস্থা। কারোরই ব্যাগ নেই।

"মাস্টারমশাই তো আলমারিতে তুলে রেখেছেন, কাল পাব'খন।" অন্যরা বলে উঠল।

আমাব চিন্তা হল। বাড়ি ফিরে ব্যাগ-এব খোঁজ পড়বেই, তখন মাস্টারমশাই আলমারিতে তুলে রেখেছেন বললে বাবার ঠিকই সন্দেহ হবে। তক্ষুণি জিজ্ঞেস কবে বসবে, "তুই তাহলে কোথায় গিছলি?" তখন যদি বলি "পিম্পলগাঁ গিয়েছিলুম" তাহলে বাবা কি আর আমাকে আস্ত রাখবে? মেরে গায়ের চামড়া তুলে দেবে না?

আমাদের বুক দুরদুর্ করতে লেগে গেল, কিন্তু উপায় কি? সেভাবেইই আমরা গাছ দুটো মাস্টারমশায়ের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলুম।

সেখানে পৌঁছেই আমি মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করলুম, "স্যার, আমার স্লেট পেন্সিল ব্যাগ ওগুলো কোথায়?"

"আমি কি করে জানব? তুই কি তোর ব্যাগ আমার কাছে ছেড়ে গিয়েছিলি?" মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন।

"আমি কি করে বুঝব অত দেরী হবে? ভাবলুম স্কুল ছুটি হবার আগেই আমরা ফিরে আসব।"

"দেখ, হয়ত কেউ নিয়ে গেছে। ভাবিস না, কাল আমরা খোঁজ করব'খন। তুইও তোর বন্ধুদের কাছে এর মধ্যে খোঁজ করতে থাক।"

"আচ্ছা," বললুম আমি ঠিকই, কিন্তু ভয় আমাব আরও বেড়ে গেল। বাবার সেই রগচটা মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভাবলুম সময় থাকতে থাকতেই ব্যাগটা নিয়ে আসি। মাস্টারমশাই যে কেন আমাদের ব্যাগগুলো নিজের কাছে রেখে দিলেন না ভেবে পেলুম না। আমরা তো তাঁর ভরসাতেই ব্যাগগুলো ছেড়ে গেছি। এত সব কাণ্ড হবে কে জানত? অবশ্য কাল খোঁজ করবেন বলেছেন এই রক্ষে।

আমার যে তিন চারজন বন্ধু ছিল তাদের বাড়িতে গেলুম। না, ওরা কেউই আমার ব্যাগ নিয়ে আসেনি। এবার আমার হাত পা সত্যি সত্যি ঠাণ্ডা হতে লাগল। বাড়ির দিকে এক পা এক পা করে এগোচ্ছি আর ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। না গিয়েও তো উপায় নেই। সন্ধে হচ্ছে হচ্ছে, ঘরে ঘরে বাতি জ্বলছে একটি দুটি করে। দেরী হলে বাবা মা দুজনের হাতেই মার খেতে হবে। ভাবছি ব্যাগ-এর কথাই বা কি বলব?

বাড়ি ফিরে দেখি মা কুলোয় চাল ঝাড়ছে। "এত দেরী হল যে? খালি হাত কেন? ব্যাগ কোথায়?"

"বন্ধুর বাড়িতে পড়ছিলুম। ব্যাগ সেখানেই রেখে এসেছি। কাল সকালে সেখানেই

যাব কিনা," নিমেষের মধ্যে যা মনে এল বলে ফেললুম। স্কুলের কাছেই একটি বন্ধু থাকে, বামুন। তার কথাই বললুম। তবুও ব্যাগ-এর ব্যাপারে মা আমাকে সাবধান করে দিলে। মনে মনে হয়তো ভাবলে বামুনের বাড়িতে ব্যাগ যখন রেখে এসেছি তখন ভয়ের কারণ নেই। সে রাতে আমার ঘুমই হল না।

পরের দিন স্কুলেও কারো কাছে আমার ব্যাগ পেলুম না। আমার কান্না পেয়ে গেল। দ্বিতীয় ঘণ্টা বাজল মাস্টারমশায় এলেন, তিনিও সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন। না, কেউই আমার ব্যাগ নেয়নি।

কয়েকজন ছেলে সেদিন স্কুলে আসেনি। আমি ভাবলুম ওদের মধ্যে কেউ হয়তো আমার ব্যাগ নিয়েছে। মাস্টারমশাই বললেন "ওরা আসুক, তখন আবার খোঁজ করব।"

এদিকে আমার আমার তর সইছে না। মাস্টারমশাইকে এত নির্বিকার দেখে এবার আমার রাগ ধরে গেল। ছেলেরা অঙ্ক কষছে, বই পড়ছে, গল্প করছে। এসব কিছুতেই আমার মন নেই, বোকার মতো বসেই আছি।

পনের মিনিটের ছুটির সময় গজা মজুমদার আমার কাছে এল। বললে, "তুই বাড়ি গিয়ে যদি একটা নারকোল এনে দিতে পারিস্, আমি তোর ব্যাগ খুঁজে দেব।"

"সত্যি?"

সে দিব্যি কেটে বললে সে পারবেই পারবে।

"ব্যাগটা তাহলে কোথায় বল?" আমি শুধোলুম।

"সে আমি খুঁজে দেব'খন বলছি তো। তোকে ভাবতে হবে না। তুই বাড়ি গিয়ে নারকোল নিয়ে আয়, আমি এদিকটা সামলাচ্ছি।"

এবার যেন আমি সাহস পেলুম। গইবি কাগলের ভীষণ জাগ্রত দেবতা, তাঁর নামে দিব্যি কেটেছে, হাজার দুষ্টু হলেও গজা তাহলে মিথ্যে বলছে না। আমরা ছোটরা জানতুম গইবির নাম করে নারকোল ভেঙে খেলে যে মিথ্যে কথা বলে তার পেট ছাড়ে। এই ঠাকুরের নাম করেই যাচাই করা হত কে মিথ্যে বলছে, কে সত্যি। আমাদের কাগলের এই ছিল রীতি।

আমি বাড়ির পথ ধরলুম। বাড়ি গিয়ে মাকে কি বলি? নারকোল কেনার পয়সা চাইলেই হয়েছে আর কি! পিম্পলগাঁয় গিয়েছিলুম জানলে জানেই মেরে দেবে আমায়। আর মাস্টারমশাই? তাঁকেও ছেড়ে কথা কইবে না কি? দেবে এক দাঁতখিঁচুনি। পিম্পলগাঁয়ে পাঠিয়েছ আর ব্যাগগুলো নিজের কাছে সামলে রাখতে পার নি? ফলে মাস্টারমশায়ের রাগটা ঘুরে ফিরে আবার আমার ওপরেই পড়বে।

বাড়িতে পা দিতেই মার জেরা, "ফিরলি কেন?"

"পায়খানা পেয়েছে।"

সত্যি বলতে গেলে এ কম্মটা স্কুলে থেকেই সারা যেত। কাছাকাছি পুলের তলায় একটা নালা ছিল। অন্যসময় এসব কম্ম আমরা সেখানেই সেরে ফেলতুম। মার অবশ্য এসব জানার কথা নয়।

"মাগো, আমার যে খিদেও পেয়েছে।"

"সকালে পেটভরে খেতে কি হয়েছিল। আচ্ছা যা, আগে পায়খানাটা তো সেরে আয়।"

কিছুক্ষণ ভড়ং করে আমি ফিরে এলুম। মাকে থালায় খাবার বেড়ে দিতে বললুম। আমাকে খাবার দিয়ে মা পেছনের উঠোনের পাথরে কাপড় কাচতে লেগে গেল। সেই ফাঁকে টক করে ঘরে ঢুকে অন্ধকারে যেখানটায় সবসময় কালো কোট ঝোলান থাকত পেরেকে, তারই পকেট থেকে হাতে যা উঠে এল তাই তুলে প্যান্টের সেলাইর ফাঁকে গুঁজে রেখে চলে এলুম। তারপর খাবারের থালায় আর এক দফা খাবার ভড়ং করতে হল। মা আমার প্যান্টের পকেটে এক মুঠো বাদাম গুঁজে দিলে। এবারে ব্যাগটা ফিরে পাবার আশায় লাফাতে লাফাতে চললুম। পথেই পড়ে কটকে আন্নার দোকান। সেখান থেকে একটা বড় নারকোল কিনে দেখলুম দু আনা পয়সা তখনও আছে—সেটা আমার কাছেই রইল।

স্কুলের কাছাকাছি আসতেই টিফিনের ঘণ্টা কানে এল। মাস্টারমশায় অফিসঘরে গিয়েছিলেন। সুযোগটা কাজে লাগালুম। ক্লাসে স্যার-এর না থাকাই ভাল। আমিও আর একটুও সময় নষ্ট না করে নারকোলটা গজাকে দিলুম। গজা আবার তক্ষুণি উঠে গিয়ে অন্য একটা ক্লাসে ওর বন্ধুর হাতে সেটা পাচার করে দিলে আর আমার ব্যাগও সেই সঙ্গে আমি পেয়ে গেলুম। সেই টিফিনের ছুটিতেই ডানপিটে গজা আর ওর বন্ধুরা মিলে স্কুলের পেছন দিককার উঠোনটায় সবার কাছে আমাকে কেমন বোকা বানালে তার গল্প রসিয়ে রসিয়ে বললে আর তার সাথে সাথে সেই বড় নারকোলটা ভেঙে সদ্ব্যবহার করতেও ছাড়লে না। আমি নারকোলের একটা টুকরোও পেলুম না। মাস্টারমশায়কে নালিশও করতে পাচ্ছি না, হাতের স্কেলটা তুলে গজা আমায় মারের ভয় দেখিয়েছে। তাছাড়া মাস্টারমশায়কে নালিশ করলে উনি সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করে বসতেন, "নারকোলটা কি করে আনলি?" তাতে আবার অন্যরকম ফ্যাসাদে পড়তুম। তাই আর কোনো কথা না বাড়িয়ে সোজা বাড়ির দিকে হাঁটা দিলুম ব্যাগটা নিয়ে। কিন্তু ঘাটগে মাস্টারমশাই সেইদিন থেকে আমার চোখে একটু খাটো হয়ে গেলেন।

তারপর থেকে ব্যাগ ছেড়ে আমি কখনও আর কোথায়ও যাইনি। টিফিনের ছুটির সময় ব্যাগটা আগলে বসে থাকতুম। আমার ধারণা হয়ে গেল মাস্টারমশাই নিশ্চয়ই আমাকে তেমন ভালবাসেন না, আমাকে এভাবে কেউ ঠকালেও তাঁর কিছু যায় আসে না। সবাই আমাকে ঠকায়, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, গজাকেই বিশ্বাস করে, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। এসব ভাবতে ভাবতে একসময় আমি সঙ্গীহীন হয়ে গেলুম।

টিফিনের ছুটিতে দেখতুম তিন চারজন ক্লাসেই বসে থাকত। এদের মধ্যেই তিনজনের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেল। বাপু মেছো এইসময়টা ক্লাসে বসে বসে অঙ্ক কষত। আমাদের নতুন বালুগুড়ি নামে যে জমিটা ছিল তারই কাছেপিঠে গাঁয়ের একটু বাইরে বাপুরা থাকত। চন্দ্রকান্ত মেরওয়াড়ে আর সুরেশ মানে ছিল বই পাগল। ছুটির ঘণ্টা পড়লেই এ দুজন ওদের টিনের বাক্স থেকে গল্পের বই বার করে পড়তে আরম্ভ করত। রঙিন টিনের বাক্সদুটি ছিল ওদের কাছে অমূল্য সম্পদ। ক্লাসে আর কারো বাক্স ছিল না। আমাদের তো কাপড়ের ব্যাগ। কারো কারো আবার চৌকো এক কাপড়ের টুকরোতে স্লেট পেনসিল বাঁধা থাকত। আমার ব্যাগটা ছিল সাদা। এ দুজনের

একজনের কাকা ডাক্তার। ও সেই ডাক্তারকাকার কাছে থেকেই পড়াশুনা করছিল। অন্যজনের বাড়ির অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। ছেলেদুটি বেশ গোলগাল, দেখতে যেমন সুন্দর ছিল তেমনি সুন্দর জামাকাপড় পরত। আমি তো ছিলুম জংলী, না জানতুম আদবকায়দা, না পরতুম পরিষ্কার জামাকাপড়, হয় চারদিন বাদে বাদে চান করছি, জামাকাপড় পাল্টাচ্ছি। রোদে রোদে ঘুরে বেড়াতুম, শুকনো মাথা, উসকো চুল। ওরা রোজ চান করত, পরিষ্কার কাপড়জামা পরত।

একবার আমি চন্দ্রকান্তর কাছ থেকে ধার নিয়ে একটা বই ছুটিতে পড়ে শেষ করে ফেললুম। ভারি সুন্দর গল্পের বই। আমাদের বন্ধুত্ব আরও গাঢ় হল। গোড়ার দিকে ছেলে দুটি আমার কাছে বড় একটা ঘেঁষত না। আমি কিন্তু ওদের সঙ্গ ছাড়তুম না, ছোটখাটো অনেক কাজ ওদের করে দিতুম। চন্দ্রকান্ত ওর বই পড়া হয়ে গেলে আমায় পড়তে দিত। এক ধরনের বিচি যাকে আমরা কালা বলতুম সেই বিচি নিয়ে খেলতে আমি ওস্তাদ ছিলুম। খেলায় আমি জিতবই। আমি ওদের কালা নিয়ে খেলে জিতে সেই কালা আবার ওদের ফিরিয়ে দিতুম— এতেই আমাদের মধ্যে ভাব আরো জমে গেল। ওদের কাছ থেকে যা যা বই পেতুম আমি সে সব পড়ে ফেলতুম। চন্দ্রকান্তের কাছে একশরও ওপর বই ছিল। স্কুলের কাছে যে ডাক্তারখানাটা ছিল তারই পেছনটাতে চন্দ্রকান্ত থাকত। ওর কাকা তো ডাক্তার ছিলেন, ডাক্তারখানায় অনেক ঘরই খালি পড়ে থাকত। এরই মধ্যে একটিতে চন্দ্রকান্ত থাকত। চন্দ্রকান্তব ঘরে দেখেছি অনেক খেলনা। সিনেমার অনেক টুকরো টুকরো ফিল্ম্ ওর কাছে ছিল। আর ছিল একটা দুরবীন, একটা কাঁচ। সেই কাঁচের কাছে টুকরো ফিল্ম্‌গুলো ধরে আয়না দিয়ে তার ওপর রোদ ফেলে সে দেয়ালে ছবি দেখত। বেশ বড় ছবিই ভেসে উঠত দেয়ালে। আমার খুবই অবাক লাগত।

স্কুলের হাফটাইমের ছুটিতে আমরা এই সব দেখে বেড়াতুম। কখনো সখনো কালা নিয়েও খেলেছি। অনেক সময় খেলতে খেলতে আমি ইচ্ছে করেই হেরে যেতুম।

এই করে একটা সময় এল যখন চন্দ্রকান্তর সব বই আমার পড়া হয়ে গেল। তখন আর কি করি? পড়া বইগুলোই বসে বসে আবার পড়তে লেগে যেতুম। যেখানে যা বই পেতুম সব আমি পড়ে ফেলতুম। পড়া করেছি কিনা জিজ্ঞেস করবার কেউ তো আমার ছিল না বাড়িতে। কেউ কি এসব জানত, না বুঝত? সবাই তো মুখ্যু। একটা কিছু গুল মেরে দিলেই হত।

একই বই যখন তিনবারের বার পড়তে যাচ্ছি, তখন দেখছি লাইনকে লাইন সব মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন মনে হল একই বই তৃতীয়বার পড়তে আর তেমন ভাল লাগে না। তবে বই পড়ার আগ্রহ দিন দিনই আগুনের মতো দাউ দাউ করে বেড়েই চলল।

ইঁদুর পড়ার দিনগুলোতে এদিকে আস্ত গাঁ-টাই প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। আমরাও তখন থাকতুম বাগানে। বাড়ির সব গয়না আর টাকা পয়সা বাবা এই বাগানেই পুঁতে রেখেছিল। মনে আছে একবার আমি ছোট্ট পাঁচিলের ওপর রাত্রে শুয়ে আছি। বাবা আর মা গল্প করছে। আমি যেখানে শুয়েছিলুম তার তলা থেকেই আস্তে আস্তে

একটা বাক্স বার করলে। দেখলুম লণ্ঠনের আলোতে বাবা আর মা সেই বাক্স থেকে টাকা পয়সা বার করে গুণছে। ওদের কথাবার্তায় ঘুম তো আমার আগেই ভেঙে গিয়েছিল, কাজেই আমি সবই দেখতে পেলুম, সব কথাই শুনতে পেলুম। একসময় সত্যি সত্যি ঘুমিয়েও পড়লুম। এটা বুঝেছিলুম যে, যে-পাঁচিলটার ওপর ঘুমোতুম ঠিক তার নীচে দশ টাকার একটা বাণ্ডিল একটা বাক্সতে পুরে মাটি খুঁড়ে রাখা ছিল। পরের দিন থেকে আমার মাথায় কেবল ঐ ব্যাপারটিই ঘুরে বেড়াচ্ছে থেকে থেকে। আমার মনে হতে লাগল আমারই হাতের কাছে এত পয়সা আছে। এত গোপন একটা তথ্য আমি আবিষ্কার করেছি। এখন তা নিয়ে করবটা কি ভেবেই পাচ্ছি না। মনে পড়ে মাসে কি দুমাসে মার কাছে চেয়ে চেয়ে হয়তো বা একটা পয়সা পেতুম। তার জন্য আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত, অনেক কাজ করতে হত। আর বাবা? বাবা যা বদরাগী ছিল, কোনোকালে একটা পয়সাও হাতে ঠেকায়নি। চাইলে বলত, "কোমরে লাথি খাবার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি? আজ খাওয়াটা কম হয়েছে, তাই না? পয়সা দিয়ে কি করবি? বাড়ির বাগানে খাবার কম আছে? কেনা জিনিস না খেলেই নয়, না? ভাগ এখান থেকে।"

এতসব কথার জবাব আমি খুঁজে পেতুম না। বেশী জোরাজুরি করলে বা জিদ ধরলে বেশ ভাল রকমের উত্তম মধ্যম জুটত কপালে। বাবার পালোয়ানের মতন হাত—থাপ্পড় যখন পড়ত গায়ে মনে হত ঠিক যেন কাঠের তক্তা এসে পড়ল। তাই পয়সা চাওয়া বা কোনোরকম আবদার আমোদ আহ্লাদ করার সাহস আমি বাবার কাছে কখনই দেখাতুম না। আমাকে কাজ করতে হুকুম করে নিজে আড্ডা মারতে বসে যেত। যেহেতু কুড়ি বড় জোর পঁচিশ-এর বেশী গুণে যাবার বিদ্যে পেটে ছিল না, তাই কুড়ি টাকা গোণা শেষ হলেই বাবা তার একটা বাণ্ডিল করে ফেলত। এভাবে পাঁচটা বাণ্ডিলের ঢিপি করে বাবার একশ টাকা গোণা শেষ হত। কাকে কত টাকা দিয়েছে জিজ্ঞেস করলে বলত, 'অমুককে এক কুড়ি পাঁচ, তুসুককে পাঁচ,' এ'রকম।

সেদিন ছিল একটা ছুটির দিন। কেউ কোথায়ও নেই দেখে আমি মাটি খুঁড়ে ছোট্ট সেই বাক্সটা বার করলুম। খুব সাবধানে ওখান থেকে একটা দশ টাকার নোট সরিয়ে বইয়ের ভেতরে রেখে বাক্সটা আবার যেমন ছিল তেমনি গর্তের ভেতরেই ঠেলে দিলুম। আর সেই সঙ্গে বই খুলে পড়তে বসে গেলুম। ওদিকে বাবা আর মা যেসব সব্জী কাটা হয়েছিল ক্ষেত থেকে, সেগুলোকে বসে বসে আঁটি করে করে বাঁধছিল।

পরের দিন স্কুল চলেছি। দশ টাকার নোটও চলেছে আমার সঙ্গে সঙ্গে। কত কথাই যে ভাবছি যেতে যেতে। শাহ্ এ্যাণ্ড সন্স্-এ কত বই দড়িতে ক্লিপ দিয়ে এঁটে রাখে। সে সব বই এখন আমার ব্যাগে এল বলে।

স্কুলে যেতে যেতেই আমি তিনটে বই কিনে ফেললুম। "গল্পের এক ঘণ্টা" দ্বিতীয় ভাগ, ইঁদুরমামার গল্প, আর "চতুর বীরবল" চতুর্থ ভাগ। এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে বই তিনটির মলাটের ছবিগুলো। বইগুলো নিয়ে আমার বইয়ের ভেতর থেকে দশ টাকার নোটটা বার করলুম।

টাকা দেখে গান্ধী টুপি পরা শাহুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। এক টাকা আড়াই

আনার বইয়ের জন্য ছেঁড়া জামাকাপড় পরা ঐটুকু একরত্তি ছেলে কিনা দশ টাকার নোট বার করে দিচ্ছে! অবাক কাণ্ড! ডালমে নিশ্চয়ই কিছু কালা আছে। আমাদের গাঁ ছোট বলে সবাই সবাইকে চিনত। কার কিরকম অবস্থা, কে কিরকম মেজাজের লোক, তাও অজানা ছিল না। বাবার ট্যাঁকের খবর আর মেজাজের বহর ওর ভাল করে জানা ছিল বলেই ও যেন কিছুতেই আমার হাতের দশ টাকার নোটের হিসেব মেলাতে পারছিল না।

"রিত্নাপ্পা যাকাতের ছেলে না তুই? দশ টাকা কোত্থেকে পেলি?" চোখ বড় বড় করে সে জিজ্ঞেস করলে।

"মামা দিয়েছে বই কিনতে," চট করে বলে দিলুম।

"কে? লিঙ্গাপ্পা? সে দিয়েছে?" শাহ্ মামাকেও জানে।

"হ্যাঁ।"

"তোর মাম্যকেই বাকি টাকাটা ফেরত দেব। তুই বই নিয়ে চলে যা। মামাকে গিয়ে বল আমাব কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে যেতে।"

"আচ্ছা" বলে চলে এলুম। ভাবছি, আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল তো! ভেবেছিলুম টাকা কে দিয়েছেরে? যাহোক একটা জবাব পেলেই শাহ্র চলে যাবে। বড় জোব বলবে দশ টাকার নোট নিয়ে ছোটদের চলাফেরা করতে নেই। এরকম যে হবে তা কে জানত?

যেতে যেতেই ঠিক কবে ফেললুম মামাকে কিছুই বলা হবে না। পয়সা যাবে যাক। মামাকে বললে তো আরও ধরা পড়ে যাব। ক'দিন সেই দোকান এড়িয়ে স্কুলে যাচ্ছি আসছি। আস্তে আস্তে ব্যাপাবটা যখন প্রায় ভুলতেই বসেছি এমনি কোনো একদিন স্কুল থেকে সবে ফিবেছি দেখি সামনে মামা দাঁড়িয়ে।

"হ্যাঁরে, শাহ্র দোকানে দশ টাকা নিয়ে গিয়েছিলি?"

না বলি কি কবে, তাহলে তো ধবা পড়ে যাব।

"কোথায় পেলি?"

"টাকাটা মেছোর ছেলের।"

"তা, তুই নিয়ে গিয়েছিলি কেন?"

"সে বলেছিল নিয়ে যেতে। গল্পের বই আনতে। ওতো ভাল বই বাছতে পারে না, তাই আমায় দিয়েছিল।"

"শাহ্কে কেন বললি মামা টাকা দিয়েছে?"

"মেছোর ছেলেকে যদি মিছে সন্দেহ করে? তাই তো আমি বললুম টাকাটা আমার মামা আমাকে দিয়েছে।"

"তা ছোঁড়া এখনও টাকা ফেরত নিচ্ছে না? চুপ করে বসে আছে?"

"আমি তো ওকে রোজই বলি টাকাটা শাহ্ আমার মামাকে ফেরত দেবে। তাই তো সে আর কি করবে? চুপ করে বসে আছে কবে তুমি টাকাটা দাও।"

"আব কখনও এসব কাণ্ড করিস না। যা, বাকি টাকাটা ছুটে গিয়ে ওকে ফিরিয়ে *দিয়ে আয়।*"

"আচ্ছা," বলে আমি এক ছুট দিলুম।

মেছোর ছেলে অর্থাৎ বাপু। স্কুলের টিফিনের ছুটিতে ক্লাসে বসে বসে যে বই পড়ত সেই ছেলেটা। ভারি গোবেচারা ভালমানুষ ধরনের। অনেক অঙ্কই সে আমায় দেখিয়ে দিত। আমিও তাকে কখনো সখনো দেখিয়ে দিতুম। এভাবে আমাদের মধ্যে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছিল। অনেক সময় সে আমাদের ক্ষেতে চলে আসত পড়ার জন্য। তখন আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে পড়তুম। মুরগি থাকলে তাদেরও সামলাতুম। কিছু-না-কিছু কাজ তো থাকতই। বাপু এলে পড়ার আগ্রহ আমার বেড়ে যেত।

ছুটে আমি ওর কাছেই গেলুম। বাবা তখন ক্ষেতে ছিল না। বাবা ফেরার আগেই এই উটকো ঝামেলাটা মিটিয়ে ফেলতে চাইছিলুম, কেননা বাবার কানে কথাটা এলে বাবা এব পুরো খোঁজ খবর না নিয়ে ছাড়তই না। এমনিতেই নোটটা সরাবার চার-পাঁচ দিন পরে শুনছিলুম বাবা মাকে জিজ্ঞেস করছে, "বাক্স থেকে দশ টাকার একটা নোট তুই নিয়েছিস? একটা যেন কম মনে হচ্ছে।"

মা বলেছিল, "আবার গুণে দেখ, নইলে মনে করে দেখ, কোথাও খরচ করেছ কিনা। আমি নিই নি।"

"গুণে দেখেছি, কমই মনে হচ্ছে। কোথাও খরচ করেছি বলে তো, কই, মনে পড়ে না।"

এখন যদি জানতে পারে আমার কাছে দশ টাকার বাকিটা আছে তাহলে আর রক্ষে ছিল! সব ফাঁস হয়ে যেত।

ছুটির দিন ছিল। বাপু তাই বাড়িতে বসেই পড়াশোনা করছিল। ওকে বাইরে ডেকে নিলুম, "বাপু একটু বাইরে আয় তো।"

"দেখ এই আট টাকা সাড়ে তের আনা তোর কাছে রাখছি।"

সে বেচারা ভয় পেয়ে গেল। জিজ্ঞেস করলে, "কেন রে?"

"মা আমাকে বই কিনতে টাকা দিয়েছিল। মনে আছে তোকে এক ঘণ্টার গল্প পড়তে দিয়েছিলুম? সেটাও সে টাকা থেকেই কেনা। বাবা জানে না এসব কথা। জানতে পারলে মাকে মেরে ফেলবে। টাকাটা এখন তুই তোর কাছেই রাখ।"

"তা এত টাকা আমার কাছে কেনরে?" ওর ভয় তখনও যায় নি।

"তুই এখন রাখ না। আমি মামাকেও বলেছি নতুন বইগুলো আমার নয়, বাপুর জন্য কেনা। শাহ্‌কেও এ কথা বলেই বইগুলো কিনেছি," বাপুকে বোঝাতে লাগলুম, "আমরা আরও বই কিনব এ টাকা দিয়ে। বই তুইও তো পাবি পড়তে।"

বাপু ভয়ে অস্থির হয়ে গেল, "তাড়াতাড়ি বইগুলো কিনে ফেল ভাই। এত টাকা আমি কি বলে রাখি বল?"

"ভাবিস না। আমরা বসন্ত পেন্টারের দোকান থেকে চারদিন বাদে বাদে একটা করে বই কিনব।"

"আচ্ছা।"

ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করিয়ে আমি ফিরে এসে কাজে লেগে গেলুম আর নতুন কি কি বই কেনা যায় তাই ভাবতে লাগলুম।

এর পর সারা মাস ধরে বই কেনার পালা চলল। ছোটয় বড়য় মিশিয়ে খান পঁচিশেক বই-ই জমা হয়ে গেল। ক্লাস ফোরের চন্দ্রকান্ত মেরবাড়ে, সুরেশ মানে এদেরকে বই দিতুম পড়তে। একবার এ অভ্যেস ধরিয়ে ফল হল এই যে প্রায় ক্লাস ফোরের সব ছেলেরা গল্পের বই পড়তে শুরু করে দিলে। ক্লাসের পড়ার বই ছেড়ে গল্পের বই পড়ার ধুম পড়ে গেল আর সেজন্য ছেলেগুলো মাস্টারমশায়দের মারও খেতে লাগল। বসন্ত পেন্টারের দোকানে এর পর থেকে নতুন নতুন বই আসা আরম্ভ হয়ে গেল। আমরা তো বই বদলে বদলে এ হাত সে হাত করে পড়তুম তাই নতুন বই তেমন আর কিনতেই হত না। তাছাড়া দশ টাকার পুঁজি তো ফুরিয়েই গিয়েছিল।

এদিকে বই পড়ার নেশা ক্রমেই বেড়ে চলার সাথে সাথে পয়সা চুরির নেশাও বাড়তেই চলল। মনে পড়ে এরকম সময় বাবার কোটের পকেট থেকে পাঁচ ছ'বার আমি চার আনা আট আনা সরিয়েছি। এ করতে করতে একবার ঠিক ধরা পড়ে গেলুম— এবারেও মামা বই কিনতে পয়সা দিয়েছে বলেছিলুম তাই ধরাও পড়ে গেলুম।

ততদিনে প্লেগ কমে এসেছে। আমরাও গাঁয়ে ফিরে এসেছি মাঠ থেকে। মামা চলে গেল গুজরাদের ক্ষেত দেখাশোনা করতে। সেখানেই খেতও। আমাদের বাড়িতে আসত সেই পনের দিন বাদে বাদে। ভেবেছিলুম মামা যখন এতদিন পর পর আসে, তার নামে চালিয়ে দিলে ক্ষতি নেই, ধরা পড়ব না। পনের দিনের আগেই যদি মামা এসে পড়ে তাহলেও অত ভয় নেই, কেননা বাবারও তো কথাটা মনে থাকতে হবে। দেখা যাবে হয়তো বাবার মনেই নেই। তাই মামার নাম বলেছিলুম। সেবার হল কি, মামা তিনদিনের মাথায় এসে হাজির। পার্বণের দিন— সন্ধেয় মামা খেতে বসেছে। বাবা আর আমি একই সঙ্গে খেতে বসেছি। ধরা পড়তেই বাবা আমাকে খাবার থালার ওপরেই লাথি মারতে লেগে গেল। মা আর মামা বাধা দিতে চেষ্টা করেও ফল হল না।

এর পরেও সুযোগ পেলেই চুরি হয়তো আমি করেই যেতুম কিন্তু তা আর হল না। বাবার নিজের ঘরে একটা দরজা করে নিলে, তাতে তালা ঝোলালে আর কোমরে বাঁধলে চাবি। আমার চুরিও বন্ধ হয়ে গেল। মার পয়সা চুরি করা সম্ভব ছিল না। বাবাকে লুকিয়ে মা পয়সা যে কোথায় রাখত তা জানা ছিল না। তাছাড়া, মা মাঝে মাঝেই খাবার খেতে আমাকে একটা পয়সা দিত।

মার সঙ্গে আমি বাজারে যেতুম ক্ষেতের ফসল নিয়ে। ঘুঁটের ঝুড়িও বইতুম। দুধও দিতে যেতে হত। রেশনে সস্তা চিনি পাওয়া যেত। কালোবাজারে সেটা চড়া দামে বিক্রী হত। যে চিনি আমরা পেতুম তা আমাদের প্রয়োজন হত না। বাড়িতে তো প্রচুর গুড় থাকত। গুড়ের চা-ই খেতুম আমরা। মা একটা দোকানে আমাদের চিনি দেড়া দামে বেচে দিত। এ ব্যাপারে মার কাছে আসতুম বলে মা আমায় এক পয়সা দুপয়সা বকশিস্ দিত।

একবার চিনি ওজনের সময় দোকানদারকে লুকিয়ে দাঁড়ি পাল্লায় একটা বাড়তি ওজন দিয়ে দিলুম। ফলে দু তিন আনা বেশী পেলুম সেবারে। সেই বাড়তি পয়সা

আমি প্যান্টের সেলাই-এর ভেতর গুঁজে রেখে দিলুম। বাড়ি ফিরে পয়সা দিয়ে মাকে বললুম, "এই পাওয়া গেছে।" খেতে বসেছি যখন, তখন দেখি দোকানদারও আমার পিছু পিছু বাড়ি চলে এসেছে। মাকে আমার কেরামতির কথা সবই বললে। তারপর আর কি? আমার গোপন পকেট আর গোপন রইল না। বাড়ির পয়সা চুরি করার অভ্যেস আমার হয়েছিল কম্বলা পিসির ছেলে বাবুকে দেখে। আমি অবশ্য ওর মতন তালাটালা ভাঙাভাঙি করতে পারতুম না। আর তালা ভাঙলে বাবা কি আর আস্ত রাখত? জ্যান্ত পুঁতে দিত। যতটা পেরেছি নিজেকে বাঁচিয়ে চুরি করেছি। চুরি করা পয়সার বেশীর ভাগই খরচ করেছি বই কিনে। গল্পের বই পড়তে পড়তে আমি যেন একটা সম্পূর্ণ আলাদা জগতে চলে যেতুম। সে জগৎ একেবারেই নতুন, আমার মনের মতো। চুরি করে ধরা পড়ে গিয়ে আমার মাথাটা বেশ খুলে যেত, একটা জুৎসই জবাব মুখে ঠিকই এসে যেত। বাবা, মা, মামা আর বাপুর ধরন-ধারণ তো আমার অজানা ছিল না, তাই যেখানে যে জবাবটা খাটবে মানানসই সেরকম জবাব চট করে দিয়ে দিতুম। ঘাটগে মাস্টারমশাই ইতিহাসের কাহিনী পড়াতে গিয়ে চরিত্রগুলো যেমনি অভিনয় করে ফোটাতেন, গল্পের বইগুলো পড়তে পড়তে আমিও তেমনি গল্পের পাত্র-পাত্রীদের চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেতুম। সেইসব চরিত্রগুলো যতই আমার মনের ভেতর পাকা আসন গেড়ে বসতে আরম্ভ করে দিল, আশেপাশে বাইরের বাস্তবজগৎটা ততই আমি ভুলতে শিখলুম।

আট

ক্লাস ওয়ানে থাকতেই আমরা দেশাইদের জমি ছেড়ে দিয়েছিলুম। এবারে আমরা বালগুড়ি জমি ধরে নিলুম। জমি দুটোতে জমিন আশমান ফারাক ছিল। দেশাইরা ছিল জমিদার, গাঁয়ে বিরাট বাড়ি। রাজবাড়ির ঘাটগেদের সঙ্গে ওদের যেমনি আত্মীয়তা ছিল, তেমনি কোলহাপুরের রাজবাড়িতেও খাতির, সম্মান ছিল। দত্তাজীরাও বাবারই সমবয়সী ছিলেন। তাঁর বাবা আমার দাদুকে ভাগে চাষ করতে এ জমিটা দেন। সেই ব্যবস্থাই আজও চলেছে। দত্তাজীরাও ছিলেন আয়েশি, জমিতে ভাগের ফসল যেটুকু আসত তা বাড়িতে বসে বসে ভোগ করতেন। কোলহাপুরেও তাঁর কিছুটা জমিজমা ছিল, যাতায়াতও ছিল। কাগলে তিনি দাপটে থাকতেন, যেতে আসতে লোকেরা সেলাম ঠুকত। সঙ্গে বসে গল্প করতে, শহরে ঘুরতে ফিরতে, কোলহাপুরে যেতে আসতে এ সবেতেই দত্তাজীরাও-এর প্রয়োজন হত সঙ্গীর। আর বাবা তাঁর ঠিক এই প্রয়োজনটাই মেটাত। বসে বসে গল্পের সঙ্গীও হত আবার বেড়াতে, ঘুরতে ফিরতে ঠিক হাজিরও থাকত।

বালগুড়ির জমিটা ছিল ফাঁকা মাঠের একধারে। লাল মাটির জমি। ধারে কাছে গাছ যে খুব একটা বেশী ছিল তা নয়, খালের ধারটায় হয়তো বা একটা দুটো থেকে থাকবে। ফলের গাছ তো মোটেই ছিল না, থাকার মধ্যে ছিল শুধুমাত্র দুটি ডুমুর গাছ। খুব মিষ্টি ডুমুর হত গাছ দুটোতে, খেয়েছিও প্রচুর। অবশ্য পোকাও থাকত। কাগলের লোকেদের একটা ধারণা ছিল ঐ পোকা খেলে চোখ ওঠে না। তাই ছেলেবুড়ো যে যখন আসত পোকাশুদ্ধ সে ডুমুরই খেয়ে নিত। পোকা থাকলে ডুমুর যেন আরও মিষ্টি লাগত। গুড়ের মতন। পোকা ফেলে দিয়ে খেতে গেলে ডুমুরই আমি কপাকপ খেয়ে নিতুম, লোভ সামলাতে পারতুম না। সেই দুটো ডুমুরগাছ ছাড়াও জমিতে আর একটা বস্তু ছিল— সেটা হচ্ছে একটি কুয়ো। গাঁয়ের প্রায় শেষ দিকে এই কুয়োটিতেও ফি বছর না হলেও এক বছর ছেড়ে ছেড়ে গাঁয়েরই কোনো-না-কোনো ঘরের বউ সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সইতে না পেরে ওখানে ঝাঁপ দিয়ে জ্বালা মিটোত। স্বপ্নে আমি ওকেই দেখতুম ভূত হয়ে এসেছে। বাড়ির কাছে জমিটা ছিল বলে যেতে আসতে কষ্ট হত না।

বালগুড়ির এ জমিটা একজন দর্জির সম্পত্তি ছিল। কাগলের মহারাজা রাজবাড়ির নবজাতক শিশুর জন্য জরির চাদর সেলাই করিয়ে নিতেন এই দর্জিকে দিয়ে। সে সুবাদেই দর্জি জমিটা পায় আর সেই থেকেই জমির নামের আগে বাল কথাটাও জুড়ে যায়। জমিটাতে তেমন কিছুই ফসল হত না। তবুও বাবার এ জমিটাই পছন্দ হল। এদিকে আর যা জমি ছিল বাবার হাতে, তাও বাবা সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বসে রইল। এক নম্বরের কুঁড়ের বাদশা, বসে বসে গল্প করতে পেলে বাবা আর কিছুই চাইত না। অবশ্য বাড়িতে তো ক্ষেতে খাটবার মতো বড় কেউই ছিল না। সবাই তো ছোট ছোট। চারদিকে চারটে ক্ষেত একটা মানুষ, সামলায় কি করে? ফসল

কাটার সময় সামলানো দায় হত, চুরিও হয়ে যেত হয়তো বেশ কিছুটাই। বাবা তাই শুধু এ জমিটাই হাতে রাখল। এতে ফসল যা হবে তাতে সম্বৎসরের খোরাকি হয়তো আমাদের চলে যাবে, তবে বাড়তি কিছুই থাকবে না। অবশ্য কিছু আখ চাষ হবে।

দেশাইদের বাগানটা হাতছাড়া করার সঙ্গে সঙ্গে বাবা আরও একটা কারবার গুটিয়ে নিলে। সুদের ব্যবসাটা বাবা এবার ছেড়ে দিলে। এ ব্যবসাটা দাদুর আমল থেকেই ছিল এ পরিবারে। বলা যায় কিছুটা লোকসান করেই বাবা এ ব্যবসা তুলে দিলে। মাঙ্গ, মেথররা বাসন কোসন বাড়িতে বন্ধক রেখে টাকা ধার নিত। জিনিসগুলো ফিরিয়ে নেবার সময় ভয়ানক ঝগড়া শুরু করে দিত। হয়তো কখনও কোনো চাষী এক বস্তা ধান রেখে টাকা ধার নিয়েছে। বর্ষায় সে ধানে পোকা লেগে গেল। ব্যস্, চাষী সে বস্তা নিতেই চায় না। বস্তা আটকে রেখেও লাভ নেই, পরের জিনিস বলে বেচেও দেয়া যায় না। পোকায় ধান খেত, টাকাও মারা যেত, উপরি পাওনা হিসেবে পাওয়া যেত ঐ ঝগড়াঝাটি। আমাদের পাড়ার সনগররা ঐ একই মুস্কিলে ফেলত বাবাকে। আমাদের কাছে ওদের 'ঘোঙরী' অর্থাৎ কম্বল রেখে টাকা নিত। ছাড়াবার সময় ঐ একই ঝগড়া বাধিয়ে বসত। আমি সে সময় সবে ক্লাস টু'তে পড়ি। বাবা আমাকে ওদেব টাকার হিসেব করতে বলত। আমি পারি কখনো সে হিসেব কষতে? তার জন্য আবার আমাকেও মারধোর গালাগাল খেতে হত। তাই শেষ পর্যন্ত বাবাকে এ ব্যবসা গুটোতে হল। গাঁয়ে এই সুদের ব্যবসা গুটোবার সময় বাবা পেল মাত্র আট ন'শ টাকা।

যে বছর ক্ষেতে প্রচুর গুড় হল, সে বছর আমি ক্লাস থ্রীতে পড়ি। মহারাষ্ট্র যেখানে কর্ণাটককে ছুঁয়েছে সেই সীমারেখার দুমাইলের মধ্যেই ছিল আমাদের গাঁ কাগল। সে বছর মহারাষ্ট্রে প্রচুর গুড় হল, কর্ণাটকে তেমন নয়। ফলে কাগলের অনেকটা গুড়ই চড়া দামে কর্ণাটকে চালান হয়ে যেত। কাগলের চারপাশের চাষীদের সে বছর ভাল রোজগারই হল। বালগুড়ির জমিটুকু থেকে প্রথম দুবছর আমাদের বেশ লাভই হয়।

আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি, সে বারে দেয়ালীতে মার আবার বাচ্চা হল। এবারে এক জোড়া, আবার দুটোই মেয়ে। এতদিন আমরা ছিলুম পাঁচজন। সেবন্তীকে ধরছি না, সে এক বছরেরটি হয়েই মারা যায়। পাঁচজনের সঙ্গে যমজ দুবোন এসে এখন আমরা হয়ে গেলুম সাত ভাইবোন। সারা পাড়া মা আর বাবাকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। বাবা আর লজ্জায় মাথা তুলে চাইতে পারত না।

"কি রে রতনু, তোর আবার দুটো মেয়ে হল এবার?"

"হ্যাঁ, ভগবানের দান। আমাদের হাতে কি কিছু আছে?" বাবা অসহায় ভঙ্গীতে জবাব দিত।

ওরা এসব শুনে আরো হাসত, বলত, "বারে মরদ! ভগবানের ওপর অমনি দোষ চাপিয়ে দিলি? পাঁচ সন্তানের বাপ তুই, তোর একটু সামলে চলতে হত না?"

ওদের কথায় বাবা পেরে উঠত না। আমি সামনে পড়ে গেলে শুনে ফেলতুম, আমার ভারি লজ্জা করত। আমার বাপ সমানে বাচ্চা বিয়োচ্ছে বলে সারা গাঁয়ে

ওকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা চলছে একি আমি বুঝিনি? বাবার ওপর আমার ভীষণ রাগ হল। বাবা বাড়িতে থাকলেই আমি মনে মনে খুব রেগে যেতুম। মুখে কিছু বলতে পারি না। মার কষ্ট আর আমি চোখে দেখতে পারতুম না। এরকম অশান্তি আর অস্থিরতার মধ্যেই ক্লাশ ফোর-এর পরীক্ষা দিলুম।

আমার এই যমজ বোন দুটোর জন্মের পর থেকেই মা ভীষণ খিটখিটে হয়ে গেল। চেহারা খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। সবে পঁয়ত্রিশ পেরিয়েছে, এরই মধ্যে আট সন্তানের মা হয়ে বুকে আর আগের মতো দুধ আসে না। দুধ কম ছিল বলেই মাই দুটো কিছুক্ষণ খাওয়ালেই খালি হয়ে যেত। তখন বোন দুটো চিৎকার শুরু করে দিত। মার হত মুস্কিল, আর যেন পেরে উঠত না। একজনকে খাওয়াতে-না-খাওয়াতেই আরেকজনের খিদে পেয়ে যেত, সে কান্না জুড়ে দিত। কাকেই বা খাওয়াবে, বাদই বা দেবে কাকে? হয়রান হয়ে মা নিজেই কেঁদে ফেলত আর বাবাকে শাপশাপান্ত করত, "খাটবে না, বসে বসে খাবে, বছরে বছরে বাচ্চা বিয়োবে আর এর তার ওপর চোখ রাঙাবে। ওতেই যেন বাপের কাজ হয়ে গেল।" অন্ধকারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেন সীতা মায়ের মতো মা একা একাই বলে যেত।

একদিন মা আর বাবাতে ভীষণ ঝগড়া লেগে গেল। আমি রাত্তিরে গলিতে বেরিয়েছিলুম। বাবা মাকে বেদম মারলে। সদ্য দুটি সন্তানকে জন্ম দিয়ে মার আর রুখে দাঁড়াবার মতো মনেও জোর ছিল না, গায়েও বল ছিল না। খুঁটিতে বাঁধা গোরু ছাগলের মতো মুখ বুজে মা শুধু মারই খেয়ে গেল। রাগে আমার গা জ্বলে গেলেও কিছুই করতে পারলুম না।

সকালে বালা সনগারিন এল বাচ্চাদুটোকে চান করাতে। মা ওর কাছে নিজের দুঃখের কথা সব বলতে লাগল। "মা গো এই ছেলেপুলে নিয়ে আর যেন পারি না। এদের আফিম খাইয়ে দিই ঠাণ্ডা করে। তাহলে সব যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবে। আর কত সইব বল তো?" মা আর কিছু বললে না বালা বাঈকে, ওখানেই থেমে গেল তখনকার মতো।

বালাবাঈ সবই শুনলে, পরে ধীরে ধীরে মাকে বোঝালে, "তা হোক বাপু। ভগবান দেছে মাথা পেতে নে। এভাবেই ঠাকুর এক-একজনের পরীক্ষা নেয়। তোর মেয়েদের বাপু, শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে, গড়ন পেটন তো ভালই হয়েছে, রূপেও কমতি থাকবে না। যে কোনো ঘরে ওদের লুফে নেবে। তুই অত ভাবছিস কেন? তোর মেয়েরা ওদের চলতে ফিরতে হাত পা নিয়েই তো এসেছে, খেটে খাবে 'খন। তোর ঘাড়ে বেশীদিন চেপে বসে থাকবে না। হাজার হোক মেয়ে তো, কোনোরকমে ঠিকই চলে যাবে।"

মেয়েদের কান্না থামাতে মা এবার থেকে চালু করে দিলে সহজ একটা উপায়। বহুদিনের পুরনো দাওয়াই, সবারই জানা। বোন দুটি পাঁচ ছ'মাসের হতে-না-হতেই মা ওদের মুখে এক কণা আফিম দিয়ে তার ওপর চামচে করে দুধ ঢেলে দিত।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা মরার মতো চুপ মেরে পড়ে থাকত। বোন দুটো ভারি সুন্দর ছিল দেখতে, কালো কুচকুচে চুল, উঁচু টিকোলো নাক, কালো মাছের মতো চোখ। দেখেই নজর লেগে যাবার মতো। একজন একটু রোগাটে, অন্যজন বড়সড় আছে। দুজনেই ফর্সা। মা ওদের না চাইলে কি হবে, আমাদের ভাইবোনদের কাছে ওরা খুব আদরের ছিল।

ওরা যখন সাত আটমাসে পড়ল তখন থেকেই মা ওদের ক্ষেতে নিয়ে আসতে শুরু করে দিল। আনসা আর আমাকে বাদ দিলে, অন্য সব ভাইবোনেদের বয়স দশেরও কম। যমজ বোন দুটি জন্মাবার আগের অবস্থাটা অন্যরকম ছিল। মা তখন মাথায় করে দুপুরের খাবার নিয়ে আসত পুঁটলিতে করে। কোলে একটি বাচ্চা, আরেকজন হাঁটত মার হাত ধরে, আর পেটে থাকত আর একজন। বাকি যে একজন ছিল সে চলত মার পেছনে পেছনে কেঁদে কেঁদে নাকের সিকনি মুছতে মুছতে। এ মিছিলে এখন আরও দুজন বাড়ল। এদের দায়িত্ব মার ঘাড়ে পড়তেই মা যেন আরো দিশেহারা হয়ে গেল। আমাদের দুজনেরই বোঝবার বয়স হয়েছে, আমাদের সব কাজ আমরা নিজেরাই করে নিতে পারতুম। কিন্তু বাকি পাঁচজনের সব কাজ তো মাকেই করতে হত। রান্নাবান্না তো ছিলই, তার ওপর মোষের দুধ দোয়ানো, সে দুধ বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে আসা। এসব সারা হতে-না-হতেই আবার ঠিক সময় মতো ক্ষেতে খাবার নিয়ে যাওয়া। মা আর পেরে উঠত না। মা তাই আনসাকে গোরু ছাগলদের চরাতে মাঠে না পাঠিয়ে রান্নাবান্নার কাজে বসিয়ে দিলে। সাত-আট বছরের হীরা হাততালি দিতে দিতে কোনোমতে দুটো বোনকে সামলাতে লাগল, তাদের পায়খানা পেচ্ছাব সব সামলাত, তাদের খাইয়েও দিত। পাঁচ ছ'বছরের রুগ্ন শিবা আখের ক্ষেতের ধারে ছাগল আর ছাগলের বাচ্চাদের চরাত, তাদের দুধ চায়ের জন্য আনত। আমিও স্কুল কামাই করে মোষ চরাতে লেগে গেলুম। আমার ভাগে যা কাজ পড়ত আমাকে তাই করতে হত, এছাড়া উপায়ও তো কিছু ছিল না।

এভাবে আমরা সব ভাই বোনই এক এক করে কাজে লেগে গেলুম। ক্লাস ফাইভএ উঠে সবে দুমাস পেরোতে-না-পেরোতেই আমার এ দুরবস্থা এসে হাজির হল।

এই দুর্দশার মধ্যে বাবা আবার বাড়ি তৈরী করতে লেগে গেল। পুরোন বাড়িতে মাঝখানের দেয়াল তুলে দোতলা করবে ঠিক করেছে। দোতলা করতে গিয়ে অনেক কিছু ঘটে গেল। বাড়ি করতে খরচ যেমন একদিকে বেড়েই চলল, সঞ্চয় তেমনি ফুরোতে থাকল। শেষে দেখা গেল বাড়ি তৈরীর খরচ তিন সাড়ে-তিন হাজার শুধু পুঁজিতেই শেষ হল না। ঘরের সোনাদানায়ও হাত পড়ল, ওগুলো বেচে দিয়ে আরো সাতশ টাকা এল। এই করে দোতলা উঠল ঠিকই, কিন্তু ছাত খোলাই রয়ে গেল, সিঁড়িও করা হয়ে উঠল না।

এভাবে আমাদের অবস্থা ক্রমেই আরো পড়তে থাকল। আমি তখন দশ-এগার বছরের। বাবা বাড়ির কাজের ব্যাপারে প্রায়ই শহরে যাচ্ছে, যদিও বাড়ি তোলার কাজে তখন মন্দা চলছে। মাকেও কাজে যেতে হয়। এদিকে বাড়ির ওপর দিকটা সবই তো খোলা। সবার অবাধ যাতায়াত, ফলে মাকে বাড়ি পাহারাও দিতে হত। আমি

ক্ষেতটা পাহারা দিতুম। গরমের ছুটিটা না হয় এভাবেই কেটে গেল কিন্তু জুন মাস পড়তেই স্কুল খুলে গেল। এরকমই একটি দিনের ঘটনা। বাবা তড়িঘড়ি করে বাইরে যেতে যেতে বলে গেল, "আন্দ্যা, আজ আর স্কুলে গিয়ে কাজ নেই, ক্ষেতে জলটা ছেড়ে দিয়ে আয়। আমি একটু শহরে ঘুরে আসছি।"

আমি আর কি করি? "আচ্ছা" বলতেই হল। এভাবে কখনো বা ক্ষেতে নজর রাখা, কখনো বা ক্ষেতে জল ছেড়ে দিতে, আবার কখনো হয়তো মোষ ছাগল চরাতে গিয়ে স্কুল কামাই হতেই থাকল। ছেলের ক্ষেতে বা মাঠে কাজ করার বয়স এখন হয়েছে এটা বাবা বুঝেছিল, তাই ছুতোনাতা করে আমার স্কুলে যাওয়া আটকাতে লেগে গেল। শেষে এমন দাঁড়াল সাত দিনে হয়তো একদিন, খুব বেশী হলে দুদিন স্কুলে যেতে পারতুম।

গোড়ার দিকে দুমাস ক্লাস ফাইভে পড়াতেন রণদিভে মাস্টারমশায়। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ক্লাস চালু হতেই উনি শক্ত নামতাগুলো ঝালিয়ে নিতে লাগলেন। ক্লাস ফোরে যা হয়ে ওঠেনি, উনি সেগুলো করিয়ে নিলেন। এ ছাড়াও ওঁর আর একটা দিক ছিল। উনি নানা বিষয়ে আমাদের রচনা লিখতে দিতেন। কোলহাপুরের রাজসিংহাসনের ওয়ারিশ ঠিক হল। জেওয়াসের শাহ্‌জী মহারাজকে দত্তক হিসেবে নেয়া হল। কাগলের ঘাটগে পরিবারের রাজপ্রাসাদে শাহ্‌জীর অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে সারা গাঁয়ের লোক ভেঙে পড়ল। রঙিন কাগজের পতাকায় সাজানো হলো গাঁটা। গাড়ি ভর্তি লোক যাচ্ছে আসছে। শোভাযাত্রার আগে আগে চলেছে ব্যান্ড পার্টি, বাজাচ্ছে তাদের বাদ্যি বাজনা। অবাক করে দেবার মতো কত খেলাই না খেলা হল। উৎসবের জাঁকজমক শেষ হয়ে যাবার পর একদিন রণদিভে মাস্টারমশায় আমাদের এই বিষয়ের ওপর একটি রচনা লিখতে বললেন। সবাই লিখলে, আমিও লিখলুম। আমার লেখা মাস্টারমশায়ের খুব পছন্দ হল, কত যে প্রশংসা করলেন বলার নয়। রচনাটির বিশেষ বিশেষ অংশ তিনি ক্লাসে পড়েও শোনালেন। বললেন, "এই যাকাতে পড়াশোনা যদি এভাবে চালিয়ে যায় তাহলে কালে সে একজন বড় লেখক হবে একথা বলতে পারি। কাগলের লেখকদের ট্রাডিশনটা বজায় রাখবে ছেলেটি।" রেন্দালকর, সুমন্ত আর রণদিভে এই তিন কবির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে কাগলের নাম। শেষের দুজন তো খোদ কাগলেরই বাসিন্দে। আমাদের মাস্টারমশাই কবি রণদিভেরই ছেলে।

আরেকদিনের ঘটনাটা এরকম। রণদিভে মাস্টারমশাই আমাদের নামতা শেখাচ্ছেন। সেদিন হঠাৎই তাক লাগিয়ে দেবার মতো একটা কাণ্ড হল। যে অঙ্কের নামতা উনি শেখাচ্ছিলেন, ক্রমে ক্রমেই সেটা যখন বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন তখন ঐ বাড়ানোর ধরন আমি বুঝে ফেললুম। তাই এর পরের সংখ্যার নামতা বলতে আরম্ভ করতেই আমি পুরো নামতাটা খুব সহজেই বলে ফেললুম, কারণ উত্তরগুলো একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নেই যাচ্ছিল। কুড়ি থেকে তিরিশের নামতা অবধি আমি এভাবে অতি সহজেই বলতে পারলুম। আমার মনে হল অন্যের সাহায্য ছাড়া আমি নিজে নিজেই মাথা খাটিয়ে কিছু বার করতে পারছি, আমার মাথা খুলছে একটু একটু করে। যারা মুখে মুখে নামতা আওড়ে যাচ্ছে তারা কাগজেও ঠিক ঠিক লিখছে কিনা সেটা দেখার ভার

মাস্টারমশাই আমাকে দিলেন, বললেন "যাকাতের কি বুদ্ধি! নিজে নিজেই মাথা খাটিয়ে কাজ করতে পারে, কেবল মুখস্থই করছে না।" এসব শুনে গর্বে আমার বুক ভরে যেত। মাস দেড়েকের মাথায় রণদিভে মাস্টারমশাইয়ের অন্য ক্লাসে পড়াতে চলে যাবার সাথে সাথে লেখার কাজে আমার রুচি ও তাঁর উৎসাহ দুটোই মাঝপথে থেমে গেল।

এবারে আমাদের পড়াতে এলেন গাস্তে মাস্টারমশায়। ভারি রগচটা লোক। মাঝে মাঝে আমার স্কুল কামাই হলেই রেগে যেতেন। এদিকে সত্যি সত্যিই তো রোজ স্কুলে যাওয়া হত না আমার। আস্তে আস্তে আমি ক্লাসে পিছিয়ে পড়তে লাগলুম, অনেক কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। ফলে ভুল হতে আরম্ভ হল। আর গাস্তে মাস্টারমশায় প্রত্যেকটি ভুলের জন্য একটি করে বেতের ঘা দিতেন। কেমন যেন একটা আক্রোশ হয়ে গিয়েছিল ওঁর আমার ওপর। আসল ব্যাপারটা অবশ্য সম্পূর্ণ আলাদা, পড়া না পারার সঙ্গে সম্বন্ধ নেই। আমাদের ক্ষেতের লাগোয়া ওঁরও এক ফালি জমি ছিল। ওঁর ধারণা হয়েছিল আমরা যখন গোরু মোষ চরাতুম আমাদের মাঠে, তখন ওরা ওঁর জমিতেও চরে বেড়াত, ফলে ওঁর জমিতে ঘাস তেমন বাড়তে পারছিল না। গোরু মোষ না চরালেও লম্বা ঘাস ওখানে হতেই পারত না, তার কারণ ঐ জমিগুলো ছিল একেবারে মাঠের শেষের দিকে। ঘাস তেমন ছিল না, সে জন্যই না আমরা গোরু মোষদের ওখানে চরাতুম। এ নিয়ে মাস্টারমশায় আর বাবার মধ্যে কয়েকবার ঝগড়া বাদানুবাদও হয়ে গেছে। আমার মনে হল মাস্টারমশায় বোধহয় সে রাগ পুষে রেখে আমার ওপর দিয়ে পুরোপুবি উসুল করে নিচ্ছেন। তাই স্কুলে যেতে যেতে থেকে থেকেই মাস্টারমশায়ের বেতটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত।

বাবা সারাদিন শহরে কাটাত, আমি ক্ষেত পাহারা দিতুম। কেউ দেখবার নেই আমিও আমার মতো থাকতুম, পড়াশুনার বালাই নেই। ক্ষেতে জলও আমিই দিতুম, আমার ইচ্ছেমত। দিন্যা নামে আর একটি ছেলেও ক্ষেতে কাজ করত, তার সঙ্গে আমার ভাব জমে গেল। তার সঙ্গেই আমি খেলতুম। কোনোরকমে সময়টা কেটে যেত। স্কুলের ওপর টান তো আমার কমে নি, তাই স্কুলে যেতে আমার খুবই ইচ্ছে করত। কিন্তু বাবার জেন্য সেটি হবার যো ছিল না। গাস্তে মাস্টারমশায়ও কম বাগড়া দিচ্ছিলেন না। অন্য সব চাষীদের মতো আমিও পুরোপুরি চাষের কাজে নেমে পড়ি বাবার মনোগত ইচ্ছে তাই। চাষীর ছেলে চাষবাস করবে এটাই তো স্বাভাবিক। অন্য কিছু হতে পারেও না, হওয়া উচিতও নয়। এই সমাজে যে বর্ণাশ্রমের বিধান চালু আছে তা মেনেই তো চলছে সবাই। তাতেই গৌরব। বাবাও তাই চাইছিল। আমাদের বংশে লেখাপড়া তো এর আগে কেউ করে নি, করবে বলে ভাবেও নি। বাবার অবশ্য গোড়াতে এ ব্যাপার চিন্তার ধারাটা একটু অন্যরকম ছিল। দুটি মেয়ের পর আমিই বাবার প্রথম ছেলে। আমাকে নিয়ে বাবার তাই উৎসাহ আর আনন্দের সীমা ছিল না। আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে ক্লাস ফোর অবধি টানলও। নিজের হিসেবটা নিজেই করে নিতে পারবে এ অবধি বিদ্যে। আমাদের পাড়ায় ক্লাস ফোর ডিঙিয়ে ক্লাস ফাইভে স্কুল ছেড়েছে এরকম দু তিনটি ছেলে ছিল, একটু বড়সড় হলে কাজে লেগে গিয়ে রোজগারপাতিও করছিল। ওরা হিসেব করতে শিখেছিল। আমিও হিসেব

করতে পারতুম। রোজ সন্ধেয় মজুরদের হাজিরা নিতুম, সাত দিন কাজ শেষ হলে হপ্তা হিসেব করে ফেলতুম। কখনো সখনো এক-আধজনের পাওনা একটু বাড়িয়েও দিতুম। বাবাকে বানান করে করে আস্তে আস্তে পড়েও দেখাতুম। বাবা তো এতে মহাখুশী। এখন বাবার সাধ আমি যেন আমার পূর্বপুরুষদের পেশা চাষে লেগে যাই। সেজন্যই তো স্কুল থেকে আমাকে তুলে নিয়ে মোষ ছাগল চরাতে পাঠানো। আমার এসব একদম ভাল লাগত না, স্কুলে ফিরে যাবার জন্য কেবলি ছটফট করতুম।

অক্টোবর মাস থেকে আমার স্কুলে আর যাওয়া হল না। ততদিনে বাড়ি তৈরীর কাজও শেষ। এখন বাড়িসুদ্ধ সবাই মিলে ক্ষেতে যাচ্ছি। ক্ষেতে সেই গাধার খাটুনি, রোদে রোদে ঘুরে হয়রানি, তার সঙ্গে বাবার মারধোর আর গালাগাল। আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। তখন ছেলেমানুষ ছিলুম, স্কুলের দিকে মন তো টানবেই। বাপু মেছো মাঝে মাঝেই স্কুলে পড়াশুনা কতদূর এগোল তা বলে যেত এসে। আমি ক্ষেতে বসেই রাতে পড়তে লেগে গেলুম। বাবাকে বললুম আমি এবারে পরীক্ষাটা দিয়ে রাখি, ক্লাস ফাইভের পরীক্ষাটা পাশ করার পর না হয় আবার ক্ষেতের কাজে লেগে যাব। বাবা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

পরীক্ষার দিন দশটা অবধি আমাদের ক্ষেতের কাজ সেরে সাদা কাগজ থলেতে পুরে স্কুলে রওনা দিলুম। ক্লাসে গিয়ে বসতেই ঘন্টা বাজল। গাস্তে মাস্টারমশাই ঢুকলেন।

"এই যে এতদিন বাদে উদয় হয়েছেন। কেমন সোনা ফলাবে কাগজে তা জানা আছে," মাস্টারমশায়ের এ মন্তব্যে আমি চুপ করে রইলুম, কোনো শব্দ করলুম না। উনি নাম ডাকলেন, আমি উপস্থিত বললুম। কতদিন পর যে উপস্থিত বললুম! চুপচাপ যখন লিখে যাচ্ছি গাস্তে মাস্টারমশাই তখন কাছে এসে বললেন, "ছ'মাসের মাইনে বার আনা বাকি পড়েছে। দুপুরে নিয়ে আসিস, নইলে আর পরীক্ষায় বসতে পাবি নে।"

"দুপুরে না মাস্টারমশাই, কাল এনে দেব।"

"কেন?"

"বাড়িতে কেউ নেই— সবাই ক্ষেতে কাজে গেছে।"

"ঠিক আছে। কালও না আনলে আর পরীক্ষায় বসতে দেব না।"

"ঠিক আছে।"

পরীক্ষার প্রথম দিনেই মাস্টারমশায় আমার গায়ে যেন একটা সাপ ছেড়ে দিলেন। সারাটা দিন বার আনার চিন্তায়ই কেটে গেল। দুটো পরীক্ষাই সেদিন এভাবেই দিলুম। আমাদের বাড়ির কাজ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্কুলের মাইনেও বন্ধ হল, স্কুলে যাওয়াও বন্ধ হল। এরপর বাকি মাইনে না নিয়ে গেলে গাস্তে মাস্টারমশাই তো পারলে আমায় পিষেই ফেলবেন।

সেদিন পরীক্ষার পর বাড়ি গিয়ে বাবাকে আমি সব বললুম, "বাবা, স্কুলে ছ'মাসের মাইনে বাকি পড়েছে। গাস্তে মাস্টারমশাই বলেছেন বাকি মাইনে দিলে তবেই পরীক্ষায় বসতে দেবেন। তা নইলে নয়। আমায় বার আনা দাও।"

"তোর স্কুলের গায়ে মুতে দি গে যা। তোকে পরশুদিন আমি কি বলেছি মনে

নেই? ও সব স্কুল টুলে আমাদের দরকার নেই। বার আনা দিচ্ছে। বার আনাতে দুটি মেয়েছেলের দিন মজুরি হয়ে যায় তা জানিস। পয়সা দিয়ে পরে যদি পরীক্ষায় ফেল করিস তোর পয়সাটা তোর মাস্টারের ওপর ফালতুই নষ্ট হবে। তোকে আর কাল স্কুলে যেতে হবে না। এখন ক্ষেতে আখ তোলা হচ্ছে, চল আমাদের সঙ্গে।"

আমি আর কি বলব? মাথায় কিছুই আসছে না। তাও সাহস করে বলে ফেললুম, "শুধু বার আনাই তো চাইছি।"

"ঐ জুতো জোড়া দেখছিস দরজার পেছনে? তোর স্কুলের গায়ে মুতে দিতে বললুম না? তোর বাপদাদারা বাপের জন্মে স্কুলের ধার না মাড়িয়েও বেঁচে বর্তে ছিল, কেউ মরে নি। স্কুলে ঢের লেখাপড়া হয়েছে, যাক আর পড়ে কাজ নেই। হিসেব করতে পারলেই হবে। মুখে রা-টি না করে মাঠে চল তো বাপধন, মাঠে খাটবি। এক গাড়ি গুড়ে পাহারা দিলে একটা মজুরের এক দিনের মজুরি বেঁচে যাবে, ওই টাকা তোরই আখেরে কাজে লাগবে।"

আমি একেবারে চুপ মেরে গেলুম। মনিবের কাছে যেমন কুকুর। বাবার রাগ আমার অজানা ছিল না। রেগে গেলে খুব সামান্য কারণেও বাবা হাতের কাছে যা পেত তাই দিয়েই মারতে শুরু করে দিত।

মাত্র বার আনার জন্য আমার আর পরীক্ষাই দেয়া হল না। মনে মনে ভীষণ কষ্ট হত, মনের কষ্ট মনেই চাপা থাকত, করার কিছুই ছিল না।

সেদিন বাবা সোজা হিসেবই করেছিল। তার ছেলেকে জীবনে ক্ষেতেই খেটে খেতে হবে। এমনিতেও খাটবে, অমনিতেও খাটবে। সে তো আর বামুন কায়েতের ছেলেদের মতো শহরে চাকরি করবে না। তাহলে তার ক্লাস ফোরের পাশ আর ফাইভের পাশে তফাৎটা কি? তাতে কার কি এসে যায়? তার পেছনে বার আনা ফেলাটা জলে ফেলে দেয়ারই নামান্তর।

নয়

স্কুলের জীবন পেছনে পড়ে রইল, নতুন জীবন শুরু হল। আমি গোবর শুকোতুম, আখের ক্ষেতে জল দিতুম, বাড়ি বাড়ি গিয়ে দুধ পৌঁছে দিয়ে আসতুম। তাছাড়া আরও ফাইফরমাসও খাটতুম। ক্ষেতে আমার সঙ্গী ছিল দিন্যা। চেষ্টা করতুম ও যাতে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ওর মা ওকে পনের দিন অন্তর অন্তব একদিনের ছুটি করিয়ে নিয়ে যেত। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ওকে তেল মাখিয়ে চান করিয়ে জামা কাপড় ধুয়ে দিয়ে চাঙা করে দিত ছেড়ে। ও তখন হয়তো এখানকার কোনো সিনেমায় বায়োস্কোপ দেখে এসে আমার কাছে ঐ ছবির গল্প করত। গল্পটা শুনেই মনে হত, যাই ছবিটা দেখে আসি। অনেক সময় সেজন্যে মার কাছে আবদার করে পয়সাও চাইতুম। মা হয়তো এক আনা দিত, সিনেমার জন্য দরকার তিন আনা, সেটা আর দিতে পারত না। তখন কাঁদতে লেগে যেতুম।

"দিন্যার মা ওকে বায়োস্কোপ দেখার জন্য পয়সা দেয়। আমি ক্ষেতে খেটে খেটে মরে গেলেও পয়সা পাই না। হয় পয়সা দাও নয় আমায় ছেড়ে দাও, আমায় স্কুলে যেতে দাও।"

"তুই গোরু ছাগল চরিয়ে গোবর কুড়িয়ে ঢিবি করে রাখ। আমি তোকে ঘুঁটে করে দোব। সেগুলো রোদে শুকিয়ে বেচে যা পয়সা হবে সেটা তোর। তুই জামাকাপড় কেন, বায়োস্কোপ দেখ, খাবার কিনে খা, যা খুশী কর না কেন।"

মার কথাটা মনে ধরল, মন্দ নয় তো। আমি মাঠে গোরু মোষও চরাই আর যত গোবর পাই কুড়োতে লেগে গেলুম। যখন গোরুও চরাচ্ছি না, হাতও খালি আছে তক্ষুণি আমি ঝুড়ি নিয়ে গোবর কুড়িয়ে ঢিবি করতে বসে যেতুম। ঢিবি জমে গেলেই হয় মা নয়তো আনসা ওগুলো দিয়ে ঘুঁটে দিয়ে দিত। সে ঘুঁটে হয় বামুনদের গলিতে নয় বাইজীদের পাড়ায় বেচে দিতুম। পয়সা যা পেতুম তা জমতে লাগল। শেষে ঘুঁটে বেচাটা নেশায় পেয়ে গেল। হেঁটে হেঁটে খুঁজে পেতে অনেক দূর দূর জায়গা থেকেও ঝুড়ি ভর্তি গোবর নিয়ে আসতুম। রোজকার যা আমার কাজ তাতে কোনো ফাঁক পড়ত না সেগুলো সেরেই ঘুটের ব্যবসা চলতে লাগল। এই করে আমার পাঁচ ছ' টাকা জমে যাবার পর আমি পনের দিন বাদে বাদে একটা করে ছবি দেখে আসতুম। মা আমার জন্য চিন্তায় পড়ে গেল। ভাবলে এসব করে টাকাগুলো আমি নষ্ট করে বেড়াচ্ছি। একদিন বললে, "আজ হাটের দিন। তোর পরনের জামা প্যান্ট নেই। চল, কাজের শেষে আমরা দুজনে গিয়ে তোর জন্যে জামা প্যান্ট কিনে নিয়ে আসি।" আমি এক কথায় রাজী হয়ে গেলুম। মনে আমার খুব আনন্দ হল। এমন তো বড় একটা হয় না। এই কেনাকাটা নিয়ে মাকে কতই না জোরাজুরি করতে হত। কোনো বিশেষ পার্বণ এলেই মা জামাকাপড় কেনার কথা ভাবতে বসত— যেমন পাড়োয়া, দশেরা, দেয়ালী।

সব কাজটাজ সেরে সেদিন আমি ভাখরি খেয়ে বাড়ির পথ ধরলুম। সেদিনকার রোজগার আমার সামনে বসেই মা গুণলে।

"একটু কম হবে মনে হচ্ছে রে।"

"এ্যাঁ!" আমি চমকে উঠলুম।

"হ্যাঁরে। আজকের বিক্রি তেমন হয়নি মনে হচ্ছে।"

"তা, এখন কি করবে?" আমি শুধোই।

"একটা কাজ করা যাক। আমার যা আছে আমি দিয়ে দিই। যেটুকু কম পড়বে তুই দিয়ে দিস। তাহলেই তো হল। তোর মনের মতো জামাপ্যান্ট কিনতে পারবি তাহলে। না হয় কিছু বেশীই লাগল। তাতে কি আর এমন হবে? কর্তাকে এরজন্য কোনো কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। জিজ্ঞেস করলে বলব আন্দ্যা নিজের পয়সায় ওর জিনিস কিনেছে। তাহলে আর তোর বাবা কিছু বলবে না।"

"সেই ভাল।" এ প্রস্তাব আমার মনঃপূতই হল।

এরপর মাঝেসাঝে মা আমার কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিত। হাটের দিন আমার খাবার কেনার জন্য আমার কাছ থেকেই পয়সা নিত। এসব দিয়ে থুয়েও কিন্তু আমার পয়সা জমতে লাগল। মাঝেসাঝে সিনেমাও দেখতুম। সে সব সিনেমার গান গেয়ে গেয়েই তো আমি ছাগল চরাতুম, বলতে গেল মেতে রইলুম। বোধহয় বইয়ের বদলে তার জায়গা সিনেমায় ভরে গেল।

বালগুড়ির জমিটা এদিক সেদিক ছড়ানো ছিল। জমিটার মাঝখানে ছিল মাঠ আর ধারে ধারে ধান হত। বর্ষাকালে কাগলের একশ থেকে দুশ মতন মোষ এ জায়গাটাতেই চরে বেড়াত। দূর থেকে এ জায়গা কেমন দেখাত বর্ষাকালে? দাঁড়াও বলি। মনে হত যেন সজীব সবুজের মাঝে কে যেন কালো কালো ছাতা খুলে রেখেছে। ধূ ধূ করা এ মাঠ পেয়ে কিশোর রাখালেরা তাদের গোরু মোষ এখানেই ছেড়ে দিয়ে নিজেরা দিব্যি খেলায় মেতে থাকত। কি দিয়ে খেলত? যা পেত তাই দিয়েই খেলত। কোনো খেলনার প্রয়োজন হত না ওদের। মাঠে ঘাটে যা কুড়িয়ে পেত ওতেই ওদের কাজ চলে যেত। খেলতে খেলতে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন সেখানে ভাখরি খেয়ে পাশের ক্ষেতে জল খেয়ে নিত। আর একটা ব্যাপারও হত। বর্ষায় এক দল গোঁসাই ভিখিরি হাজির হত এ মাঠে। থাকত তাঁবু খাটিয়ে আর পুরো বর্ষাকালটা কাগল আর তার আশে পাশের গ্রামগুলোতে ভিক্ষে করে বেড়াত। জীবিকার সমস্যাটা এরা এভাবেই সমাধান করত। জঙ্গলে নানা ছোটখাটো জানোয়ার, বনবিড়ালী, খরগোশ, একরকমের শেয়াল, বড় টিকটিকি ধরতে পারলে আর ছাড়ত না, মেরে খেত। রাস্তার ধারে সবার সামনেই ওগুলো মেরে তাদের গায়ের ছাল ছাড়াত। এসব দেখতে দেখতে কখন যে বেলা গড়িয়ে যেত বুঝতেই পেতুম না।

গোঁসাইদের মোষগুলো আমাদের মোষগুলোর চেয়ে ভাল জাতের ছিল। ওরা যখন আমাদের মাঠে চরে বেড়াত, তখন এই গোঁসাইরা যখন তখন নির্বিকারভাবে কোনো দ্বিধা ভয়ডর না পেয়ে, এর তার ঘাস, বিচালী, গাছগাছড়া টেনে এনে ওদের মোষগুলোকে খাওয়াত। ফলে, আমাদের মোষগুলোর জন্য যা যা খাবার বরাদ্দ ছিল তার কিছু

ভাগ ওদের মোষগুলোও দিব্যি পেয়ে যেত। কখনো কখনো এদের ঘোড়া আমাদের ক্ষেতে ঢুকে পড়ত। একবার বিরক্ত হয়ে বাবা তো এদের একটি ঘোড়ার ঠ্যাং ভেঙে দেয়। খবরটা পেতে দেরী, তারপরই গোঁসাইদের দল আমাদের কুঁড়ে ঘর ঘিরে ফেললে। প্রায় শ' খানেক গোঁসাই দেড় ঘণ্টা ধরে বাবার সঙ্গে ঝগড়াই করে চলল। ওরা এখন এই খোঁড়া ঘোড়া নিয়ে করবেটা কি? অতএব বাবাই যেন এটা কিনে নেয়। বাবাই বা ঘোড়া নিয়ে কি করবে? শেষ পর্যন্ত ঘোড়ার মালিককে দশ টাকা দণ্ড দিয়ে ঝগড়াটা মেটানো গেল।

শুধু যে গাঁয়েই ভিক্ষে করে বেড়াত তা নয়, জঙ্গলেও ওদের দৌরাত্ম্য কম ছিল না। দশেরার পর তাদের দেবতার মেলা বসত। মেলা ভাঙবার পর ওদের ডেরাও ওরা ভেঙে দিত, আর এ গাঁয়ে সে গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ত।

বর্ষাকালেই কোনো এক সময়ে ধনগররা ওদের ভেড়ার পাল এ মাঠে ছেড়ে দিত। ভেড়ারাও মাঠে মাঠে ঘুরে খেত আর হেগে বেড়াত। দু তিন দিন পর ঐ নোংরা চাষীরা আদর করে কিনে নিয়ে সার তৈরী করত। এ মাঠেই আমার মনে পড়ে কত গড়াগড়ি দিয়েছি, গায়ে মাটি মেখেছি, বৃষ্টিতে ভিজেছি, আবার সারা গা শুকিয়েছি। কত মোষ চরালুম, কত গোবরই না কুড়োলুম। এ মাঠেই দাঁড়িয়ে মোষদের গায়ে আকাশ থেকে বাজ পড়তে নিজের চোখে দেখেছি। মাঠের অনেক ভূতই স্বপ্নে এসে আমায় দেখা দিত রাতে। গ্রীষ্মে, বর্ষায় বা শীতে ঋতুচক্রের বিভিন্ন সময়ে এ মাঠের রূপ যেমন দেখেছি, আবার গোরুর গাড়ির রেস যখন হত এ মাঠে বা দিনের আলোয়, রাতের আঁধারে কিংবা জ্যোৎস্নারাতে চাঁদের আলোয় তেমনি এ মাঠের কত রূপই না দেখেছি আমি। মাঠটা যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেই নীচের দিকটায় ছিল আমাদের জমিটা। সেখানে প্রচুর ঘাস জন্মাত। লম্বা খুঁটিতে মোষগুলোকে এখানে বেঁধে জলের দিকে চলে যেতুম। মোষগুলোও আরামে চারদিকে চরে বেড়াত। খুঁটিতে বাঁধা থাকত বলে পাহারার দরকার হত না। তবে এদের বাঁধতে গায়ের জোরের দরকার হত খুব, তাছাড়া মা আর তার বাছুর এ দুজনকে একসঙ্গে বাঁধা আমার পক্ষে সম্ভব হতই না। এই মোষ খুঁটিতে বাঁধা নিয়ে একদিন এমন নাজেহাল করলে যার জের পনের দিন ধরে চলল। সেটাই বলি।

আমাদেরি কোনো একটি মোষকে একদিন কোনোরকমে বেঁধেছি খুঁটিতে। ফিরে এসে ওর বছর দেড়েকের বাছুরটাকে নিয়ে যাব বলে তোড়জোড় করছি। একসঙ্গে দুজনকে বাঁধা অসম্ভব, তাছাড়া এ বাছুরটা ছিল যেমনি চনমনে, ছুটতও তেমনি। ওর মাকে আমি তাই আগে ভাগে মাঠে বেঁধে রেখে এসেছি। গোয়ালঘরে গিয়ে বাছুরটির শিঙের খাঁজে দড়ি ভাল করে এঁটে সেই দড়ির একটা দিক আমার কোমরে শক্ত করে গুঁজে দিলুম। তারপর দড়িটা বাছুরটির গলায় ভাল করে লাগিয়ে গোয়ালঘর থেকে ওকে নিয়ে বেরোতে না বেরোতেই সে ব্যাটা দিলে এক ছুট। গোয়ালঘরটা থেকে এক ফার্লং দূরে মোষটাকে বাঁধা আছে। মাঝখানটায় ক্ষেতের অংশটুকুতে সবে ফসল কাটা হয়েছে, গাছের গুঁড়িগুলো খোঁচা খোঁচা হয়ে বেরিয়ে আছে সারাটা ক্ষেতে।

তারপর মাঠ যেখানে ঢালু হয়ে নেমে গেছে, সেখানে আছে ছোট বড় কত এবড়ো খেবড়ো গর্ত— কত রকমের নুড়ি পাথর ভর্তি তাতে।

বাছুরটা ওরকম হঠাৎ ছুট লাগাবে ভাবতে পারি নি, তাই তৈরী ছিলুম না। খুব টানছে দড়িটা আমি হাতে ধরে রাখতে পারছি না। তাড়াতাড়ি দড়িটা ছেড়ে দিলুম আর যে দিকটা কাঁধে আটকান ছিল তা খুলতে হাত ওঠাতে গিয়ে হাত গেল আটকে। ব্যস্ আর যায় কোথায়। নিমেষের মাঝে পড়লুম চিৎপাত হয়ে। তারপর আর কি! সে ব্যাটা মহানন্দে আমাকে টানতে টানতে ঐ এবড়ো খেবড়ো এলোমেলো পাথর ভর্তি গর্তগুলোর ওপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে চলল। যতই হো হো করে ডাকি না কেন ও আর থামে! মা যেদিকে বাঁধা আছে সেদিকে ও ছুটছে তীরের বেগে। এদিকে আমিও চেঁচিয়েই চলেছি। যখন মোষটার কাছে গিয়ে পড়লুম তখন জামাকাপড় ছিঁড়ে কুটিকুটি, পেট আর উরু সব ঘেঁষটে ঘেঁষটে রক্তারক্তি। ইঁট পাথরের গায়ে লেগে লেগে মাথার এখানে সেখানে ফেটে গেছে, ঠোঁটও বাদ যায়নি। আর হাত দুটো যেন বগল থেকে খুলেই পড়ে যাবে।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিবে এসব দেখে বাবা বাছুরটাকে আচ্ছা করে পেটালে। সে বেচারা তো অবাক। মাঠে চবার পর খুঁটিতে চুপ চাপ বাঁধা পড়ে আছে তাকে অকারণে কেনই বা মারধোর তা বুঝেই উঠতে পারছে না। আর আমার অবস্থা? দিন পনের বাড়িতে বসে কাটাবার পর একটু সেবে উঠলুম।

আর মা সরস্বতীর দিকটা? সেটাও বলি। সেই যে ক্লাস ফাইভ-এর পরীক্ষা দিতে দিতে স্কুল ছেড়ে দিলুম তখন থেকে বাবা তো ভেবে বসে আছে স্কুলে যাওয়া আমার আর হবেই না। দিন্যাকে ছাড়িয়ে দিয়ে তার কাজও বাবা আমার ঘাড়েই চাপালে। কিন্তু বাড়িতে দোতলা উঠে যাবার জন্যই হোক বা ক্ষেতে জল দেবার জন্যই হোক বাবা এবারে গণপা নামে একটা বয়স্ক মুনিষ বহাল করলে। বাবার শহরে হয়তো কোনো কাজ রয়েছে, বা বাইরে কোথাও যাবে বা কোর্ট কাছারীতে কোনো কাজ আছে, সে সব ক্ষেত্রে আগে আগে বাইরে থেকে লোক নেয়া হত ক্ষেতে জল দেবার জন্যে। এখন এ মুনিষ রাখার সঙ্গে সঙ্গে আর ওসবের কোনো চিন্তা রইল না। তাছাড়া জমিতে লাঙ্গল দেয়া, গোরুমোষদের দেখাশোনা করা বা ক্ষেতের জন্য সব কাজও এই মুনিষই করে। তার সঙ্গে একটা ছোট ছেলে দিয়ে দিলে সে গোরু-মোষের গোবর তুলে রাখতে পারবে, খাটাল পরিষ্কার করবে, ওদের জল খাওয়াবে, লাঙ্গল ধরলে সে বলদ মোষ সামলাবে আর আখের গাছের সবুজ পাতাগুলো কেটে কেটে রাখবে, গোরুমোষগুলোকে খেতে দেবে—দুজন মিলে কাজ করলে আমাদের মতো চাষীর ঘরে যথেষ্ট। আমাদের ক্ষেতের জন্য এর বেশী আর কি দরকার? কুয়ো তো মোটে একটি সেই একটি কুয়োর ভরসায় চার গাড়ি গুড়ের চাষ হয় ক্ষেতে। তাই গণপাকে বহাল করে আর তার সঙ্গে আমাকে জুড়ে দিয়ে বাবা দিব্যি কাজ চালিয়ে নিচ্ছে আর নিজে কাজের ছুতো করে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক চাষীই এভাবে শহরে ঘুরে বেড়ায়। বাজারে বা কারো দোকানে, নাপিতের কাছে বা কোনো অবস্থাপন্ন চাষীর বাড়িতে বসে সময় কাটিয়ে দেয়। এভাবে এখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে গল্প করেই ওদের আনন্দ। গাঁয়ের ঘানিটানা কাজের জীবনের একঘেয়েমিতে এই ফাঁকটুকু ওদের কাছে যেন একটি মধুর স্বপ্ন। ওদের ছেলেরা ক্ষেত খামারে মাথার ঘাম পায়ে

ফেলে খেটে মরছে আর নিজেরা ফুলবাবু সেজে শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এটা ওদের কাছে কম গৌরব! জন্ম যেন ওদের এতেই সার্থক। ওরা এ থেকে এক অনির্বচনীয় আনন্দ পায়।

আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, আমি তাতে গুমরে মরছি তাও ঠিক, কিন্তু এ সত্ত্বেও ঐ ক্ষেত খামারেই আমি স্কুলের পড়াশুনার পরিবেশ এনে তাতে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে চেষ্টা করলুম। রাতে বাসায় ফিরে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বসে বসে পড়াশুনার গল্প করতুম। যারা আমার সঙ্গে পড়ত তারা সবাই এখন ক্লাস সিক্স-এ উঠে গেছে। ওরা ক্লাস সিক্স-এর পড়ার বই, ক্লাসে কি হত এসব নিয়ে নানা গল্প করত। স্কুলের আরও কত গল্পই না ওরা করত। সেসব কথা শুনতে শুনতে কেবলি মনে হত আমার কি যেন একটা হারিয়ে গেছে। এর মধ্যে ক্লাস সিক্স-এ পড়ানো হয় এরকম একটি মারাঠী বই পড়ে ফেললুম। পড়ে মনে হল স্কুলে পড়াটা চালু থাকলে কত কিই না শিখতে পারতুম। ছেলেরা যে সব গল্পের বই নিয়ে আসত তাও ল্যাম্পের আলোয় পড়ে শেষ করে ফেললুম। যখন বাড়িতে দোতলা উঠছিল তখন আমার ঐ পঞ্চাশটি বই কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। আমি বেখেছিলুম দেওয়ালের খোপে। যে মিস্ত্রীগুলো লেখাপড়া জানত, কাজ করতে করতে কখন সেগুলো সরিয়ে ফেলেছে কে জানে।

একবার মনে আছে বাবা খাওয়া দাওয়া সেরে পাঁচিলের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে পড়ে নাক ডাকছে। মা পাশেই ছায়ায় বসে ভেড়ার লোম কাটছে, আমি দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছুটা বসে, কিছুটা শুয়ে আছি। হাতে আমার ক্লাস ফাইভ-এর ইতিহাসের বই। আমার বইয়ের থলে ক্ষেতেই পড়ে থাকত। সেসব বই আমি মাঝে মাঝে খুলে খুলে পড়তুম। শিবাজী মহারাজের কীর্তিকাহিনী পড়তে আমার ভারি ভাল লাগত। বার বার পড়তুম। সেই সময়টায় মনে পড়ে এটাই করেছি। শাহাজী, শিবাজী আর সম্ভাজীর ছবি দেখে আমার একটা কথা প্রায়ই মনে হত। লক্ষ্য করতুম তিনপুরুষের চেহারা, মুখভঙ্গী একই রকম। বাবারই মতন ছেলে আবার নাতিও তারই মতন। সবাই একই রকম তেজী আর ধার্মিক। এটা তাঁদের বংশগত।

"রতনু আছ নাকি ?" তাকিয়ে দেখি তুকদেব পাটিল হেলতে দুলতে ঘেমে ঘুমে এদিকেই আসছে।

"আছে," মা জবাব দিলে।

আমার স্বপ্নের জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে এলুম, বাবাকে ডেকে তুললুম। তুকানানা কুঁজোর ঠাণ্ডা জল চাইলে। ছিলিমে তামাক ভরে এরপর বাবার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলে। আমি তুকানানার বড়সড় চওড়া হাড়ের সুঠাম শরীর দেখছি আর তার গল্প শুনছি।

"ভর রোদে ছুট দিলি ?"

"হ্যাঁ। খোকার দুধ পৌঁছে দিয়ে এলুম কাগল বাস স্ট্যাণ্ডে।"

সামনে বালতিতে রাখা ছিল দু তিনসের দুধ। তুকানানা গল্প করছে আর দুধের দিকে তাকাচ্ছে। গল্প বেশ জমে উঠেছে। তুকানানা ছেলেকে কোলহাপুরের মতিবাগে কুস্তি শেখবার জন্য রেখেছিল। ছেলেটির বয়স সতের আঠার কিন্তু দেখতে একটা হাতির বাচ্চার মতো। নিজের জেলার নাম রাখবে বলেই মনে হয়। রোজ তিন মাইল পায়ে হেঁটে তুকানানা

কাগলে আসে, সেখান থেকে সার্ভিস মোটর করে যায় কোলহাপুরে দুধ আরও কি সব খাবার নিয়ে। ছেলে কুস্তির মার প্যাঁচ ভালভাবেই রপ্ত করেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্প মোড় নিলে কুস্তিগীরদের নিয়ে। বাবা তুকানানার সময়কার কুস্তিগীর আর পালোয়ানদের কুস্তিমেলার গল্প শুরু করে দিলে।

আমি আবার আগের মতো দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বই পড়তে লেগে গেলুম। মা এর মধ্যে ভেড়ার লোম কাটা সেরে ফেলেছে। ঘণ্টাখানেক এখানে সেখানে কাটল তারপর আমরা সবাই দুপুরের খাওয়া খেতে বসলুম। যাহোক কিছু মুখে দেব।

"চল আন্দ্যা," মা ডাক দিলে, "কত আব বই পড়বি। বইটা ওখানে রেখে, আয় তো বাবা, যাহোক কিছু খেয়ে নিবি, চল।"

আমি বইটা আড়াল করে ভাল করে আসন করে বসলুম। বাবা চিবোতে চিবোতে বলে যাচ্ছে, "ক্ষেতে খাটছিস্ বাড়িতে দু দুটো মোষ রয়েছে। যত পারিস দুধ খেয়ে নে। নিজে চাঙ্গা থাকলে দুনিয়া চাঙ্গা। খেয়েদেয়ে বলদের মতো গায়ে জোব আনতে হয়। তাহলে আর জ্ঞাতিগুষ্টি যত শত্রুতাই করুক না কেন তোর গায়ে আঁচড়টি লাগবে না। কেউ তোর পেছনে লাগতে সাহস পাবে না। চোর ডাকাত আসতে পারবে না। ডর পাবে। রোজ সন্ধেয় চলে যাবি কুস্তির তালিম দিতে।" বুঝলুম বাবার মনে তুকানানার ছেলে বেশ ভালই দাগ কেটেছে। কথাটা আমারও পছন্দ হল। মন্দ কি? আমাদের গাঁয়ে সবাই অল্পবিস্তর কুস্তি পাগল তো ছিলই। শাহু মহারাজ কুস্তির ধাবাটা এ অঞ্চলে বাঁচিয়ে রেখেছেন। পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া খোলা, সেখানে সকালে যেমন পাঁচটা থেকে সাতটা অবধি চলে তেমনি রাতে ন'টা অবধি। আমি কখনো সখনো এমনিই গিয়ে বসে বসে দেখতুম। গাঁয়ে পুজো পার্বণের সময় কুস্তির আসর বসত। কুস্তিগীররা নানা জায়গা থেকে আসত। তাদের কসরতের গল্প গাঁয়ের লোক পাঁচ ছ'মাস ধরে মনে রাখত।

বাবার হুকুম হয়েছে। এই সুযোগে আমি কুস্তির তালিম নিতে শুরু করে দিলুম। শিখব তো, কিন্তু গায়ে মাখার নারকোল তেল কোথায়? আমাদের বাড়িতে নারকোল তেল কেনা হতই না বলা চলে, এরা মনে করত মাথায় তেল না দিলেও কিছু যায় আসে না। মাথা ঠিক মাথার জায়গাতেই থাকে। মাসের মধ্যে হয়তো এক চামচ মতো নারকোল তেল আনা হত তা থেকেই আমাদের সকলের মাথায় মা এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে দিত। শুধু তাই নয় সে এক চামচ তেল থেকে বাঁচিয়ে মা আবার তার কোলের বাচ্চাটিকেও মাখাত। গায়ে তেল না মেখে কুস্তি হবে না তাই কিছু না পেয়ে আমি খাবার তেলই গায়ে মেখে নিতুম। অনেকটা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো। সাত আট মাস এভাবেই কেটে গেল। দু তিনটি প্যাঁচ রপ্ত করেছিলুম। তার মধ্যে কায়দা যে খুব ছিল তা নয়, গায়ের জোরই খাটাতুম বেশী আর সেটা পারতুমও। খুব ক্ষেপে গিয়েছিলুম, খুব উৎসাহ ছিল। ওঠ বোস করতে করতে হাঁপিয়ে পড়তুম, তাও থামতে চাইতুম না। পালোয়ানদের মতো কাঁধ উঁচু করে হাঁটতে লাগলুম। তখন আমার একটাই চিন্তা। পালোয়ানদের মতো বড় পাকানো গোঁফ কবে হবে। কে যেন বললে গোঁফের ওপর ক্ষুর চালালে গোঁফ আরও তাড়াতাড়ি ওঠে। বাবার ক্ষুরটা তাই একদিন আমার গোঁফের ওপর চালালুম। গোঁফ অবশ্য উঠল না। গোঁফ না-ই বা উঠল, এখন বড় হয়েছি বাইরের লোককে সেটা দেখাতে হবে

তো। তাই মা আর আমি দুজনে মিলে এখানে সেখানে কাজ করে, ঘুঁটে বেচে এক জোড়া ধুতি আর মাথার একটা পাগড়ি কিনে ফেললুম। তারপর কুস্তিগীরদের মতো ধুতি পরে, পাগড়ির লম্বা লেজ ঝুলিয়ে ক্ষেত থেকে সোজা গাঁয়ে যেতে লাগলুম আর সেখানে ঘুরতে লাগলুম। মা ভাবলে ছেলে এবার সত্যি তার বড় হয়েছে। বাবাও তাই ভাবলে, ছেলে এখন তাহলে পুরোপুরি চাষী হয়ে গেছে।

একদিন যা নয় তাই হল। শিরপ্যার সঙ্গে আমি কুস্তি লড়ছি। খেলা বেশ জমে উঠেছে, আমি ওকে টানছি ও-ও আমাকে টানছে। খেলতে খেলতে একসময় ও আমার গলার সুতো ধরে টান মারলে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম, কব্জির জোর ঢিলে হয়ে আসছে তখন ওকে আর আমি চেপে ধরতেই পারলুম না। ও আমার হাত থেকে ফসকে গেল। তারপর আবার আরম্ভ হল কোস্তাকুস্তি। আধঘণ্টা ধ্বস্তাধ্বস্তির পর আমরা দুজনেই উঠে এসে গা মুছতে লাগলুম। গলার কালো সুতোটার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ খেয়াল হল ওর ভেতর যে সোনার মাদুলিটা ছিল সেটা সেখানে আর নেই তো। শুধু কালো সুতোটাই ঝুলছে। আমার তখন ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হবার জোগাড়। যে জায়গাটায় কুস্তি লড়ছিলুম সেখানটা ভাল করে খুঁজতে লেগে গেলুম। খুব ভাল দেখাও যাচ্ছিল না, কেরোসিনের ক্ষীণ আলোতে যতটুকু দেখা যায় তাই। সে জায়গায় অন্য ছেলেরা তখন খেলছে, কুস্তির হুড়োহুড়ি তো লেগেই থাকে। কুস্তি যেখানে খেলা হয় সেখানে এক চৌবাচ্চা ভর্তি মাটি থাকে। ছেলেদের হুটোপুটিতে মাটি সব সময়ই এদিক ওদিক সরছে নীচের মাটি ওপরে, ওপরের মাটি নীচে। আমার সঙ্গে আরও দু-তিনজনও খুঁজতে লেগেছিল। মাদুলিটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরেছি। ঠিক করলুম মাদুলিটির কথা কাউকে বলা হবে না। খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরের দিন ক্ষেতের পাঁচিলে বসে খাচ্ছি। মার নজর ঠিক গিয়ে পড়েছে ওখানে। জিজ্ঞেস করলে, "তোর গলার মাদুলি কোথায়?"

"কোথায় আবার! গলার মাদুলি গলাতেই আছে," আমি চমকে যাবার ভান করে গলার কাল সুতো ধরে টানলুম, "কোথায়ও পড়ে গেল নাকি?"

"আমার কপাল," বলে মা সেখানেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লে। মাদুলির জায়গায় শুধু তার আংটা ঝুলছে কালো সুতোয়। বাবা তা দেখে আমি খাচ্ছি সে অবস্থাতেই পিঠে মারল এক ঘুসি। গলার ভেতরের খাবারের দলা আমার মুখেই আবার ফিরে এল।

"হারামজাদা, গলার মাদুলি কোথায় পড়ল তা খেয়ালই নেই। আফিম খাস না গাঁজা খাস? এতখানি ভারী সোনার মাদুলি এখন কোথায় খুঁজে পাই?" বাবা সেই থেকে আমার পিঠে কিলই মেরে যাচ্ছে।

মা অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় পড়ে গেল তুই খেয়ালই করলি না?"

"রাতে কুস্তি লড়তে লড়তে বোধহয় পড়ে গেছে কোথাও। শিরপ্যা আমার গলার সুতোটা ধরে খুব টানছিল।"

"ওঠ, ওঠ, রাখ তোর রুটি। চল দেখি, যেখানে কাল তালিম নিচ্ছিলি সেখানে চল এক্ষুণি," বাবা আমার পিঠে এক লাথি মেরে আমায় ওঠালে, আমিও খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়লুম।

যে জায়গাটায় কুস্তির কসরতি হচ্ছিল তার বাইরে থেকে একটা ছিটকিনি দিয়ে আটকানো ছিল। আমি সেটা খুলে ঢুকে পড়লুম। একদিনকার মাটি ধুলো সব দেখলুম, চট্ করে বাড়ি গিয়ে একটা চালুনিও নিয়ে এলুম ধুলোমাটি চেলে দেখব। বাবা তো সেই থেকে যাচ্ছেতাই গালমন্দ করে যাচ্ছে আমাকে। আমি চুপ করে শুনে যাচ্ছি। তাতে বাবার রাগ আরো বাড়ছে— উপরি পাওনা হিসেবে তাই জুটছে লাথি। এমনি করে তিন ঘণ্টা প্রায় খোঁজাই চললল। মাটি ঢেলেও দেখা হয়েছে। শেষে দুজনেই বুঝে গেলুম মাদুলিটি ওখানে আর নেই। তখন বাবা আমাকে ঐ ধুলোভর্তি চৌবাচ্চায় লাথি মারতে মারতে একেবারে শেষ করে ফেললে। জামাকাপড় ধুলোয় ভর্তি হয়ে গেল। চৌবাচ্চার রাঙামাটিতে ওদিনের বাবার লাথির দৌলতে যে গড়াগড়ি দিতে হল সেটাই কুস্তির মাটিতে আমার শেষ লুটোপুটি। এরপর যখনই বাবার মাদুলির কথা মনে পড়ে যেত তখনই আমার পিঠে পড়ত কিল। এভাবে চলেছিল আরও তিন চার দিন। সেই সাথে কুস্তির তালিম জীবনের মতো শেষ হয়ে গেল।

ঘুঁটে বেচে পেয়েছি এক টাকা। সিনেমা হলে ঠিক এর আগের দিন একটা মারামারির বই এসেছে। গণপা কি একটা কাজে দুদিন গাঁয়ে গেছে, বাবা তাই ক্ষেতে থেকে গেছে। আমি বাড়িতেই শুতাম। সেদিন খেয়ে দেয়ে বাবা সবে ক্ষেতের দিকে এগিয়েছে। আমিও মাথায় টুপিটি পরে মাকে বললুম, "মা, আমি বায়োস্কোপ দেখতে যাচ্ছি।"

মা বলে, "কত আর বায়োস্কোপ দেখবি বাবা? পয়সাগুলো খাবার জন্য রাখলেই তো পারিস।"

"খাই তো। আমি চললুম," বলে হাঁটা দেব এমন সময় সাড়ে ছ'বছর হয়েছে কি হয় নি সেই ভাই শিবাজী টক করে বিছানায় উঠে বসে বলে, "দাদা আমিও তোর সঙ্গে সিনেমা দেখব।"

মা বললে, "ওকেও তাহলে নিয়ে যা।"

"না, না, আমার কাছে অত পয়সা নেই। ওর তো হাফ টিকিট লাগবে।"

মা করুণভাবে বলে, "আজ না একটা টাকা পেলি? তোর টিকিটের পয়সা আছে আর ওর বেলায় নেই। ও না তোর ছোট ভাই?"

"বললুম তো, আমার কাছে নেই, তুমি যদি দাও তাহলে নিয়ে যাই," আমি বলি।

"আমার কাছে পয়সা নেই, বাবা।"

আমি শিবাকে বললুম, "তুই চুপ করে বোস বাড়িতে।" রাস্তার একটা পাথর তুলে ওকে ভয় দেখালুম, "আমার হাতের এই পাথর দেখছিস? যা, মার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে আয়, তবে নিয়ে যাব।"

সে বেচারা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল। খাবার সময় শাসিয়ে গেল, "দাদা আজ আমি বাবাকে সব বলে দিই কিনা দেখিস।"

"আচ্ছা, আচ্ছা বল গে যা," আমি ততক্ষণে এগিয়ে গেছি।

শিবা এভাবে সব সময় আমার পিছু ধরত। তাই বাড়িতে আর কিছু বলার উপায় ছিল না।

পরের দিনের কথা। বাবা ক্ষেতে জল দেবার তোড়জোড় করছে। আমিও জলের দিকটাতেই

ছিলুম। জল ছাড়াটাড়া হয়ে গেছে, আমরা সবাই খেতে বসেছি। ঠিক খাবার সময়টিতে শিবা এল খেতে আর এসেই বাবার কাছে আমি কাল রাতে বায়োস্কোপে গিয়েছিলুম চুকলি কাটলে। খেতে যেতে বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলে,

"হ্যাঁরে আন্দা, কাল রাতে বায়োস্কোপ দেখতে গিয়েছিলি ?"

"হ্যাঁ, আমি আমার পয়সায় গিয়েছিলুম।"

"তা, সে পয়সাটা পেলি কোত্থেকে ?"

শিবা অমনি বাবাকে বলে দিলে কাল ঘুঁটে বেচে আমি একটা টাকা পেয়েছি।

"তাই ?"

"হ্যাঁ, আমি মাঠে মাঠে গোবর কুড়োই, মা তাই দিয়ে ঘুঁটে করে দেয় আমায়।"

"শালা! বায়োস্কোপ দেখে দুটো ঘণ্টা সময় আর পয়সা নষ্ট না করে, সে পয়সায় কিছু কিনে খেতে পারিস তো? তোকে কতবাব বলব। বায়োস্কোপ দেখে কি আর পেট ভরে? ওটা ফতুব হবার নেশা।"

আমি "হুঁ" বলে চুপটি করে খেয়ে উঠে পড়লুম।

মা আর বাবা বায়োস্কোপের ওপর ভীষণ চটা। ওরা সর্বদাই পেটের চিন্তা কবতেই অভ্যস্ত। তবু আমি ঠিকই বায়োস্কোপ দেখতে চলে যেতুম। মাসে দু-তিনবার তো যাবই।

বাবা এটা জেনে ফেলেছে আমার এই সিনেমা দেখার পয়সা জোগাচ্ছে ঘুঁটে। আমাদের গাঁয়ে সিনেমা দেখিয়ে দেখিয়ে গরীবদের সর্বনাশ হচ্ছে, ওদের ছেলেপিলেরা সিনেমার পেছনে পয়সা খরচ করছে। এটা আমি যে বুঝতে পারি নি, তা নয়। তবুও বায়োস্কোপ দেখার নেশা ছাড়তে পারছিলুম না। অবশ্য ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াল না। একদিন বাবা আমায় খুব ধমকালে, "হারামজাদা, বাড়িতে বিনিপয়সায় গিলছিস, আবার মাঠের গোবর কুড়িয়ে পয়সা করা হচ্ছে। কাল থেকে যত গোবর কুড়োবি সব এক জায়গায় ঢাঁই করে রাখবি।"

মাকে বললে, "তুইও শুনে রাখ। এসব মতলব আর যদি ছেলেকে শেখাস তোর ভাল হবে না সাবধান করে দিলুম।"

সেদিন থেকে আমার কুড়োনো গোবর থেকে ঘুঁটে হয়ে পয়সা হয়ে আমার পকেটে আসা বন্ধ হয়ে গেল। যা গোবর কুড়োতাম তা বাড়ির গোবরের ঢিপিতেই রাখতে হত। সিনেমা দেখাও বন্ধ হয়ে গেল। তবে সিনেমা দেখার নেশা কি আর অমনি অমনি যায়? সে ইচ্ছে তো এখন আকাশছোঁয়া। ফলে এই হল, আমি নানা ছলচাতুরির আশ্রয় নিয়ে সিনেমা দেখার চেষ্টায় থাকতে লাগলুম। সিনেমা হলে সামনের দিকে চেয়ার থাকত না, মাটিতে বসতে হত। এতে একটা সুবিধে এই যে অনেক লোক ধরে যেত। কখনো ভীড়ের মধ্যে কোনো চাষীর মাথার ঘোঙড়ীর আড়ালে চট করে ভেতরে ঢুকে পড়তুম। কখনো আবার সিনেমা আরম্ভ হওয়া অবধি এখানে সেখানে ঘুরে কাটাতুম। বই আরম্ভ হলে দরজার পাশের ফাঁক দিয়ে যতটা দেখা যায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক চোখ ঠেকিয়ে সেভাবেই দেখতুম। মাঝে মধ্যে যখন এসব করছি তখন গেটকীপার হঠাৎ পেছন থেকে এসে কাঠের একটা তক্তা দিয়ে পাছায় দিত এক থাবড়া। তখন সিনেমার একটা দুটো অংশ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। আরেকটা কায়দাও আমার জানা ছিল। সেকেন্ড শো আরম্ভ হত দশটায়।

এই শো'টার ইন্টারভ্যাল হত সওয়া এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার ভেতর। এ সময়টায় ভেতরের লোক পেচ্ছাব করতে বাইরে আসত। ভীড় বেশী থাকলে বা গেটকীপারকে কুড়েমিতে পেলে যারা বাইরে যেত তাদের টোকেন দিত না। এরকম সুযোগ পেলে আমি চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ে কারো পেছনে গা ঢাকা দিয়ে দরজার দিকে পিঠ করে বসতুম আব দিব্যি সিনেমার বাকি আদ্ধেকটা দেখে নিতুম। মোটামুটি ন'টার সময় বাড়ি থেকে বেরোন, তারপর এগারটা অবধি কোনোবকমে গেটকীপারের আড়ালে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে থাকা। সেকেন্ড শো আরম্ভ হবার সময় গেটকীপার আমাকে বাইরে দেখে ফেললে তো বিপদ। তাহলে তো সে আর ইন্টারভ্যালের সময় আমাকে ভেতরে যেতে দেবেই না। এ ভয়টা আমার সব সময়ই থাকত। এত সব হিসেব টিসেব করে সমাধান হয়েও কখনো কখনো গেটকীপার আমায় ঠিক ধবে ফেলত আর তখনি হাত ধরে হল থেকে বার করে দিত। কখনো বা ইন্ট্যারভ্যালে সে ভেতরের লোকেদের বাইরে বেরোবার সময় টোকেন দিত। তখন আর ভেতরে ঢোকাই হত না। বোকার মতন বাইবেই নটা থেকে বারটা কাটিয়ে দিতুম, হলেব দেয়াল ছবি ঝোলান দেখে বেড়াতুম। কখনো বা বাড়িও ফিরে গেছি।

সেবারে দেয়ালীর দিন "গেরুয়া পতাকা" নামে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী দেখান হচ্ছিল। ছবিটি সবাক চিত্র। শিবাজীকে নিয়ে কোনো ছবি এলে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করতুম ছবিটা দেখার। চার পাঁচদিন টিকিট ঘরের সামনে শুধু শুধু দাঁড়িয়েই ছিলুম। আশা, কেউ হয়তো আমার টিকিটটা কেটে দেবে। হয়তো মামাই এল ছবিটা দেখতে, নয়তো ওর নীচে যারা কাজ কবত তাদের কেউ এল, আর আমাকে দেখে আমাকেও নিয়ে চলল ছবি দেখতে। এটা মাঝে মাঝে হত না যে তা নয়। কিন্তু এবারে তা আর হল না।

সেই দেয়ালীতে শীতের মধ্যে আমি নর্দমার ধাবে মাঝরাত অবধি বসে বসেই কাটিয়ে দিতুম। সেবারে গেটকীপার ইন্টারভ্যালের সময় কারুকেই টোকেন ছাড়া বেরোতে দিলে না।

দেয়ালীর কাছাকাছি সময়েই কাগলে উর্‌স্‌ হত। তখন লোকেরা এখানে সেখানে বেড়াতে যেত। সারারাত এ আসাযাওয়া চলত। নানারকম অনুষ্ঠান, নাটক এসবও হত। আমার মনে হত এ জন্যই বোধহয় এ সময়টাতে গেটকীপার টোকেন নিয়ে এত কড়াকড়ি করত। আমি কিন্তু তাতেও হাল ছাড়িনি। কোনো-না-কোনোদিন গেটকীপার টোকেন ছাড়াই ভেতরের লোকদের ছেড়ে দেবে এ আশায় নটা থেকে সাড়ে এগারটা অবধি সিনেমা হলের ওখানটায় ঘুর ঘুর করতুম। এরকমই যখন ঘুরঘুর করছি তখন একদিন দেখতে পেলুম সিনেমার পর্দা যেখানে ঝোলানো আছে তার ঠিক উল্টোদিকে একটা পোড়ো বাড়ির পাঁচিল আছে। মনে হল সেখানে দাঁড়ালে ছবিটা দেখা যেতেও পারে। কারণ, সিনেমা হল মানে তো আর চারদেয়ালে ঘেরাবন্ধ ঘর ছিল না। কিছুদিন চলে যাবার মতো করে কোনরকমে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে— ওর বাঁ দিকটা খোলাই ছিল। একদিকে উঁচু দেয়াল ছিল বলে রাস্তায় যারা চলাফেরা করত তারা ভেতরটা দেখতে পেত না। এসব ভেবেটেবে পোড়ো বাড়িটাতে ঢুকেই পড়তুম। একবার দেখে নিলুম দেয়ালে দাঁড়ান যায় কিনা। দেয়ালের একটা খাঁজে দাঁড়িয়ে ওপরের দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছবি দেখতে পেলুম ঠিকই,

তবে কথা তো আর শোনা যাচ্ছিল না। তাই ছবিটার মানে ধরতে পাচ্ছিলুম না। শুধু ছবি দেখে আমার আর ভাল লাগছিল না। ইন্টারভ্যাল অবধি এভাবেই ছবিটা দেখে দরজার কাছে এসে দেখি গেটকীপার টিকিটের যে আদ্ধেকটা ওর কাছে থাকে সেগুলো বিলি করছে।

এরই মধ্যে কে যেন হঠাৎ বলে বসলে উর্স্-এ যে ভ্রাম্যমাণ টকী এসেছে সেখানে কোনো একটা মেসিনে একটা কিছু গড়বড় হয়েছে, ফলে ওদের ছবি গোরা কুম্ভার ("ফর্সা কুমোর") দেখাতে দেখাতে মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেছে, টিকিটের পয়সা ওরা ফিরিয়ে দিচ্ছে। খবরটা যেই না রটা অমনি এ হলটার মালিক আমারই সামনে একটা লোক পাঠিয়ে দিলে। বলে দিলে রাত সাড়ে বারটায় ভগওয়াঝেণ্ডা ("গেরুয়া পতাকা")-র আরও একটা শো হবে ঢেঁড়া পিটিয়ে চোঙা মুখে দিয়ে এটা যেন সে বলে আসে ঘুরে ঘুরে। ঝানু ব্যবসাদার ছিল মালিকটি।

খবরটা পেয়ে রাত বারটায় যথারীতি ভীড় জমতে শুরু হল। আমিও দাঁড়িয়ে আছি ধৈর্য ধরে। এর আগে দেয়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো ব্যথায় টনটন করছিল তবুও আরেকটা শো রাত সাড়ে বারটা হবে শুনেই আমার খুব লোভ হল। এ শোটার ইন্টারভ্যালের সময় গেটকীপার নিশ্চয়ই টিকিটের আদ্ধেকটুকু দিতে পারবে না, দেবেও না এ ভেবে নিয়ে আমি বিনি পয়সায় ছবি দেখার মতলবে রয়ে গেলুম। রাত দুটোর সময় আদ্ধেক বই দেখতে কি আর কেঁউ আসবে? মনে তো হল না। আমি তাই সেই রাতের অন্ধকারে বসে রইলুম ঘাপটি পিটে। হাই উঠছে তো উঠছেই। শীতের রাত। কোনোরকমে দুহাত দুকাঁধে জড়িয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে চলেছি শীত থেকে। ছবি দেখার লোভ। পৌনে দুটোতে ইন্টারভ্যাল-এর সময় গেটকীপার সত্যি সত্যি টোকেন দিলে না। যখন লোকে বেরুচ্ছে তখন দরজায় কেউ দাঁড়িয়েও নেই। আমি এমন ভাব দেখালুম যেন আমিও ওদেরই মতো বাইরে এসেছি পেচ্ছাব করতে। যারা নর্দমার ধারে পেচ্ছাব করতে বসেছিল তাদেরই পাশে আমিও বসে পড়লুম, আর যারা আবার ঢুকছে ভালমানুষের মতো তাদেরই একজন হয়ে ভেতরে ঢুকে বসেও পড়লুম। গেটকীপারকে কোনো পাত্তাই দিলুম না। এবারে বাকি আদ্ধেকটা নিশ্চিন্ত মনে ভাল করে দেখে মনের আনন্দে রাত সাড়ে তিনটের সময় বাড়ির দিকে হাঁটা দিলুম। হঠাৎ খেয়াল হল রাতে যে কিছু খাওয়া হয়নি। খিদেতে পেট চুঁই চুঁই করতে লেগেছে। সিনেমা দেখতে হলে রাতের খাবার জুটবেই না এটা জানাই ছিল। আর জুটলে তো সেই বাবার খপ্পরে পড়তে হত। আটটা সাড়ে আটটায় বাবা ফিরত ক্ষেত থেকে। আমি তো দিনের শেষে মোষেদের নিয়ে আসতুম। কখনো আমি মার সঙ্গে মোষছাগলদের দলে শুকনো ঘাসের চারা মাথায় করে মেয়েদের নিয়ে যেতুম। মার বাচ্চা হলে বা পেটে বাচ্চা এলে ওদের ক্ষেতেই রেখে আসা হত— তা নইলে গোরুমোষেদের রাতে আমাদের গাঁয়ের বাড়িতেই রাখা হত। সকালে দুধ দোয়ানো হয়ে গেলে আমিই ওদের আবার মাঠে ছেড়ে দিয়ে আসতুম, দিনের শেষে আমিই ঘরে ফিরিয়ে আনতুম এই নিয়মেই চলছিল। বাড়িতে মোষ থাকলে মার সুবিধে হত। তাড়াতাড়ি দুধ দুইয়ে রান্নার কাজে লেগে গেলেই তো ভাল, মা বলত। রাতে দুধ দোয়ালে সে দুধ পেয়ে খদ্দেররাও খুশি হয়। চাকরবাকররা ভাল দুইতে পারে না। ওদের মারধোর করে। রাতে উঠে যে মোষেরা দুধ দেয় ওদের

ঘাসের চারা খেতে দিতে হয়, সে কাজ চাকরদের দিয়ে হয় না। তাই তো ওরা সকালে দুধ কম দেয়। কখনো সখনো ওরা পোয়াখানেক দুধ হয়তো খেয়েও ফেলে। তাই নিজের গোরুমোষ নিজের চোখে চোখে রাখাই ভাল। মা তো ঠিকই বলত। যাকে আমরা মোটক্যা বলতুম, ক্ষেতে জল দেবার সেই লোকটা বহাল হবার পর থেকে বাবা তো বাড়িতেই থাকত। এক এক সময় যখন যেত, তখন ফিরতও দেরী করে। সে সময়টা দুধ দোয়ানোর কাজ চাকরদের ওপর পড়ত। বাবা যখন দোয়াতে বসত তখন মোষ বেচারাদের বড় কষ্ট হত। ওরা দুধ আটকে রাখলে আর রক্ষে নেই, বাবা ওদের এমন হ্যাঁচকা টান টানত। দুধ দোয়াতে দোয়াতে মোষেরা একটু পা নাড়ালেও বাবার রাগ হত, চেঁচাতে শুরু করে দিত। বাবার ঐ বাঁজখাই গলা, মোষেরা ভয়েই কাঁপত। আর সে ভয়েতেই দুধ অনেক সময় আটকে যেত। মার সঙ্গে মোষ নিয়ে বাড়ি ফিরলে আমি পৌঁছে দিয়েই গলিতে খেলতে যেতুম। বাবা ফিরে না আসা অবধি খেলতুম। এর মধ্যে রান্না হয়ে গেলে বাবা ফিরে এলে হীরা নয়ত শিবা ডাকতে আসত।

বাবা বাড়ি ফিরেছে কিনা জেনে ঠিক করতুম তক্ষুণি বাড়ি ফিরব কি না। সিনেমায় যাবার ইচ্ছে হলে ওদের বলতুম, "তোরা চল আগে আগে, আমি আসছি।" এই বলে ওদের কাটিয়ে দিয়ে সিনেমায় পালাতুম। কখনো সখনো বাবা নিজেই ডাকতে এসে বাড়িতে ধরে নিয়ে যেত। যেদিন রান্না তাড়াতাড়ি হয়ে যেত সেদিন খেতে খেতেই দেখতুম বাবা বাড়ি ফিরছে। তখন আমার সিনেমা দেখা মাথায় উঠত। এভাবে মাঝে মধ্যে খাওয়াটা বাদ দিয়েও সিনেমা দেখার বুদ্ধিটা তো সেই থেকেই মাথায় এসেছিল। সারাদিন মাঠে খেটে রাতের এই উপোস। বেশ কষ্টই হত। পেটে কিল মেরে ছবি দেখতে হত। তবে সিনেমার আনন্দে এসব কষ্ট কষ্টই মনে হত না।

সেদিনও তেমনি "গেরুয়া পতাকা"র আদ্ধেকটা দেখার আনন্দে বেশ মশগুল হয়ে ফিরছি। মোরগের প্রথম ডাক শুনতে পেলুম কানে। আমিও তখন কড়া নাড়ছি খুব আস্তে করে। কড়ায় হাত দেবার আগে অবশ্য বাবা বাড়িতে রয়েছে কিনা দেখে নিয়েছি। বাবা সাধারণত দরজার কাছেই শুত। কখনও ক্ষেতে যেত, কখনও বা আমার জন্য অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ত। মাথার কাছে ছোট্ট একটা ল্যাম্প জ্বালিয়ে একটু একটু নাক ডাকিয়ে ঘুমোত, দরজায় কান পাতলে শোনা যেত সেই নাক ডাকানি। দরজার ফাঁক দিয়ে ল্যাম্পের ঐ ক্ষীণ আলোতে বাবাকে দেখতে পেলে আর কথা নেই, অমনি চোরের মতন পিটটান দিয়ে একা একা সেই রাত বারোটায় সোজা রওনা দিতুম ক্ষেতের দিকে। প্রাণের ভয় ডর তখন কোথায় উঠে যেত। উপোসে পেট পিঠ সমান হয়ে যেত। সকালে আবার বাবার মার তো আছেই কপালে, সেটার পর দিন আরম্ভ হত।

সে রাতে অবশ্য বাবা বাড়ি ছিল না। মা দরজা খুলেই ছিটকিনি দিয়ে দিলে। গোরু মোষদের যে ছড়িটা দিয়ে মারে তা দিয়ে মা আমায় বেদম পেটালে। হাতে যে ছড়িটা এনেছে, অন্ধকারে সেটা বুঝতেই পারি নি। মনে হল মা বোধহয় রাতটা জেগেই কাটিয়েছিল। মুরগীর প্রথম ডাকও শোনা যাচ্ছে অথচ আমার দেখা নেই—

তাতেই আমাকে না দেখে এতক্ষণ যত চিন্তা ছিল, দেখা পেয়ে নিশ্চয়ই ঠিক ততটাই রাগ হয়েছে। মাও মারছে আমিও সে মার থেকে বাঁচবার জন্য দোলনার চারধারে ঘুরছি। চেষ্টা করেও বাঁচতে খুব একটা পাচ্ছিলুম না, ছড়ি ঠিকই সপাসপ মাথায় পিঠে এসে পড়ছিল। আর সেই সঙ্গে কথা "কত দেরী করবি? হ্যাঁরে, আমি সারা রাত ভেবে ভেবে মরব, চোখের দুপাতা এক করবার জো নেই, চিন্তায় চিন্তায় রাত কাটল, আর কত দেরী করবি? আর কত জ্বালাবি আমাকে?" একটা কথা শেষ হচ্ছে, তার পরেই পড়ছে সপাং করে ছড়ির মার। একসময় চট করে কানে ধরে ফেললে, পালাতে পারলুম না। এবারে হাতের কাছে পেয়ে হাঁটুতে মারতে আরম্ভ করলে, "আর যাবি টই টই করতে?"

সেই ভোরে মা হাঁটুতে মেরে মেরে একসময় ক্লান্ত হয়ে গেলে মার হাত থেকে ছড়ি পড়ে গেল, আমিও নিস্তার পেলুম। আমার চিৎকারে বাচ্চাটা জেগে গিয়ে কান্না জুড়ে দিলে, মা দৌড়ুল ওকে বুকে ধরতে। সেই ফাঁকে আমি মাটিতে সতরঞ্চি পেতে কাঁথা টেনে বাচ্চাদের বিছানায় গিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লুম। সে রাতে খাওয়া আর জুটলই না।

আগের দিন রাতে বারটা অবধি আমার জন্য অপেক্ষা করে বাবা মাঠে চলে গিয়েছিল। সকালে ফিরল তাড়াতাড়ি। "আন্দ্যা ফিরেছে?" বলতে বলতে ঢুকল। আমার ঘুম ভেঙেছে পিঠে মার লাথি খেয়ে। পায়খানা সেরে আমি সবে মুখ ধুচ্ছিলাম। মা বললে, "হ্যাঁ ফিরেছে, যাবে কোন্ চুলোয়?" বাবার হাতে ছড়ি দেখে আমার তখন ভয়ে কাঁপুনি ধরেছে।

"কোথায় গিয়েছিলি কাল রাতে?"

"সিনেমায়।" বাবার মারের ভয়ে দুহাত আমি আগেই তুলে দিয়েছি মার ঠেকাব বলে।

"পয়সা পেলি কোথা?"

"কোথাও নয়। ইন্টারভ্যাল-এর সময় বিনে পয়সায় ঢুকে পড়েছি।"

"তোকে একশবার বলেছি সিনেমা দেখতে যাবি না, কি বলি নি?" এবারে বাবা ছড়ি তুলেছে।

"হ্যাঁ বলেছ।"

"তাহলে কেন গেলি?" বলেই যে বলদ বেঁকে বসে তাকে যেমন চাবুকের হাতল দিয়ে পিঠে ঘা দেয়, তেমনি বাবা ছড়ি দিয়ে আমার পিঠে ঘা দিতে লাগল। বাবার একটা মারেই আমার আধমরা অবস্থা হয় আর এখন তো মারের বর্ষণ হচ্ছিল। শেষে এমন হল কাঁদলে গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোচ্ছিল না। মা আমাকে বাঁচাতে গিয়ে বললে, "ওকে আর মেরো না। রাতে আমার হাতে অনেক মার খেয়েছে।" কে কার কথা শোনে? মা মাঝখানে এসে পড়াতে আমার একটা লাভ হল, পালাতে সুবিধা হল। এক দৌড়ে সেখান থেকে চলে বেরিয়ে গেলুম। তখনও পেটে না পড়েছে চা, না পড়েছে জলখাবার। আমাকে দেখে গণপা হেসে হেসে বলে উঠল, "কি খুব কেঁদেছিস? বাপ বুঝি বেশ ভালরকম দিয়েছে পিঠে?"

আমার এই সিনেমার নেশা, খালি পেটে সারারাত বাইরে ঘোরা বন্ধ করতে না পেরে বাবা মা দুজনেই একদম তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল আর সেজন্যই দুজনে এক জোট হয়েই মেরেছে আমাকে শোধরাবে বলে— এটুকু বুঝে গেলুম। যাক গে, সকাল থেকে রোদে তেতে পুড়ে ক্ষেতে জলই দিয়ে যাচ্ছি, মরার খিদে পেয়েছে— পেটে দানাপানি তো কিছুই পড়েনি। হাতে পায়ে বলই পাচ্ছি না। জল ছাড়তে গেলে যেটুকু দাঁড়াতে হয় তাও যেন পাচ্ছিলুম না। একটু ঝুঁকে জল ছাড়ছি, সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ে দম নিচ্ছি। গণপা জল ছাড়লে। আনসা গোরু মোষদের মাঠে চরাচ্ছে। ক্ষেতে জল দেয়া শেষ হলে ঘরের কাছে এসে দেখি বাবা মা দুজনেই এসেছে। তখন বেলা বারোটা হবে। বাবা দরজায় বসে আছে। "এই কাস্তেটা নিয়ে দুটো পাতা এনে দে। তারপর বলদগুলোকে খাইয়ে আয়। তারপর তুই খাবি। তোকে এবার আমি টিট করব।"

মা পাঁচিলের ওপর বাসনকোসন নামিয়ে রাখছিল, শুনে চুপ মেরে গেল। আমি আর কান্না আটকাতে পারলুম না। পেটে কিছু পড়লে পাতা কাটতে দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম। খালি পেটে দুটো পাতাও কাটতে হাত উঠতে চায় না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে ঘরে ঢুকে ঢক ঢক করে ঠাণ্ডা জল খেলুম মাটির কলসী থেকে, তারপর ঘর থেকে কাস্তে নিয়ে দুম দুম করে পা ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে গেলুম। মা আমার কাণ্ডকারখানা শুধু দেখেই গেল। আমি যে না খেয়ে আছি সেটা তো মার অজানা নয়। না খেয়েই দুদিন গাধার মতো কেবল কাজ করেই চলেছি। তবে বাবা রেগে গেলে কে কি করতে পারে? চারটে পাতা কাটতে দু ঘণ্টা লাগবেই। তার মানে দুটো বেজে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত বেঁচে থাকলে হয়। এসব বাপ মায়েদের ঘরে জন্মালে এরকমই হবে। কখনো একটাও রঙচঙে বাহারে জামা আদর করে কিনে দেবে না, খেলার সময় খেলতে দেবে না, সিনেমা দেখতে দেবে না, এদের ঘরে ছেলেপিলেদের জীবনে কোনো সাধ আহ্লাদ থাকতে নেই। সারা জীবন শুধু এদের জন্য চাকরবাকরের মতো খেটে মরতে হবে, তবে দুবেলা দুমুঠো খেতে দেবে। এর চেয়ে শহরে গিয়ে খেটে খাওয়া অনেক ভাল। সেখানে যে কোনো ডাক্তার বা উকীলের বাড়িতে ঝাড়পোঁচের কাজ পেলেও ভাল থাকব, ভাল খেতে পাব। তাদের ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করতে করতে হয়তো বা তাদের সঙ্গে একটু খেলতেও পারব। এরই ফাঁকে ফাঁকে একটু গল্পের বইও পড়া যাবে। চাই কি, সিনেমায়ও হয়তো যেতে পারা যাবে। মনে মনে এসবই ভাবছি। স্কুলে পড়ার সময় ক্লাস ফোর ফাইভে ভদ্রলোকের ছেলেদের ক্লাসে দেখেছি। ওরা নিজেদের বাবা-মার কত ভাল ভাল গল্প বলত, কত প্রশংসা করত। আমার বাবা-মা তো, কই, ওদের বাবা-মাদের মতন নয়? ভেবে খুব মন খারাপ হত।

কাঁদতে কাঁদতে জোরে জোরে বাবাকে গালাগাল দিতে দিতে আমার পাতা কাটা সমানে চলল। যা হবার হবে, পাতা না কেটে উঠছি না। দুপুরে জলের দিকে যাবার সময় হলেও এখানেই বসে থাকব পাতা নিয়ে।

কাটা প্রায় আদ্ধেক হয়েছে, এমন সময় 'আন্দা' বলে মা ডাকলে। মা ক্ষেতের

জংলা গাছ নিড়োতে এসেছে। 'আন্দা' মার আদরের ডাক। অন্য সময় আমি 'আন্দ্যা' বাবা আমাকে কখনও আন্দা বলে ডেকেছে বলে মনে পড়ে না। ছেলেরাও তাই আমাকে 'আন্দ্যা' বলেই ডাকত।

মার 'আন্দা' ডাক শুনেই বুঝলুম মার রাগ পড়েছে, আমার জন্য মন টানছে। এ সহানুভূতিতে আমার আরো কান্না পেয়ে গেল। আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলুম। এক হাতে এক ঘটি জল, অন্য হাতে রুটি তরকারি নিয়ে মা কাছে এসে বললে, "আগে এগুলো খা দিকি নি।"

"আমার খিদে নেই।"

"ওরে বাপ আমার, খেয়ে নে। সোনা আমার, কাল থেকে না খেয়ে আছিস।"

"ওগুলো তোমার ঐ মরদটিকে দাও গিয়ে। বারবার করে চব্বিশ ঘণ্টা খেটে খেটে দেখ গিয়ে ওর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে।"

আমি যে খুব রেগে আছি মা সেটা বুঝেছে। বাবা নিজে কোনো কাজ না করে শুধু ছেলেপিলেদের যে খাটিয়ে নেয় এসব তো মার অজানা নয়। কিন্তু মা বেচারা তো বাবার মুখের ওপর কিছু বলতে পেত না।

অনেক করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে পিঠে হাতটাত বুলিয়ে আদর করে, মিনতি করে শেষ পর্যন্ত মা আমাকে খাইয়ে ছাড়লে। খিদেয় তো আমার পেট চুঁ চুঁ করছিলই, তাই চোখের জল ফেলতে ফেলতে খেয়েই ফেললুম। মা আমার দিকে তাকিয়ে বললে, "নিজেকে এত কষ্ট দিয়ে সিনেমা দেখতে যাস কেন বল তো? তোর বাবা এত মারধোর করে, আমার কি ভাল লাগে দেখতে? সারা দিন গাধার মতো খাটিস আর রাতে কিছু না খেয়েই পালাস। কি আনন্দ পাস তুই সিনেমাগুলো থেকে?"

আমি যে কি পাই তা অবশ্য মাকে বোঝাতে পারি নি। তবে খিদের জ্বালা সহ্য করে, মারধোর খেয়েও যে সিনেমা দেখতে আমার মন চাইত সেটা সত্যি।

এদিকে পয়সা রোজগারের সব পথই বন্ধ হয়ে গেছে। পনের দিন এক মাস বাদে বাদে হয়তো মা দুপয়সা বা বড়জোর এক আনা হাতে ঠেকাত। তাই যে করেই হোক পয়সা করবার নেশা আমায় পেয়ে বসল। ক্ষেতে জল ছাড়া হয়ে গেলে, বারটার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে রোদ থেকে রেহাই পেতে ঘণ্টা খানেকের জন্য সবাই বিশ্রাম করত। রোদ কিছুটা পড়ে গেলে আবার যে যার কাজে লেগে যেত।

বিশ্রামের এই সময়টুকুতে আমার কিন্তু ঘুম আসত না চোখে। পুরনো ছবির বদলে নতুন ছবি এল কিনা, সে ছবির নাম কি, এসব নানারকম জিজ্ঞাসা এসে মনে ভিড় করত। গাঁয়ের একেবারে শেষের দিকটায় আমাদের ক্ষেতটা ছিল বলে ছুটে গেলে পনের মিনিটের ভেতর থিয়েটারে পৌঁছে যাওয়া যেত। যখন দেখতুম সবাই ছায়ার তলায় বসে বিশ্রাম করছে সে ফাঁকে সুট করে আমি কেটে পড়তুম। ধরা পড়ে গেলে বলে দিতুম জলের ধারে গাধা এসেছে কিনা দেখতে যাচ্ছি। বলতুম এসব, যেতুম গাঁয়ে। নতুন বই এলে ছবিগুলো দেখতুম, ওতেই কিছুটা খিদে মিটত। মনের মধ্যে ছবিগুলোকে জীবন্ত করে নিয়ে চরিত্রগুলোর কথাবার্তা বাজিয়ে নিতুম। ছবির মানুষগুলো তখন মনের মধ্যে জ্যান্ত নড়ে চড়ে বেড়াত যেন। যখন ফিরছি তখনও এ ঘোর

কাটত না। ফেরার সময় ছুটতে হত না, তখন অত তাড়া থাকত না তো।

পথে পড়ত শেখ শেরার দরগা। একটু উঁচুতে ছিল বলে দরগাতে যেতে হলে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে হত। চারিদিকে তেঁতুলগাছ দিয়ে ঘেরা। যেতে আসতে তেঁতুল পাওয়া যেত। মাটিতে পড়েই থাকত। আমি সেখানে একবারটি যেতুমই। একটুকরো তেঁতুল মাটি থেকে কুড়িয়ে মুখে চুষতে চুষতে দেখতুম সেই চৌহদ্দির মধ্যে অনেক মুসলমান বসে বসে বিড়ি বাঁধছে— চাঁদ সাহেবের বিড়ির কারখানায় চালান দেবে সে বিড়ি। বেশ লাগত তেঁতুল মুখে ঐ দৃশ্য দেখতে। এদিকে এক ধারে ছাউনির তলায় বসত তাসের আড্ডা আসলে জুয়ো খেলা। তাসের খেলার হারজিত দেখতে খুব ভাল লাগত, তন্ময় হয়ে যেতুম। সময় যে কখন গড়িয়ে গেছে জানতেই পারতুম না। আমার মন তখন পাড়ি দিয়েছে অন্য জগতে, ভাবছি ও কেমন চাল চালবে, উল্টোপক্ষ কেমন খেলবে, কোন নতুন খেলার প্যাঁচ ফাঁসাবে ওকে। অন্যজন আবার কেমন চোট্টামি করবে, তাহলে এর কি করা উচিত ছিল। সে তা না করে কি ভুল করল। হেরে একজনের পয়সা গেছে। মুখ কেমন কালো হয়ে গেছে। এসব দেখতুম আর খেলায় জয়ী বা পরাজিত দুটো জায়গাতেই নিজেকে ফেলে আসল খেলোয়াড়দের সুখ দুঃখের কিছুটা মনে মনে ভাগ করে নিতুম।

দু'তিনটে খুচরো পয়সা কখনো আমার কাছেও থাকত। ছেলেরা যখন টিপ মেরে খেলত তখন আমার কেবলি মনে হত আমার টিপটা নিশ্চয়ই লেগে যাবে। ভগবান আমাকে ঠিকই কিছু পয়সা এভাবে পাইয়ে দেবে। আমি যে এত কষ্ট করছি সে কি আর ভগবান জানে না? ভগবান নিশ্চয়ই আমার মনের কথা বুঝে আমাকে এক আধ আনা জিতিয়ে দেবে এ বিশ্বাস আমার ছিল। একটা চাল জিতলেই জেতার পয়সা নিয়ে ক্ষেতের দিকে ছুট মারতে হবে। এসব ভেবেচিন্তে একদিন আমি খেলতে লেগে গেলুম। এক আধবার যে জিতি নি তা নয়, কিন্তু হেরেছিও। পয়সাও বেরিয়ে যেত। কিন্তু পয়সা রোজগারের এর চেয়ে সহজ পথ আমার আর জানা ছিল না। আমি হিসেব করে নিলুম এক আধবার হারলে এক আনা যাবে কিন্তু দু তিনবার জিতলে যে দু তিন আনা পাওয়া যাবে তাতে একটা সিনেমার পয়সা হয়ে যাবে। তাছাড়া, এভাবে খেলতে খেলতে আরো ভাল শিখে যাব এ ভরসাও আমার ছিল।

ক্রমে এ নেশা আমার বেড়েই চলল। মাঠে গোরু মোষ চরাবার ফাঁকে ফাঁকে আমি বিচি দিয়ে টিপের প্র্যাকটিস করতুম। দু'তিন পয়সা হাতে থাকলে নিজে নিজেই এভাবে খেলতুম। এভাবে খেলে খেলে হাত যখন আরও পাকা হল তখন আর ভুল হত না। পয়সা আগের চেয়ে বেশী আসতে লাগল, সিনেমা দেখাও সে সঙ্গে গেল বেড়ে। কখনও হয়তো তাস দিয়েও খেলতুম, তবে তাসের খেলায় তেমন সুবিধে করতে পারতুম না। আমার ধারণা হয়েছিল তাস যারা খেলে তাদের তাস সব আগে থেকে ঠিক করাই থাকে। তাই তাসের পথ আর তেমন মাড়াতুম না।

আমার নির্ভুল টিপ দেখে ওখানকার বয়স্ক অনেকেই খুব অবাক হতে লাগল। কোনো বিশেষ দিনে বা পার্বণে যখন সেখানে জুয়ো খেলা হত, নানান রকমের খেলার আসর বসত, তখন সেখানে আমিও পয়সা দিয়ে খেলতে লাগলুম। তবে

যতরকম জুয়ো খেলা হত তার মধ্যে টিপের খেলাই আমার বিশেষ পছন্দ ছিল। গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতুম কে কোথায় এ ধরনের জুয়ো খেলছে। যখন গাঁয়ে না গিয়ে মাঠে গোরু মোষ চরাচ্ছি, তখনও বিচি দিয়ে টিপ খেলছি আর জেতা বিচিগুলো অন্য ছেলেদের কাছে বেচে দুটো পয়সা করছি। এ যেন এক নেশায় ধরে গেল।

জুয়োর নেশা বেশ ধরে গেছে, সিনেমা দেখা বেড়েছে, একটা বই তিন চার বারও দেখছি, সাড়ে সাতটার শো দেখে খেতে আসতে দেরী হচ্ছে, কৈফিয়ৎ হিসেবে বলছি গলিতে ছেলেদের সঙ্গে গল্প কবতে করতে দেবী হয়ে গেছে— ব্যাপারটা যখন এরকম চলছে তখন বাবা কেমন করে জানি জেনে গেল আমার জুয়ো খেলার কথা। যারা টিপেব জুয়ো খেলত তাদের কাছে রতনু যাকাতের ছেলের বেশ নাম ডাক ছিল। মাঝে সাঝে কেউ না কেউ আমার বাবার কানে সে কথা তুলে দিত। বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলে সত্যি কথা আর কি করে বলি? তাই বলতুম অন্য লোকের পয়সা নিয়ে খেলে তাদের জিতিয়ে দিই। কখনো অন্য কথাও বলতুম, "সেই কবে একবার খেলেছি সেটাই ঘুরে ফিরে এরা তোমায় বলেছে।" অনেকে আবার হিংসেয় জ্বলে মরত, ভাবত আমি না খেললেই তো ওরা জিতবে তাই বাবাকে গিয়ে চুকলি কাটত, "রতনু, তোব ছেলেকে কি জুয়োব নেশায় পেয়েছে রে? সারাটা দিন পয়সা দিয়ে খেলছে। তোর বুঝি খুব পয়সা হয়েছে?"

"না, না, ছেলে আমার সারাটা দিন মাঠে কাজ করে," বাবা ওদের ঠেকাত।

"এ্যাঁ, বলিস কি? আমরা না ওকে শেখ শেরাতে খেলতে দেখলুম কাল দুপুরে?"

বাবার এসব কথা বিশ্বাস হত না। আমি তো সারাটা দিন ক্ষেতেই থাকতুম। শুধু যে দুপুরে বিশ্রামের অবসরে খেলে আসতুম সে খবর তো বাবার জানা ছিল না। তাই আমি যখন বলতুম "পয়সা টয়সা দিয়ে আমি খেলি না" তখন বাবা সেটা অবিশ্বাস করত না।

একবার হল কি উর্‌স্ শেষ হয়ে গেলেও গাঁয়ে জুয়োর আড্ডাটি রয়ে গেল। ট্যাঁকে চার আনা পয়সা আছে। ক্ষেতে না গিয়ে হাজির হলুম জুয়োর আড্ডায়। জুয়োর ছক পাতাই ছিল। খেলা খুব জমে উঠেছে। আমি পয়সা ফেলছি যে ঘরে সে ঘরেই জিৎ হচ্ছে। চটপট পয়সা কুড়োচ্ছি। ঝানু খেলোয়াড়ের মতো পয়সা সামনে ফেলে খেলে যাচ্ছি। আমার খেলা দেখতে লোকের ভিড় জমে গেছে। চামড়ার একটা কৌটোতে চিড়েতন, রুইতন সব আঁকা চৌকো ঘুঁটি বারবার নাড়িয়ে উপুড় করে ফেলছে। এরপর আমরা ছবির ওপর পয়সা দিয়ে খেলতে লাগলুম। কৌটো উপুড় করা মাত্র আমি আন্দাজে দুটি ছবি বেছে পয়সা দিয়ে খেলে যেতুম। কি করে আন্দাজটি ঠিক হত সে বলতে পারব না তবে হার কমই হত। বেশীর ভাগই জিতেছি। চারধারে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, যেন ছবি দেখে যাচ্ছে। কৌটোর যে মালিক সে বেচারা বড়ই মুস্কিলে পড়েছে। আমি যে প্রায় দশ বার টাকার খুচরো ওতে জমা করেছি। তখন আমার নেশা ধরে গেছে। আমি আট আনা ফেলে খেলতে লাগলুম। একজন মজুর বৌ সারাদিন খেটে যেখানে আট আনা রোজগার করে, সেখানে আমি কত সহজেই না আট আনা ফেলে খেলে যাচ্ছি। যে সব ঘর আমি ধরছি আর জিতছি, যারা দাঁড়িয়ে

দেখছিল তারাও সে সব ঘর ধরে বেছে নিতে লাগল।

এসব দেখে শুনে জুয়ো খেলার সরঞ্জাম যার তার ছোট ভাই এবার ঘুঁটি নাড়বার জন্যে বসে গেল। তখন থেকেই কিন্তু আমি হেরে যেতে লাগলুম। এবারে আমি ভয় পেয়ে গেলুম, আমার ঘাম ছুটে গেল। একবার দুবার আরও খেলে মনে হল আর নয় এবারে ফিরি। যেতে দেরী হবে। হয়তো বাবা খোঁজে বেরোবে, হয়তো এবার সব পয়সাই যাবে। "আমায় এখন যেতে হবে" এই বলে পয়সা কুড়োতে লাগলুম।

"ওজী, খেলতে রহো, একটা দুটো কেন গড়বড় করছ? এতো তকদিরের খেল," ছোট ভাইটা আমাকে লোভ দেখাতে লাগল। অন্য যারা খেলছিল ওরা ভাবলে আমার জন্যই ওরাও দু পয়সা করে নিচ্ছে তাই ওরাও আমাকে খেলে যেতেই উসকাতে লাগল। আমি আবার খেলায় নামলুম। আবার পয়সা আসে আর যায়। এবার রেগে মেগে এক টাকা লাগালুম। এর মধ্যে হঠাৎ দুম করে কোমরে পড়ল এক লাথি। আমি সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলুম। বাবা এসেছে। লোকেরা দেখছে অবাক হয়ে। আমার সামনে তখনো পড়ে রয়েছে চার পাঁচ টাকার খুচরো। খুচরোগুলো যে গুটিয়ে পকেটে ঢোকাব সেটাও হল না, কারণ তার আগেই কোমরে পড়ল আবার একটা লাথি!

"মাঠে যে আখের গাছগুলো শুকোতে বসেছে তাতে জলটা কে দেবে শুনি?" বাবা ভীষণ রেগে গেছে।

লোকগুলো বাবাকে ধরে থামিয়ে দিলে আমি লাগালুম এক দৌড় সে ফাঁকে। খুচরোগুলো বাবার পকেটেই আশ্রয় পেলে, বাবাই সেগুলো তৎক্ষণে কুড়িয়ে নিয়ে আমার পিছু পিছু আসছে। তখন দশটা বেজে গেছে— সকালে খাবার সময় হয়ে গেছে। মনটা বেজায় খারাপ। তখুনি যদি উঠে পড়তুম তাহলে আর এ দশাও হত না, পয়সাটাও আমারই থেকে যেত। বাবার কাছে আর সেগুলো চাইতে পারলুম না, সে পয়সা হাতছাড়া হলো তো হলই, খুব পস্তাচ্ছি। বাবা হয়তো ভাবছে আমি বাবার পয়সাই চুরি করে জুয়ো খেলতে নেমেছি। বাবাকে কে বোঝাতে যাবে যে ওটা মোটেই সত্যি নয়? এদিকে আবার সিনেমার নেশাও ছাড়তে পারছি না।

এভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। ক্ষেতের কাজে চব্বিশ ঘণ্টা খেটেই মরছি। আগের দিনই ঠিক হত কাল গণপা আর আমি কে কোন কাজটা করব। স্কুলের কথা সবাই ভুলে গেছে। আমারও আর স্কুল নিয়ে কথাটা ফের তোলার মতন সাহস ছিল না। বললে মার খাওয়া ছাড়া আর কিছু জুটত না কপালে। গণপার সাথে রাতে খেতে বসে মাঝেসাঝে মনে হত সিনেমা দেখতে গেলে হত। আমি ওকে আস্তে আস্তে বলতুম, "তুই এগো আমি সিনেমার ছবিগুলো চট করে একবার দেখে আসি। এই গেলুম আর এলুম।"

"না, না মাঠে চল, নইলে কাল সকালে বাপুকে আমি কিন্তু সব বলে দেব," সে আমায় ধমকাত।

সিনেমা দেখা তো দূরের কথা, সিনেমার ছবিগুলোও সে আমাকে দেখতে দেবে

না। বাবা আমার পুরো দায়িত্ব ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছে। রাতে এদিক সেদিক গিয়ে কোনো কিছু হয়ে গেলে গণপাকে বাবা ছেড়ে দেবে?

প্রায় দিন পনের এভাবে কেটে যাবার পর একটা মতলব ভাঁজলুম। গণপার যা কাজ একদিন আমিই সব করে দিতে লাগলুম, এতে যদি ওর মন গলে। মাঠে জল ছেড়ে দেবার পর গোরু মোষদের আমিই খেতে দিলুম। প্রত্যেকটিতে বালতি বালতি করে জলও খাওয়ালুম। ওদের সন্ধেবেলার খাবারের জন্য গাছের পাতা এসব গাছ থেকে আমিই কেটেও আনলুম। সবই গণপার ভাগের কাজ, করে দিলুম আমিই।

সারাদিন এভাবে তোয়াজ করে রাতে খাওয়া দাওয়ার পর মাঠে যাবার পথে কথাটা ওর কাছে আবার পাড়লুম, "গণপা, চল আমরা সিনেমায় যাই। খুব ভাল বই এসেছে।"

"বাপরে ওসবে আমার কাজ নেই। রাতে হঠাৎ করে বাগানে এসে পড়লে? কখন আসবে তার ঠিক আছে? আমায় না দেখতে পেলে পায়ের চটি পড়বে পিঠে আর মাথার সব চুল টেনে ওপড়াবে তা জানিস? ওসব মতলবও করিস না, চুপ চাপ চলো তো বাপু মাঠের পানে।"

"তুই তাহলে যা, আমি একটু হয়ে আসি। তুই দেখিস না দেখিস, আমায় অন্তত দেখতে দে।"

"আচ্ছা, ভাল চাস তো মাঠে চল। রাতে এ বনবাদাড়ে কত সাপখোপ বেরোয় তোর জানা আছে? অন্ধকারে ওদের মাড়ালে তোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাপু আব বৌদি কি ভাববে বল তো? বাপ মায়ের কথাও তো একটু ভাববি নাকি? রাত বেরাতে ঘুরে বেড়াস হেথায় সেথায় ওরা কত ভেবে মরে তা জানিস?"

"আজকের রাতটাই না হয় চল, লক্ষ্মীটি গণপা। আমি আমার টিকিট কাটব, তুই তোরটা কাটবি।"

"পাগল! আমার এসব পোষাবে না বাপ আমার।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? সারা দিন গাধার মতো খেটে পাই তো মোটে বার আনা পয়সা। তা থেকে ঝট করে তিন আনা পয়সা সিনেমার জন্য নষ্ট করলে আমাদের মতো গরীব লোকের চলে, তুই-ই বল?"

আমি বুঝলুম আমার সিনেমা যাওয়াটা গণপার মনঃপূত হচ্ছে না। ও দেখেছে কোনো কোনো দিন এমনও হয়েছে আমরা মাঠের দিকে এগিয়ে গেছি, কিছুক্ষণ পরেই বাবাও এসে হাজির মাঠে আমাদের সঙ্গে সে রাত থাকবে। বাবার মেজাজ গণপার তো আর অজানা ছিল না। আমিই তখন নেহাৎই ছেলেমানুষি করছিলুম। তাছাড়া, অতরাতে অতটা পথ— গাঁয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসা— ঐটুকু বাচ্চার পক্ষে চাট্টিখানি কথা তো নয়। আমাদের মাঠ আর গাঁয়ের মাঝে দু'তিন ফার্লং একেবারে ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ। পথে একটা পুরোনো কেল্লা আর ঘন গাছগাছড়ার ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সে এলাকাটার আবার ভূতের রাজত্ব বলেও বদনাম ছিল। মাসে দু তিনবার নাকি ভূতেদের উৎপাত হতই। গণপার ভয় ওসব ভূতেরা যদি আমাকে ধরে সে তো হবে আরেক ফ্যাসাদ। এ সব ভেবেই ওর ভয়। আমার কথাটা একটু

আলাদা। ভাল বই এসেছে জানতে পারলে আর সে সবের গল্প গলির ছেলেদের মুখে শুনলে আমি অস্থির হয়ে পড়তুম। আমাকে তখন কে ধরে রাখে? সে সিনেমার কথা ভাবতে ভাবতে রাত বারটা অবধি আমার চোখে ঘুমই আসত না।

এরকম যখন চলছে তখন একবার এল প্রভাত ফিলম-এর "সন্ত জ্ঞানেশ্বর"। বইটার কথা আমি অনেক শুনেছি। সারাদিনের ভেতর এসব কথার আঁচ একবারও গণপাকে দিই নি। রাতের খাওয়া সেরে ক্ষেতে একটু তাড়াতাড়িই চলে এলুম। সঙ্গে পয়সা ছিল। পয়সার যাতে শব্দ না হয় তার জন্য ধুতির খুঁটে ভাল করে বেঁধে নিলুম। বাগানে এসে ভড়ং করলুম, "আর ভাল লাগছে না, এবার একটু শুই।" আমার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ার ভান করলুম। গণপা বিছানা পাতলে, পায়ের কাছে কম্বল ছিল। সে বলদগুলোকে রাতের খাবার দিয়ে এসেছে— এবারে ওর হুঁকো নিয়ে বসার পালা— রোজ রাতে যা করে থাকে। শুয়ে শুয়ে আমি ওর ওপর নজর রেখে চলেছি। ইঁদুরেব দল ঘুরছে আর চিঁ চিঁ শব্দ করছে। ভেতর থেকে বাইরে পাথরের চৌবাচ্চা— ওদের রাতের যাতায়াতের পথ।

শিয়রের কাছে ল্যাম্পটা নিবিযে গণপা বিছানায় শুয়ে পড়েছে। ঘর অন্ধকার — সব চুপচাপ। ইঁদুর এবারে গণপার চাদরের ওপর দিয়ে যেতে শুরু করেছে — গণপার তাতেও সাড় নেই। বুঝলুম সে এখন গাঢ় ঘুমে। আমি পা টিপে টিপে বাইরে এলুম নিঃশব্দে বেড়ালের মতন। একটু দাঁড়িয়ে রইলুম,—গণপার রকম সকম বুঝে নেয়া ভাল। না, কোনো সাড়া নেই। আমিও ওখান থেকে নিমেষে চলে এলুম। গাছের ঝোপ অবধি। তারপর এক ছুট। খানিক পরেই থিয়েটারে।

খুব মশগুল হয়ে সিনেমা দেখছি। আমার মতো ছোট ছেলেমেয়েদের কষ্টের কাহিনী —বেশীক্ষণ চোখে দেখা যায় না। আমি ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। আর সেই সঙ্গে ভাবলুম চলে যাই জ্ঞানেশ্বরের দেশে সেখানে গিয়ে ঐ বাচ্চাদের সাহায্য করি গে। সিনেমা যে কখন শেষ হয়ে গেছে খেয়ালই নেই। এক সময় চোখের জল মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলুম। সিনেমার রেশ তখনও কাটেনি, ভাবছি ছবির ঐ বামুন ঠাকুরের মতন বাবাও আমায় জ্বালাতন করে, কষ্ট দেয়, আমিও তাই এ জীবন শেষ করে দিয়ে সব যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাব। আর, নয় তো জ্ঞানেশ্বরের মা-বাবার মতো কুয়োতে বা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরি। জ্ঞানেশ্বরের বাবা-মা তাঁদের ছেলের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, আমি না হয় আমার বাবা-মার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেব। কি বাবা-মাই না পেলুম। অন্য কারো ছেলে হলে কাজে দিত। আর কিছু না হোক আমাকে স্কুলে তো পড়াত, যা পারি ততদূরই পড়তুম। এ সব ভেবে ভেবে গাঁয়ের বাইরে এসে দাঁড়ালুম এক দণ্ড। যতক্ষণ গাঁয়ের ভেতরে ছিলুম, লোকও ছিল আমার সাথে সাথে। তাদের সাথে আমিও চলেছি তাই ভয় ডর ছিল না। এবারে কিন্তু আমি একা, সঙ্গে কেউ নেই, চারধারে সব চুপচাপ। আকাশে এক ফালি চাঁদ দেখা যাচ্ছে— নীচে শুরু হল ভূতের এলাকা। এতক্ষণে কেল্লার ওপরে উঠে ওরা হয়তো গাঁ দেখছে। কুয়োতে যে সব মেয়েরা মরে গিয়ে পেত্নী হয়েছে ওরাও নিশ্চয়ই এখন এই ঝোপঝাড়ের মাঝে বেড়াচ্ছে এসে— পাহারা দিচ্ছে। আমার খুব ভয় হলো।

বাড়ির দিকেই বা যাই কি করে? বাবা তো ঘরেই আছে। তাই ক্ষেতেই ফিরে যেতে হবে, বেঁচেই ফিরি বা মরেই ফিরি। মন শক্ত করে মুখে রাম নাম নিতে পা আমার জোরে জোরে এগিয়েই চলল। আর আমি যেন ফড়িং-এর মতনই হাওয়ায় উড়তে উড়তে চলে এলুম। পুরোনো কেল্লা পেছনে ফেলে, ঝোপঝাড় পেরিয়ে, ঝাঁপ দিয়ে পড়ে মরার কুয়োকে পাশে রেখে, ডুমুরের গাছ আর তলার অন্ধকারের বুক চিরে আমি যেন মোটর গাড়ির গতিতেই এসে পড়লুম। যখন আমাদের কুঁড়েঘরটার সামনে চলে এসেছি তখন একটু থামলুম। এতক্ষণ খুব পেচ্ছাব চেপেছি— সামলাতে না পেরে কিছুটা ধুতিতে, কিছুটা বাইরে সেরে ফেললুম। ঘরে এসে দেখি গণপা শান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। কোথাও কোনো শব্দই নেই। মাথার পাগড়ি, ধুতি, জামা সব খুলে মাথার কাছে রেখে ভাল মানুষের মতো চুপচাপ বিছানায় শুয়ে পড়লুম। শুয়ে শুয়ে মনে হল ভূতের এলাকায় ওদের ওপর টেক্কা দিয়ে পার হয়ে এসে আজ রাতে আমি আমার জীবনে এই প্রথম এত দুঃসাহসের কাজ করলুম।

ভোর হলে গণপার ডাকে ঘুম ভাঙল, "আন্দ্যা, ওঠ বাপ আমার, ওঠ, যতটা জল আছে ছিঁচতে হবে।"

চোখ কচলাতে কচলাতে উঠে চোখে মুখে জল দিলুম। গণপা আপন মনে গোরু মোষগুলোকে লতাপাতাগুলো খাওয়াচ্ছে। খাটালে গোবর শুকিয়ে গোল্লা করা ছিল সেগুলো ঝুড়িতে তুলতে লাগলুম। গণপা কুয়োর দিকে এগিয়ে গেল মাঠে জল ছাড়ার কাজে। মনে হল কাল রাতের ব্যাপারটাও কিছুই বুঝতে পারে নি। সারাটা দিন থেকে থেকেই কাল রাতের ছবির কথা মনে ভেসে আসছে। বাবা, মা, গণপা কেউ সেটা টেরই পেলে না। আমার গোপন কথা আমার মনেই লুকোনো থাকবে —সে যে কি আনন্দ! ভাবলুম, যাক এবার আর চিন্তা নেই। সিনেমা দেখতে যাবার ইচ্ছে হলেই যাওয়া যাবে। বাবা জানতে পারে না, গণপাকে বলা হবে না। ভূত আমায় কিছু করতে পারবে না, ভগবান আমার সহায়।

অবশ্য আমার এ রাত-পালানো সিনেমা দেখা বেশীদিন গোপন রাখা গেল না। তিনবারের বারই ধরা পড়ে গেলুম।

"রাতে কোথায় গিয়েছিলি?"

"কখন?"

"মাঝরাতে?"

"ও! তখন। তখন আমার ভীষণ পেট কামড়াচ্ছিল, তাই পায়খানা করতে গিয়েছিলুম।"

"অত দেরী?"

"পেট কামড়িয়েই যাচ্ছে। থামছেই না। সেই যে বসেছি উঠতেই পারছি না।"

"দেখ আমার কাছে আর মেলা মিছে বকিস না। এর পরে যদি যাস তবে বাপুকে বলে দেব। তখন পিঠের চামড়া তুলে নিলে আমায় বলতে এস না।"

"কিন্তু আমি তো পায়খানায় গিয়েছিলুম।"

"বেশী গুল মারিস না। যা।"

এ প্রসঙ্গ সেদিন এখানেই শেষ হল। আরেকবার ইন্টারভ্যালের পর দেখি গণপা

মূর্তিমান আমার পাশে বসে আছে। আমার দেখা না পেয়ে ভেবে ভেবে চলে এসেছে। সেবারে সিনেমা দেখতে দেখতেই ধরা পড়ে গেলুম। গণপা আমায় নিতে এলে কি হবে, সিনেমা দেখতে দেখতে আমি আবার বাস্তবের সব কিছু ভুলে গেলুম। ছবির চরিত্রগুলোই কাছের হয়ে গেল, যেন কতদিনকার আত্মীয়তা। দেখতে দেখতে মজে গেলুম। মনে হল রোজকার জীবনে এই সব চরিত্রগুলো আমার চারপাশে থাকলে বেশ হত। বাবা, গণপা, মাস্টার, বইয়ের দোকানদার, সবাই বাজে লোক, মিথ্যেবাদী মনে হল। সিনেমার চরিত্রগুলোর মতো ভাল ভাল লোক গাঁয়ে থাকলে বেশ হত।

মাঠে আমার সারাটা দিন অমানুষিক খাটনি ছিল। তাতে কোনো ফাঁক ছিল না। মানসাবাঈ আর হীরাবাঈ সন্ধে হলে মোষ নিয়ে বাড়ির পথে পা বাড়াত। আমি থেকে যেতুম মাঠে গণপার সঙ্গে। সেখানেই ওব সাথে আমিও সারাদিন অবিরাম খেটেই মরতুম। সন্ধেবেলায় গণপার সঙ্গে বাড়ি যেতুম খেতে— এই যা। গণপাও যেত নিজের বাড়িতে রাতের খাবার খেতে। ফিবতি পথে আমাকে নিয়ে যেত পাহারা দিতে দিতে। অনেকটা জেলের কয়েদীদের মতন। ক্ষেত পরিষ্কার রাখা, জল দেয়া, গোরু মোষের জন্য লতাপাতা জোগাড় করা, মাটিতে সার দেয়া, গোবর ঢিবি করা, খাটাল পরিষ্কার করা, কাজ আর কাজ। সারাদিন ঠাসা থাকত কাজে— গা গতর ব্যথায় টনটন করত। বাড়ি থেকে মাঠ, আর মাঠ থেকে বাড়ি এই হল আমার জীবন। স্কুলের ক্লাসগুলো, গলির ছেলেদের সঙ্গ, বইয়েব জগৎ, সিনেমার চরিত্রগুলো — কেউ দয়াবান কেউ বা নির্দয়, নিষ্ঠুর সব আমার থেকে দূরে সবে গেল। আমার জীবন বিস্বাদ হয়ে গেল— ভাবলুম জীবনের শেষ অবধি এরকমই চলবে। অন্য কোনো গতি নেই। বাবা মার কাজে খেটে খেটে মরবার জন্যই যেন এসেছি। এই ক্ষেতেই খাটতে খাটতে জীবন একদিন শেষ হবে। মনে হল আমার অবস্থাটাও বোধ হয় ঘাটগেদের দীনুর মতনই হবে। গায়ে ময়লা বসে যাবে, মাসে একবার কি দুবারের বেশী চান জুটবে না, মাথায় উকুন এসে যাবে। খাটালের গন্ধ, গোবর আর চোনার গন্ধ সে তো গা থেকে যাবার নয়। হাতের নখে সবসময় ভরে থাকবে গোবর, সে হাতেই খেতে হবে। এভাবেই পেটের ভেতর সারাজীবন গোবর ঢুকবে খাবারের সাথে। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের নানারকম চিন্তা এভাবে মনের মাঝে এসে বাসা বাঁধত। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে সবই ভেবে মরতুম। ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি আর কখন যে খেটে খাওয়া শক্ত শরীর বিছানায় পাথরের মতো নিশ্চল অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে জানতেও পারতুম না।

তারপর আবার সেই সকাল, সেই একঘেয়ে পরিচিত ডাক, "আন্দ্যা, ওঠরে, তাড়াতাড়ি ওঠ। ভোর হয়ে গেছে। গোরুমোষগুলোকে লতাপাতাগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি, তুই গোবরগুলো একধারে জড়ো কর, তারপর আমি ঝাড়ু দিয়ে দেব'খন।"

কাক ডাকতেই গণপার এ ডাকে আমার চোখ খুলতেই চাইত না। শরীর চাইত আরো বিশ্রাম। আরো ঘুম। তবুও এই বিরাট মাঠের এককোণে আমাদের এই ক্ষেতটিতে ঘুম ভেঙে উঠে আমাকে বসতেই হত। যে দিনটা সামনে পড়ে রয়েছে, গোরুমোষদের গোবর কুড়িয়ে সেই দিনের কাজের সূচনা তো এখন থেকেই আরম্ভ করতে হবে। আরেকটু পরেই পুরোদমে চলবে আরেকটা ঘানিভাঙার দিন।

দ্বিতীয় ভাগ

এক

গণপাতে আর আমাতে এবার খুব ভাব জমেছে। ওর সাথে একসঙ্গে থাকতে আমার বেশ লাগত। খেতে যাবার পথে গণপা আমায় অনেক গল্প শোনাত। রাজারানীর গল্প, সুয়োরানী দুয়োরানী, রাখাল ছেলের দৌরাত্ম্য, শয়তানের কথা, রাক্ষসীর কথা, আরও কত অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পই না সে আমায় বলত। প্রচলিত লোককাহিনীর ভাণ্ডারটি ওব বেশ ভালই ছিল। আমিও আবার সেই শোনা গল্পগুলো আরও ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে রঙ চড়িয়ে পাড়ার বন্ধুদের বলতুম।

গণপা আমাকে জমি চাষবাসের সব কাজ শেখালে, চাষীদের ব্যবহারের যতরকম সাজ সরঞ্জাম আছে তা দেখালে। বলদ কী করে জুততে হয়, মাটি কেটে কী করে সমান করতে হয়, লাঙল কী করে ধরতে হয়, কিছুই সে বাদ রাখল না।

আমাদের কুয়োটি থেকে জল তোলা মোটেই সহজ কাজ ছিল না। খুব গভীর কুয়োটির জল গ্রীষ্মকালে এত নীচে নেমে যেত যে ওপর থেকে তখন কিছুই দেখা যেত না। গাঁয়ের লোকেদের বিশ্বাস এ কুয়োটাতে ভূত-পেত্নী অনেক কিছু আছে। মাঝে মাঝেই ওরা জ্যান্ত মানুষ পাবার জন্য অস্থির হত। তখনই শ্বশুরবাড়ির লাঞ্ছনায় অতিষ্ঠ বধূরা, স্বামীর অত্যাচারে অস্থির স্ত্রীরা এই কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে সব যন্ত্রণার অবসান করত। গাঁয়ের শেষ সীমান্তের এই কুয়োটাকে আমি মনে মনে খুবই ভয় করতুম। কখনো সখনো ছেলেরাও চান করতে এসে নাকি মরেছে এ কুয়োতে। দু তিন বছর বাদে বাদে মানুষ মেরে এর খিদে মেটে— জনশ্রুতি মোটামুটি এরকমই। এবার সেই তিন বছর হতে চলেছে। কুয়োটাকে নিয়ে যে সব গল্প গাঁয়ে চলতি ছিল আমি সেগুলো মনে প্রাণে বিশ্বাস করতুম। ওটা যেন রহস্য দিয়ে ঘেরা ছিল। গ্রীষ্মকালে ঐ গভীর রহস্যময় কুয়ো থেকে জল তোলা সত্যি সত্যি বেশ শক্ত কাজ বলেই আমার মনে হত।

"তুই আবার আগ বাড়িয়ে জল তুলতে যাস নি," বাবা আমায় সাবধান করে দিত।

"কেন?"

"ঐ তো অতটুক প্রাণ। তোর ঐ হাত দিয়ে দড়িও টানতে পারবি না। আস্ত পবানটাই বেরিয়ে যাবে। কুয়োটা কেমন সে তো তুই জানিস না। জল তুলতে গেলে ভাল সাঁতার জানতে হয়। অত তাড়াহুড়োর দরকার নেই। টিকটিকির মতো থেঁতলে যাবি।"

বাবা কথাটা মিথ্যে বলে নি। শুধু আমাকেই নয়, গণপাকেও বাবা সাবধান করে দিয়েছে। আমাকে কুয়ো থেকে দূরে রাখার হুকুম দিয়েছে। গণপা ভেবে দেখলে আমার যদি মাঠের কাজে একবার মন বসে যায় তাহলে আর আমি এদিক-সেদিক যাব না। তাহলে মারও খেতে হবে না। তাই ও বেচারা চাষবাসে আমার উৎসাহ বাড়াবার

চেষ্টায় লেগে থাকত। খেতের কাজে নামলেই আমিও গণপার পিছু পিছু ঘুরতুম, শিখব বলে। আখের খেতে জল দেয়া আর এমন কি শক্ত কাজ? জল দেবার ভারটা ছিল গণপার ওপর। সেই এ মাঠের সর্বেসর্বা। আখের জল ছাড়তে গেলে জলকাদার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধৈর্য ধরে দাঁড়াতে হত। মাথার ওপর কড়া রোদ, আর পায়ের তলায় কেবলি জল আর কাদা।

জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো অসাড় হয়ে যেত। গাছ মাথা-সমান উঁচু হয়ে গেলে আর এক বিপদ হত। শেয়াল বনবেড়াল সাপ বা এ ধরনের বন্য পশু হঠাৎই মুখের সামনে এসে খাবার ভয়টা সব সময় থেকেই যেত। গরমের সময় রোদের তাতে মাটি যখন ফুটিফাটা, তখন সে মাটিতে জল ঢুকলে মাটির ভেতর থেকে কি সব বিছে তরতর করে গা বেয়ে বেয়ে প্যান্টের ভেতরে কখন যে ঢুকে যেত টেরই পেতুম না। একবার তো এরকম হল, জামার ভেতরে ঢুকে হাতে, পিঠে, কোমরের নীচের দিকে তিন জায়গাতেই কামড়ালে। জামার ভেতরে কী নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে দেখার জন্য ঝেড়ে দেখতে গিয়ে দেখি, ওমা! হাত ফুলে ব্যথায় টনটন করছে। গোড়াতে আমি ভাবলুম সাধারণ পিঁপড়ে টিপড়ে হবে। বিছেটা ততক্ষণে হাত থেকে পিঠে সরে গেছে। আমি যেই সেখানে হাত দিয়েছি অমনি সেখানেও ব্যথায় টনটন করতে লেগেছে। আমি তো সেখানেই প্রায় আধমরা হয়ে গেছি। বুঝতেই পারছি না কি হয়েছে। একবার ভাবলুম পেছন থেকে জামাটা টেনে ফেলি। সেটা করতে গিয়ে আরেকবার কামড়ালে। দেখতে দেখতে বেশ আরও বারকতক কামড়েই গেল। এবার আমি মরিয়া হয়ে গেছি, বিছে বা যাইহোক ওটাকে বার করবই, এই ভেবে হাত চটকে শেষ করতে গিয়েও হালকা একটা কামড় খেলুম। আর পারা গেল না, আমি ছুটে গণপার কাছে চলে গেলুম মাঠের একেবারে শেষ দিকে, "গণপা, দেখত আমার পিঠে কি কামড়ালে। খুব ব্যথা কচ্ছে," কাঁদতে কাঁদতে গণপাকে বলি।

গণপা জামা তুলে একটা কুচকুচে কালো বিছে বার করল। জামাটা ঝেড়ে ফেলে চাবুকের হাতল দিয়ে বিছেটাকেও শেষ করলে। এদিকে বিছের নাম শুনে দারুণ ভয় হল। হাতগুলো অবশ হতে চলেছে, যন্ত্রণাও ক্রমেই বাড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে হাতে পিঠে। হাত-পা ছুঁড়ে কান্না জুড়ে দিলুম— এত যন্ত্রণা হল। মাঠে তখন গণপা আর আমি। গণপা জলের দড়ি হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে পিঠে করে নিয়ে হাঁটা দিলে। আমার চিৎকার আর কান্না দেখে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে গেল।

"কি হয়েছে রে?"

"বিছে কামড়েছে," গণপা জবাবে বলে।

"ওরে বাবা! বিছে? ক'টা?"

"বিছে একটাই। কামড়েছে তিন চারটে জায়গায়।"

"কী সব্বনাশ!" ওরা আমার অবস্থা করুণ চোখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে।

ওভাবেই আমাকে মেথরদের পাড়ায় টেনে আনলে গণপা। বণ্ডা মেথর বিছের কামড় সারাবার টোটকা ওষুধের খবর রাখত। ওর বাড়িতে গিয়ে দেখি ও গাঁয়ে গেছে। ওর বৌ হাঁড়িকুড়ি বাক্সপেটরা খুঁজেও ওষুধটা পেলে না। এক ছেলেকে পাঠালে আমার

বাড়িতে খবর দিতে আর এক ছেলেকে পাঠালে বাজারে বগুাকে খুঁজতে। আমাদের ঘর তো কাছেই ছিল। মা এল ছুটে। ভয়ে মা বেচারার আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। ততক্ষণে বগুা মেথরও চলে এসেছে। ও এসেই কি যেন একটা পাতা হাতে কচলে নিয়ে আমাকে শুঁকতে দিলে। পাতা শুঁকতেই হাঁচতে লেগে গেলুম আর বিছের বিষের তেজও কমতে লাগল। হাত আর পিঠ যে অসাড় হয়ে গিয়েছিল সেটাও কমতে লাগল। তবে যেখানে যেখানে কামড়েছিল সেখানে তখনও বিষম ব্যথা। বগুা কামড়ের জায়গাতেও ওষুধ লাগিয়েছিল কিন্তু তাতে ফল হয় নি। ব্যথা কমল না, মেথরদের পাড়ায় লোকের ভিড় হয়ে গেল।

মা আমাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে গরম চা খাইয়ে শুইয়ে দিলে। বাবা বাড়ি ফিরেই সব শুনে প্রথমেই আমাকে এক চোট গাল দিয়ে দিলে, "এত কুচকুচে কালো একটা বিছে জামায় উঠে গেল আর তুই তা দেখতে পেলি নে? চোখের মাথা খেয়েছিস নাকি, হতভাগা?" বলে রেগেমেগে মাঠে চলে গেল। গণপা গেল পিছু পিছু।

খেতে জল পড়ে নি— সব যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। জল দিতেই তো যাচ্ছিলুম— আর তখনই তো এ কাণ্ড হল। বিছে কামড়াবাব ফলে সেদিন কিন্তু আমি বিশ্রাম পেলুম। সন্ধে হতে না-হতেই আমি গলিতে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে চলে গেলুম। কতদিন পর যে খেলতে এলুম তার ঠিক নেই। বিছের কামড় খেয়েছি তার জন্যে মনে মনে খুশিই হলুম।

কুয়োর দিকে কাজ করলে সারাদিন একাই কাটত। কেউ কোথাও কথা বলার ছিল না। ভীষণ একঘেয়ে লাগত। যেদিক দিয়ে নালায় জল বয়ে যেত, সেদিকটায় কিন্তু অনেক লোকের যাতায়াত ছিল। কেউ কাপড় কাচত, কেউ বা ঝোপের ভেতর দিয়ে যাবার পথে রুটি খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে জল খেয়ে যেত। রাখাল ছেলেগুলোও আসত জল খেতে, সনগররা আসত কাপড় কাচতে। জলের এ দিকটায় লোকের যাতায়াত লেগেই থাকত। এদের সঙ্গেই কথা কইতে কইতে হেসেখেলে গণপা মাঠে জল ছাড়ত। এই জলের পথের ওপরেই ছিল ডুমুর গাছের ঘন শীতল ছায়া। গণপাকে আমার মতন জলে কাদায় হাত পা ডুবিয়ে থাকতে হত না। ভিস্তি ঝট করে ভরে যেত বলে আমার এক মুহূর্তও বসবার উপায় ছিল না। জল মাঠে ছাড়তে হত। আমি যদিও জলের মধ্যেই দাঁড়িয়েই থাকতুম তবুও তেষ্টায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। নীচের জল ছিল ঘোলাটে কাদা মেশানো, সে জল খাবার উপায় নেই। এদিকে গণপার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোকেরা ওকে পান খাওয়াত। তাই তো আমি খেতে জল ছাড়ার দায়িত্ব নেবার জন্য খুব উসখুস করতুম। দিব্যি খেতের মালিক হয়ে গ্যাঁট হয়ে থাকব। মুখে থাকবে পান। যারা আসবে যাবে, তাদের সাথে কথা বলব। গোরুমোষেদের নিজের হাতে রেখে সামলাব। এজন্য আস্তে আস্তে আমি জল ছাড়ার সব কায়দাটা শিখে ফেললুম। জল ছাড়তে গিয়ে কুয়োতে ঝুঁকে জলের মাপ দেখতে হত। কুয়োতে পড়ে গেলে তো আবার সাঁতার কাটতে হবে। তাই তো গণপা যখন চান করতে কুয়োতে চলে আসত তখন আমিও ওর পিছু পিছু চলে আসতুম। সাঁতার শেখাবার জন্য ওকে পীড়াপীড়ি করতুম।

সেবার গরমের সময় জল বেশ নীচে নেমে গেছে। গণপা আর আমি জলে নামব। আমি ধারে বসে থেকেই ভয়ে ভয়ে একটু ডুব দিয়েই উঠে পড়তুম। একদিন গণপা বললে, "চল, তোকে জলের মাঝখানে নিয়ে ডুব দিয়ে আনি। তোকে কোমরে ধরে থাকব। আমি জলে সাঁতার কাটতে গিয়ে কেমন হাত-পা ছুঁড়ে দেখবি চল। আগে হাত-পা ছুঁড়তে শেখ দেখি।" আমি রাজী হয়ে গেলুম। গণপা আমার বগলের তলা দিয়ে হাত গলিয়ে আমাকে ধরে রাখলে। আমি জলের ধার থেকে আস্তে আস্তে জলে নামতে লাগলুম। জলে পা পড়তেই আমি ভয় পেয়ে গেলুম। গণপা সেই থেকে আমাকে হাত-পা ছুঁড়তে বলেই যাচ্ছে, আমি ভয়ে ওসব হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি কিছুই না করতে পেরে শেষে ওকে জড়িয়ে ধরতে গেলুম। হয়তো আমাকে ভয় দেখাবার জন্যই হবে— গণপা আমার বগলের তলার হাত ছেড়ে দিল। ব্যস্। এক নিমেষে জলের মধ্যে ডিগবাজী খেয়ে পড়ে গেলুম, নাকে মুখে জল ঢুকে গেল, লাগালুম এক চিৎকার।

"ওরে চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি তো আছি। চুপ কর। আমি কি তোকে ডুবতে দেবরে বোকা?"

গণপা আবার আমার বগলের তলায় হাত দিলে। আমি সাঁতরাতে পারব বলে বিশ্বাস হল না, ওপরে উঠে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি লাগিয়ে দিলুম।

"মেয়েছেলেদের মতো ভয় পেলে সাঁতার শিখবি কি করে? বুকে সাহস চাই, বুঝলি?" গণপা আমায় ঠাট্টা করলে।

"কাজ নেই আমার সাঁতার শিখে। কোমরে কিছু না বেঁধে আর আমি জলে নামছি না," আমি বললুম।

পরের দিন গণপা ওর কাজগুলো আমার ওপর চাপিয়ে দিয়ে লেগে গেল দুপুরে সাঁতার শেখাবার সময় আমার কোমরে যা বাঁধবে সেটা বানাতে। একটা গামছা দিয়ে গোলমত একটা জিনিস তৈরিও করে ফেললে। ওটা কোমরে বেঁধে আমি জলের মধ্যে হাত-পা ছুঁড়তে শিখলুম। আস্তে আস্তে সাঁতরাতেও লাগলুম। এমনিতেও কুয়োর জল তো তলানিতে এসেই গিয়েছিল। সেজন্যই বোধহয় দিন পনেরর মধ্যেই কোমরে ওসব কিছু না বেঁধেই আমি কুয়োর এক দিক থেকে অন্য দিকে সাঁতরে পার হতে পারলুম। কুয়োর জল আমার খুব পরিচিত হয়ে গেল। ওপর থেকে যেটাকে অন্ধকার ভয়ের বলে মনে হত, দারুণ গরমের মধ্যে সেই নীচের জলকে কত স্নিগ্ধ শীতল বলেই না মনে হল। কুয়োটাকে আমার খুব নিরীহ মনে হতে লাগল। আমি জলে খেলতে শুরু করে দিলুম। কোনো দুষ্টু আত্মা, কোনো ভূতপ্রেত আমাকে কিছু ক্ষতি করত না। যেমন অন্য জায়গার জল হয়, কুয়োর জলও তেমনি জলই মনে হল, তলার মাটিও অন্য মাটি যেমন হয় তেমনি মাটি বলেই মনে হল। এই কুয়ো কখনই আমাকে বিপদে ফেলে নি, সে আমার অতি আপনজন, আমার আর এক মাসি হয়ে গেল।

জুন জুলাই মাসে বর্ষার ঢল নামলে কুয়োর জলও উঠতে লাগল। এ সময়ে একদিন গণপা আর আমি চান করছি। হঠাৎ গণপা আমায় তুলে জলের মাঝখানে নিয়ে ঠেলে

ফেলে দিলে। আমার সাহস বাড়াবার জন্যই সে এ কাজ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। যাক গে, আমি দিলুম এক চিৎকার। ভাবলুম বুঝি মরেই গেছি। কিন্তু জলে পড়ে আবার ওপরে উঠে এলুম। হাত-পাও ছুঁড়তে লাগলুম। গণপা তো ছিল আমার পাশেই, হাসছিল আর জল দুহাতে সরাচ্ছিল। আমাকে জলে ফেলে দিয়ে সে নিজেও জলে নেমে এসেছিল। আমাকে জলে ফেলে দিয়ে সে নিজেও জলে নেমে এসেছিল। কুয়োর জল যখন বেশ উঠেছে তখন গণপা একটা জায়গা থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ত। এবারে ডাঙায় উঠে আমার মনে হল আমিও এখন ওরই মত ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়তে পারব। এত উঁচু থেকে জলে পড়ে গিয়েও যখন ডুবে মরিনি তখন নিশ্চয়ই পারব। দু এক দিন পরেই সেখান থেকেই জলে ঝাঁপ দিতে লাগলুম আর সেই সঙ্গে জলেতে গণপার সাথে লুকোচুরিও খেলতে লাগলুম। শেষে এমন হল জলে যাবার জন্য অস্থির হয়ে যেতুম, কেবলি মনে হত জলে কখন যাব।

আমি সাঁতার শিখেছি বাবাকে জানানো হয় নি। বাবা জানলে সাঁতার শিখতেই দিত না। সপ্তাহ তিনেক পর একদিন কুয়োতে চাকাটা পরে গেলে বাবাকে বললুম, "আমি ওটা তুলে আনি গে, আমি তো সাঁতার জানি।" বাবা গোড়াতে তো বিশ্বাসই করতে চাইলে না, পরে সব জানতে পেরে গণপার ওপর ভীষণ রেগে গেল। গণপা আবার উল্টে বাবাকেই দু কথা শুনিয়ে দিলে, "তা, এখন না শিখলে কবে আর সাঁতার শিখবে? চাষীর ঘরে ছেলেরা সাত আট বছর হলেই সাঁতার শেখে। আর আন্দ্যার তো এগার চলছে। তোমার হাতে থাকলে তুমি কি আর এখনও ওকে সাঁতার শেখাতে? না কি বয়স বেড়ে গেলে ওরই জলে নামতে সাহসে কুলোত? ব্যাটাছেলে যদি সাঁতারই না জানল তবে তো আর জনমটাই মিছে হয়ে গেল।"

গণপা ঠিকই বলেছে। বাবা কখনই আমাকে সাঁতার শেখাত না। ঘর থেকে খেতে আসতে যেতে যে সব গল্প শেষ হত না, তার শেষটুকু রাতে শুয়ে শুয়ে গণপার কাছে শুনতুম। কখনও কখনও সে পাড়াগেঁয়ে ভাঁড়ামিও করত। কখনও বা ঘরের সামনে একাই বসে বসে যে বালতিটার তলায় নতুন টিন লাগানো হয়েছে তাতে একটু জল ঢেলে সেটাতে বাজাত ঠুকে ঠুকে। লোকগীতি গাইত, শাহ্‌মহারাজের কথা গাইত।

ছেলেবেলায় যখন সে মোষ চরাতে মাঠে যেত তখন নাকি কোন এক ভিখিরির কাছে এ গান সে শিখেছে। একটা করে লাইন গাইত আর গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত নাকি নাকি শব্দ করে বালতি ঠুকে তাল দিত। রাতে মাঠের কাজ যখন সব শেষ, ওর তখন গায়ে তেল মেখে পঞ্চাশবার ওঠ বোস করার পালা শুরু হত। এতে ওর শরীর মজবুত থাকবে। আমি তো ওর কাছে কাছেই ঘুরঘুর করতুম। ও হয়তো কোনো কাজে লেগে আছে, আমি সেই ফাঁকে বালতিতে জল ভরে ওর মতো করে বাজাতে চেষ্টা করতুম। আমি তখন সিনেমার গানও গাইতে শিখেছি। ওর মতন নাক দিয়ে অদ্ভুত আওয়াজ করতে চেষ্টা করতুম।

সারাদিন গণপার সঙ্গেই কাটিয়ে দিতুম বলে শুধু যে ওর গানবাজনার দিকটাই নকল করে শিখতে চেষ্টা করতুম তাই নয়, চাষবাসের সব কাজও আমি ধীরে ধীরে

ওর কাছ থেকে শিখে নিলুম। জমিতে কী করে সার দিতে হয়, লোহার কাস্তে কী করে ধরে, চাষীদের যন্ত্রপাতি কী করে লাগাতে হয় সবই আমার শেখা হয়ে গেল গণপার কাছ থেকে। এখন চাষের কাজ করতে আমার ভালই লাগত। রাতে ভূত পেত্নীদের জায়গার ভেতর দিয়ে, ঝোপঝাড় কাটিয়ে, জমিতে, খেতে টহল দিয়ে বেড়াতুম। গণপাকে দেখেই আমার সাহস বেড়ে গেল। এখন আমি বলদ ধরতে পারি, একা একা গোরুর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারি। খেতে জল ছাড়ার কাজ ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেরে ফেলছি। কাজের সময় গোরু মোষগুলোর ওপর, মাঠ থেকে তোলা ফসলের ওপরেও আমার মায়া পড়ে গেল। জমির সেই সবুজ প্রাণবন্ত ডুমুর গাছটাকে আমার ঠাকুরদা বা তারও আগের কোনো পূর্বপুরুষ বলে আমি ভাবতে লাগলুম। আমার থেকে থেকে কেবলি মনে হত কখনো সখনো দাদু যেমন নাতিকে সবসময়ই স্নেহভরা দৃষ্টি দিয়ে দেখে, ঐ ডুমুরগাছটিও যেন আমাকে প্রতিনিয়ত তেমনি দৃষ্টি দিয়েই ঘিরে রাখছে।

দুই

সে বছর খুব অল্পই বৃষ্টি হল। দুর্ভিক্ষের ছায়া যেন পড়তে শুরু করেছে সেবার। শ্রাবণ শেষ হতে চলল, কিন্তু তখনও মোটে একমাথা জল। কুয়ো থেকে জল ছাড়া হয়েছে মাঠে। আগের দিন সন্ধেবেলা মা আর ভাইবোনে মিলে ঘুঁটে তুলেছি গোরুর গাড়িতে। সে গাড়ি নিয়েই গণপা চলেছে বাড়ির দিকে। ঘুঁটে নামিয়ে খালি গাড়ি নিয়ে সে ফিরবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া। বাবা আগের দিনই বুঝিয়ে দিয়েছে আজ এভাবেই কাজ চলবে। খেত থেকে বাড়ি চার ফার্লং দূর। তার মাঝে গাঁয়ে গিয়ে গাড়ি আবার ফিরতে ফিরতে ঘন্টাখানেক লাগবে। বাবাও গণপার সঙ্গেই গেছে। আমি একা খেত পাহারা দিচ্ছি। গাড়িতে যখন বলদ জুতছে তখন গণপার ছোট ভাই রামা ওর দাদার ভাখরী নিয়ে চলে এসেছে। ওর সাথে ওর ভেড়ার বাছাটাও আছে। ঘন্টা দুই একটা খেতের ধারে ভেড়াটার বাচ্চাটাকে চরিয়ে রামা বাড়ি ফিরত। ওকে দেখে গণপা বললে, "ভাখরী রেখে একটু বোস, আমি এই ঘুরে এলুম বলে।"

রামাকে দেখে আমি খুব খুশি। ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কানহেরি গাছের বিচি দিয়ে খেলা যাবে মনে মনে এই ভাবছি। খেলার ছকটা এঁকে ফেলে খেলতে লেগেছি, ভেড়ার ছাড়া তার নিজের খেয়ালে চরে বেড়াচ্ছে। এবার আমসা আমার ভাখরী নিয়ে এসে হাজির।

"আন্দ্যা, খাবি আয়।"

"এক জায়গায় রেখে দে, গণপা এলে একসঙ্গে খাব," খেলায় মশগুল হয়ে আছি তখন, খাবার ফুরসৎ নেই। রামা একবার দান দিচ্ছে, একবার আমি। আমসা নিজের মনে কী যেন করছে, আখের খেতে একবার যেন ঘুরেও এল মনে হল। আমাদের খেলা এদিকে তখন খুবই জমেছে।

হঠাৎ আনসা আমার কাছে এসে একটা ছোট্ট কাপড়ের পুঁটলি দিয়ে বললে, "নে, এটা রাখ।"

"ওখানে রাখ না! ওতে কি এনেছিস?" আমি ভেবেছি মা বুঝি আমার জন্যে বাদাম আর গুড় পাঠিয়েছে।

আনসা কিন্তু বললে, "ওতে তরকারী আছে।" পুঁটলিটি খেতে জলের নালার ধারে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে রইল। আনসা কাপড়ে বাঁধা ভাখরী নিয়ে কুয়োর দিকে চলেছে। ওর চোখ দেখে কেমন যেন লাল মনে হল। কিছুক্ষণ আগে হয়তো কেঁদেছে। আমি ভাবলুম মার খেয়ে থাকবে। মা ঠেঙাত বাচ্চাদের, বাবা আমাকে। এ তো রোজকার ব্যাপার। আমি তাই এ নিয়ে ওকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে খেলায় মেতে রইলুম। আমার লক্ষ্য এখন কি করে খেলায় জিতে বিচি কেড়ে নেয়া যায়। তাও ওকে কুয়োর দিকে যেতে দেখে একবার জিজ্ঞেসও করলুম, "ওদিকে কোথায় চলেছিস?"

"কুয়োয় গিয়ে গোবর কুড়োব, ঘর নিকোতে হবে।"

মা মোষের গোবর ঘর নিকোতে ব্যবহার করত না। গোরুর গোবরও তাজা হলে তবেই কাজে লাগাত, বাসি হলে বড্ড গন্ধ বেরোত তাতে পোকাও হত। তাছাড়া বাসি হয়ে শুকিয়ে গেলে তা দিয়ে ভাল করে নিকোনও যেত না। আমি ভাবলুম আনসা বোধহয় বলদের তাজা গোবর আনতে চলল। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন ও আর ফিরে এল না তখন আমার মনে সন্দেহ জাগল।

"এই রামা, আনসা এখনও ফিরল না কেনরে? গোবর কুড়িয়ে কুয়োতে হাত টাত ধুতে গেল নাকি কে জানে? চল তো দেখি গে পা পিছলে পড়েই গেল নাকি ভেতরে?"

খেলা ফেলে আমরা ছুটে চলে গেলুম। রামার পিছু পিছু আবার ওর ভেড়ার বাচ্চাও ছুটছে। সে বেচারা হয়তো ভাবছে ওর মালিক ওকে ফেলে কোথায় ছুট দিচ্ছে?

কুয়োর কাছে গিয়ে দেখি খাবার পুঁটলি তেমনি পড়ে আছে। আমি চট করে একবার কুয়োতে ঝুঁকে উঁকি দিয়ে দেখে নিলুম। আনসাকে দেখতে পেলুম। ও জলের মধ্যেই ছিল। ওর খোলা চুল জলের ওপর ভাসছিল। কাপড়ে হাওয়া ঢুকেছে, আঁচলও ভেসে উঠেছে। কাপড়ে হাওয়া ঢুকেছে বলেই আনসা ডোবে নি, জলেতে ভাসছিল।

"এই আনসা এ কী করছিস," এই না বলে আমি খুব জোরে কাঁদতে লেগে গেলুম আর গায়ের জামা পরনের ধুতি চট করে খুলে নীচে কুয়োর মধ্যে নাবলুম। ওদিকে ওপরে দাঁড়িয়ে রামা তখন চেঁচিয়েই যাচ্ছে, "তাড়াতাড়ি কর আন্দ্যা, তাড়াতাড়ি।"

জলে নেমেই আমি আনসার কাপড়ের আঁচল আর চুলের মুঠি ধরে ওকে টেনে কুয়োর পারে এনে হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখলুম।

"কি করছিস আনসা?"

"আমায় ছেড়ে দে আন্দা। খেটে খেটে মরে যাচ্ছি, আমি আর বাঁচতেও চাই না, তুই আমায় ছেড়ে দে।"

আনসা নিজের হাত আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে জলের দিকে ঝুঁকতে লাগল। আমি আবার নতুন করে চেঁচাতে লেগে গেলুম, "ওরে জলে পড়িস না রে, জলে পড়িস না," বলে ওকে কেঁদে কেঁদে মিনতি করে বলে যেতে লাগলুম। কাঁদতে কাঁদতেই রামাকে বললুম, "তুই ছুটে বাড়ি যা তো, বাবা-মাকে ডেকে নিয়ে আয়।" ভেড়ার বাচ্চাটাকে এক কোণে বেঁধে রেখে রামা সঙ্গে সঙ্গে দিলে এক ছুট। আমি আনসাকে ধরে কুয়োতেই বসে রইলুম। এবার আমাদের দু ভাই-বোনেরও একসঙ্গে কাঁদার পালা। গোবর ফেলে এসেছে, গাড়ি তাই হালকা, বাবা তাতে বসে ঝড়ের বেগে চলে এল। সঙ্গে আছে গণপা আর গলির আরও দু-তিনজন। মাও পিছু পিছু ছুটছে আর কাঁদছে, "ওরে কি সব্বনাশ হলরে আমার, আমার ছেলেমেয়েরা কুয়োতে পড়ে গেল রে।" দুহাত দিয়ে বুক চাপড়াচ্ছে, কাঁদছে আর ওদের পিছু পিছু ছুটে চলেছে। মার পিছু পিছু গলির সব বউ আর মেয়েরাও ছুটে এসেছে, ওরা ভেবেছে আনসাকে বাঁচাতে গিয়ে আমিও ডুবে মরেছি। বাবা গাড়িতে এসেছে, তাই বাবাই সবার আগে এল। গণপা তারপরে এল, গাড়ির বলদগুলোকে খুলে বেঁধেটেঁধে ধীরে

সুস্থে। ততক্ষণে মা আর অন্যসব বউমেয়েদেরও ভিড় লেগে গেছে কুয়োর ধারে। এত লোক দেখে আনসা এবার আমার সঙ্গে ওপরে উঠে এল। আমি তখনও ওর হাত ছাড়ি নি। আমাদের জ্যান্ত চলে ফিরতে দেখে বাবা-মার মুখে এতক্ষণ বাদে একটু হাসি ফুটে উঠল। যেই ওপরে উঠলুম অমনি মা ঝট করে আমায় বুকে টেনে নিয়ে আনসাকে চিৎকার করে বললে, "ওরে রাক্ষুসি, তুই আরেকটু হলে আমার ছেলেকে মেরে ফেলতিস। দুটো একটা থাপ্পড় মেরেছি তাতেই তোর এত রাগ?" বলেই মা আনসার পিঠে লাগালে দু ঘা। এই দেখে বাবা গেল রেগে আর মাকে মারতে শুরু করে দিলে।

"এখনও তোর হাত নিশপিশ করছে, হারামজাদী? এখনও তুই মারছিস মেয়েটাকে?" এক বুড়ি পিসি মাকে বাবার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলে।

"নে কাপড়টা পর," গণপা আমার ধুতিটা এগিয়ে দিলে। এতক্ষণ পর আমার খেয়াল হল গায়ে আব্রাব কিছুই নেই। লজ্জায় আমি আর তাকাতেই পারলুম না, কোনোমতে ধুতিটা কোমরে জড়িয়ে নিলুম।

আনসা ওদিকে সবার মাঝখানে ভেজা কাপড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কাঁদতে কাঁদতে ওকে জড়িয়ে ধরে কাপড়ের জল গায়েই নিংড়ে দিতে গিয়ে মার খেয়াল হলো মেয়ের গায়ে তো কোন গয়না নেই। জিজ্ঞেস করলে, "গয়না কি করলি?" আনসা আমাকে দেখিয়ে বললে, "আন্দ্যাকে দিয়েছিলুম।"

"কখন?" আমি তো হতভম্ব।

"কাপড়ের পুঁটলিটায় ছিল তো।"

আমার ততক্ষণে মনে পড়েছে। আমি আর কোনো কথা না বলে আখের খেতের দিকে দিলুম এক দৌড়। সেখানেই তো আমরা খেলছিলুম। তরকারির সেই পুঁটলিটা এখনও সেখানেই পড়ে আছে। ভাগ্যিস ওটার ওপর কারো নজর পড়ে নি। তাহলে আর দেখতে হতো না। আনসাকে আর আমাকে বাবার হাতে মার খেতে খেতেই মরতে হত। পুঁটলিটা খুলে দেখি তাতে আছে কানের ফুল, গলায় মার দেয়া হার, পায়ের চুটকী আর মঙ্গলসূত্র।

গণপা বাদে আমরা সবাই বাড়ি ফিরে এলুম। মা আমাকে আর আনসাকে ঠাকুর প্রণাম করতে বলে আমাদের গায়ে ঠাকুরের পুজোর ধুনোর ছাই লাগালে। তারপর আমাদের দুজনকেই খাওয়ালে পেট ভরে। আমরা খাচ্ছি, মা ঠাকুরকে অভিমান করে কটু কথা বলে যাচ্ছে, আবার আনসাকেও এরই মধ্যে একটু উপদেশও দিচ্ছে।

আসল ব্যাপারটা জানা গেল পরে। লোকজন আসছে, খোঁজখবর নিচ্ছে, হঠাৎ কী'ই বা এমন ঘটে গেল? তখনই জানতে পারলুম কী হয়েছিল। আনসিকে ভাখরি করতে বলে মা চলে যায় রেশন আনতে। ফিরে এসে দেখে আনসি সব ভাখরি তখনও করে নি। এতগুলো লোক খাবে এ ক'টা ভাখরিতে হবেটা কি? মার রাগ হ'ল, আনসি বসে ছিল, ঐ অবস্থাতেই দেয়ালে ওর মাথা ঠুকে দিয়ে লাগালে এক চড়। আনসি বেচারার দোষ নেই, হয়তো বুঝে উঠতে পারে নি আমাদের ক'খানা ভাখরি লাগতে পারে। হয়তো বা ভাখরি করতে করতে হাত ওর ব্যথা হয়ে গিয়েছিল

তাই সে থেমে গিয়েছিল। এসব জানার বা বোঝার চেষ্টা করার সময় কোথায় মার?

রাতে খেতে খেতে বাবা মাকে বললে, "ভালই হয়েছে, গণপা ছেলেটাকে সাঁতার শিখিয়েছে, নইলে আজ আর ছেলে মেয়ে দুটোকে পাওয়া যেত না।" সেদিন মার চোখের জল আর শুকলোই না। চোখে জল নিয়েই বসে রইল।

চার-পাঁচ দিন পর মা ছোটমামাকে ডেকে পাঠালে। বিয়ের পর মামা কিছুদিন এদিক্-সেদিক করে ফের গুজরাদের জমিতে ট্রাকটর চালাবার কাজ নিয়েছিল। বেশ আরামের চাকরি। মা ছোটমামাকে বললে, "লিঙ্গাপ্পা, এই নে তোর বৌ। এ ক'টা বাসন নে, এ ক'টা কৌটোও নে। এতে যা চাল, জোয়ার আছে তাতে তোদের দিন চারেক চলে যাবে। তোর বৌ এখন বড় হয়েছে, সে এখন আর আমার শাসন মানবে না, আমার কাছে থাকবে না। কোনো সময় মাথা ঠিক না থাকলে আমি হয়ত রেগে গিয়ে দু এক ঘা লাগাব আর বৌ তোমার অমনি মান করে কুয়োর জলে দেবে ঝাঁপ। আমি পড়ব ফ্যাসাদে। তার চেয়ে তোমার বৌ তুমি সামলাও। যেখানে খুশি তোমরা থাক গে। তুই তো আর আগের মতন ছোটটি নেই যে আমি তোর বৌকে তোর হয়ে আগলে আগলে রাখব আর তুই গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবি। তোর এখন সংসার পাতার বয়স হয়েছে, আর চাকরিও তুই ভালই কচ্ছিস, খারাপ তো নয়। সাতদিন গেলে হপ্তা তো ঠিকই পাস। তাছাড়া, ধান শাক-সব্জি, জ্বালানি কাঠ যখন যেমন হয় তা থেকেও অল্পস্বল্প ভাগ পাবি। দুজনে ওখানেই মাটি আঁকড়ে পড়ে থাক। বৌ নিয়ে ওখানেই ভাল থাক পর, খাও দাও।" এ সব অনেক উপদেশই মা মামাকে দিলে, মামাও এবারে যেন সবই বুঝতে পারলে। সেবারে গণেশ চতুর্থীতে গাঁয়ের সব কুয়োই যখন প্রায় শুকনো আর সেই শুকনো কুয়োতেই গণপতিকে যখন বিসর্জন দেয়া হচ্ছিল আমাদের আনসা তখন কোগলেদের বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া করে তার সোয়ামির সঙ্গে নতুন সংসার পাতলে। বাবা-মাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মেয়ের নতুন ঘর সংসার দেখে।

দেয়ালীর সময় মার বড় ভাই রামু মামা ফি-বছরের মতো এবারও উদগাঁ থেকে কাগলে এল। এবারে মামা একাই এসেছে। তার ছেলেপিলে চারটি। বড় ছেলে রাজুর বয়স এই সাত-আট হবে। তার পরেরটি আকনি— বছর পাঁচ-ছয় তার বয়স। পরের দুটির নাম মালু আর অঞ্জনি। বড় দুটি পড়ছিল। মামা নিজে ফি-বছরে এলেও এদের কিন্তু এক বছর বাদ দিয়ে বাদ দিয়ে আসত। দেয়ালীর সময় এসে উর্‌স্ শেষ করে যেত।

মামা যে উদগাঁতেই থাকতে চাইত তার কারণ ছিল। নিজের সংসারে কোনো কিছুর টান পড়লে ওর শাশুড়ি এটা-সেটা দিয়ে সাহায্য করত। কিন্তু তা বলে কাগলে ওর ছোট ভাই বোন, যে কাকা মারা গেছে তার মেয়ে, আরও কত জ্ঞাতিগোষ্ঠী আছে, তাদের বছরে একবার করে দেখে যেতে মামা আসতই।

রামুমামা মানুষটা খুবই ভাল ছিল। সারাটা জীবন খেটে খেটে চেহারাটা কঙ্কালসার দাঁড়িয়েছে। মাথায় কিন্তু থাকত একই সিল্কের পাগড়ি— ওর সারাজীবনের সাথী। মামা আমাদের বাড়িতে এসে মার জ্বালাযন্ত্রণা দেখে চোখের জল ফেলত, মাও মামাকে

দেখে অস্থির হয়ে পড়ত— কতক্ষণে ওর সঙ্গে দুদণ্ড নিরিবিলিতে বসে দুটো প্রাণের কথা বলে মন জুড়োক সে আশায়। কিন্তু তার কি জো ছিল? মাকে এত কাজ সামলাতে হত--- বিরাট এ যজ্ঞশালায় একটু ভুলচুক হয়েছে তো আর রক্ষে নেই, বাবার খিস্তি আরম্ভ হয়ে যাবে, "হারামজাদী, সর্বক্ষণ ভাইয়ের সঙ্গে কেবল ফুসুর ফুসুর।" সে ভয় মার তো সব সময় ছিলই। রামু মামা এলে মা তাই ওকে এক দিনের বেশি আমাদের বাড়িতে থাকতেই দিত না। এক দিনের বেশি থেকে গেলে পরেব দিনই বাবা চোখ বড় করে মার দিকে তাকাবে। কথায় আর মুখ চোখের ভঙ্গীতে বাবার রাগ ফুটে উঠতে বেশি দেরী হত না— মাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যেত এ সংসারে মার ভাই একদিনের বেশি দুদিন দুটি গিলছে বলে তার সোয়ামী রাগে গজগজ করছে। মা তখন কি করে? একটু চিনে বাদাম, লঙ্কা, কিছু ডাল, হয়তো একটু গুড়ের ডেলা, কিছু পাঁপড়, বাড়িতে যা যা থাকত তা থেকেই একটু করে লুকিয়ে চুরিয়ে একটা পোঁটলায় বেঁধে মামার হাতে দিয়ে বলত, "তুই আর তোর বৌ ছেলেমেয়েরা তোদের বাড়িতে বসেই এগুলো খেয়ে নিস। এসেছিস, দেখা হয়ে গেল, ভালই হল, এই যথেষ্ট," বলে চোখের জল আঁচলে ঢেকে দাদাকে রওনা করে দিত।

এবারে অবশ্য ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। ছোটমামাকে মা সংসারী করিয়েছে, সে তার নিজের সংসার পেতেছে। বড়মামা এখন তাহলে ছোটভাইয়ের কাছে নির্ভয়ে উঠতে পাবে। ছোটমামা যে আলাদা সংসার পেতেছে এ খবরটা বড়মামা পেল কাগলে এসে। শুনে অবধি ওর কি আনন্দ! ছোটভাই বাউণ্ডুলে হয়ে হেথাহোথায় ঘুরে বেড়াত, ওর একটা হিল্লে হয়েছে এখন, এ কি কম আনন্দের কথা!

উদগাঁ ফিরে যাবার দিন রামুমামা মাব সঙ্গে এল ফের দেখা করতে। দুভাইবোনে আবার প্রাণ খুলে সুখদুঃখের কথা হলো। মামা যখন উঠে পড়েছে তখন মা চোখ মুছতে মুছতে বললে, "কি দিই তোকে এবার? জল মোটে হয় নি, মুখ গোমড়া করে বিষ্টি যে এবারে কোথা চলে গেল কে বা জানে? জমিতে এবার ফসল কিছুই হয় নি।"

রামুমামা বললে, "আমি কিছু চাই না, আমাকে কিছুই দিতে হবে না। তুই তোর সংসারটা ভাল করে দেখ আর আমাদের লিঙ্গার ঘরকন্নারও একটু খোঁজ-খবর রাখিস সে ভালভাবে গুছিয়ে সংসারী হয়েছে দেখতে পেলে তোর আমার কোনো দায়িত্ব আর রইল না। মনে কব না কেন, একটা বড় দায় ঘাড় থেকে নামল। আজ নয়তো কাল, রত্নাপ্পার গায়ের জোর কমবে, রক্তের তেজও অত থাকবে না, ও তোকে কত আর মারধোর করবে? জানে তো আর মারতে পারবে না। আর তোকেও বলি, বোন, রাগের মাথায় তুইও যেন এ কুয়ো সে কুয়োতে ঝাঁপ দিতে যাসনি। তোর সাত-আটটা বাচ্চাকে তুই মরে গেলে দেখবেটা কে? আজ না হয় ওরা ছোট আছে, কাল ওরা বড় হবে, সেয়ানা হবে তখন তোকে ওরাই দেখবে তোর সব দুঃখু ওরাই ঘোচাবে।"

এ সব সান্ত্বনা দিয়ে মামা চলে গেলে মার মনও অনেকটাই শান্ত হয়ে গেল।

সে যে অন্তত তার একটি ভাইয়ের ঘরকন্না বসিয়ে তাকে সংসারী করতে পেরেছে এই ভেবে মা অনেকটা তৃপ্তিও পেলে মনে মনে। তার চেয়েও বেশি খুশি হল এই ভেবে যে তার মেয়ে তো তার চোখের সামনেই রইল। রামুমামা চলে যাবার পর মার দুচোখ আবার জলে ভরে গেল। এই অভাব-অনটনের সংসারে এত দুঃখকষ্ট সহ্য করেও মার মনে কিন্তু নিজের দু'ভায়ের জন্য মায়ামমতা এতটুকু শুকিয়ে যায় নি, এখনও তাদের জন্য প্রাণটা থেকে থেকেই হু হু করে।

যেতে যেতে মামা তার খরখরে হাত জামার পকেটে ঢুকিয়ে একটা এক আনা বার করে আমার হাতে দিয়ে আমার গালে চুমু খেয়ে আদর করলে। মাথায় হাত বুলিয়ে মার দিকে তাকিয়ে বললে, "চলিরে তারা। লিঙ্গার ঘরসংসার ভালভাবে চলছে এ দেখেই এবারকার দেয়ালী উৎসবে ষোল আনা সুখ পেলুম, মন ভরে গেল।"

দুর্ভিক্ষের দরুণ মামা এবারে ভাইফোঁটাতে মাকে দেবার জন্য ফি-বছর যে ব্লাউজের কাপড় আনত তা আনতে পারে নি। এ নিয়ে মামার মনে কম দুঃখ হয় নি। মামার দেয়া ঐ এক আনা পেয়ে একদিকে আমি যেমনি দারুণ খুশি হলুম তেমনি সঙ্গে সঙ্গে মা আর রামুমামার দুঃখ কষ্ট, ওদের মনের বেদনার খানিকটা আমার মনে বিষণ্ণতার ছোঁয়া দিয়ে গেল।

তিন

দোতলা তুলে গাঁয়ে বাবার খাতির একটু বেড়েছিল, বাবা নিজেও একটু রোয়াব নিত। বলতে গেলে দোতলার কাঠামোটাই শুধু হয়েছিল। ছাত করার জন্য আড়ে আড়ে কাঠ ফেলা হয়েছিল ঠিকই, তবে তার ওপর কাঠের তক্তা দেবার পয়সা ছিল না, সব পয়সাই ততক্ষণে দেয়াল তুলতেই শেষ হয়ে গেছে। দেয়ালগুলোও বাইরে থেকে পাকা ইঁটের হলে হবে কি, ভেতরে ছিল কাঁচা ইঁট। দেয়ালে আলমারির জন্য খোপের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তাতে তাক বা দরজা লাগান যায় নি। একতলার ছাত বেয়ে জল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ত বলে দোতলার ছাত এমন ঢালু করা হল যে টালি লাগাবার সময় মিস্ত্রী পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। বাড়িটার চেহারা দেখে গলির সবাই ঠাট্টা-মস্করা করতে ছাড়ে নি।

ভেতরটা যাই থাক, বাইরে থেকে বাড়িটাকে সবাই দোতলা বাড়িই মনে করত। হাজার হোক বাবা দোতলা তো তুলতে পেরেছে। লোকে ভাবত রতন যাকাতের হাতে কতই না পয়সা আছে, নয়তো সে দোতলা তোলে! আর এই ভেতরে ফাঁপা বড়লোকের সাজেই বাবা মহাখুশি ছিল। নিজেকে বাবা বড়লোকই ভাবত, বন্ধুদের সাথে আড্ডা মেরে সময় কাটাত। আর জমিতে খেটে মরতুম আমি আর চাকরটা। দেশাইদের জমির মালিক ছিলেন দত্তাজীরাও দেশাই। তিনি ছিলেন জমিদার। বাবা ওঁর কাছে গিয়ে বসত। বাবা ওঁদের পুরোন রায়ত তাই দুজনার গল্প জমত খুবই। যদিও দেশাইদের জমি বাবা ছেড়ে দিয়েছিল কিন্তু ওঁদের বাড়ির আড্ডাটা ছাড়তে পারে নি। মা-প্রায়ই বলত, "লোকের বাড়িতে কি যে এত আড্ডা মার বুঝি না। জমিতে গেলেই তো পার, একটু কাজও দেখাশোনা করতে পার।"

"ওরা যে বড়লোক। ওদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করলে গাঁয়ে আমাদের মান বাড়বে, সেটা বুঝিস না। বিপদে-আপদে এরাই তো বাঁচাবে। কোর্ট-কাছারিতে এরাই তো আমাদের সহায়।"

মা তাও বলে যেত, "যেতে আসতে মাঝে মাঝে জমিতে একবার করে গেলেও তো পার। সারাটা দিন এভাবে অন্য কোথাও আড্ডা মেরে কাটিয়ে দেয়াটা কি ঠিক? চাষবাসের কাজ কেমন করে হবে?"

বাবার এবারে রাগে গজগজ করার পালা, "কেন, জমিতে যা কাজ সে তো চাকরেই করছে। ছেলেটাও বড় হয়েছে, সেও হাতে-কলমে করছে কাজ। তোর কি উনুনে আঁচ পড়ছে না?"

মা এবারে চুপ করে যায়। মা জানে ওর মুরোদ কতটা, ততটাই আপত্তি জানায়, তার বেশি নয়।

চারদিন বাদে বাদে বাবা যেত শঙ্কর নাপতের কাছে দাড়ি কামাতে। সেই সাতসকালে বেরোত, ফিরত দুপুরে ঠিক খাবার সময়টাতে। শঙ্কর নাপতের দোকানে অনেক চাষীরাই

আড্ডা মারতে আসত। ফসলের কথা, মাঠে জলের কি হাল, বাজারদর কেমন যাচ্ছে, নিত্যকার জিনিসপত্রের দাম, আরও কত গল্পে ওরা মশগুল থাকত। দোকানটা ছিল বাজারের ঠিক মাঝখানটায়। যারা যেত আসত ও পথ দিয়ে, তারাই দোকানটায় বসে পড়ত। গাঁয়ে যত মামলা-মোকদ্দমা, বাদ-বিসম্বাদ, মারামারি, ঝগড়াঝাটি চলছে, ওরা এখানে বসেই নিজেদের বুদ্ধিতে যতটা কুলোয় তা দিয়ে সে সব বাদ-বিসম্বাদ মামলা-মোকদ্দমার ফয়সালা করে দিতে চেষ্টা করত। বিচারের রায় যাদের মনে ধরত না তারা তর্ক করেই যেত। এরই ফাঁকে ফাঁকে কখন যে কার দাড়ি কামান হয়ে গেছে, বা কার চুল কাটা শেষ হয়েছে সেটা যখন খেয়াল হত তখন বেলা অনেকটাই গড়িয়ে গেছে, বাবা তা বুঝতেই পারত না।

বাড়িতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই তামাকের তাজা ছাই দিয়ে দাঁতন করতে করতে বাবা চলে যেত রখমাদের বাড়ি। সেখানে রখমা মাসির দড়ির খাটে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পও চালাত কোন কোন দিন। দাঁতও ঘসছে, গল্পও চলছে।

সন্ধেবেলায় আমাদের গলির সনগর দেওয়ানজী আসত। ওর আখ মাড়াই করার কল ছিল। সে কলটা নিয়ে যাওয়া হত যেখানে গুড় তৈরি হবে সেখানটায়। আখ মাড়াই-এর কাজ দু আড়াই মাস চলত, তারপর প্রায় সারাবছরই চুপচাপ। সেই চুপচাপের সময় চলবে অন্যসব কাজ, যেমন আখ মাড়াই করার কলের চরকায় মেরামত, তেল জল দিয়ে কল সাফাই, রস জমিয়ে রাখার লোহার পাত্র, চৌবাচ্চা এসব পরিষ্কার, মেরামতি, গুড় চিনি বানাবার নতুন নতুন ছাঁচ তৈরি করার হিড়িক, এমনিধারা আরো কত কাজই না এ সময়টায় সেরে ফেলা হত। দেওয়ানজী এসব কাজই বসে বসে করত, তদারকি করত। আমাদের বাড়ির পথ দিয়ে গেলেই দেওয়ানজী আমাদের ঘরে এসে গল্প জুড়ে দেবেই। অর ব্যবসা, রোজগারপাতির হাজারো গল্প, রকমারি ঘটনার কথা। যেমন লম্বা চওড়া আয়ের কথা, তেমনি দেদার খরচেরও গল্প। একশ দুশ হাজার। মাঝে মধ্যে আবার বিষয়ের পরিবর্তন হয়ে গ্রামের কোনো ঘটনা নিয়েও দেওয়ানজী বলে যেত। সে গল্পের আকর্ষণ এত বেশি ছিল বাবা নিজের সব কাজ ফেলে দেওয়ানজীর গল্প শুনতে বসে যেত মন দিয়ে। একটা বাগানের মালিক ছিলেন এক দর্জির বৌ, থাকতেন বাগানেই তার এক পোষ্যপুত্র নিয়ে। বাবা মাঝে মাঝে এঁর কাছে গিয়েও সময় কাটাত, এও দেখেছি।

সারাদিনের এই ছিল বাবার রুটিন। মার সেটা জানা ছিল, তাই বিশেষ কোনো দরকার থাকলে সময়টা দেখে এই ক'টি জায়গার মধ্যেই একটিতে আমাকে পাঠাত। দেশাইদের বাংলোতে বাবা গদির চেয়ারে বসতে পেত, কাপ ডিশে চা খেত। এ নিয়ে বাবার কতই না জাঁক। বাড়িতে এসে এসবের গল্পই করত। ও বাড়িতে ধবধবে সাদা লোমওয়ালা একটা কুকুর দেখতুম দরজায় বাঁধা আছে, কেউ যাতে হুট করে ঢুকতে না পারে। কুকুরটাকে আমি ভয় পেতুম, তাই দরজার বাইরে থেকেই বাবাকে ডাকতুম।

রখমা মাসির বাড়ির দেবদেবীর ছবি দেখতে আমার খুবই ভাল লাগত। শঙ্কর নাপতের দোকানেও ছবি ঝোলানো থাকত। কোন পাপের কি শাস্তি সেসব খবর তো আমি

ঐ নাপতের দোকানের ছবিগুলো থেকেই না জেনেছি। ছবি দেখতে ভাল লাগত। সময়ের জ্ঞান থাকত না, মা দেরী দেখে ভাবত, যাকে পাঠালুম কর্তাকে খুঁজতে, তারও তো ফেরার নাম নেই দেখছি।

বাবার এই আড্ডা দিয়ে সময় কাটানোর স্বভাবের জন্য চাষের কাজ ভালভাবে হত না। চাকর বাকররা অযথা সময় নষ্ট করত, কোনো কাজই তাড়াতাড়ি করতে চাইত না, কাজ এড়িয়ে চলত। জমিতে জল দেয়া, মাঠে বলদ চরানো, এসব কাজ ঢিলেঢালাভাবে সারত। বাগানের আনাজপাতি কোথায় যে উধাও হয়ে যেত বোঝাই যেত না। যেখানে চার মণ ফসল পাবার কথা, সেখানে দেখা গেল তিন মণ উঠেছে। এদিকে খাবার লোক বাড়ছে। আমি কেবলি ভাবতুম বাবা ঘুরে ঘুরে না বেড়িয়ে খেত-খামারে কাজ করলে তো সব ঠিক হয়ে যায়। আমিও আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করতে পারি।

কিন্তু মনে মনে যা ভাবতুম বাস্তবে তা হত কোথায়?

আমাদের তো বেশি জমি ছিলনা— বলা যেতে পারে এক ফালি জমি— বাবা সেটাকেও অনাদর করছে। কোনো কাজ করবে না— বসে বসে শুধু অন্ন ধ্বংস করবে। চাকরদের মাইনে দিতে গুচ্ছেরখানেক টাকাই বেরিয়ে যাচ্ছে— কিন্তু সে অনুপাতে ফসল হচ্ছে কোথায়? বাড়ি করতে গিয়ে এন্তার টাকা বেরিয়ে গেল, এ দিকে সংসারের খরচের জন্য পয়সা নেই। পয়সার অভাবে জমিতে সার পড়ে না— ফলে জমির ফসল কমে গেছে। ঘাটতি মেটাতে কোলহাপুর থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করা হত। আখের চাষের পর গুড় বেচে সে ধার শোধ করা হবে এই চুক্তিতে। এর মধ্যে আবার যুদ্ধের ছায়াও পড়েছে সব কিছুতে। ভাল ফসল সরকারকে লেভি প্রথায় ছেড়ে দিতে হত সস্তা দরে। মা অবশ্য অনেক সময়ই বাছাই করা ভাল ফসলটা বাজারেই বেশি দরে বেচে দিত। যা পয়সা তাতে পেত তাই দিয়ে রেশনের বাজে ধান চাল কিনে খেতে হত। অনেক কিছু আবার পয়সা দিয়েও পাওয়া যেত না। একটা দেশলাই বাক্স অনেক কষ্টে হাতে পায়ে ধরে যদি বা পাওয়া গেল— দাম দিতে হত ঠিক ডবল। সে জন্যই মা উনুনে ঘুঁটে জ্বালিয়ে আঁচ রেখে দিত— তাতেই দু-তিন দিন উনুন ধরানো চলত দেশলাই ছাড়াই। খামারে তো আঁচ রেখে দেয়াই হত। রেশনে যতটুকু চিনি পাওয়া যেত মা সেটা বেশী দামে বাইরে বেচে দিত। বাড়তি যেটুকু পয়সা তাতে হত, মা তাই দিয়ে গুড় কিনে আনত। চিনির চেয়ে গুড় সস্তা তাই ওতে বেশি দিন যেত।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের সংখ্যা যেই বাড়তে থাকল, বাবাও বাড়িতে খাবার জন্য গুড় আনা বন্ধ করে দিলে। মাত্র এক ঢিপি গুড় থাকত। জিজ্ঞেস করলে বলত, বাড়িতে থাকলেই সব গুড় খেয়ে খেয়ে শেষ হয়ে যায়, যা লাগে সেটুকু কিনে কিনে খাও না কেন? এটুকু বলে চিনেবাদাম আর গুড়ের বেশির ভাগটাই বাবা হাটে নিয়ে বেচে দিত। ফলে বাড়িতে খুব টান পড়ত, মাকেও তাই খুব বুঝেসুঝে চলতে হত। তাছাড়া মুরগি, ছাগল আর মোষও মা রাখতে আরম্ভ করেছিল। ওর থেকে ডিম, দুধ বা ওদের বাচ্চা যা হত তা হাটে বেচে মার দুটো বাড়তি পয়সা

হত। তাই দিয়ে মা রেশন জোগাড় করত। দিনের পর দিন মা বেচারা শুধু কষ্টই করে গেল।

কেরোসিন চোখেই দেখা যেত না। গাঁয়ে কেরোসিন এসেছে খবর পেলে লোকের বেজায় ভিড় লেগে যেত। এমনি এক সকালে খবর এল গাঁয়ে কেরোসিন এসেছে। মাথা পিছু এক পাইন্ট পাওয়া যাবে। মা আমাকে পয়সা আর বোতল দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। আমি গিয়ে দেখি কেরোসিনের লাইন ততক্ষণে এক গলি থেকে আর এক গলিতে পৌঁছে গেছে। সেই সকালে চা খেয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছি। তেল যখন পেলুম তখন বেলা বারটা। কত দিন পরে যে হাতে কেরোসিনের গন্ধ পেলুম। কি খুশিই যে হলুম। হাতে বোতল নিয়ে এক দৌড়। বাড়িতে এসে পাথরের চৌকাঠে ঠোক্কর খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম, ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোল। তাতে বোতলের ভাঙা কাঁচ আর কেরোসিনের কিছুটা মিশে গেল। মার লাথিটা পেলুম উপরি পাওনা হিসেবে। "তেল গেল" বলে মা তড়পেই যাচ্ছে। কতদিন পর চোখে তেল যদি দেখতে বা পেলে তাও কিনা আমার জন্য সব গেল। এ ঘটনার পর পরের দিন পর্যন্ত মার কাছে কিছু চাইলেই মা তক্ষুণি বলত, "যে তেলটা নষ্ট করেছিস সেটা এনে দে, তারপর যা বলবার বলবি।"

গুজরাতিদের ওখানে মামা ট্রাক্টর চালাত। মামা আমাদের সাহায্যও করত। গাঁয়ে গুজরাতিদের সাত আটটা বড় বড় বাগান ছিল। গাঁয়ের সবটুকু ভাল জমিও ওদেরই। অনেক ইঞ্জিনও ছিল ওদের। সেগুলো লাগানো থাকত কুয়োতে আর গদিতে। এসব ইঞ্জিনের জন্য যে অশোধিত তেল পাওয়া যেত তা লুকিয়ে চুরিয়ে মামা আমাদের মাঝে মাঝে এনে দিত। আমরা ঐ তেলে বাতি জ্বালাতুম। ল্যাম্প জ্বালাতে কিন্তু কেরোসিনেরই দরকার হত। তেল থাকত না বলে রাতে বাগানে যেতে হলে অন্ধকারেই যেতে হত। মার ডর লাগত, বাবাকে বলত, "এত অন্ধকারে আর ছেলেটাকে নাই বা পাঠালে, ঘরেই থাকুক না, ভোর হলে উঠে যাবে'খন।"

জবাবে বাবা বলত, "খেতে লোক থাকলে জলটা তাড়াতাড়ি দেয়া যায়।"

মা কিন্তু বলেই যেত, "সকাল হলে যাবে'খন। রাতের অন্ধকারে পথে সাপে টাপে কাটলে কি করবে? ঐটুকু ছেলে? তোমার জমি সে কি এখানে? সে তো সেই ভূতপেত্নীদের জায়গায়। ছেলে আমার ভয় পেলে কি হবে?"

বাবা তখন আর কি করে? বলত, "হ্যাঁরে, ভোরে যাবি তো ঠিক?"

"হ্যাঁ, ঠিক চলে যাব," আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যেতুম। বাবা নিজে কিন্তু বাড়িতেই শুত। গণপা একাই ক্ষেতে ফিরে যেত আর সুযোগটা কাজেও লাগাতো। সঙ্গে নিয়ে যেত তার ভাইকে। ওর হাত দিয়েই ঘাস, খড় সব একসঙ্গে জড়ো করে পাচার করত নিজের বাড়িতে। গণপার পাশের বাড়ীতেই মোরেদের কিসনি মাকে এসব খবর দিত। কিন্তু মা শুনেও না শোনা, দেখেও না দেখার ভান করত। বাবা জানতে পারলে মাকেই দোষ দেবে আর আবার আমাকে রাতের অন্ধকারে মাঠে যেতে হবে। তাই মা ওসব সব শুনেও হজম করে বসে থাকত। মায়ের পরাণ তো! সব সময়ই আমাদের ভাই-বোনদের জন্য কাঁদত, কিন্তু মা বেচারা খুব একটা কিছু করে উঠতে

পারত না। আট-আটটি সন্তানের মা হয়েও এখনও প্রায় রোজই বাবার হাতে মা মার খেত। একদিনের জন্যও মাকে বাড়িতে বসে বিশ্রাম করতে দেবে না বাবা। বাড়িতে এতগুলো লোকের রান্নাবান্না করে, তাদের দেখাশোনা সেরে রোজই এর পর মাঠে যেতে হত নিয়ম করে। গাঁয়ে জল না পেলে দূরে গিয়ে খাবার জল আনতে হত, ছেলেপিলের চানের জন্য জল গরম করতে হত। দুটো চৌবাচ্চাই বেশ দূরে— প্রায় তিন সাড়ে তিন ফার্লং। কলসি, হাঁড়ি যে যাতে পারত জল নিয়ে আসত। মার পঁচিশ থেকে তিরিশটা মোটা মোটা ভাখরি করতে হত। দুধ বেচতে যেতে হত। এসব সেরে আবার মাঠে যেতে হত খাবার নিয়ে। জমিতে ঘুঁটে দেয়া, বাচ্চাদের কাপড়-চোপড় কাচা, যে মজুর-বৌ ক্ষেতে কাজ করত তার সঙ্গে কাজ করা, এসব তো ছিল অধিকন্তু। সপ্তাহে হাট বসত দুদিন তার জন্যে আনাজপাতি কেটে ধুয়ে গুছিয়ে কে রাখবে? সেও মা-ই। আবার বাজারে এ সব বেচতে যাবে কে? কেন মা-ই তো আছে!

কোন দিন বাড়িতে কাজ সারতে দেরী হয়ে যাবার দরুণই হোক বা পাঁপড় বানানোর জন্যই হোক, মা যদি খেতে না গিয়ে বাড়িতে রয়ে যেত তাহলে আর রক্ষে ছিল না। বাবা গর্জে উঠত।

"হারামজাদী! তোদের বসে বসে খাওয়াব মনে করেছিস? বাড়ীতে বসে পাপড় তৈরী করছিস? জমিদার-গিন্নী মনে করছিস নাকি নিজেকে? বলতে বলতে মাকে মারতে আরম্ভ করে দিত। খাবার সময় পাপড় কিন্তু বাবারই লাগত বেশী। কোনদিন যদি খাবারে একটু কম পাপড় দিয়ে মা বলত, "বাচ্চারা খেয়েছে, যা আছে আজ তাই দিয়ে খাও।" তাহলেই হয়েছে, মার পিঠে পড়ত লাথি, মুখে পড়ত চড় চাপড়।

"হারামজাদী! আমাকে না খাইয়ে তোর ছেলেপিলেদের খাওয়াচ্ছিস! তোকে কতবার না বলেছি, রাক্ষুসী, আমি ভাল থাকলে সংসার ভাল চলবে। আমার গায়ে তাকত থাকলে আমিই রোজগার করে ওদের খাওয়াতে পারব। আমিই যদি না রইলুম তবে ওদের কে দেখবে? তোকে আর কত বোঝাব হতচ্ছাড়ী?"

বাবা শরীর চর্চা করত শরীরের ওপর বেশ খেয়াল ছিল, তাই এসব অঙ্ক কষে, এ সব যুক্তি তর্ক দিয়ে মাকে হিসেবটা সহজ করে বলে ফেলতে চাইত। আর এদিকে মার যে পাঁচটি মেয়ে আর দুটি ছেলে পেটে ধরে শরীরপাত হলো তার হিসেবটা কে করবে? আমার বোনেদের দেখিয়ে আবার মাকে বলত, "এই মাগীগুলো তো আজ নয় কাল বাড়ী ছাড়বে, তাদের ভাল মন্দ খাইয়ে করবিটা কি?" এসবের জন্যই মা বাবাকে আগেভাগে খাইয়ে দিত। বাবা খেয়ে চলে যাবার পর যা পড়ে থাকত তা-ই ক্ষুধার্ত ভাইবোনেরা খাবলে খুবলে নিমেষের মধ্যে খেয়ে শেষ করে দিতুম। কিন্তু ভাগাভাগি করেই খেতুম, মারামারি করতুম না।

হাটে বসে জিনিস বেচতে মার জুড়ি ছিল না। জমিতে ফসল যা হত, বাবা সেটা মার ওপরেই ছেড়ে দিত। নিজে এসব নিয়ে সুবিধে করতে পারত না—হক-চকিয়ে যেত। আনাজপাতি বেচে যে পয়সা আসত তা দিয়ে মা রেশন তুলত। কখনো-সখনো এক মুঠো ছোলা আর মুড়ি খেতে পেতুম। কখনো আবার হয়তো এক টুকরো পেয়ারা।

এক আধবার কখনও বা বাজারে তৈরী ভাজাভুজি, কাঠি ভাজা। বাবাকে না জানিয়ে মা এসব লুকিয়েচুরিয়ে আমাদের দিত। মুরগির ডিম বেচে, দুধে খানিকটা জল মিশিয়ে একটু বেশি লাভ করে, ঘুঁটে বেচে, তাছাড়া জমির আনাজপাতি বেচে যা পেয়েছে তার কিছুটা কম বাবাকে বলে মা একটু একটু করে পয়সা জমাত। সে জমানো পয়সা দিয়ে মা আমাদের ভাইবোনদের জন্য জামাকাপড় কিনত। বাবা কাপড়জামার জন্য যে পয়সা মাকে ধরে দিত তাতে মোটা বস্তার মতো কিছু জুটলেই যথেষ্ট। ঐ পয়স্যর সঙ্গে মার জমানো পয়সার কিছুটা জুড়ে মা আমাদের জন্য রঙচঙে বাহারে অথচ টেকসই জামা কিনে দিত। সেরকম রঙচঙে বাহারে জামাকাপড় আমাদের গায়ে দেখলেই বাবা রাগে জ্বলে উঠত। বাবার মনে হত তার সব পয়সা এই বাহারে জামাকাপড় কিনে কিনে বরবাদ হচ্ছে। তার বৌ এসব দামী কাপড়চোপড় কিনে মিছিমিছি টাকা নষ্ট করছে। যা খরচ হয়েছে তার আদ্ধেক পয়সায় সাদামাটা পোশাক কেনা যেত না কি? মা কিন্তু বাবাকে বলত কাপড়চোপড় যা কেনা হয়েছে সবই বাবার দেয়া অল্প পয়সাতেই হয়েছে। নিজের সঞ্চয় থেকে যে ওতে অনেক টাকাই জুড়তে হয়েছে সেটা মা বাবাকে কখনই বলত না। বলতে কি আর রক্ষে থাকত? "চুরি করিস, পয়সা মেরে দিস্" এসব বলে বাবা মাকে মার লাগাতে লেগে যেত। সারাটা জীবন বাবা মাকে কেবল সন্দেহই করে গেল, আর মা মুখ বুজে সব অত্যাচার সয়েই গেল। কত সময়ই তো এরকম হয়েছে, আমরা মার ছেলেপিলেরা এরকম মারের সময় ঝট করে বাবা আর মার মাঝখানে পড়ে যেতুম, বাবাকে অনুনয় বিনয় করে কাঁদতে কাঁদতে মাকে আর না মারতে বলতুম। এতে অবশ্য কোনো লাভই হত না। মাঝখান থেকে আমরা দুতিনটে থাপ্পড় বা এক চোট লাথি খেতুম বাবার কাছে। আমাদের ভাগের মারটা কোনো সময় বেশ জোরেই হত। আর মার কপালে? মার গা কেটে রক্ত বেরোত ফিনকি দিয়ে। গলির বাসিন্দেরা বাবার খুব নিন্দে করত, বাবাকে যা নয় তাই বলত। বৌ মেয়েছেলেরা বাবাকে শাপশাপান্ত করত, গালাগালি দিত। তবে এতে বাবার কোনো বিকার হত না, বাবা নিজের মতনই চলত, ভাবত এটা বুঝি খুব বীরত্বের কাজই হচ্ছে। বাবা মাকে ঘোড়া, গাধা যা মুখে আসত তাই বলত, রাগে অমানুষ হয়ে যেত, কোনো অশালীন গালাগালই মুখে আটকাত না। ঠিক পাগলা কুকুরের মতো। রাগে বাবার সারা গা কাঁপত, আমাদের বাড়িতে বাবার ওপর আর কে কথা বলবে?

বাবার এ অত্যাচার সইতে না পেরে মা দুতিন বারই কুয়োতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। কখন, কোথায়, কেমন করে যে মা চলে যেত আমরা জানতেও পারতুম না। আমাদের ভাগ্য ভাল, তাই যতবারই মা এভাবে কুয়োতে ঝাঁপ দিতে গেছে ততবারই কুয়োর কাছাকাছি কোনো-না-কোনো চাষী মাকে দেখে ফেলে ধরে এনে বাড়ি অবধি ছেড়ে দিয়ে গেছে। চাষীটা ফিরে যাবার সময় বাবাকে, বাড়িতেই হোক খেতেই হোক, বোঝাত, মাকে চোখে চোখে রাখতে বলত, শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে বাবাকে কিছু গালাগালও দিয়ে যেত। বাবা যে মাকে মারধোর করে, গাঁয়ে তা তো কারো অজানা ছিল না। তাই মাকে কুয়োর কাছাকাছি হাঁটতে দেখলেই সন্দেহ

হত। যার নজরে এটা পড়ত সে মাঠে কাজ করছে এমন চাষীই হোক বা কাছাকাছি ছিল এমন যে কেউ হোক সে মাকে ফিরিয়ে আনত। শেষে এমন হল যে বাবা মাকে মারধোর করলেই আমরা সেদিনটা আর মাকে একা ছাড়তুমই না। সারাটা দিন মার গা ঘেঁষে কাটিয়ে দিতুম। বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই আমরা মার সামনেই বাবাকে গালাগাল দিতুম। মা এই ভেবে সান্ত্বনা পেত— যতই হোক এরা মার নিজের পেটেধরা সন্তান— এরাই তো মার আপনজন। আমরাও ভাবতুম আমাদের সত্যিকারের আপনজন আমাদের এই মা। বাবা আমাদের কেউ নয়— সে শুধুই কিল মারার গোঁসাই— ভালও বাসে না কাছেও টেনে নেয় না।

বাবার এই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মা আর সন্তান চাইত না। তা, মা না চাইলে কি হবে পেটে তার সন্তান ঠিকই আসে। মনে হয় বাবা এ ব্যাপারে মার ওপর রীতিমত জোর জুলুম চালাত। ঝগড়া করতে করতে, মার খেতে খেতে তিতিবিরক্ত হয়ে মা এক এক সময় চেঁচিয়ে উঠত, "মিনসের শখ আর মেটে না। একটার পর একটা বাচ্চা পেটে ধরাবেই। আমি একা মেয়েমানুষ, কোথা থেকে এতগুলো লোককে খাওয়াই? জন্মাতে না জন্মাতেই গলায় টুঁটিতে নখ লাগিয়ে মেরে ফেলি নি কেন ওদেব ঠাকুর?" একটা দুঃখী গাই তার বাছুরের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়ে যেমন হাম্বা-হাম্বা করে ডাকতে থাকে, মার এই খেদোক্তি, দীর্ঘশ্বাস আমার কাছে তেমনি মনে হত। কিন্তু এসব সব বানচাল করে দিয়ে বছরের পর বছর মার বাচ্চা হয়েই যেত। একটা বাচ্চা হামাগুড়ি দিতে না দিতেই মার পেট আবার বড় হতে থাকত। মার পর পর বাচ্চা হয়েই যাচ্ছে, আর তার জন্যে আমরা নানা কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছি, সেটা আমিও বুঝতে পারতুম। তাই বাবার ওপর ভীষণ রাগ হত। আমি ভাবতুম আমার ভাইবোনেরা আমার কাছেব মানুষ, আপনজন, ওদের কোলে পিঠে নিয়ে ঘুরতুম, খেলতুমও কখনও কখনও। কিন্তু মার যা যন্ত্রণা তা তো হয়েই যাচ্ছে, সেটার কি কিছু সুরাহা হচ্ছে?

যেবার লক্ষ্মী জন্মাল, সেবারে মার যন্ত্রণার চেহারাটা আমার পরিষ্কাব মনে আছে। মাকে সেই ভোর পাঁচটা থেকে কাজে লেগে যেতে হত—সূর্যি উঠতে তখনো অনেক দেরী। মার তখন পেট নেমে এসেছে— বাচ্চা হবার সময় কাছে এসে পড়েছে। সেই ভোরে মা আমাকে আর হীরাকে ঘুম থেকে ওঠালে। হীরাকে উনুনে আঁচ দিতে বলে মা আমাকে নিয়ে চলল গাঁয়ের চৌবাচ্চায় জল তুলত। প্রথম দু খেপ জল মা আর আমি সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারেই তুলেছিলুম। তিনবারের বার তুলতে গিয়েই মার পেট ব্যথা শুরু হয়ে গেল। মা চট করে চৌবাচ্চার পাশেই বসে পড়লে আর কাতবাতে আরম্ভ করলে। ব্যথার প্রথম জেরটা কোনোরকমে সামলে নিয়ে মা বাড়ির দিকে হাঁটা দিলে— জলের একটা কলসী মাথায় চাপিয়ে আর বাকি দুটো দুকোলে। আমিও কাঁধে একটা কলসী নিয়ে মার পিছু পিছু চললুম। কলসীগুলো কোনমতে ঘরেতে নামিয়ে মা মোষেদের খাটালের একটি কোণায় গিয়ে বসে পড়লে। তখন মার পেটের যন্ত্রণা বেড়েছে। এসব দেখে হীরা বড্ড ভয় পেয়ে গেল। আমিও কেঁদে ফেললুম, ভাবলুম মা বুঝি এবার ব্যথায় ছটফট করে মরেই যাবে। আমাকে কাঁদতে

দেখে মা বললে, "কাঁদছিস কেন আন্দা? চুপ কর। আমার কিছুই হবে না। যা তো বাবা, ছুট্টে গিয়ে বালা ঠাকুমাকে ডেকে নিয়ে আয় তো। বলবি মার পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়েছে তুমি শীগ্গিরি এস। তুই দাঁড়াস নি চট্ করে বলেই চলে আসবি।"

মার কথা শেষ হতেই আমি দে ছুট। বালা ঠাকুমা এসে সব ব্যবস্থা করে খাটালের দোর বন্ধ করে দিলে। হীরা এরই মধ্যে মোষগুলো আর তাদের বাছুরদের গোয়াল থেকে বার করে বাইরে বেঁধে রেখেছে। ভেতরে যা ছটফটানি চলছে বাইরে কান খাড়া করে আমি তার সবটাই শুনতে পাচ্ছি। মা যন্ত্রণায় কুঁকিয়ে কুঁকিয়ে উঠছে আর ঠাকুমা সাহস দিয়ে চলেছে। মাকে জোর দিতে বলছে। মা আরও ছটফট করছে। একসময় কলসী ভেঙ্গে জল বেরিয়ে গেলে যেমন হড় হড় করে একটা শব্দ হয় তেমনি একটা শব্দ হলো। মার যন্ত্রণার গোঙানি আরও বাড়ল। তারপর এক বিকট চিৎকার ব্যস তারপর সব চুপচাপ। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। কিছুক্ষণ পর ঠাকুমা বেরোল। কাপড়ের টুকরো নেবার জন্যে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, "ভাই না বোন?"

"তোর আবার একটা বোন হয়েছে। কি পোড়া কপাল রে তারার। দে হীরা, ঝট করে পুরনো ন্যাকড়া দে।"

আমি চট করে আনসীকে ডেকে নিয়ে এসে রান্নায় লাগিয়ে দিলুম।

এরই মধ্যে এক ফাঁকে মাঠে বাবাকে চা দিতে গেছলুম। বাবা মাঠেই থাকত তখন। আমি মাঠেব একটা ধারে চা নিয়ে রাখলুম। বাবা মাঠে জল দিচ্ছিল। বললে, "কি রে এতক্ষণে এসেচিস্?"

"মার বাচ্চা হলো যে।"

"কখন?"

"সেই ভোরে।"

"কি হয়েছে?"

"মেয়ে।"

বাবা জল ঢেলে বলদগুলোকে পেছনে টানছিল। চুপ মেরে গেছে। এদিকে আমিও চা নিয়ে সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছি। অন্য সময় হলে বাবা জলের কাজ ফেলে দিয়ে চাটা হাতে নিয়ে নিত। আজ সেসব কিছুই করলে না। আমি কি দিয়ে আরম্ভ করব ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "চাটা গরম করব?"

"গরম করবি কর, নয়ত ঐ নালার মধ্যে ফেলে দিগে যা", বলেই বলদ সামলাতে সামলাতে তাদের পিঠে সপাং করে লাগালে চাবুকের ঘা।

আমি কুঁড়েঘরটার দিকে এগোচ্ছিলুম। বাবা বললে, "হারামজাদা, ওদিকে না গিয়ে জলের দিকে যা। গণপাকে জলের কাজে লাগতে বল।"

আমি জলের দিকে পা বাড়ালুম। কিছুক্ষণ পরেই বাবা বাড়ির দিকে হাঁটা দিলে। আমার সাত নম্বর বোনের জন্ম এভাবেই হল।

এতসব জ্বালা-যন্ত্রণা, মারধোর, অত্যাচারের কথা বলে জ্বালা জুড়োনো, হালকা হওয়ার মার একটাই মাত্র জায়গা ছিল— সেটা হল দত্তাজীরাওয়ের বৌ আর মার কাছে। বাবার কথামতই মা যেত ও বাড়ি। কখনও শাক-সব্জি নিয়ে, কখনও সদ্য

বিয়োনো মোষের ঘন দুধ নিয়ে কখনও বা ও বাড়িতে ঘুঁটে কমে গেলে, ঘুঁটে পৌঁছে দিতে। সে সময়টায় মার ওপর অত্যাচারের সব কথা মা ওদের বলত। ওরা সব শুনে খুব কষ্টই পেত, মার ওপর ওদের করুণাই হত।

দত্তাজীরাওকে ডেকে এনে বসিয়ে ওরা বলত, "শোন, তারা কি বলছে।"

দত্তাজীরাও বলতেন, "আমি ঐ হারামজাদাকে এমন শিক্ষা দেব।"

মাঝে মাঝে দত্তাজীরাও বাবাকে এ নিয়ে সত্যি সত্যি বলতেন না যে তাও নয়। তাতে কাজও হতো। বাবা দত্তজীরাওকে ভালবাসত, ভয় করত, সম্মানও করত। বাঁড়িতে এসে এই নিয়ে বাবা আবার মাকে বকাবকি শুরু করত। জবাবে মা বলত, "মা ঠাকুরণ শুধোলে কপালে চোট লেগেছে কিসের জন্যে, তখন আমাকে বলতেই হল।"

"কেন, গাছে ধাক্কা লেগেছে নয়তো অন্য কিছু বানিয়ে বললে কি ক্ষতি হ'ত শুনি?"

"শুধু শুধু মিছে কথা বলতে যাব কেন? তোমার মারের ওপর চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে নাকি? তোমার যা ইচ্ছে তুমি বল না গে দত্তাজীকে। আমি কি বারণ করেছি বলতে?"

"তোর ফের মার খাবার সময় হয়ে এয়েচে" বলে বাবা আরেক বার ধমক দিয়ে এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করত। আমাদেব সংসার এভাবেই চলছিল। একটা করে ভাইবোন বাড়ছে আর আমরা আরো কাঙাল হচ্ছি।

এদিকে সারা বছর মোটে জল হয় নি। কুয়োটা চারভাগের একভাগও ভরে নি। মাঠে তাই ফসলও হয়েছে খুবই কম, না হবারই মতন। গোরু মোষের খাবার মতো কিছু খড় হয়েছে এই অবধি। আগে যেখানে দুতিন গাড়ি গুড় হত, এবারে আখের রস থেকে দেখা গেল গুড় হয়েছে মাত্র আঠার টিপি। সে গুড় তো এমনিতেই সাবাড় হয়ে গেল বাড়ির লোকে খেয়ে। এদিকে ধানের দাম হু হু করে বাড়ছে। আমাদের বাড়ির খরচ চালাবার মতো পয়সা কুলোচ্ছে না। যেটুকু সঞ্চয় ছিল, দোতলা তুলতে গিয়ে তাও গেছে। ভাগেব চাষের জমির মালিকদের যা পাওনা, তাও সময়মত সবটা দেখা যায় নি, বাকি পড়ে গেছে। খাটবার লোক তো মাত্র দুজন, বাবা আর মা। যেটুকু ফসল হয়েছে তাতে চৈত্র অবধি চলল, নতুন বছর শুরু হতেই খোরাকির ফসল শেষ। আমাদের জমি পাঁচ-ছ একরের বেশি তো নয়। তাছাড়া, লাল মাটির জায়গা, জল কম হলেই হাওয়াতেই গাছের ফসল শুকিয়ে যেত। সম্বৎসর খোরাকির ফসল হতো না— ফলে রেশন থেকে আমাদের নিতেই হত। রেশনের দোকানেও হতো তেমনি ভিড়। লোকে লোকরাণ্য। পোকা ভর্তি চাল ডাল পেলেও লোকেরা বর্তে যেত— ঘন্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে এক মুঠো রেশনে জুটত কি জুটত না। সুন্দরা চন্দরা এখন দেড বছরেরটি হয়েছে। কিন্তু হাঁটতে এখনও পারে না, হামাগুড়ি দেয়। জন্মাবার সময় কিন্তু ওরা বেশ সুন্দর গোলগাল ছিল। পরে গিয়ে তেমন বাড় আর হল না। মার বুকের দুধ তো শুকিয়েই গিয়েছিল। এদিকে পেটে এসেছে আরেকটি বাচ্চা।

ধনগরদের গলিতে থাকত রামা ডল্লে। পঁচিশ-তিরিশটা ভেড়া, একটি গোরু একটি

ঘোড়ার মালিক। বাবা তাকে একশ পঁচিশ টাকা ধার দিয়েছিল। সেটা আট-ন বছর আগেকার কথা। টাকাটা ফেরৎ চেয়ে চেয়ে বাবা হয়রান হয়ে গেছে। ফেরৎ দেবার মুরোদ নেই রামার।

বাবা বলছিল, "দেখ রামা, কিছু না হোক, আসলটা দিবি তো।" সে বেচারা জবাবে বলে "কোত্থেকে দেব?" প্রতিবারই টাকাটা ফেরৎ না দিতে পারার একটা না একটা কারণ সে দেখাবেই।

দুর্ভিক্ষ যখন দোরগোড়ায়, বাবা তখন ওকে ডেকে বললে, "টাকাটা আমার এক্ষুনি চাই, নইলে তোর ভেড়ার পাল আমি লোক দিয়ে টেনে নিয়ে যাব কোলহাপুরের বাজারে। বেচে দিয়ে আমার আসল টাকা আর এতদিনকার সুদ রেখে দিয়ে বাকিটা তোকে ফিরিয়ে দেব। দেখি কোন্ শালা আমাকে আটকায়।"

নিজের সন্তানদের খেতে কি দেবে সে চিন্তায় বাবা মরিয়া হয়ে উঠেছে। টাকা আদায় করার অন্য কোনো উপায় বাবার আর ছিল না। শেষে ধনগরদের স্বজাতিরা সবাই রামাকে বাঁচাবার জন্য একজোট হল বাবার সঙ্গে। একটা রফা করলে। সিদ্ধু বুড়ো বললে, "দেখ রত্নাপ্পা, রামার গোরুটা মাসখানেকের মধ্যেই বিয়োবে। মনে হচ্ছে ফি-বারের মতো এবারেও এঁড়ে বাছুরই হবে। রামার গাইটা তোর খাটালে নিয়ে বাঁধ গে যা। যদি এঁড়ে বাছুরই হয়, তাহলে ভেবে দেখ তোর সব পাওনা সুদে আসলে উসুল হয়ে যাবে। এই দুর্দিনের বাজারে তোর বাড়ি দুধে দুধে ভরে যাবে। তোর ছেলেমেয়েরাও তো এখন কচিই আছে। তাদের দিবি খেতে ঐ গাইয়ের দুধ। আর গাইয়ের দুধ তো মায়ের দুধেরই মতো। দেখবি গোরুর দুধ খেয়ে বাচ্চারা তোর কেমন মোটাসোটা হয়। তাছাড়া, এতে রামারও বাচ্চাগুলো বেঁচে যাবে, তোকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করবে, ওতে তোর মঙ্গলই হবে।"

বাবা-মা দুজনেই এতে রাজি হয়ে গেল। মা ভেবে দেখলে তাদের রোগা মেয়ে দুটো এবারে তাহলে দুধ খেয়ে একটু মোটাসোটা হবে। অবশ্য বাবা একটা শর্ত দিলে। বাবা বললে, "যদি গাইয়ের এঁড়ে বাছুরই হয় তবে ভেবে নেব সবই উসুল হল, তা না হলে মনে করব শুধু সুদ পাওয়া গেল।" বাবার খুব বলদের শখ ছিল। গোরু যদি সমানে বলদ বিয়োতে থাকে তাহলে বাবা ওদের জমির চাষে লাগিয়ে দেবে। বাবা চাষী, ওর চিন্তার ধারাটাও তাই চাষের দিকেই লক্ষ্য রেখে। বাবা ভেবে দেখলে চাষীর জমিতে একজোড়া বলদের কাঁধে লাঙল জুতে জমির শোভা কতই না বেড়ে যাবে। এই সব সাত পাঁচ ভেবে বাবা রামার গাইটা নিজের গোয়ালে এনে বাঁধলে। মাসখানেকের মধ্যেই গাইটা বিয়োলো, সত্যি এঁড়ে বাছুরই হলো। সবাই খুব খুশি। সবচেয়ে খুশি হল বাবা, এতো খুশি হল যে গাইটার সবটুকু দুধ বাবা ওর বাছুরটাকেই খেতে দিত। আমার বোনেদের কপালে দুধ জুটল না, ওরা যেমন রোগাপটকা ছিল তেমনি রয়ে গেল। চন্দরার আবার মাটি খাবার অভ্যেস হল। তার হাত-পাগুলো শুকনো কাঠির মতো লিকলিকে, পেট হাঁড়ির মতো বড়। দুবছরের হল, কিন্তু এখনও মুখে কথা ফোটে নি। ওকে যেখানে বসিয়ে রাখা হত সেখানেই চুপচাপ বসে থাকত, সেখানে হাগত মুতত। কারও নজরে পড়লে তাকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিত, নোংরাটাও

পরিষ্কার করে ফেলত। আবার সে জায়গায় চুপ মেরে বসে থাকত। সামনে কেউ না থাকলে ও নখ দিয়ে মাটি খুঁটত আর সে মাটি খেত। দেয়াল খুঁড়ে খুঁড়েও মাটি খেত।

হীরার পরে যতগুলো ভাই-বোন হয়েছে সবাই ওকে দেখে মাটি খেতে শিখেছে। সেজন্যই আনসা আর আমাকে বাদ দিলে পরের সব কটি ভাইবোনেরাই লিকলিকে রোগা, মুখ ফোলা ফোলা, হাতে-পায়ে জোর নেই, নাক দিয়ে অনবরত সর্দি পড়ছে। সব কটাই ছিল রুগ্ন, কখনো হাসিখুশি চনমনে দেখাত না ওদের। মার দু বছর বাদে বাদেই বাচ্চা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কারুরই তেমন খাবার জুটত না। মার বুকে দুধ শুকিয়ে গেছে, শরীরও ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। আমার ভাইবোনেরা সবাই যেন এক-একটা কঙ্কাল, একদিকে তাদের সংখ্যা বাড়ছে যেমন, কষ্টও বাড়ছে তেমনি। এর মধ্যে আবার নেবে গেল দুর্ভিক্ষ, আকাল। রেশন থেকে ছাতু, সাইলো, জোয়ার, হলদে পোকাভর্তি ভুট্টার দানা, মানুষে খেতে পারে না এরকম চাল আসত বাড়িতে। এ চালই কখনও বেটে, কখনও বা গুঁড়ো করে তা দিয়ে রুটির মতো করে, কখনও বা ওগুলোই সেদ্ধ করে ডালের সঙ্গে, পাতলা জলের মতন ঘোলের সঙ্গে, আমরা খেতুম।

মোষের সবটুকু দুধই এখন বেচে দেয়া হত, তাতে রেশন তোলবার টাকা হবে। ছাগলের আর গোরুর দুধ বাড়িতেই থাকত-তাতে কোনো স্বাদ পাওয়া যেত না। ছাতুর রুটি খেতুম— ঠিক চামড়ার মতো শক্ত। হলুদ ভুট্টোর দানা পিষে তা দিয়ে রুটি হতো মোটা মোটা, কেমন একটা বোঁটকা গন্ধ ছাড়ত তাতে। যতই খিদে পাক না কেন এ ভাখরী খেতে আমার মোটেই মন চাইত না। গলা দিয়ে নাবত না। এ বিস্বাদ ভাত আমি গুড় দিয়ে মেখে কাদা কাদা করে খেতুম। ছোট ছোট থালায় এগুলোই বাচ্চাদের সামনেও ফেলে রাখা হত। অবশ্য বেনের দোকানে ভাল ধান চাল যে পাওয়া যেত না তা নয়, কিন্তু সেগুলো আমাদের মতো গরীবদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। সেগুলো খেত বামুনবা আর ধনীরা.

রেশনের এই পচে যাওয়া, নষ্ট হয়ে যাওয়া ধান, চাল খেয়ে সবারই পেট ছাড়ছে, শরীর দিন দিন ভেঙে পড়ছে, চলতেই চায় না। বাড়ি থেকে খেতে যাবার পথে ভাই-বোনগুলো যেখানে সেখানে পায়খানা করতে বসে পড়ত, তারপর জামা তুলে হাঁটতে থাকত মার পিছু পিছু। বাগানে এসে পড়লে মা জল দিয়ে শুচিয়ে দিয়ে গাছের তলায় ওদের বসিয়ে নিজে কাজে লেগে যেত। ঘুঁটে দিত, কাপড় কাচত, শাক-সব্জি তুলত, আখ কাটত। এদিকে বাচ্চাগুলো মাটিতে বসে সেখানকার মাটিই খুঁটে খুঁটে খেয়ে যেত। মাটি খেত বলে হীরা আর শিবো সবচেয়ে বেশি মার খেত। আমাদের বাড়ির দেয়ালের চুণের অংশটুকুর প্রায় সবটাই ওরা খাবলে খাবলে পাঁপড়ের মতো হাত নিয়ে কচমচ করে খেত। শেষে মা বিরক্ত হয়ে ওদের হাত মুখে গরম ছ্যাঁকা দিত। ফলে, ওসব জায়গায় সাদা শ্বেতির মতন দাগ হতে লাগল। মা এ দুজনদের হাতে কাপড়ের থলে করে বেঁধে রাখত, কাপড়ের থলে যখন তাদের হাতে টিকত না তখন পাতলা চামড়ার থলে করে হাতে বেঁধে রাখত। এতে মাটি খাওয়া বন্ধ

হল ঠিকই, কিন্তু ওরা কোনো কাজও করতে পারত না, হাতগুলো থেকেও না থাকার মতন। ওভাবে চামড়ার থলে হাতে বাঁধা অবস্থাতেই ওরা খেতে আসত। মুখে মাছি বসলেও তাড়াতে পারছে না, হাত দিয়ে চুলকোতে পারছে না এমন করুণ ওদের অবস্থা। আসতে যেতে যারাই ওদের ওভাবে দেখত, তাদেরই দয়া হত। অনেকে জিজ্ঞেসও করে ফলত, "বাছাদের হাতে ওগুলো কি বেঁধেছিস রে?"

"মাটি খায়, কি করি বল?" মা জবাবে বলত।

"কাণ্ডখানা দেখ। তা বাপু, ছেলেপুলেদের হাত কিন্তু খোলা থাকাই ভাল। ওরা মনের মতন এটা ওটা ধরে ফেলতে পারে, হাগতে মুতভেও সুবিধে, চুলকোবার দরকার হলে সেটাও পারে, মুখে চুল এলে সরাতে পারে। নিজেরা নিজেদের নিয়ে থাকতে পারে, এসব কাজে হাত তো লাগেই, ওভাবে বন্ধ করে রাখা কেন," এরকম কত কি তত্ত্ব কথা মাকে ওরা শুনিয়ে যেত।

এসব শুনে মার মনটাও খারাপ হত, ছেলেমেয়েদের সেই থলে বাঁধা হাত আর করুণ মুখ মা আর সইতে পারত না। মা তখনই ওদের হাত থেকে থলেগুলো খুলে নিত, সেই সঙ্গে শাসাতও, "দেখ, থলেগুলো খুলে নিচ্ছি, কিন্তু ফের যদি দেখি মাটি খেতে লেগেছিস তবে বঁটি দিয়ে হয় আঙুলগুলো কেটে নেব নয়ত জানেই মেরে দেব।" হীরা আবাব এবই মধ্যে চালাকি করত। কাদামাটি খেয়ে তার ওপর চট করে জল খেয়ে ফেলে মুখটা কুলকুচি করে ধুয়ে ফেলত। পায়খানায় বসে যখন পাতলা কাদার মতো পায়খানা বেরোত, তা দেখে মা ওখানেই ওকে লাথি লাগাত। যাতে মাটি আর না খায় সেজন্য অন্য খাবার দিয়েও কোনো ফল হয় নি। সে খাবার খেয়েও ওরা ফের মাটি খেত। মাটি যেন ওদের কাছে মণ্ডা মিঠাই। মাও তো আর সব কাজ ফেলে ওদের নিয়েই পড়ে থাকতে পারে না— তাহলে চলবে কি করে? তাই ছেলেমেয়েদের মাটি খাওয়াও চলতে থাকল, আর ঐ মাটি খেতে খেতেই ছ্যাকরাগাড়ির মতো ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে বাড়তে থাকল। হীরা আর শিবার পরের ভাইবোনগুলোও ওদের দেখে মাটি খেতে শিখে গেল।

এদিকে আনসার ঘরকন্না ভালই চলছে। এখন সে খানিকটা সুখের মুখ দেখতে পাচ্ছে। ওকে এখন আর মাঠে কাজে বেরুতে হয় না, ভাইবোনদের পায়খানা পেচ্ছাবও পরিষ্কার করতে হয় না, আট ন'টা লোকের ভাখরীও বসে বসে করতে হয় না, এতগুলো লোকের একরাশ বাসনও মাজতে হয় না, এ বাড়ির চারটে বড় বড় ঘরও আর এখন ওকে ঝাড়ু দিতে হয় না। এ সব থেকেই ও এখন মুক্তি পেয়েছে। এটাই ওর সবচেয়ে বড় আনন্দের ব্যাপার। স্বামী-স্ত্রীর দুজনের রান্না-বান্না আর দুটো ঘর ঝাড়পোঁছ করলেই তার চলে যায়। তারপর সারাদিন বাড়িতে বসে বসেই কাটাত। মামা এখন ঘরের খাবার খাচ্ছে তাই আনসা মামার জন্য গুজরাতিদের বাগানে ভাখরী নিয়ে যায়।

নদীর ধারে গুজরাতিদের একটা খেত ছিল। সুন্দর উর্বর, কাল মাটির বাগান। পুরো খেতটা কুড়ি একরের মত হবে। নদী থেকে প্রচুর জল আসত। সবুজ ফলে ফুলে ভরে থাকত খেতটা। ভাখরী পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে ঐ খেত থেকে কিছু

আনাজপাতি নিয়ে ফিরত আনসা। কখনো সখনো মাকেও তা থেকে ভাগ দিত। নদীর ধারে ঘুরে ঘুরে গোবর কুড়িয়ে তা দিয়ে ঐ খেতেরই এক ধারে ঘুঁটে দিয়ে যেত। বাড়ি ফেরার সময় আনাজপাতির সঙ্গে ঐ ঘুঁটে আর শুকনো ডালপাতাও ওর মাথায় চড়ে আসত— ওতে জ্বালানি হবে। মামা এখন শখ করে ওর জন্যে পাঁচগজী শাড়ি কিনে আনে। ওকে আর ন'হাতি শাড়ি পরতে দেয় না। সেই শাড়ি পরে আনসা আসত আমাদের খেতে, ভাইবোনেদের সাথে একটু গল্পসল্প করে যেত— কোনদিন সন্ধেবেলায় ওর নিজের বাড়ি ফেরার পথে, নয়ত বা হাটের দিনে, দিনের শেষে।

আনসার সঙ্গে আমার বেশি ভাব ছিল, খুব জমতও তাই। যতদিন আনসা আমাদের সঙ্গে ছিল ততদিন আমরা একসঙ্গে মিলে অনেক কাজই করেছি। যেগুলো লুকিয়ে চুরিয়ে করতে হত, তা নিয়ে কত শলাপরামর্শই না করতুম। আমার হয়ে আনসা ঘুঁটে দিত, স্কুল থেকে ফিরলে ওই তো আমাকে খেতে দিত। ছোটবেলা থেকেই চান ও-ই করাত আমাকে। আমার যেমন আনসার ওপর ভীষণ টান ছিল, ও-ও আমায় তেমনি ভালবাসত। আমি বাড়ির প্রথম ব্যাটাছেলে বলে ছোটমামা আমাকে গোড়া থেকেই খুব ভালবাসত। আনসা এখন আলাদা থাকলেও ওর বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা চলছিল। আনসা যা যা মুখরোচক রান্না রাঁধত যেমন ভাল ফোড়ন দিয়ে ডাল, তেলেভাজা জিনিস তার ভাগ আমিও পেতুম। কখনো সখনো মামা কল নিয়ে গুড়ের কারখানায় গেলে রাতে আনসার কাছে গিয়ে থাকতুম আমি। ওর বাড়িতেই আমিও যেন দুদণ্ড শান্তি পেতুম।

আনসা চলে যেতে সংসারের পুরো কাজের ভাগগুলো একটু অদল-বদল করতে হল মাকে। এই যেমন, মা এবার আট ন'বছরের হীরাকে নিজের সঙ্গে হাতে হাতে কাজে লাগালে। মাটি খেয়ে খেয়ে হীরার গায়ে কোনো জোরই ছিল না, কোনো কাজই সে ঝুঁকে করতে পারত না, একটা কাজ করতে করতে কাজের মাঝেই ধপ করে বসে পড়ত। কেঁচো যেমন মাটিতে আস্তে আস্তে ঘেঁষটে ঘেঁষটে চলে হীরাও তেমনি ঘর ঝাড়পোঁছ করা, বাসন মাজা, পেঁয়াজ কাটা, যতটা ওর শরীরে সয় ততটাই ভাখরী করা, সকালের খাবার মাঠে পৌঁছে দেয়া, এসব কাজ আস্তে আস্তে সারতে লাগল। অবশ্য এর জন্য মার গালাগালও ওর কপালে জুটত।

হীরা ছিল মার মতনই কাল, বাজরার রং, নাক বোঁচা মাথায় খাটো ছিল— তেমন বাড়ই হয় নি। এদিকে মাটি খেয়ে খেয়ে মুখ রক্তশূন্য ফ্যাকাসে ফোলা ফোলা লাগত। সব সময় রুগ্ন দেখাত ওকে— ভারী কোনো জিনিস ও তুলতেই পারত না। এমনিতেই কাহিল হয়ে যেত। মাটি খাবার জন্য দিনে অন্তত একবার ও আমার হাতে মার খাবেই। ওর ঐ মাটি খাওয়া আমি একেবারে সইতে পারতুম না। ওকে দেখে দেখেই তো পরের ভাই-বোনগুলোর মাটি খেয়ে ক্রিমি হল— ওরাও ওরকমই রোগা হয়ে গেল। মাটি খাওয়া না ধরলে হয়তো ওরা আনসা বা আমারই মতন সুস্থ সবল হতে পারত। এটা যখন মনে ভাবতুম তখন হীরার ওপর আমার ভীষণ রাগ হত। আমার ঐ ভাইবোনগুলো রোগা হয়েছে বলেই না আমার খাটুনি এত বেড়েছে।

সকালের খাবার নিয়ে হীরা মাঠে এলেই আমি বলে উঠতুম, "দেখি মুখ খোল তো।" সেও তো ধড়িবাজ কম নয়, গাঁ থেকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ঢক ঢক করে জল খেয়ে নিত। তাই জল খাবার আগেই ওকে আমি ধরতুম; মুখ হাঁ করতে বলতুম। মুখ খুললেই ওর জিভে মাটির দাগ যেই না পাওয়া অমনি ওখানেই পিঠে লাগাতুম দুটো কিল। "মাটি আর কত খাবি হতভাগী? মাটি খেয়ে খেয়ে বাড়ির তো আর কিছুই রাখছিস না," এ সুযোগে আমি একটু দাদাগিরি ফলিয়ে নিতুম ওর ওপর। বাবা যেমন গালাগাল দিত তেমনি গালাগাল দিতুম ওকে। বেচারা রোগা বোনটি আমার শুধু মাটি খাবার অপরাধেই আমার হাতে মার খেয়ে মরত আর নিজে অসহায় বলে মনে মনে বিড় বিড় করত। কখনও আমাকে উল্টে গালাগালও দিত না যে তা নয়। খেত থেকে দুধ নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আমাকে আরো গালাগাল দিতে দিতে যেত, "এত করে খাবার নিয়ে এলুম, তোর পেটে ঢাললুম, আবার আমাকেই কিনা মাটি খাবার জন্য মারা হচ্ছে? কাল থেকে আর ভাখরী আনি কিনা দেখিস।" ফেরার পথে একা যেতে যেতে হীরা মুঠো মুঠো মাটি খেয়ে সকালের মারের বদলা নিত— ও রাস্তায় তো ওকে দেখবার কেউ ছিল না। আমার চেয়ে হীরা ছিল আড়াই তিন বছরের ছোট, শিবা হীরার চেয়ে দুবছরের মতো ছোট ছিল— ওদের দুজনের মধ্যে ভাবও ছিল খুব বেশি। সুন্দর আর চন্দ্রার জন্যে একটা পুরোন কাঠের বাক্স মেরামত করে তার নীচে চাকা লাগিয়ে মানুষে টানা গাড়ি করা হল। এতে এ দুই যমজ বোন বসত, আর এটাকে টেনে নিয়ে খেতে যেত হীরা আর শিবা— দুভাই বোন। এরা নিজেরাই ভীষণ রুগ্ন ছিল ব'লে দু যমজ বোনকে ওরা কোলে করে নিতে পারত না। সেজন্যে মার এই ব্যবস্থা। টানতে টানতে হাঁপিয়ে গেলে একটু দাঁড়িয়ে দম নিয়ে আবার চলা। পেছনে পেছনে মা চলেছে আস্তে আস্তে— বড় পেট নিয়ে, মাথায় খাবারের ঝুড়ি। আর সঙ্গে যেত ছাগল ও তারও দুটো বাচ্চা— যেন ওরাও আমার মারই সন্তান। ছাগলের বাচ্চাগুলো একটু বড় হলেই মা অবশ্য ওদের বেচে দিত, কিন্তু ততদিনে ছাগলটি আরও নতুন দুটো শাবকের জন্ম দিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন মানুষে ও ছাগলে বাচ্চা নিয়ে এই চলাচলের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল ছিল— আমরা মস্করা করে বলতুম ছাগলের বাচ্চাগুলোকে মা বেচে না দিলে মা আর মার ছাগল কেমন সুন্দর তাদের সারি সারি বাচ্চা নিয়ে জোড়ে জোড়ে চলত!

আমাদের চাষের জমিতে জল নিয়ে যাওয়ার যে নালা ছিল তারই ধারে ধারে শিবা এ ছাগল চরাত। চরাতে চরাতেই ও নিজে খানিকটা মাটি খেয়ে নিত। শিবা এমনিতেই হীরার চেয়েও বেশি রোগা ছিল, ওর মুখ সব সময়ই ফোলা থাকত। নাকটা বসে গেছে। সারা গাও ফোলা ফোলা, হাত-পা কাঠির মতো, পেট ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে। এরকম চেহারায় গলির ছেলেরা ওকে নাক বোঁচা বলে ডাকত। আমরাও ওর চেহারা নিয়ে ঠাট্টা যে না করতুম তা নয়। ওকে আর স্কুলে ভর্তি করাই হয় নি। কে যেন মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "খোকাকে স্কুলে দিস নি?"

"এত রোগা ছেলে, স্কুলে আর দিই কি করে, বল? মাস্টারের মার খেতে খেতে কোনো সময় যদি মরেই যায়? তাছাড়া স্কুলের বন্ধ ঘরে বসে বসে ওর রোগ আরও

বাড়বে বই কমবে না। তার চেয়ে এখানে খোলামেলায় ঘুরছে, বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে, এটাই তো ভাল। স্কুলে শিখে পড়ে কি আর এমন দিগগজ হবে। একজন তো পড়ল। পড়ে টড়েও তো শেষে সেই মাটির কাজেই হাত লাগাতে হল।" এই সব বলে মা ওদের চুপ করাত।

আমি যখন ক্লাস ফোরে পাস করে উঠি, শিবা তখন ছ'য়ে পড়েছে। আমি তখনই মাকে বলেছিলুম শিবাকে স্কুলে ভর্তি করাতে। বলেছিলুম, "পড়লে ছেলেরা বুদ্ধিমান হয়, ওদের বুদ্ধি বাড়েও। তাছাড়া স্কুলে গেলে ওর মাটি খাওয়াটাও বন্ধ হয়ে যাবে।" তখন মা বলেছিল, "তাহলে মাঠে কাজ কে করবে বল? তুই পড়ছিস পড়। সবাইকে স্কুলে পাঠিয়ে আমি কি ভিক্ষে করে বেড়াব? খেতে খাটবার লোক আছে আমাদের?" আমি তা সত্ত্বেও মাকে বোঝাতে চেষ্টা করতুম, "স্কুলে পডলে পরে ভাল চাকরি পাবে, তখন তোমরা বসে বসে খেতে পারবে।"

মা বলত, "আর তাহলে আমরা কুনবীদের চৌদ্দপুরুষ ধরে চলে আসছে যে চাষবাসের কাজ তা কে সামলাবে? আমরা কি জমিদার যে বসে বসে খাব আর আমাদের ছেলেরা স্কুলে পড়বে? নে, খুব হয়েছে, চুপ কর তো, যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলুক।"

আমি আর শিবা একা থাকলে আমি শিবাকে বলতুম, "এই শিবা, বাবাকে বল স্কুলে ভর্তি করে দিতে।"

"না বাবা, আমি স্কুলে টুলে যাব না। মাস্টাররা বড্ড মারে।"

"বাড়িতে বসে বসেই বা কি করবি?"

"বাড়িতে বসব কেন? খেতে কাজ কবব. চাষ করব," সে খেতে থাকবার স্বপ্ন দেখছে।

বাবাও তো এটাই চায়। এক ছেলে স্কুলে পড়বে আর একজন চাষে। মনে মনে এই ঠিক করে রেখেছে।

রাতে আমি গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে এলে শিবা আমার পিছু ধরত, আমার সাথে গলিতে খেলতে আসত। গলিতে একটা ছাউনির তলায় বসে আমরা ছোটরা গল্প করতুম। যেদিন আমার সিনেমা যাবার ইচ্ছে হত সেদিন আমি শিবাকে একটা গুল মেরে বাড়িতেই বসিয়ে রেখে একাই বেরিয়ে পড়তুম। আমার এ চালাকি যেদিন ও ধরে ফেলত সেদিন আর রক্ষে ছিল না, সেদিন ও আমাকে ছাড়ত না, শেষ পর্যন্ত ওকে সিনেমায় নিয়ে যেতেই হত। কখনও রাস্তায় একটা পয়সা কিছু খাবার কিনে হাতে দিয়ে ফিরে যেতে বলতুম, ওকে বোঝাতুম আমি বন্ধুর বাড়িতে পড়তে যাচ্ছি। কখনও বা ধমকেও দিতুম। ওর বাড়িতে মন টিকত না— তাই আমার সঙ্গ ছাড়তে চাইত না।

হীরামাকে রান্নাঘরের কাজে জোগান দিত। চার সাড়ে চার বছরের ধোঙুবাজ সুন্দরা ও চন্দ্রাকে হাততালি দিয়ে দিয়ে কোনোরকমে আটকে রাখত। দরকার পড়লে শিবাকেও এই একই কাজ করতে হত বলে ও বাড়িতে মোটেই বসে থাকতে চাইত না, আমার পিছু পিছু গলিতে আসতে চাইত। রোগা বলে খেলাধুলোয় ও

না, ওর বয়সী ছেলেরা এ নিয়ে ওর সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ারকি করত। ওদের সঙ্গে একা পেরে উঠত না বলে ও আমার ভরসায় আমারই সঙ্গে গলিতে আসতে চাইত, খেলতে বা মজার মজার গল্প শুনতে। নিজে যেসব কাজ করবার কথা চিন্তাও করতে পারত না, অন্যদের সেগুলো করতে দেখলে ওর মন ভরে যেত।

দুপুরে ছাগল চরাবার ফাঁকে ফাঁকে শিবা ভেজা মাটিতে বসে কাদামাটি দিয়ে বলদ তৈরি করত, উনুন বানাত, সংসারে কাজে লাগে এমন সব বাসন-কোসন মাটি দিয়ে বানাতে পারত। খেলার বাগান তৈরি করে তাতে মাটির কুয়ো বানাত, ওতে জলও ছাড়ত। তারপর মাটির বলদগুলো সেই বাগানে ছেড়ে দিয়ে গান গাইতে গাইতে কুয়োর জল বাগানে ছাড়ত। নালার ধারে ধারে যে ঘাস গজাত শিবার কাছে সেগুলো ছিল ধান, ওগুলোকে ধান মনে করেই ও খেলত। এদিকে মাটি খাবার তো কোনো বিরাম ছিল না, দীর্ঘকাল মাটি খেতে খেতে ও নিজেই একটা মাটিরই প্রতিমূর্তি যেন হয়ে গিয়েছিল। আর এই মাটিতেই ও বেচারা ওর খেলার সংসারও পেতে বসেছিল। এদিকে ধোণ্ডুবাঈ সুন্দরা চন্দ্রাকে সামলাতে না পারলে নিজেই কান্না জুড়ে দিত, মাঝে মাঝে মুখ পাল্টাবার জন্য মাটিও খেত। এই ছেলেমেয়েগুলো বাড়িতে মাটি ছাড়া আর খাবার যেন আব কিছুই খুঁজে পেত না।

হাটের দিন আনসা যখন বাগানে আসত তখন এ বাড়িতে ফেলে আসা ভাইবোনগুলোকে ছিটেফোঁটা চিড়ে মুড়ি দিত খেতে। অনেকটা যেমন হাঁস মুরগিকে ছড়িয়ে দেয় তেমনি। আমরা ছোট ছোট ভাইবোনেরা এটুকু পেয়েই কি খুশিই না হতুম!

চোখের নিমেষে ওগুলো মণ্ডা মিঠাই-এর মতোই হাত চেটেপুটে খেয়ে নিতুম। এসবই বাবার চোখের সামনেই হত।

এ উঞ্ছবৃত্তিতে বাবার নিজের কোনো বিকার হত না, মনের আনন্দে চিড়ে মুড়ি সেও খেত। কিন্তু ছেলেমেয়েদের জন্য বাজার হতে নিজে থেকে বাবা কোনোদিন কিছুই এনে দিত না, গালাগাল দিয়েই ছেলেমেয়েদের পেট ভরিয়ে দিত। কখনো সখনো মা আমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এলে বাবার হত ভীষণ রাগ, বলত, "খাবার খাওয়া হচ্ছে, হারামজাদী কোথাকার, জিব পাল্টাতে গিয়ে টাকা যাচ্ছে জলে। এসব কখখনো করবি না, তার চেয়ে পেট ভরে ভাখরী দিবি। ছোলা মুড়িতে পয়সা নষ্ট করার চেয়ে জোয়ার আর চাল কেনা ঢের ভাল। রেঁধে খাওয়াবি।"

মা কিন্তু আমাদের লুকিয়ে চুরিয়ে এনে খাওয়াত, আমরাও লুকিয়ে চুরিয়ে খেতুম। এসব খেলে কাজের উৎসাহ আমাদের অনেক বেড়ে যেত।

চার

ভোর হবার সাথে সাথে সূয্যি ওঠার একটু আগে থেকেই জমিতে জল দেবার কাজ শুরু হয়ে যেত। মাথার ওপর সূয্যি এলে একটু জিরিয়ে নেবার পালা। তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বকাবকি শাসন করবার জন্যে কেউ থাকত না ধারে কাছে।

জমির একদিকটা গাঁয়ের দিকে, অন্যদিকে ধূ ধূ মাঠ। ওপরের দিকে ছিল একটি কেল্লা, নীচের দিকে মেথরদের মাঠের পর মাঠ। এরকম খোলামেলা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করত। কেবলি মনে হত যা দেখি নি তা দেখে আসি গিয়ে। মাঠের মাঝেই তো কত জিনিস দেখার ছিল। কেল্লাটার চারধারে উঁচু দেয়াল, মাঝখানে ছিল খাদ। ভেতরে বিশাল বিশাল ঘর, কত সুড়ঙ্গ আর গোপন পথ। দুচোখ যেদিক পানেই যায় শুধু ধূ ধূ মাঠ, ওপরে নীল আকাশ, মাথার ওপর কড়া রোদ এরই মধ্যে আমি একা একা এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেন যে ঘুরতুম তাই কি জানি! ঘুরতে ভাল লাগত, আনন্দ পেতুম ব্যস এটুকুই জানতুম। কেল্লাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে মনে অনেক কিছুই কল্পনা করে নিতুম। কত লড়াইই না এককালে হয়েছে এখানে, কেল্লা থেকে যখন তোপ ছাড়ত তখন কিরকম হত, এরকম আরও কত ভাবনা, কত জল্পনা-কল্পনা। এসব ভাবতে ভাবতে একসময় মাঠেতে আমাদের কুঁড়েঘরটার সুমুখে ঠিক এসে পৌঁছে যেতুম, এখন জমিতে জল ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। এতক্ষণ মাঠে ঘাটে চোখ যা দেখেছে, কান যা শুনেছে, মন যা ভেবেছে, কল্পনা করেছে, সবই জমা হয়ে রইল মনের গভীরে।

বর্ষা শুরু হয়ে গেলে জমিতে করার আর বিশেষ কিছু থাকত না। কেবল গোরুমোষেদের বসে বসে লতাপাতা খাওয়াতে হত। আবার এক জায়গায় বেশিক্ষণ বসে থাকলেই মনের ভেতর সিনেমার চিন্তা উদয় হত। ভাবতুম রাতে সিনেমায় গেলে মন্দ হয় না। তবে ট্যাঁকে পয়সা থাকত না। পকেটের যখন এরকম অবস্থা তখনই পদম আনার খেতের কথা মনে পড়ে যেত। ওদের জমি আমাদের জমির লাগোয়া। জমিটা ওর নিজেরই, কিন্তু বয়স হয়েছে তো তাই নিজে আর এখন চাষ করতে পারে না, ভাগ দিয়ে দেয় বা মুনিষ খাটিয়ে চাষ করায়। ওদের ছেলেপুলে ছিল না। যা ফসল হত স্বামী-স্ত্রীর চলে যেত। বুড়ো জমির যত্ন বড় একটা নিত না, খুব বেশি হলে একটা ফসল ওঠাত। বরাবর ও জমিতে জোয়ার আর অড়হর ভাল ফলত। জোয়ার গাছের ফাঁকে ফাঁকে আগাছাও হত প্রচুর। কোনটা জোয়ার গাছ আর কোনটা আগাছা বোঝা দায় হত। আমি এখানেই বসে বসে মাঝে মাঝেই আমাদের গোরু মোষেদের মধ্যে ঘাস কাটতে লেগে যেতুম। যেসব গাছে জোয়ারের দানা তখনও বেরোয় নি সেসব গাছ আমি উপড়ে ফেলে সন্ধেবেলায় হাটে গিয়ে ভাল দামে বেচে দিতুম। পয়সা যা পেতুম তাতে হাটের দোকানে এক প্লেট ভাজাভুজিও খাওয়া যেত আবার একটা সিনেমাও হয়ে যেত। সন্ধেবেলায় পদম আন্না জমিটা ঘুরে ঘুরে দেখতে আসত।

তাই চারটে নাগাদ আমি জলের ধার পেরিয়ে ওদের জমিতে চলে যেতুম। চার দিকটা ভাল করে চোখ বুলিয়ে দেখে নিয়ে ঘাস টাস যা পেতুম ঝপাঝপ কেটে নিতুম। একবার হল কি, একটা দুটো গাছ সবে কেটেছি এমন সময় পায়ের শব্দ। আমি কাস্তেটা চট্ করে আমাদের জমির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে ঝোরার দিকে চলে গিয়ে পায়খানায় বসার ভঙ্গীতে বসে পড়লুম। পদম আন্না কাছে আসতেই পায়খানা হয়ে গেলে যেভাবে হাত পা ধোয় সেসব করে টরে উঠে পড়লুম। ও ভাবলে আমি সত্যি সত্যি পায়খানাই করছিলুম এতক্ষণ ওখানে বসে বসে। আমায় বললে, "খোকা, আমার জমিতে ঢুকে কে যেন ঘাস কাটছিল রে।"

"তাই নাকি? আমি অবশ্য ঝোরার দিকে বেশি থাকি না। আমরা তো আমাদের জমিতে থেকেই পাহারা দিই।"

"এখুনি কে যেন ঢুকেছিল মনে হল। আর এই দ্যাখ, দু চারটে গাছও কেটে রেখে গেছে।'

"আমিও তো এক্ষুনি এলুম এখানে। আমাদেরও পাঁচ-সাতটা বাণ্ডিল কেউ নিয়েছে মনে হচ্ছে। আমি না হয় কাল থেকে এদিকটা টহল মারব। তখন তোমাদের জমির ওপরেও নজর রাখব। দেখব তো কে চুরি করে নিয়ে যায়।"

"দেখিস তো বাবা। কাউকে দেখতে পেলেই হাঁক দিস।"

"আচ্ছা, দাদু।"

আমি আবার ঝোরার দিকে ঘাস কাটতে লেগে গেলুম। আন্না বগলে হাত গুটিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। যখন সে গাঁয়ের দিকে চলে গেছে তখন আমি আবার খচ খচ করে ঘাসের সাথে সাথে জোয়ার গাছও কাটতে লাগলুম। কাটা শেষ হলে গাঁয়ে গিয়ে এগুলো আন্নার সৎভায়ের কাছে বেচে দিলুম। এরা দুজনে পাশাপাশিই থাকত কিন্তু সৎভাই চাষের কাজ না করে কাছারীতে কেরানির চাকরি করত। ওকে তাই মোষের খাবার বাইরে থেকে কিনতেই হত। দশেরার সময় আমার এই অন্যের জমির ঘাস, জোয়ার গাছ লুকিয়ে কেটে বেচে দেবার ব্যবসা ভালই জমত, দুটো পয়সার মুখও দেখতুম, জমাতেও পারতুম।

বাড়িতে অবশ্য এসব কারুরই জানার কথা নয়, কেননা এই বাড়তি ঘাস খড় এসব আমাদের ঘাস খড়ের সাথেই মিশিয়ে রেখে দিতুম। মাঠে আমাদের যে কুঁড়েঘরটি ছিল সেখানেই ঝোরার দিকটায় ওগুলো রাখা থাকত। দুপুর গড়িয়ে গেলে একটু গোছগাছ করে আমি গণপাকে "বাড়ি যাচ্ছি" বলে সোজা বাজারে যেতুম। কেউ ধরতেই পারত না। আমি এমন ভাব দেখাতুম যেন মাঠ থেকেই ফিরছি। এই করে করে আমার হাতে একটু পয়সা জমল, মনে একটু ভরসা এল।

আমাদের জমিটার কাছেই সঙ্ঘের একটা শাখা ছিল। সেখানে জনা পঁচিশ-তিরিশ যুবক ও কিশোর জড়ো হত, পরনে তাদের খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা সার্ট, মাথায় কাল টুপি। এরা ঐ মাঠে নানা ধরনের খেলা খেলত, আবৃত্তি করত, গান গাইত। ওদের ঐসব দেখতে আমার খুবই ভাল লাগত। জলের দিকটায় থাকলে আমার আর ওসব দেখতে যাওয়া হয়ে উঠত না। বর্ষা একবার শুরু হয়ে গেলে মোষেরা চরে

বেড়াত আর আমি ওখানে চলে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখতুম। রোজই গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি, এটা দেখতে পেয়ে ওদেরই মধ্যে কে যেন আমার খোঁজখবর নিতে লেগে গেল। জিজ্ঞেস করলে, "স্কুলে পড়িস?"

আমি বলে ফেললুম, "হ্যাঁ।"

"কোন্ ক্লাসে পড়িস?"

"ক্লাস ফাইভ-এ।"

"বা! খুব ভাল। আমাদের শাখায় আসিস না কেন, আসবি বুঝলি?"

"আর, গোরুমোষদের কে দেখবে?"

"ওরা আপন মনে চরে বেড়াবে। তুই সঙ্ঘে এসে ভর্তি হয়ে যা।"

"না, বাবা।"

"কেন?"

"আমার কাছে তোমাদের মতো ওরকম জামাপ্যান্ট নেই।"

"নেই তো নেই, যেমন আছিস তেমনিই আসবি।"

আমি যেমন ছিলুম সে পোশাকেই গেলুম। মোষগুলো মাঠে চরে বেড়াত, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেদের সাথে খেলতুম। একটা পা উঁচু করে আর অন্য পায়ে ছুটে ছুটে লুকোচুরি আমি খুব ভালই খেলতুম। আর খেলতুম তু তু কাবাডী। ছুটতে পারতুম খুব জোরে আর কাবাডী খেলায় যাকে একবার ধরতুম জাপটে, তাকে আর ছাড়তে চাইতুম না। ওদের দলের ছেলেদের সাথে গলা মিলিয়ে গানও গাইতুম। এসব আমার খুব ভাল লাগত বলে ওরা ডাকলেই আমি চলে যেতুম। প্রায় দিন দশ এভাবে যাবার পর ওরা আমার নাম দলের খাতায় ঢুকিয়ে নিলে।

সেদিনই দলের নেতা হলদিকর আমার সব খোঁজখবর নিলেন। দুতিন দলের ছেলেরা সামনে বসেছিল, উনি উঠে দাঁড়ালেন আমাকেও দাঁড়াতে বললেন। দলের অন্যদের কাছে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, "এ ক্লাস ফাইভ-এ পড়ে।"

দাড়িকার নামে একটি ছেলে আস্তে আস্তে বললে, "এ তো স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। নইলে আমার সঙ্গে সিক্সে পড়ত।"

হলদিকার একটু অবাক হলেন, "তাই?"

আমার ভারি লজ্জা হল, খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, "হ্যাঁ, সত্যি। মাঠে কাজ করবার লোক নেই, বাবা তাই স্কুল ছাড়িয়ে দিলে।"

"ও! এই কথা। আমরা তোমার বাবাকে বলব আবার তোমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতে, তাহলে খুশি তো?"

"হ্যাঁ।"

ওরা সোজা বাবার কাছে চলে এল। বাবা তখন সবে মোষের দুধ দুইয়ে হাতে হুঁকো নিয়ে তামাক খাচ্ছে আমাদের কুঁড়েঘরটার দাওয়ায় বসে।

"নমস্তে বতনু আন্না, বাড়ি আছ নাকি?"

"রাম রাম," বাবা বুঝতেই পারছে না, এ বামুনরা লাঠি হাতে ওর কাছে আসছেই বা কেন।

ততক্ষণে আমি ঘরে ঢুকে মোষেদের গলায় দড়ি পরিয়ে এসেছি।

"এ তোমার ছেলে?"

"হ্যাঁ," বলেই বাবা আমার দিকে তাকালে। বাবা ভেবেছে আমি বোধহয় কোথায়ও কোনো গোলমাল পাকিয়ে এসেছি।

"খুব বুদ্ধিমান ছেলে তোমার। আমাদের দলে তো বলতে গেলে রোজই আসে।" বলেই ওদের মধ্যে তিনজন সঙ্ঘের ছেলেরা যেমন করে বসে তেমনিভাবে বাবার সামনে বসে পড়লেন।

"খেলতে যায় বোধহয়। কতবার বারণ করেছি। যাস না বললেই কি আর শোনে?" বাবা এখনও ধরতেই পারে নি ওঁরা কি জন্য এসেছেন।

আমার দিকে তাকিয়ে এবার বাবা হুঁকোটা নামিয়ে রাখলে।

"তোমার ছেলে খেলাধুলোয়ও বেশ ভাল। ওর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করো না, স্কুলে ভর্তি করিয়ে দাও আবার ওকে।"

"ও! এই ব্যাপার," এতক্ষণে বাবার মাথায় এসেছে পুরো জিনিসটা।

"ছেলেকে স্কুলে পড়তে পাঠালে অসুবিধে হবে তোমার?"

ওঁরা শুধোলেন।

"মাঠের কাজ তাহলে কে করবে, দাদাসাহেব?"

"তুমি করবে। ছেলেদের তো পড়ানোই উচিত।"

"আমিও তো কাজই করছি। আমি কি বসে বসে খাচ্ছি, না বসে বসে খেতে চাইলেই কেউ খাওয়াবে? বাড়িতে পাঁচ সাতটা খাবার লোক, আর খাটবার মধ্যে আমি একা। এতগুলো পেট খাওয়াতে গেলে একজনের শুধু খাটলে চলে কখনও? ছেলেটাও মাঠের কাজে, ঘরের কাজে হাত লাগাচ্ছে তবেই না দুবেলা খেতে পাচ্ছি আমরা সবাই?"

এর পরে ওঁরা চুপ করে গেলেন, ভেবেই হয়তো পাচ্ছেন না কি বলবেন।

একজন এরই মধ্যে থেকে বললেন, "ছেলেটা চালাক চতুর আছে, পড়াশুনা করলে ভাল চাকরি পেয়ে যাবে, তখন তো তোমাদের আর খাওয়াপরার কোনো কষ্ট থাকবে না।"

বাবা শুনে একটু হেসে বললে, "আর ততদিন কি খাব? ছেলেটা চাকরি পেয়ে মাইনের টাকা ঘরে আনতে আনতে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে তো?"

"এ অবস্থায় যেমন করে পার সেভাবেই পড়াবে। ওতে ওরও ভাল হবে, তোমাদেরও মঙ্গল হবে। ছেলেটা বুদ্ধিমান তাই বলছিলুম আর কি।"

"তা সে বুদ্ধিটা তো চাষবাসেও লাগাতে পারে। ওতেও তো লাভই হবে। আমাদের বাপ ঠাকুদ্দা থেকে চলে আসছে চাষবাসের কাজ। ও উন্নতি টুন্নতি যা হবার চাষেই হোক," বাবার বিরক্তিটা এবারে একটু স্পষ্টই হল, বাবা হয়তো ভাবছে কোথাকার ছেলেছোকরা সব, আসতে যেতে পথে কাউকে পেলে তো একটু জ্ঞান দিয়ে দিলে। আমিও একটু ঘাবড়ে গেলুম, কি করব বুঝে উঠতে পারছি না।

হলদিকারও আর জুৎসই জবাব খুঁজে পাচ্ছেন না। উনি আর কি করবেন, একটু

হাসলেন মাত্র। আর একজন বললেন,"একটু বেশি পড়লে, বুদ্ধিটা চলে ভাল। কোর্ট কাচারীর ব্যাপারস্যাপার বুঝতে পারবে, পড়তে পারবে সব, অসুবিধেয় পড়তে হবে না।"

বাবা এবারে সুবিধে পেয়ে গেল, বললে, "কেন? আমি তো ওকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছি? ক্লাস ফাইভ অবধি তো ও পড়েছে।"

"আরও বছর দুই পড়াও। ক্লাস সেভেন অবধি হোক। দেখবে অনেক সুবিধে হবে।"

"কি আর সুবিধে হবে বলেন? আপনাদের ছেলেরা তাড়াতাড়ি পড়তে পারে, তাড়াতাড়ি লিখতে পারে সেটা মানিয়ে যায়। আপনাদের তো আর চাষবাস করে খেতে হয় না। লিখে পড়ে আপনাদের জীবনটা একরকম কেটে যায়। আমাদের ছেলেদের এভাবে স্কুলে পড়ালে তারা তো চাকরি নিয়ে নেবে। তখন আমাদের এ জমিজমা, চাষবাস এ সবের কি হবে?"

"তাই তো," ওঁরাও মাথা নাড়লেন এবার।

"কথায় বলে না, বামুনের বাড়িতে লেখাপড়া, মেথরের বাড়িতে গান আর চাষীদের বাড়িতে ধান, কি বলেন গো বাবুমশায়রা?"

"তা তো বটেই।"

"এ ছেলেটাকেই ধরেন না কেন? আজ ওকে স্কুলে পাঠাতে শুরু করলে, কাল কি আর ও গোবর, চোনা এতে হাত দেবে? আপনারা শিক্ষিত, আপনারা কি গোরুমোষের গোবর, চোনা ঘাঁটেন?"

এবারে ওঁরা সবাই একদমই চুপ, কারো মুখে রা'টি নেই। বাবা তখনও বলেই যাচ্ছে, "আমি বলছি না যে আপনারা কোনো অন্যায্য কথা বলছেন। তবে আমি বলছি কি আপনারা চলছেন আপনাদের মতো। আমাদেরও আমাদেরই মতো, আমাদের চাল-চলন মতো চলতে দিন। চাষীর ছেলে হিসেব কত্তে পারলেই তো হলো আবার কি চাই? ওকে পড়িয়ে কি উকীল ব্যারিস্টার বানাতে হবে?"

বাবা এখন খুব বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে, এরকম বক্তৃতা দিতে ওর ভালই লাগছে। বাপ-ঠাকুর্দার আমল থেকে বাবা যা দেখে আসছে সেটা ছিলই মজ্জায় মজ্জায়, তার সঙ্গে মিশেছে ওর নিজের একগুঁয়ে স্বভাব। যাঁরা এসেছিলেন, প্যান্ট ঝেড়ে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লেন, বুঝলেন বাবা যেটা বুঝেছে বা ধরে রেখেছে সেখান থেকে ওকে নড়ানো যাবে না। তা-ও প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে এরই মধ্যে একজন বলে গেলেন, "আমাদের মতে ওকে এখনও পড়ানো উচিত। তাতে ও চাষবাসও আরও ভালভাবে করতে পারবে।"

"চাষবাসে কেমন করে উন্নতি করতে হয় সেটা না হয় আমিই ওকে দেখিয়ে দেব'খন। আর এরই জন্যেই তো চাষের স্কুলেই ভর্তি করে দিয়েছি ছেলেটাকে," বাবা হাসতে হাসতে বলে গেল, ওর চোখে-মুখে জয়ের চাপা উত্তেজনা বেশ স্পষ্ট।

"ঠিক আছে, আজ তাহলে উঠি," ওঁরা চলে গেলেন।

আমি ভেবেছিলুম বাবা হয়তো শেষ পর্যন্ত ওঁদের কথাটাই মেনে নেবে। যতই

হোক ওঁরা হলেন বামুন, শিক্ষিত বড়ঘরের ছেলে সব। ভেবেছিলুম বাবা মনে মনে বিরক্ত হলেও বাইরে ওঁদের কথাটাই মেনে নেবে, হয়তো বলবে, "আন্দাকে দিই আবার স্কুলে ভর্তি করে।" তা, সেসব হল আর কোথায়? বাবার ঐ হেঁড়ে গলায় কথাবার্তা, চেঁচামিচি, অভদ্র চালচলনের কাছে ঐ তিনজন ভদ্র, শান্ত সভ্য মানুষ ক'টি কোনো দাগই কাটতে পারলেন না। হলদিকার তো উঁচু গলায় কথাই বলেন না। বাবার সঙ্গে ওঁর এর আগে পরিচয়ও ছিল না। এত অল্প সময়ের ভিতর বাবাকে বোঝান তাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বাবার জেদি স্বভাব আমার অজানা ছিল না, কিন্তু কি করব বুঝে উঠতে পারছিলুম না। আমাকে আপনার জন মনে করে আমার ভালর জন্যই এই তিনজন অচেনা শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রলোক আমারই হয়ে বাবার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলে গেলেন এতে আমি খুব সান্ত্বনা পেলুম। মনে মনে ঠিকই করে ফেললুম এঁরাই আমার আদর্শ, আমাকে এঁদেরই মতো হতে হবে। স্কুলে ভর্তি হবার জন্য চেষ্টা করে যেতেই হবে, যেমন করে হোক পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে, শিক্ষিত না হলে ওঁদের মতো হব কি করে?

সন্ধে নেমে এল। বাড়ির দিকে চলেছি, বাবা আগে আগে পিছু পিছু আমি, হাতে গোরুর দুধের বালতি। নাকে দড়ি দিয়ে গোরু মোষকে যেমন নিয়ে যায়, আমিও অনেকটা তেমনি নীরবে চলেছি। পথে থেকে-থেকেই বাবার উপদেশ বর্ষণ হচ্ছে, "চাষীর ঘরের ছেলেদের বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়, ওদের মাঠেতে চাষের কাজই তো শেষপর্যন্ত করতে হবে," এরকম আরও অনেক সারগর্ভ কথা। আমি হুঁ হাঁ করে যাচ্ছি।

বাবার গলার স্বর, কথা বলার ধরন দেখেই আমি বুঝে নিয়েছিলুম বাবা রেগে আছে। আমি যদি হুঁ হাঁ না করে শুধুই চুপ করে থাকতুম তাহলে আর রক্ষে ছিল না। আমাকে রাস্তার মাঝখানে পা দিয়ে চেপে মেরেই ফেলত হয়তো সে সন্ধ্যায়। মনে মনে ভাবছিলুম দুধের এই বালতিটা দিয়ে বাবার পিঠে এক ঘা লাগিয়ে রাস্তার মোড় থেকে বামুনদের গলি দিয়ে ছুটে যদি কোথায়ও পালিয়ে যাই তাহলে কেমন হয়!

পাঁচ

বাবা কোথায় বাইরে যেন গিয়েছিল। সন্ধের অন্ধকার হতে না হতেই আমিও বেরিয়ে পড়লুম, ভাবলুম গলির ছেলেদের সাথে একটু আড্ডা মেরে আসি। স্কুলে আজ কি একটা উৎসব গেছে— তারই মজার মজার গল্প জুড়ে দিয়েছিল ছেলেগুলো সব একজোট হয়ে মেঝেতে বসে। আমি শুনেই যাচ্ছি— আমি যে এখন আর ওদের মতন একজন নই তা ভেবেই আমার মন খুব খারাপ হচ্ছে। ভাবছি এদের জগৎ এখন আলাদা, আমিও অন্য জগতের বাসিন্দে। এদের জামা প্যান্ট একরকম, আমার আরেকরকম, পরনে ধুতি, মাথায় পাগড়ি। ওদের জন্য স্কুল আর আমার বরাতে চাষ। আমি গোরু-মোষের গোবর কুড়োব, আর ওরা স্লেটে পেনসিল দিয়ে লিখবে। যে সুখের ছায়াতে বসে ওরা আড্ডা মারছে, গল্প করছে সে ছায়ার তলায় আর আমার বসা হবে না। সে সুখের ছায়ার বদলে আমার বরাতে আছে খেত খামারের কাদা আর মাটি। বাইরের আঁধারের সঙ্গে মিল রেখেই যেন আমার মনের ভেতরেও কয়লার কালো অন্ধকারই ঘনিয়ে এল।

একাই ফিরছি ঘরের পথে। হঠাৎ দেখি তুকারাম আবাজীর ঘরের জানালায় আলো। সেখানে দুজন বসে বসে পড়ছে— ভাবলুম কিছুক্ষণ ওখানে গিয়ে বসি। ঘরের বাইরের দিকটায় বিঠোবা আন্না দেওয়ানজী কি যেন পড়ছেন বসে বসে। ওঁকে পাশ কাটিয়ে আমি ঘরে ঢুকলুম। দুটি ছেলে মন দিয়ে পড়ছিল। তুকারামের সামনে ক্লাস সিক্স-এর বইগুলো স্তূপাকারে ছিল আমি একটু নাড়াচাড়া করে বইগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলুম। মারাঠী বই দেখতে পেয়ে তাব ওপর আলাতো করে হাত বুলিয়ে চুপ করে পড়তে লেগে গেলুম। মিষ্টির দোকানের কাঁচের বাইরে থেকে যেমন লাড্ডু শুধু চোখে দেখাই যায়, চাখা যায় না, আমার এখন যেন ঠিক সেরকমই অবস্থা। হঠাৎ দেখি বিঠোবা আন্না আসছেন আমার দিকে। আমি হাতের বইটা তখন মন দিয়ে পড়েই যাচ্ছি। উনি জিজ্ঞেস করলেন, “কোন্ ক্লাসে পড়িস রে তুই?”

“আমি স্কুল ছেড়ে দিয়েছি।”

“কোন্ ক্লাসে উঠে স্কুল ছাড়লি?”

“ক্লাস ফাইভ।”

“কেন?”

“বাবা ছাড়িয়ে দিলে।”

“কেন?”

“গোরু-মোষ চরাবার জন্যে, খেতে জল দেবার জন্যে কেউ নেই তো, তাই।”

“ও, এই কথা। তা মোষ চরাতে, মাঠে জমিতে জল ছাড়তে তোর বাপের হাত পা কি চলে না নাকি? সারাটা দিন তো বাউণ্ডুলের মতো গাঁয়ে আড্ডা মেরে বেড়ায়।”

আমি আর কি বলব, চুপ করে রইলুম।

"দাঁড়া, আমি তোর বাপকে বুঝিয়ে বলব'খন। জগৎটা কোন্ দিকে এগোচ্ছে দেখবি তো। তা নয়, হারামজাদাটার বুদ্ধিটা বালগুড়ির মাটিতেই গেড়ে রয়েচে। আমার বিদ্যের দৌড় মোট ক্লাস ফোর অবধি তাই দিয়েই তো একটা পুরোপুরি রাজ্য গড়ে তুললুম ধরে নিতে পারিস। তোর ঠাকুর্দার কাছ থেকেই তো কল কেনার পয়সা ধার করে নিলুম। এখন আমার ক'টা কল জানিস? তিরিশটা। তাছাড়া গম ভাঙার কলও আছে। আর আছে আঠার একর চাষের জমি। এই গর্দভটাকে ওর বাপ মানে তোর ঠাকুর্দা মারা যাবার সময় বলেছিলুম তুই একটা কল কিনে নে। তা তো আর শুনলে না, যকাতেটো কেবল জমিটাই আঁকড়ে ধরে রইল, তাতে যা হচ্ছে তাই বসে বসে খাচ্ছে। তুই না হয় মুখ্যুই রইলি, ছেলেদের তো পড়াতে পারিস?" বিঠোবার মাঝে মাঝে স্বগতোক্তি করার অভ্যেস্ ছিল।

সনগরদের সমাজ ছিল আমাদের গাঁয়ে সব চাইতে গরীব। এরা কম্বল বুনে পেট চালাত। এই সমাজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমিও বেড়েছি। এই আন্না মাত্র ক্লাস ফোর অবধি পড়াশুনা করে জীবনে কতই না উন্নতি করেছেন, আজ কোথায় উঠে গেছেন। অবশ্য তাঁর সাহস বুকের পাটা ছিল। সেজন্যই তো বিঠোবা তাঁর ছেলেদের স্কুলে পড়াচ্ছেন, পড়ার জন্য আলাদা ঘরও তাদের করে দিয়েছেন। কাঁচের ল্যাম্পও বসিয়েছেন পড়ার জন্য, পরিষ্কার চকচকে। কেরোসিনের এত টান চলছে, তা সত্ত্বেও এখান থেকে সেখান থেকে খুঁজে পেতে এনে ঠিক দিতেন যাতে ছেলেরা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারে। আমার মনে হল, হায় রে! আমি যদি এ বাড়িতে জন্মাতুম তাহলে কত বই-ই না পড়তে পেতুম। তা না হয়ে আমার বরাতে জুটেছে একটা অশিক্ষিত বাপ। আমি যদি পড়াশোনা চালিয়ে যাই, তাহলে আমাদেরও অবস্থা একদিন ফিরে যেতে পারে এই দেওয়ানজীরাই মতন, এ কথা বাবাকে বোঝাই কেমন করে?

"দেওয়ানজী, তুমি বাবাকে একটু বল না, অন্তত ক্লাস সেভেন অবধি পড়ি তো, তারপর না হয় দেখা যাবে।"

"তোর স্কুল যে বন্ধ করে দিয়েছে সে তো আমি জানিই না। আমি কালই তোর বাপকে বলব, দেব এায়সা কড়কে।"

এর পর দুতিন দিন কেটে গেছে। বাবা তখন গাঁয়েই ছিল। আমি বেশ রাতে দুধ দুইয়ে এসেছি বাড়িতে। বাবা দাওয়াতেই বসেছিল, আমি পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। ততক্ষণে বিঠোবা আন্না ধুতি সামলাতে সামলাতে সামনের গলিটা থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে রান্নাঘরে মাকে চা বানাবার জন্য বলে রান্নাঘরের দোরগোড়াতেই বসে পড়লুম। কানটা খাড়া করে রাখলুম ওদের কি কথা হয় শোনার জন্য।

"কি রে রতনু, আজ গাঁয়ে যে আছিস বড়?"

"মাঠে কোনো কাজ নেই, ফসল তো সব কাটা হয়ে তোলাও হয়ে গেছে। এখন আখের খেতে জলটা ছাড়লেই হয়ে যায়। বর্ষা নামুক তখন আবার জমিতে লাঙ্গল দেয়া, বীজ রোয়ার কথা ভাবা যাবে।"

"তোর তো ভালই হয়েছে। ছেলেপুলেরা মাঠে খেটে মরছে আর তুই এদিকে

দিব্যি গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছিস।"

"তোকেও গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াতে কেউ বারণ করেছে? তুই ঝামেলা বাড়াতে ভালবাসিস তাতে কার কি করার আছে? ছেলেদের ওপর কাজটাজ ছেড়ে দিয়ে তুইও তো হাত-পা ঝাড়া হয়ে যেতে পারিস? মিছিমিছিই গাধার খাটুনি খেটে যাচ্ছিস।"

"তা তুই ঠিকই বলেছিস। তোর মতো এভাবে কাটিয়ে দিতে পারলে আমার দেউলে হতে সময় লাগত না। তোর বাপের আমলের কিছু রাখতে পারলি রতনু, বল তো?"

"আমার বাপের আমরা মোটে তিনটি সন্তান, তাও আবার মেয়েই দুটি, ছেলে মোটে একটি এই আমি। কাজেই বাপ ব্যবসা করতে গেলে আমি জমিয়ে চাষবাস সামলাতুম। তাই তো উন্নতি হল। মোটে তো তিনটি পেট। তাহলে জমাতে পারবে না কেন বল?"

"তা এখন দুপয়সা জমছে না কেন?"

"এখন জমবেটা কোথা থেকে শুনি? সাত-আটটি সন্তান আর খাটবার বেলায় আমি একা। তাছাড়া আমার নিজের কি জমি আছে, না আমি জমির মালিক? ছেলেপুলেদের খাবাব জোগাড় করতে করতে, এ সংসারেব বোঝা বইতে বইতে আমার জান নিকলে যাচ্ছে, উন্নতি আর কোত্থেকে হবে?"

"তাহলে আরও গাড্ডায় যেতে থাকবি, ঠিক কিনা?"

"গাড্ডায় যাব কেন? কোন দুঃখে? ছেলেপিলেরা বড় হচ্ছে, নিজে হাতে কাজ করছে, সুখের দিন নিশ্চয়ই আবার আসবে ঘুরে।"

"খোকার স্কুল বন্ধ করেছিস নাকি?"

"অনেক হয়েছে, ক্লাস ফাইভ অবধি তো হল।"

"ওরে হতভাগা। পুরো গলিটার সব ছেলেরাই স্কুলে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। সনগর আর ধনগররাও তাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতে শুরু করে দিয়েছে। শাহু মহারাজের মেহেরবাণী আছে তাই তো তিনি এগাঁয়ে একটা ছেড়ে দুটো স্কুল করেছেন। তা তুই এ সুবিধেটা নিচ্ছিস না কেন?"

"আমরা হলুম গিয়ে চাষী, বেশি পড়াশুনা করে কি হবে? শেষে তো সেই লাঙলেই হাত লাগাতে হবে। ওসব পড়াশুনা বামুনদেরই মানায়, আমাদের নয়।"

"কেবল বামুন কায়েতদেরই কি পড়ার দিব্যি দিয়েছে নাকি কেউ? মহারাজ বলেন পড়াশুনা করলেই বুদ্ধিশুদ্ধি হয়। তিনি সবাইকে পড়াশুনা করতেই তো বলেন। কোর্ট কাচারীতে, অফিসে চাকরি করতে তিনি যেমন উৎসাহ দেন, আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়াতেও তিনি তেমনি পরামর্শ দেন। তাকে ওদের মঙ্গলই হবে। আর তোর কি বুদ্ধিরে? ছেলেটা ক্লাস ফাইভ অবধি পড়ল, আরও দু বছর পড়লেই তো ক্লাস সেভেন হত। তখন যে কোন স্কুলে মাস্টারী করতে পারত, কাচারীতে কেরাণী হয়ে ঢুকতে পারত, সেখানে কত বড় বড় লোকেদের কাজ ওর হাত দিয়েই হত, তোর তো কপাল খুলে যেত। দুছেলের মধ্যে একজনকে চাষে লাগা, আরেকজনকে পড়া। তোর এমন বোকা হাবার মতো বুদ্ধি কেন?"

"ওসবে দরকার নেই। দুজনেই চাষে যাক। একজন আরেকজনকে সাহায্য করলে

ফল ভালই হবে। আমি আমার বাপের কাছে হাতে-কলমে কাজ শিখেছি, হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছি তবেই না বাপ আমার চার-পাঁচটা চাষের জমি করতে পারল। তাই তো সম্বৎসর আমাদের অনেক ফসল হত।" বাবার এরকম উল্টোবুদ্ধির কথা শুনে বিঠোবা ক্রমেই রেগে যাচ্ছেন বেশ বুঝতে পারলুম।

"তোর মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি আছে না খালি পচা গোবরে ভর্তি? ছেলেদের খেত-খামারে খাটিয়ে মারছিস আর নিজে নিষ্কর্মার ঢেঁকি হয়ে এগাঁয়ে সেগাঁয়ে ঘুরে বেড়াস তা কি আর আমি জানি না মনে করেছিস? আমাকে মেলা বকাস না। আমার ছেলেরা সারাটা বছর টানা পড়েও অনেক সময় পাশ দিতে পারে না, তাও আমি ওদের পড়া বন্ধ করি নি, পড়ে যেতে বলি। যত বছরই লাগুক নিদেনপক্ষে ম্যাট্রিক পাশ ওদের করতেই হবে। কেন জানিস? ওতে আখেরে ওদেরই ভাল হবে। আব তুই হারামজাদা, যে গাড়ি চলছে ভাল তাকে অচল করে ফেলে রেখেছিস, বজ্জাত কোথাকার! এভাবে ওদের সর্বনাশ করলে বুড়ো বয়সে ওরা তোকে দেখবে ভাবছিস?"

"সুখ কি শুধু স্কুলে গেলেই মিলবে? রামাকে দেখ। চার-চারটে ছেলেকেই চাষে লাগিয়ে দিয়েছে। সবকটাই তুখোর। রামা আগে করত চার একরের চাষ। এবার ওর ছেলেরা কত জমি চাষ করে জানিস? কুড়ি একর। ভাগচাষের জমি সরকারের কাছ থেকে নিয়েছে। রাজবাড়ির মতো বাড়ি তুলেছে পাথর দিয়ে। সে বাড়ি চার•ছেলেকে ভাগ করে দিয়েছে। গোরুর গাড়ির রেসে ওর গাড়ি ছোটে কোলহাপুর এলাকায়। আস্ত কোলহাপুরে ছোটছেলের জুড়ি নেই কুস্তিতে। তুই ভেবেছিস কি? নে ওঠ, আমাকে খেতে দে, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে," বলে বাবা এবারে উঠে পড়ে সনগরদের গলি দিয়ে এগিয়ে গেল। খুব সম্ভবত দেশাইদের বাড়ির দিকেই গেল। বেচারা বিঠোবা! বাবার সঙ্গে কথায় পেরে উঠলেন না। কিছু করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হাত দোলাতে দোলাতে চলেই গেলেন। আর আমি? ভাল একটা কিছু শুনে চায়ের কাপে চুমুক দেব এই ভেবেছিলুম। কিন্তু এতক্ষণ যা ঘটে গেল তা শোনার পর মন আরও বিষাদে ভরে গেল।

ছয়

স্কুলে যাবার জন্য আমার ছটফটানি বাড়ল বই কমল না। কিন্তু আমি স্কুলে যাচ্ছি বাবার সামনে দাঁড়িয়ে এ কথা বলার সাহস আমার ছিল না। চাবকে পিঠের চামড়া তুলে নেবে এ ভয় আমার সব সময়ই ছিল। আমার হয়ে তাই কাউকে দিয়ে ওকালতি করাতে চাইছিলুম। জমির পেছনে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেও যে কিছু করতে পারব না তা আমি বুঝে ফেলেছি। দাদুদের সময় আর বাবাদের সময়ের মধ্যে অনেক ফারাক। চাষবাস করে বাবার অবস্থা দিনকে দিন আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। আমার কেবলি মনে হত পড়াশুনা চালিয়ে গেলে পরে চাকরি করে দুটো পয়সা হবে, বিঠোবা আন্নার মতো আমিও কিছু একটা করতে পারব।

দেয়ালীর পর মাঠের আখ কলে গেল। বাবা মনে করত যত তাড়াতাড়ি রস বার করতে পারা যায় তত ভাল দাম পাওয়া যাবে। খুব যে ভুল বলত তা বলব না, সব জায়গায় কল বসিয়ে একই সঙ্গে আখ মাড়াই করতে আরম্ভ করলে বাজারে গুড় আসবে অনেক বেশি, দামও যাবে কমে। এত গুড় বাজারে এলে লোকে তো এক নম্বর বা দুনম্বরের ভাল গুড়ই কিনবে প্রথমে— আমাদের খেতের তিন নম্বর গুড় আর বেচা যাবে না, পড়েই থাকবে। ক্রমে ও গুড়ের দাম আরও কমের দিকে যাবে। এতো গেল বাবা কিভাবে চিন্তা করত ব্যাপারটা নিয়ে। অন্য চাষীরা আবার অন্যভাবেও ভাবত। আখ না কেটে আরও কিছুদিন জমিতে রেখে দিলে মিষ্টি বেশি হয়, ফলে গুড়ও ভাল হয়। বাবা অবশ্যই মিষ্টি কম কি বেশি এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাত না। বাবার একটাই ভাবনা কি করে বেশি দাম পাওয়া যায়। আমাদের গুড় তাই আগেভাগেই তৈরি হয়ে যেত।

অন্যান্যবারের মতো এবারেও তাই হলো। আমরা গুড় বানিয়ে কাজ সেরে ফেলে অন্য কাজ হাতে নিলুম।

একদিন দুপুরের কথা। সবাই ঘুমোচ্ছে। মা ঘুঁটে দিচ্ছে, আমি মাকে বালতি করে জল এনে দিচ্ছি, কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু কথাও চালাচ্ছি। কাছে পিঠে কেউ ছিল না দেখে ভাবলুম মাকে এবারে মনের কথাটা বলি। প্রথমে স্কুলের কথা তুলে শুরু করলুম। মা বললে, "আমি আর কি করব বল? স্কুলের কথা বললেই তো দেখেছিস ও কেমন বুনো শুয়োরের মতো ঘোঁত ঘোঁত করে।" বুনো শুয়োরের ভয় মার মন থেকে এখনও যায় নি। আমি মাকে আবার বলি, "তুমি দত্তাজীরাও সাহেবকে আমার স্কুলের কথাটা ফের বল। আজ রাতে ওদের বাড়ি তুমি এখন যাবে, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। তুমি ওঁকে সব বুঝিয়ে বল। উনি বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাতেও পারেন।"

"যাব'খন।" মার গলায় পরিষ্কার নিস্পৃহ ভাব। আমি জানতুম বলেও হয়তো কিছু হবে না, তবুও আমাকে খুশি করবার জন্যেই মা রাজী হয়ে গেল। আমার মনে

ছটফটানিটার কথা মা জানত, বুঝত। ক্লাস সেভেন অবধি আমি পড়ে যাই এটা মাও চাইত, কিন্তু হলে হবে কি বাবার সামনে কারো মতই তো খাটবে না।

সে রাতেই মা আর আমি দত্তাজীরাওদের বাড়ি গেলুম। দেয়ালে হেলান দিয়ে কথা বলতে বলতে মা সাহেবকে সব খুলে বললে। মনে হল উনি সবই বুঝতে পারলেন। বাবা কিভাবে হাটে-বাজারে, রখমার ওখানে ঘুরে ঘুরে দিন কাটিয়ে দেয় আর তার জন্যে চাষের কত ক্ষতি হয়। মা তাঁকে বুঝিয়ে বলে যে বাবা গাঁয়ে এখানে সেখানে গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াতে চায় সেজন্যই আমাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আমায় চাষের কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। দত্তাজীরাও সব শুনেটুনে রেগে আগুন হয়ে গেলেন, "ও আসুক আজকে, ওকে মজা দেখাচ্ছি।" চলে আসার সময় আমি দত্তাজীরাওকে বললুম, "এটা তো জানুয়ারি মাস চলছে, আমাদের ক্লাসের পরীক্ষাও এগিয়ে এসেছে। এখনও যদি আমি ক্লাস ফাইভেই ভর্তি হয়ে যাই তাহলেও যেটুকু সময় হাতে আছে তার মধ্যে ক্লাস ফাইভ-এর পড়া শেষ করে ফেলতে পারব আর পরীক্ষা দিলে পাশও করতে পারব। তাহলে আমার একটা বছর বেঁচে যায়। এর আগে একটা বছর তো আমার এমনিতেই নষ্ট হয়েছে। তাছাড়া মাঠেও এখন কোন কাজ নেই।"

"ঠিক আছে। তোরা বাড়ি ফিরে যা। বাপ ফিরলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিস্, বলিস আমি ডেকে পাঠিয়েছি। ঘণ্টখানেকের ভেতর তুইও ওর পিছু পিছু আসিস্।"

"আচ্ছা," বলে আমি আবার ওঁকে মনে করিয়ে দিলুম উনি ভুলেও যেন বাবাকে না বলে বসেন যে আমরা দুজনে মা আর আমি ওঁদের বাসায় এসেছিলুম। শুধু মা-ই এসেছিল সব্জি বেচতে, এটুকু বললেই হবে। আমরা দুজনে এসেছিলুম জানতে পারলে আমাদের দুজনকেই জানে মেরে দেবে বাবা।

"ঠিক আছে, তুই যা। যা করবার আমি করব। তোর বাপের সামনে আমি যদি তোকে কিছু জিজ্ঞেস করি তাহলে সব খুলে বলবি, কিছু লুকোস না বুঝেছিস?" "আচ্ছা," বলে আমি মার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলুম। বাবা ফিরল অনেক রাত করে। আসতেই মা বললে দেশাই বাবাকে যেতে বলেছেন, অনেকদিন দেখেন নি তাই।

"কোনো কাজ আছে নাকি?"

"আমাকে কিছু বলেন নি।"

"আমি তাহলে হয়ে আসি গে। তুই ততক্ষণ ভাখরি করে রাখ, গণপা এলে মাঠের দিকে যেতে বলিস।" বাবা চট করে যাবার জন্য উঠে পড়ল। জমিদার বাড়িতে গিয়ে গল্প করতে ওর ভালই লাগত, লোকের কাছে মানও বাড়ত। আধঘণ্টাখানেক পরে মা আমাকে বললে, "এবার তুই যা। বল গিয়ে মা খেতে ডাকছে।" জমিদারমশাই আমার জন্যই বসেছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এসেছিস রে?"

"মা বাবাকে খেতে ডাকছে, বাবা তো এখনও খায় নি।"

"বোস, বোস। তোর বাবাও তো এখুনি এসেছে।"

"আজ্ঞে," বলে আমি বসে পড়লুম।

জমিদারমশাই আমাকে শুধোলেন, "হ্যাঁরে, কোন ক্লাসে পড়িস তুই?"

"ক্লাস ফাইভ-এ পড়তুম, এখন আর পড়ি না।"

"কেন?"

"বাবা বারণ করেছে। মাঠে কাজ করার লোক নেই।"

"কিরে রত্নাপ্পা, তোর ছেলে ঠিক বলছে?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তা, তুই কি করিস?" উনি বাবাকে জেরা শুরু করলেন। জেরার ফলে সব সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ল। বাবাকে উনি যাচ্ছেতাইভাবে ধমকে দিলেন। সারাদিন কোনো কাজ না করে কেবল ফাঁকি দিয়ে বেড়িয়ে, বৌছেলেপিলেকে নিজে আরাম করার জন্য খাটিয়ে মেরে ফেলছে, এসব বলে উনি বাবাকে খুব বকাবকি করলেন। বাবার কোনো ওজর আপত্তি অজুহাত কিছুই উনি শুনতে চাইলেন না। আমায় বললেন, "কাল থেকে তুই স্কুলে যাবি। মাইনে যা বাকি পড়েছে চুকিয়ে দিবি। ভাল করে পড়াশুনা কর, দেখিস এ বছরটা যেন নষ্ট না হয়। তোর বাপ তোকে স্কুলে যদি না পাঠায়, আমার কাছে চলে আসবি। সকাল সন্ধ্যায় কাজ করবি আর স্কুলের সময় স্কুলে যাবি। আমি তোকে পড়াব। তোর বাপের এক গুষ্টি কাচ্চাবাচ্ছা হয়েছে তাই ওদের কুকুরছানার মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে।"

বাবা এবারে বললে, "আমি কি বারণ করেছি? ছেলের আমার খারাপ অভ্যেস হয়েছে, তাই তো চোখে চোখে রেখেছি।"

"তা কি করে সে?"

"যা খুশি তাই করে বেড়ায়, জুয়ো খেলে, ঘুঁটে বেচে সে পয়সায় সিনেমা দেখে, যেখানে-সেখানে খেলতে বসে পড়ে। বাড়ির কাজে ওব মন আছে নাকি?" বাবা হঠাৎই আমার এ দুর্নাম দিতে শুরু করে দিলে।

"হ্যাঁরে, এসব সত্যি?"

আমি সত্যি মিথ্যে মিশিয়ে জবাব দিলুম, "একবার উরস্-এর উৎসবের সময় জুয়ো খেলেছিলুম। বাবা তো সিনেমা দেখতে দিত না তাই মাকে দিয়ে ঘুঁটে দিইয়ে তা বেচে মোটে একবারই সিনেমা দেখেছিলুম, জামাকাপড়ও তো কিনেছিলুম।"

"এবারে এগুলো সব বন্ধ করে দিবি। কোনো বার ফেল করেছিস পরীক্ষায়?"

"আজ্ঞে না, স্কুলে যাওয়াই বন্ধ হয়ে গেল, পরীক্ষা আর দেয়া হল কোথায়?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, এখন যা। কাল থেকে স্কুলে যাবি।"

"যে আজ্ঞে," বলে আমি তো উঠে পড়লুম। বাড়ি থেকে বার হতে হতে আমি শুনেছি জমিদার মশায় বাবাকে বোঝাচ্ছেন, ছেলেমানুষ, সিনেমা একবার না হয় দেখেই ফেলেছে, তাতে হয়েছেটা কি? ছেলেমানুষ খেলবেই তো, তার জন্য স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিবি?"

"আজ্ঞে, আপনি হুকুম করলে স্কুলে নিশ্চয়ই পাঠাব। দেখি দু এক বছরে শুধরে যায় কিনা," জমিদার মশায়ের সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা বাবার কম্ম নয়। সেদিন খেতে খেতে বাবা বললে সকালে উঠেই আমাকে মাঠে যেতে হবে জল ছাড়তে। এগারটা অবধি মাঠে জল ছেড়ে তারপর স্কুলে যেতে পারি। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই স্কুলের থলে নিয়ে সোজা যেতে হবে মাঠে। আমার মন [illegible]

বাড়িতে রেখেই দৌড়ুতে হবে মাঠে— সেখানে কাজে লেগে যেতে হবে। ঘোষ চরাতে হবে। যেদিন দুপুরে মাঠে কাজ থাকবে সেদিন স্কুলে কামাই দিতে হবে।

“কি, রাজী?” বাবা শুধোয়।

“খেতে কাজ থাকলে স্কুল তো কামাই করতেই হবে,” আমি রাজী হয়ে তাড়াতাড়ি মাথা নেড়ে বলে ফেললুম। মনে মনে এদিকে তখন খুবই আনন্দ হচ্ছে।

“এসব মেনে চললে স্কুলে যেতে পারবি, তা না হলে স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। সকাল বিকেল মাঠে কাজ করে স্কুল করবি। যদি দেখি মাঠে যাস নি তাহলে স্কুলে গিয়েই তোকে থেঁতলে দেব— বুঝেছিস? খুব স্কুলে যাবার ভূত চেপেছে মাথায়, মস্ত বড় ব্যারিস্টার হবে,” বাবা রাগে গজ গজ করছিল। আমি আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে মাথা নীচু করে খেয়ে যেতে লাগলুম।

রোদে, বাদলে, শীতে খালি পেটে মাঠের কাজ করে করে মরতে বসেছিলুম। তার থেকে তো মুক্তি হল, হোক না সে এগারটা থেকে পাঁচটা অবধি। আমার মনে হল মাস্টারমশায়ের ছড়ি বাবার এ জাঁতাকলের চেয়ে ঢের ভাল। আমি মহা আনন্দে ছড়ির মার খাচ্ছিলুম। গ্রীষ্মের দারুণ রোদে মাঠে না তেতে পুড়ে সময় আমার স্কুলের শীতল ছায়াতে ভালই কাটতে লাগল। গরমের এ দুমাস আমার যে খুব আনন্দেই কাটল সেটা বোধহয় না বললেও চলে।

সাত

আবার ক্লাস ফাইভ-এ গিয়ে বসলুম। স্কুলে এবার আর নতুন করে নাম লেখাতে হয় নি। আমার নামের পাশে ফেল লেখা ছিল। প্রথম দিন স্কুলে গিয়ে দেখি গলির দু-একজন ছাড়া আর কারুকেই আমি চিনি না। সঙ্গে যারা পড়ত তারা তো সবাই এগিয়ে গেছে। ক্লাসে এখন সবাই বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবে। মনটা একটু দমে গেল। বেঞ্চের এক কোণায় বসে রইলুম— যেন বাইরের কেউ। আমাদের মাস্টারমশাই বা কে তাও তো জানি না। আমি এসেছি সাদা মোটা কাপড়ের থলেতে আমার পুরোন বই খাতা নিয়ে। বাস স্ট্যাণ্ড-এ লোকে যেমন নিজের বাক্সপেটরা আগলে বসে থাকে আমিও তেমনি আমার থলেটা কোলে করে বসে রইলুম। ক্লাসের সবচেয়ে দুষ্টু ছেলেটি এসে আমায় জিজ্ঞেস করলে, "ওহে আগন্তুক, তোমার নামটা কি? এদিকে পথ ভুলে চলে এসেছ নাকি?" ওর গলার স্বরে স্পষ্টই একটা তাচ্ছিল্যের ভাব। আমার তখন খেয়াল হ'ল আমি তো ওদের থেকে একেবারেই আলাদা। আমাদের জমি বালগুড়ির লাল মাটি মাখা আমার ধুতি, মাথায় আবার পাগড়ি। এরকম পোশাকে সত্যি আর তো কেউ আসে নি।

"দেখি, দেখি, তোর মাথার পাগড়িটা দেখি," বলে সে আমার মাথার পাগড়িটা টেনে খুলেই ফেললে। এবারে এ ক্লাসে এই পাগড়ির যা দশা হবে ভেবে আমার প্রায় কান্নাই এসে গেল। ছেলেটা কাপড়ের টুকরোটা নিজের মাথায় জড়িয়ে নিয়ে মাস্টারমশায়দের ভঙ্গীতে পাগড়িটা টেবলের ওপর খুলে রাখলে আর অনেক ঝঞ্ঝাট ঝামেলা যেন পোয়াতে হয়েছে দেখাবার জন্যে মাথায় হাত বোলাতে লাগল। এর মধ্যে মাস্টারমশায় ঢুকে পড়লেন। ছেলেটা দৌড়ে ওর নিজের জায়গায় চলে এসেছে, পাগড়িটা কিন্তু টেবলে ফেলে রেখে এসেছে। প্রথম দিনেই এই কাণ্ড! ভয়ে আমার বুক টিপটিপ করতে লাগল।

রণধরে মাস্টারমশায় ক্লাসে ঢুকে টেবলের ওপর ময়লা কাপড় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কার?"

"আমার, স্যার।"

"তুই কে?"

"আমি যকাতে। গেল বছর পাশ করতে না পেরে এ ক্লাসেই আছি।"

"পাগড়িটা তুলে নে," মাস্টারমশায় ছড়ি দিয়ে পাগড়িটা টেবল থেকে নীচে ফেলে দিলে আমি সেটা তুলে আনলুম।

"এখানে রেখেছিলি কেন গর্দভ?"

"আমি রাখি নি স্যার। ঐ ছেলেটা আমার মাথা থেকে কেড়ে নিয়ে ওখানে গিয়ে রাখলে।"

"এই চৌহানের ছোকরার সব সময় হাত চুলবুল করছে" মাস্টারমশায় ছোকরাটির

কাছে এগোলেন। আমার আরও কিছু খোঁজ খবর নেবার পর বামন পণ্ডিতের কবিতা পড়াতে শুরু করে দিলেন।

টিফিনের সময় সেই ছোকরা এবারে আমার ধুতির কোঁচা টান মেরে খুলে ফেলবার চেষ্টা করলে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি দেয়ালে এমন ঠেস দিয়ে বসে রইলুম যে স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত আমাকে নড়ানই গেল না।

আমি মনে মনে ঘাবড়ে গিয়ে ভয় পেয়েছিলুম। একটা কাকের বাচ্চার গায়ে মানুষের ছোঁয়া লাগলে যেমন অন্য কাকেরা ওকে ঠোকরাতে লেগে যায়, আমার অবস্থাটা ঠিক সেরকমই হয়েছিল। আমারই স্কুল এখন যেন আমাকেই ঠুকরে মারছে।

বাড়ি ফেরার পথে চিন্তায় পড়ে গেলুম। তাই তো, ছেলেরা আমাকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ারকি করবে, টান মেরে পরনের ধুতি, মাথার পাগড়ি খুলে নিতে চাইবে, আমি কি এখন এতদিন পর স্কুলে মানিয়ে নিতে পারব? তার চেয়ে মাঠে চুপ চাপ কাজ করি গে। স্কুলে গিয়ে আর কাজ নেই, কি দরকার? আমার পাড়ার দুটি ছেলেই মোটে ক্লাসে ছিল তা সে-ও তো আমার চেয়ে বয়সে ছোট। ওরা আর আমার হয়ে রুখে দাঁড়াবে কি করে? মনটা খুবই দমে গেল। ক্লাস ফোর থেকে ফাইভ অবধি স্কুলটা বড়ই আপনার বলে মনে হত। ছেলেদের মাঝে মেলামেশা করে গল্পসল্প করতে ভাল লাগত। এবার মনে হচ্ছে তা আর হবে না, আমি পর হয়ে গেছি। আমার নিজের বলতে স্কুলে আর কেউ নেই।

পরদিন সকালে উঠে কিন্তু আবার পুরনো উৎসাহটা জেগে উঠল। আবার আমি স্কুলে যেতে শুরু করলাম। মাকে অনেক করে বলে কয়ে একটা নতুন টুপি আর দুটো দড়িদেয়া মেঠো রঙের প্যান্ট আটদিনের ভেতর কেনাও হয়ে গেল। তখন থেকেই আমার স্কুলে যাবার পোশাক হলো প্যান্ট আর মাঠে যাবার জন্যে ধুতি।

স্কুলে ধীরে ধীরে ছেলেদের সাথে আলাপ পরিচয় হতে লাগল। মন্ত্রী মাস্টারমশায় আমাদের ক্লাস টিচার হলেন। তিনি ছড়ি বড় একটা ব্যবহার করতেন না। হাতটা মুঠো করে পিঠে দিতেন কিল। এ মুষ্টিযোগ একটা পিঠে পড়লেই যথেষ্ট। ছেলেরা ওঁর ভয়ে কাঁপত। দুষ্টু ছেলেরাও ওঁর কাছে খুব একটা পেরে উঠত না। ক্লাসের পড়ুয়া ছেলেদের উনি ভালবাসতেন। উনি ছিলেন অঙ্কের টিচার। কারুর অঙ্ক ভুল হলে তিনি নিজের কাছে ডেকে নিয়ে ভুলটা কোথায় হয়েছে বুঝিয়ে দিতেন। তেমনি আবার ছেলেটি নেহাৎই বোকা বা অঙ্কে ভীষণ কাঁচা হলে তাকে দিতেন দু-তিনটি মুষ্টিযোগ। ফলে ভয়ে সবার ঘাম ছুটে যেত। বাড়ি থেকে পড়া তৈরি না করে কেউ আসতই না।

আমাদের ক্লাসের বসন্ত পাটিল পড়াশুনায় যেমনি ভাল ছিল দেখতে তেমনি রোগা টিঙটিঙে। সে রোজই সব কটা অঙ্কই শুদ্ধ করত। স্বভাবটাও খুব শান্ত ছিল, সর্বক্ষণ বইয়েই যেন ডুবে থাকত। বাড়ি থেকেও কিছু না কিছু তৈরি করে আনত। অঙ্কে খুব ভাল বলে বসন্ত অন্য ছেলেদেরও অঙ্ক দেখিয়ে দিত। মাস্টারমশাই ওকেই ক্লাসের মনিটর করেছিলেন। সে ফার্স্ট বেঞ্চে মাস্টারমশায়ের বলতে গেলে একেবারে মুখোমুখি বসার খাতিরটা পেত।

এদিকে আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছে। আমার মনে হল বয়সে বসন্ত আমার চেয়ে একটু ছোটই হবে। তাহলে তো আমারই ক্লাসের মনিটর হওয়া উচিত। আমি তো আগে থেকেই ক্লাস ফাইভে ছিলুম। একটা অঘটনে একই ক্লাসে আমায় দুবছর থাকতে হল। আমি মনে মনে ঠিক করে নিলুম যে অল্প দিনের মধ্যেই আমাকে এ ক্লাসের পড়া শেষ করে ফেলতে হবে আর পাশও করতেই হবে। ক্লাসে ফোঁপর দালালি করে বা মারপিট করে সময় নষ্ট করা আমার পোষাবেই না। আর একটা কথাও আমি কখনই ভুলতুম না, আমি সবার থেকে আলাদা বলা যেতে পারে আমি বাইরের লোক।

যাই হোক পড়ায় আমার ভাল করেই মন বসে গেল। আমি বসন্তকে অনুকরণ করতে লাগলুম। খবরের কাগজ দিয়ে বইয়ে মলাট দিলুম ওর মতন করে। স্কুলের বইয়ের থলেটা যত্ন করে রাখতুম। সব সময়ই কোনো না কোনো বইয়ে চোখ লাগিয়ে রাখতুম। সে যেমন বাড়ি থেকে কিছু করে এনে মাস্টারমশাইকে দেখিয়ে বাহবা পেত, আমিও সেভাবে পরের দিনই কিছু করে এনে দেখাতে লাগলুম। খুব মন দিয়ে পড়া করতুম বলে অঙ্ক বুঝতে আমার বেশি দেরী হল না। তাড়াতাড়িই করতে পারতুম। বসন্ত এদিক দিয়ে ছেলেদের অঙ্ক দেখিয়ে দিত তো আমি আরেক দিকে ছেলেদের অঙ্ক দেখিয়ে দিতুম। এভাবে যখন আমরা দুজনেই ছেলেদের অঙ্ক দেখিয়ে দিচ্ছি তখন আমাদের দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। বসন্ত আর আমি মিলে মিশে সব কাজ করতে লাগলুম। মাস্টারমশাই ক্লাসে আমাকে আনন্দা বলে ডাকতেন। আমাকে এ নামে তিনিই প্রথম ডাকলেন। মা কখনো সখনো আন্দা বলে ডাকত, তবে খুব কম। মাস্টারমশায়ের ব্যবহারে আর বসন্তের বন্ধুত্বের জন্যে স্কুল আবার আমার ভাল লেগে গেল, নিজের ওপর বিশ্বাস বেড়ে গেল।

সৌঙ্গলেকর মাস্টারমশাই পড়াতেন মারাঠী। পড়াতে পড়াতে বিশেষ করে কবিতা পড়াতে পড়াতে খুব মজে যেতেন। মিষ্টি গলায় আর মিষ্টি সুরে চমৎকার কবিতা পড়াতেন, আবৃত্তি করতেন। তাঁর সাহিত্য রসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ম ছিল, বহু পুরনো ও নতুন মারাঠী পদ্য ওঁর কণ্ঠস্থ ছিল। অনেক ইংরেজি কবিতাও মুখস্থ ছিল। প্রথমে গেয়ে তারপর কবিতাটি অভিনয় করে দেখাতেন। কবিতা পড়ানোর এই ছিল ওঁর রীতি। সাথে সাথেই চলত এ কবিতারই মতন অন্য কবির অন্য কবিতা। আর এরই ফাঁকে ফাঁকে গল্প ও স্মৃতিচারণ চলত বড় বড় লোকদের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎকারের। যেমন যশবন্ত বা. ভ. বোরকর, ভা. রা তাম্বে, গিরীশ, কেশব কুমারদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের গল্প। তিনি নিজেও কবিতা লিখতেন। মনে এসে গেলে কখনো সখনো তাঁর নিজের কবিতাও তিনি আবৃত্তি করে শোনাতেন। এসব শুনে আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে যেত, আমি আমার মনের সবশক্তি তখন চোখ আর কানে এনে জড়ো করে এই পাঠ, পড়া গোগ্রাসে গিলতুম, অনুভব করতুম।

সকালে মাঠে একা একা মোষ চরাতে চরাঁতে, খেতে জল দিতে দিতে মাস্টারমশাই যে সব সুরে কবিতাগুলো আমাদের শেখাতেন সে সব সুরে সব কটা পদ্যই আমি খোলা গলায় গেয়ে যেতম। কবিতাগুলোর মানে নিয়ে মনের ভেতর [illegible]

হ্রস্ব ই আর দীর্ঘ ঈ উচ্চারণ মাস্টারমশাই যেমনটি করতেন আমিও সেরকম করতে পারতুম। মাস্টারমশায়ের মতো অভিনয়ও করতুম, অবশ্য একা একা খেতে জল ছাড়তে ছাড়তে। জলের ভিস্তি কখন যে ভরে যেত, টেরই পেতুম না। মাস্টারমশায়ের শেখান সুরে নিজেও যে পদ্য বানানো যায় এটা আমার কাছে ধরা পড়ল। পদ্য বানানোর এ খেলাটাতো বেশ! এ খেলা খেলতে খেলতে আমার দুটো লাভ হল। আগে একা একা মোষ চরাতে, জল ছাড়তে, বিরক্তি লাগত, নিঃসঙ্গতা ভাল লাগত না। মনে হত গল্প করার, আড্ডা মারার সাথে সাথে লোকের সঙ্গে থেকে এ কাজটা করি। এখন তার ঠিক উল্টো। এখন আর আমার একা থাকতে বিন্দুমাত্র বিরক্তি হত না। আমি নিজের সঙ্গে নিজেই খেলতে লাগলুম, নিজেই নিজের সঙ্গী হলুম। একা থাকতেই বরং এখন আরো ভাল লাগত। জোরে জোরে কবিতা আবৃত্তি করতুম, ইচ্ছে হলে সেই সাথে অভিনয়ও করতুম। পদ্য আওড়াতে আওড়াতে এমনও হয়েছে রীতিমত নেচে বেড়িয়েছি। অনেক সময় দেখেছি কবিতায় মাস্টারমশাই নিজে সুর দিচ্ছেন। তাই দেখে আমিও সুর লাগাতুম কবিতায়। অনন্ত কনেকার এর "চাঁদের আলো ছড়াল এক শুভ্র মায়া" বলে যে কবিতাটা শুরু, তাতে আমি মাস্টারমশাই-এর চেয়েও ভাল সুর দিয়েছিলুম। ওটা সিনেমার গানের সুরে ছিল। তাছাড়া ঐ কবিতাটি আমি মাস্টারমশাইর চাইতেও ভাল অভিনয় করে দেখাতে পারতুম। কবিতার ভেতরের অর্থটা মুখে ফোটাতে চেষ্টা করতুম। মাস্টারমশাই তো তাই দেখে বেজায় খুশি। ক্লাস সিক্স, সেভেন-এ আমাকে ডেকে নিয়ে আমাকে দিয়ে সেই কবিতা অভিনয় করে করে গাইতে বলতেন। স্কুলের একটা ফাংসনেও আবৃত্তি করতে বললেন। যে জীবনটা এতদিন কাটিয়ে এলুম সেগুলো যেন শীতের পত্রহীন বৃক্ষের মতোই ছিল। স্কুলের পাঠক্রমে এই কবিতা আবৃত্তি, গান, অভিনয়, ফাংসনে সুযোগ সব মিলিয়ে যেন সেই শুকনো গাছে বসন্তের নবীন কিশলয় হয়ে দেখা দিলে। আমি সবুজ, তরতাজা ও প্রাণময় হয়ে উঠলুম। মাস্টার মশায় নিজেও কবি ছিলেন, তাঁর বাড়িতে মারাঠী কবিদের রচনার ভাল সংগ্রহ ছিল। সে সব কবিদের জীবনের কথা তিনি থেকে থেকেই স্মৃতিচারণ করে জীবন্ত করে তুলতেন। তখন এঁরাই আমার খুব কাছের মানুষ, খুব অন্তরঙ্গ হয়ে যেতেন। যিনি নিজেই কবি আমাদের সেই মাস্টারমশাইকে চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখে আমি বুঝলুম কবিরাও আমাদের মতনই রক্তমাংসে গড়া মানুষ, তাদেরও আমাদেরই মত ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি মানুষের রিপু বলে যাদের ধরা হয় তা আছে এবং আমিও তাদেরই মতন চেষ্টা করলে কবিতাও লিখতে পারি। আমার মনে পড়ে মাস্টারমশাই তার বাড়ির দোরগোড়ায় জুঁই-এর লতার ওপর একটি কবিতা লিখেছিলেন। সেই জুঁইগাছটা আমি স্বচক্ষে দেখেও ছিলুম। আমার মনে হল আমাদের গাঁয়ে, মাঠে, আমার আশেপাশে কত কি আছে যা নিয়ে আমিও কবিতা লিখতে পারি। মোষ চরাতে চরাতে, মাঠে ফসল দেখতে দেখতে জংলা গাছ জংলা ফুল দেখে আমি ছন্দ মিলিয়ে পদ্য বানিয়ে তাতে সুর দিয়ে গুনগুন করে একসময় গাইতেও লেগে গেছি। মাস্টারমশাইকেও সেগুলো দেখিয়েছি। পকেটে কাগজ পেন্সিল নিয়ে আমি তৈরি হয়েই মাঠে যেতুম। হাতের কাছে কাগজ না পেলে হয়তো মোষের পিঠেই কাঠি দিয়ে লিখে গেলুম। এমনও

হয়েছে মাঠে কোনো পাথরের গায়ে নরম খড়িমাটি ধরনের পাথর দিয়ে পদ্য লিখে যেতুম, মুখস্থ হয়ে গেলে সেগুলো মুছে দিতুম। রোববার কবিতা লিখলে আমি সোমবারের জন্য ছটফট করতুম, কতক্ষণে স্কুলে যাব আর সে কবিতা মাস্টার-মশাইকেই বা কখন দেখাব। এমনও হয়েছে, ধৈর্য রাখতে না পেরে আমি রাতেই চলে গেছি মাস্টারমশায়ের বাড়ি। কবিতা শুনে তিনি কত তারিফই না করতেন। কথা বলতে বলতে কবিতার মাইফেল জমে উঠত। কথার ফাঁকে ফাঁকেই মাস্টারমশাই কবিতার ভাষা কি করে তৈরি হয়, সংস্কৃত ভাষা কিভাবে কবিতায় ব্যবহার করা যায়, ছন্দ কি করে মেলাতে হয় সুন্দরভাবে তা দেখিয়ে দিতেন। কবিতার অলংকার কাকে বলে, তাদের বিভিন্ন রূপ, তাদের ব্যবহারের বৈচিত্র্য, আরো কত সূক্ষ্ম তত্ত্ব। ভাষার নিয়ম কি, ভাষা শুদ্ধ রাখা যে কতটা জরুরি মাস্টারমশাই তাও বলে যেতেন। ওঁকে আমার বড়ই কাছের মানুষ, আপন জন মনে হত। তিনি আমাকে বই এবং আরো নানারকম জিনিস তাঁর নিজস্ব সংগ্রহশালা থেকে দিতেন। কোনো নতুন সুর হয়তো তাঁর কাছে শিখে এলুম, মন চাইত ঐ সুর আমার কোনো একটা কবিতায় দিয়ে গাইতে। আমি সারাদিন সুর আর কবিতা নিয়ে লেগে থাকতে পারতুম, তাতে কোনো বিরাম থাকত না। মারাঠী ভাষাতে আমার দখল এভাবেই তো ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল। আমার লেখার ব্যাপারে আমি আরো অনেক বেশি সজাগ, সচেতন হলুম। নানা শব্দ, কথা, ভাষার বৈচিত্র্য আমাকে পাগল করে তুলল, মনে হত মনের ভেতরে যেন হারমোনিয়াম নানা সুরে বাজছে।

নাইক মাস্টারমশাই আমাদের জ্যামিতি শেখাতেন। এদিকে আবার বয়স্কাউট-এর আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন, বীর কিশোরদের জন্য গীতিনাট্য লিখেছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের গান দিয়ে পাঁচ অঙ্কের একটি নাটকও রচনা করেছিলেন, বিশেষ দিনে বয়স্কাউটদের বার্ষিক সভায় এ নাটকটি পরিবেশিত হতো। স্কুলের পেছন দিকটায় খোলা জায়গায় কিশোরদের ড্রাম, বাঁশি বাজানোর আওয়াজ যখন আমাদের কানে যেত আমরা চঞ্চল হয়ে উঠতুম, নিজ নিজ জায়গায় আমাদের ধরে রাখা মুস্কিল হয়ে উঠত, মন চাইত খোলা জানালা দিয়ে বাইরে কিছু দেখা যায় কিনা দেখে আসতে আর তার জন্য ছটফটানি শুরু হয়ে যেত। দেখাবার মতো কিছু করে আনলে ছেলেদের উনি উৎসাহ দিতেন, সেগুলোর তারিফ করতেন। জ্যামিতি একঘেঁয়ে হয়ে গেলে ছেলেরা নিজেদের কোনো না কোনো হাতের কাজ তাঁকে দেখাত। কেউ বা ধরত গান। বসন্ত পাটিল অনেক আগে থেকেই বয়স্কাউটে নাম লিখিয়েছিল। বসন্ত আর মধু সমগর সাঙ্কেতিক অক্ষরে নিজেদের মধ্যে দিব্যি খবরাখবর পাচার করত, তাই দেখে আমাদের খুবই ধাঁধাঁ লাগত। অম্বাবাঈর নাম করে যারা নেচে নেচে কীর্তন করত সেরকমই হাবভাব — সঙ্কেতে ভাষা। ড্রাম আর বাঁশি দিয়ে শুরু হত প্যারেড। লেফট রাইট এ দুটি শব্দের সাথে সাথে এতগুলো পায়ের তালে তালে শব্দ শোনা যেত। খাকি পোশাক পরে, গলায় সবুজ রুমাল বেঁধে ছেলেরা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। এমনিতে যে ছেলেগুলোকে বোকা ক্যাবলাকান্ত বলে মনে হত তারাও এ পোশাকে যখন গ্যাট গ্যাট করে চলে বেড়াত তখন সবার মন কেড়ে নিত। প্যারেড আরম্ভ হয়ে গেলে ছেলেরা মার্চ সং করত। তাদের পায়ের তাল, বাঁশি আর ড্রামের আওয়াজ আমার

রক্ত গরম হয়ে উঠত। মনে মনে আমিও যেন ওদেরই একজন হয়ে ওদেরই সাথে ওদেরই মতো প্যারেড করে যেতুম।

ক্লাস ফাইভ-এ পড়তে পড়তে আমার অজান্তেই আমি নাইক মাস্টারমশায়ের প্রেমে পড়ে গেলুম। আমি কবিতা খুব সুন্দর মুখস্থ করতে পারতুম। ক্লাস সিক্স বা সেভেনে যে সব কবিতা পড়ানো হতো তারও কতগুলো সুন্দর সুর দিয়ে মুখস্থ করে রেখেছিলুম। অনেক মারাঠী সিনেমার গান আমি চড়া সুরে গাইতুম, অভিনয়ও করতুম তারই সাথে সাথে। বয়স্কাউটের বিশেষ অনুষ্ঠানের দিন নাইক মাস্টারমশাই আমাকে দিয়ে ঐ সব আবৃত্তি করিয়ে নিতেন। মনে পড়ে ক্লাস টিচারকে নিয়ে একটি হাস্যকৌতুক তিনি লিখে আমাকে দিয়ে সেটা অভিনয়ও করিয়ে নিলেন।

আমি যখন ক্লাস ফোর-এ পড়তুম তখন আম্বী নামে একটি ছাত্র উঁচু ক্লাসে পড়ত। মানুষের চলাফেরা, কথা বলা, নিজস্ব ধরন-ধারণ এ সব দেখে নকল করতে ও ছিল এক নম্বরের ওস্তাদ। ওকে দেখে আমার মনে হল ওরকম নকল করলে তো বেশ হয়!

আমি মাঠে ঘাটে ঘুরতে ফিরতে অনেক জন্তু জানোয়ারের ডাক নকল করতে শিখেছিলুম। বেড়ালের ঝগড়া, মোষ তার বাছুরকে কিভাবে ডাকে, গাধার ডাক, ভোমরা ঘুরে বেড়াবার সময় যে শব্দ করে, আটকে গেলে যে ঝটপটানি হয়, জল মাঠে ছেড়ে দেবার সময় যে কলধ্বনি হয় এসবের নকল আমি সুন্দর করতে শিখে গিয়েছিলুম। মাস্টারমশাইকে একদিন ক্লাসে ঐ সব নকল করে যখন শোনালুম তিনি তো তা শুনে বেজায় খুশি, আমাকে খুব পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিলেন। এর পর আমি ঐ বিদ্যেটাকে আরও নিখুঁত করতে লেগে গেলুম। ছোট খাট লক্ষ্য করে সেটাই নকল করে ফেলতুম। চলন বলন, তাদের বিশেষ বিশেষ অভ্যেসগুলি আমার নকলের বিষয়বস্তু হত। নাটকের সংলাপ ঝগড়া মুখস্থ করে শুনিয়ে দিতুম। মুখস্থ করা আমার আসত খুব সহজেই, সেটাই এখন পুরোপুরি কাজে লাগালুম।

সনগর মাস্টারমশায় আমাদের পাড়াতেই থাকতেন। তিনি শেখাতেন আঁকা। ছোটবেলা থেকেই পাড়ায় উনি আমাকে দেখে আসছেন, খেলতে, মারপিট করতে। আমাকে তাই উনি আন্দ্যা বলেই ডাকতেন। তিনি ক্লাসে না থাকলে ছেলেরা গণ্ডগোল করত। ফিরে এসেই যারা মারপিট করত তাদের পিঠে দুমাদুম মার লাগিয়ে দিতেন। আমি বেচারা মারপিটের মধ্যে না থাকলেও হামেশাই ওঁর গাট্টা খেতুম। আমি কিছুই করিনি একথা বলার আগেই গাট্টা খেয়ে গেছি। তিনি কি করেই বা জানবেন আমি কতটা পাল্টে গেছি। আগে পাড়ায় আমি তো পেন্সিল, বোতাম, গুলি, আমের আঁটি, দেশলাইর বাক্স এ সব নিয়ে কতই না খেলেছি! কত মারপিটও করেছি। আমার ও ছবিটাই খুব সম্ভবতঃ মাস্টারমশাইর চোখের সামনে এখনও ভাসত। উনি তাই ধরেই নিতেন ক্লাসে মারপিটের ব্যাপার হলে ওর মধ্যে আমিও একজন নিশ্চয়ই আছি। বসন্ত পাটিল ভাল ছবি আঁকতে পারত। ছোটবেলায় একটু আধটু ছবি আমিও আঁকতুম সেটা খুব একটা কিছু না। বসন্তকে দেখে আমার আবার মনে হল, তাই তো! ওর কাছে হেরে গেলে তো চলবে না। আমি তাই আবার আঁকা ধরলুম, মন দিয়ে আঁকতে

লেগে গেলুম। সমগর মাস্টার মশাই ক্রমশ: বুঝতে পারলেন যে আমার ছবি আঁকার হাত আছে। সুযোগ পেয়ে একদিন ওঁকে আমি আমার সব কথা বললুম। তখন তিনি সব বুঝতে পাবলেন, আগে ভাবতেন আমি সিনেমার নেশায় পড়ায় গাফিলতি করে ফেল করেছি এক বছর।

এভাবে আমার দ্বিতীয় বারের ক্লাস ফাইভ-এর দিনগুলো হৈ-হৈ করে কাটতে লাগল। এর মধ্যে আমাদেব বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গেল। আমার ভাইবোনেরা মাটি খেয়েই যাচ্ছিল— চন্দ্রা খেত আরও বেশি করে। তার ওপর দেড় বছর ধরে ওকে আফিং খাওয়ানোর জন্য ওর মানসিক ভারসাম্য ঠিক ছিল না, আফিমের কুফল প্রথম দেখা দিল মাথার 'পরে। সে এক জায়গাতেই বসে থাকত। খিদে পেলেও খাবার জন্য কাঁদে না, যেখানে বসে আছে, নির্জীব হয়ে সেখানেই রইল বসে। মা তার সামনে ঘোলে চটকানো ভাত, দুধে ভেজানো ভাখরি, ডাল-ভাত, দুধভাত চটকে ফেলে রাখত। সে সেগুলো আস্তে আস্তে খেয়ে সেখানেই চুপ করে বসে থাকত। সেখানেই বসে বসে পেট ভরে মাটি খেয়ে যেত। এভাবে মাটি খেয়ে খেয়ে একসময় ও পচা কুমড়োর মতো ফুলে গিয়েছিল। এরপর ওর জ্বর হতে আরম্ভ হল।

মার যখন সময় হত তখন সরকারি হাসপাতাল থেকে ওষুধ আনিয়ে মা খাওয়াত ওকে। মাঝে মাঝে আমিও সে ওষুধ এনে দিয়েছি। যে ওষুধ একদিনের খাবারের জন্য দেয়া হত সেটা জল মিশিয়ে পাতলা করে তিনদিন ধরে ওকে খাওয়ানো হত। অন্ধকার ঘরে সে চুপ মেরে শুয়ে পড়ে থাকত। ঘরের অন্ধকারেই চন্দ্রা একদিন মরে পড়ে রইল। কিছু খেতে চাইছে কিনা দেখতে গিয়ে মা দেখে অবলা নিরীহ প্রাণীর মতো বেচারা চন্দ্রা মরে পড়ে আছে। চন্দ্রা তখন তিন বছরেরটি হবে। তার কচি ফর্সামুখ, মাথায় কাল কুচকুচে চুল আর সুন্দর নরম ঠোঁট— দেখে মনে হবে সে আরামে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

ঝোরার দিকের মাটিটা খুঁড়তে সেদিন আমার যে কত কষ্ট হয়েছিল তা আমিই জানি। আমি ভেতরে ভেতরে কান্নায় ফেটে পড়ছিলুম। যে মাটি এতক্ষণ ধরে খুঁড়লুম সে মাটির তলায় চন্দ্রার কেমন লাগতে পারে, নিজের বুকে ঘা মেরে মেরে পিটিয়ে পিটিয়ে আমি তা অনুভব করবার চেষ্টা করছিলুম।

মা খুব শান্ত চুপচাপ। তার কোলে ন'দশ মাসের লক্ষ্মী। তাকে বুকে ধরে মা কাঁদছিল।

আট

আমাদের বালগুড়ির জমির মেয়াদ শেষ হত পাড়ওয়াতে, নববর্ষে (চৈত্রমাসে)। ক্লাস ফাইভ-এর পরীক্ষা আমার সে সময়ই শেষ হল। যার জমি ছিল তার চাকরি শেষ হয়েছে, পেনসন পেয়েছে। তার একটি ছেলে সাবালক হয়েছে। ওর ইচ্ছে জমিটা নিজেরাই চাষ করবে, ভাগে দেবে না। তাই আমরা আর এবারে সে জমি চাষের জন্যে পেলুম না। এদিকে লীজও শেষ হয়ে এসেছে। আমরা তাই ভাটদের বাগান সাত বছরের জন্য নিলুম। দেয়ালীর সময়ই খবরটা পেয়ে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। বালগুড়ির জমিটা বাড়ির কাছে ছিল ঠিকই, কিন্তু লাল মাটির জমি বলে সেটা উর্বর ছিল না। ফসলও খুব একটা ভাল হত না। জমিতে যে কুয়োটা ছিল সেটা ছিল খুবই গভীর, জলও খুব কম থাকত। কুয়োটা এত গভীর ছিল বলে একবার জল তুলতেই অনেক সময় লেগে যেত। সেটা আবার ঢালতে হবে নালায়, যেখান থেকে জল যাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চাষের জমিতে। এমন আস্তে আস্তে সে জল যেত যেন মনে হত গোমূত্র যাচ্ছে টিকটিক করে আখের গাছে। তার ওপর জমি আবার লাল মাটির। যতই জল ঢালি না কেন পরের দিন এসে দেখব শুকনো খটখটে। জমিতে জল মোটে দাঁড়াত না। যতটা জল পেলে জমিতে সে জল দাঁড়াবে, সেটুকু পাবার সম্ভাবনাই ছিল না। আমাদের খরচে পোষাতে হবে বলে এক একর জমিতে আখের চাষ হত। তাও জলে টান পড়ত। গরমের সময় মে জুন মাসেই আখের খেত শুকিয়ে যেত আর কে না জানে গাছ একবাব শুকিয়ে গেলে, আখ আর তেমন বাড়ে না? এ জন্যই এক একর জমিতে অন্য চাষীদের যেখানে পাঁচ গাড়ি গুড় হত সেখানে আমাদের দুগাড়ি, টেনে টুনে আড়াই গাড়ি গুড়েতে সন্তুষ্ট থাকতে হত। আর শাক সব্জি চাষের তো জলই থাকত না। আরেকটা উৎপাতও ছিল। আমাদের জমিটা গাঁয়ের কাছে বলে গরমকালে সারা গাঁয়ের ছাড়া গোরু, মোষ, গাধা সবুজের দেখা পেয়ে আমাদের খেতে ঢুকে পড়ে গাছগুলোর মাথা মুড়ে খেয়ে রেখে দিত। সব দিক থেকেই সে জন্য বালগুড়ির জমি আমাদের কাছে লাভের ছিল না, সম্বৎসর আমাদের ও জমির ফসলে কুলোত না।

বালগুড়ির জমিও আমাদের হাতছাড়া হল, গণপার চাকরির মেয়াদও সেই সঙ্গে শেষ হল। আমাদের কাছে গণপা বছর দুই রয়েছে, তাতে সে কিছু টাকাও জমিয়েছে। এবারে সে বিয়ে-থা করে সংসারী হবে। এ গাঁয়েরই এক মজুরের মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে, আশীর্বাদও হয়ে গেছে। এ উপলক্ষ্যে দেশাচার অনুযায়ী গুড় দিয়ে ভাত খাওয়াও হয়ে গেছে বিয়েটা পাকাপাকি করার জন্যে। বিয়ের পর সারাবছরের জন্য চাকরের কাজ ও আর কোথায়ও করবে না। ও ঠিক করে রেখেছে ওর সুবিধেমত চাকরি ধরবে, দরকার হলে ছেড়েও দেবে, কোথাও একটানা নয়। ছেলেটি খুবই চালাক চতুর আর কাজেরও বটে। ও ভেবে রেখেছে গুড়ের কাজে হাত দেবে। আমার

মনে আছে আমগাছেও সে কেমন চটপট উঠে যেত। আখের সময় ও তাই আখ তোলারও কাজ করবে, তারপর ওর ভাগের আখটুকু ও খড়ের ওপর রেখে পাকিয়ে দেবে বেচে। এ কারবার দেড় দুমাস তো চলবেই। গুড়ের কারবারও দুমাস মতো চলবে। চার মাসের রোজগারের ব্যবস্থা তো এভাবে হয়েই গেল। তারপর ফসল তোলা হয়েছে এমন কারুর চাষের জমি নিয়ে বর্ষাকালে কিছু না কিছু ওতে তো ও ফলাবেই— এভাবে ওর পেট একরকম চলে যাবে। এদিকে বৌকে হয় একটা মোষ কিনে দেবে নয়তো অন্য কোনো ব্যবস্থা করবে রোজগারের যাতে বৌএর একটা পেট চলে যায়। এসব চিন্তাভাবনা ও আগে থেকে করেই রেখেছে যাতে পরে ওর দিন চালানোর কোনো অসুবিধে না হয়। বিয়ে ঠিক হতেই গণপা মাকে জানিয়ে রেখেছে, তবে সেই সাথে সাথে বাবাকে যেন এখনি না জানানো হয় সেটাও বলে রেখেছে। কে না জানে বাবা জানতে পারামাত্র রাগারাগি চোটপাট শুরু করে দেবে। পরে কোনো এক সময় বাবাকে জানালেই হবে। মা অবশ্য বাবার কাছে ব্যাপারটার কিছুটা আগে থেকে গেয়েই রেখেছিল। বাবারও পুরো এক বছরের চুক্তিতে চাকর রাখার ইচ্ছে এবারে আর বিশেষ ছিল না। বাবা ভেবে দেখেছে যা ছেলেপুলে ভগবান বাবাকে দিয়েছেন তাদের দিয়েই চাষবাস সামলে নিতে পারবে।

তা সত্ত্বেও গণপাকে বাবা একবার বলেই ফেললে, "তাহলে এরপর তোর আর কাজ করার ইচ্ছে নেই?"

"এখন করে যাব। তবে বিয়ের পর অসুবিধ হবে। চব্বিশ ঘণ্টা খেতে থাকলে অন্য কিছু তো আর করা যায় না। সংসারী হলে শুধু চাকরির পয়সায় কুলোবে কি করে?"

আমার কিন্তু খুব মন খারাপ হয়ে গেল। আমি আর থাকতে পারলুম না, ওকে বলেই ফেললুম।

"তুই এ বছরটা অন্তত থেকে যা।" ওর সাথে আমার খুব ভাব ছিল বলে ও চলে যাবে শুনে আমি খুব ছটফট করছিলুম, ও থেকে যাক এ চেষ্টা করছিলুম। ও না থাকলে খেতে এখন আর আমার মনই টিকবে না, খেতের কাজে ফাঁকি পড়বে।

গণপা আমার কথা শুনে হাসলে। আমি বললুম, "হাসলি যে বড়, বাবাকে বল না কেন যে তুই থেকে গেলি?"

"আন্দা, আমি তোদের চাকরিতে না থাকলেও, এ গাঁয়েই তো থাকব, তোদের গলি পার হলেই তো আমাদের বাড়ি। দরকার হলে ডেকে পাঠাস। মাঝে মাঝে একটু আধটু কাজ তুলে দিয়ে যাব'খন। রেতের বেলায় তুই আমার কাছে গেলেও তো পারিস।"

যাবার দিন গণপাকে মা খাইয়ে দিলে। আমিও ওর সাতে একসঙ্গে বসেই খেলুম। খাবার পর মা ওকে পাঁচ-ছ সেরের গুড়ের একটা ঢেলা, কিছুটা জোয়ার দিলে। "বৌদি আমি তবে আসি। বাপু আমি তাহলে চললুম," বলে গণপা মার দেয়া জিনিসগুলো কাপড়ে বেঁধে উঠে পড়ল। আমার চোখে জল এসে গেল।

ভাটদের জমি নিয়ে বুঝলুম কাজটা ভালই হয়েছে। সে জমিতে শাক সব্জি ভাল

হত— এটা সবাই জানত। আমাদের আগে রামু মানে এ জমিটা চাষ করত। সারাবছর ধরে সে সব্জিই চাষ করত। মাঝে মাঝে এক দেড় গাড়ি গুড়ও তুলত ও। পুরো জমিটার ভেতর ছ'একর ছিল কাল মাটির জমি, আর দেড় দু একর খালি মাঠ। রামু মানে শেষের পাঁচটি বছর বছরে আড়াইশ' টাকা করে খাজনা দিত জমির মালিককে। বাবা ঠিক করল বছরে সাড়ে সাতশ' টাকা করে সাত বছরের জন্য জমিটা নেবে। এ ছাড়া আস্ত আখের এক আঁটি, এক হাঁড়ি আখের রস, দু ঢেলা গুড় আর দুবার গাড়ি ভাঁড়া খাটিয়ে যা হবে তা মালিককে দিতে হবে— এও সর্তে ছিল। অনেকেই বাবাকে শুধোলে, "এত চড়া দাম দিতে রাজী হলি কেনরে রতনু?" বাবা বললে, "মালিক কুয়ো খুঁড়ে দেবে বলেছে। তাহলে কুয়ো খুঁড়ে দেবার পর তো অনেক জল পাব। আখের চাষ যদি মাত্র দুএকর জমিতেও করি তাহলেও আট দশ গাড়ি গুড় হবে। তাছাড়া সারা বছর সব্জির চাষ তো রইলই। তিন গাড়ির পয়সা মালিকের ভাগে যাবে, বাকিটা তো আমিই পাব।" বাবার বিশ্বাস ছিল, মালিক বামুন তাই কথার খেলাপ করবে না, কুয়ো ঠিকই খুঁড়ে দেবে, তাতে এ জমি বাবাকে অনেক কিছু দেবে। সামনের বছরই কুয়ো খুঁড়ে দেবে, এক মাথা গভীর হবে, মালিক বাবাকে বলে দিয়েছে ও নিয়ে ভাবতে হবে না, যদিও কুয়োর কথা লেখাপড়ার মধ্যে কোথায়ও ছিল না। তাছাড়া কুয়ো পরিষ্কার রাখার দায়িত্বও আমাদেরই ছিল।

সে বছর বালগুড়ির জমির গুড়ের কাজও শেষ হয়ে গেল। আমাদেরও ভাটদের থেকে নেয়া নতুন এ জমিটার ওপর মায়া আর যত্ন বাড়তে লাগল। জমিতে প্রথমে আখের চাষ হয়ে যাবার পর সংক্রান্তি এল। সংক্রান্তির পরই আমরা জমিতে লাঙল নামালুম। জমিটার নীচের দিকে একটা ঝোরা ছিল। ঝোরা আর জমির মাঝখানের কিছুটা জায়গায় শুধুমাত্র ঘাস হত।

কাল নরম মাটির ঘাস ছিল মিষ্টি। বালগুড়িতে গোরুমোষ চরত মাঠে। ভাটদের জমি নেবার পর একদিনের কথা। সেদিনও আমি ওদের ঝোরার কাছে গোরু মোষ চরাচ্ছি। সন্ধেবেলা আমার গাঁয়ের দিকে নজর পড়তে দেখি আকাশে ধোঁয়ার ঢেউ দেখা যাচ্ছে। মনে হল কারু কিছু জ্বলছে বা পুড়ছে। ধোঁয়া যখন অনেকক্ষণ ধরে উঠছিল আর ক্রমে বেড়েই চলল তখন মনে ভাবনা হল। দেখিতো গিয়ে কি হয়েছে গাঁয়ে, এ ভেবে গাঁয়ের রাস্তা ধরলুম। এমনিতে সুয্যি ডুবে যাবার পর যেতুম, আজ সকাল সকাল ফিরে গেলুম। সঙ্গে আছে গোরু মোষের দল।

বাড়িতে যখন গিয়ে পৌছুলুম তখন পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এসেছে। গাঁয়ের সব জায়গায় খুব হৈ চৈ হচ্ছে। বাড়ির পেছনের উঠোন দিয়ে ঢুকে মোষগুলোকে খাটালে বেঁধে সামনের দরজায় এসে দেখি বাবা বাড়ির দোরেই বসে আছে। কি যেন ভাবছে। এ দিকে অন্ধকারও ক্রমেই বাড়ছে। আমি শুধোলুম, "গাঁয়ে এত হৈ চৈ কিসের?" বাবা বললে, "বামুনদের ঘর পোড়াচ্ছে।" আমি বললুম, "কেন?" বাবা বললে, "গান্ধী মহারাজ খুন হয়েছেন।" শুনে আমার খুব ভয় হল। গলিতে লোকেরা এখানে সেখানে এলোমেলোভাবে ছুটোছুটি করছে। আমাদের বাড়ির পর থেকেই মাঙ্গদের পাড়া শুরু হয়। কাগলের এই মাঙ্গপাড়া এ জেলাতে সব চাইতে

বড়। মাঙ্গরা বামুনদের দিকে একবার করে ছুটে যাচ্ছে ফের পিছু হটে ফিরে আসছে। ঘর পুড়িয়ে দেবার আগে লোকগুলোকে টেনে বার করে বাড়িতে আগুন দিচ্ছিল। আগুন লাগাবার ছুতো করে লোকগুলো ঘরে ঢুকে হাতের কাছে যা পাচ্ছে নিয়ে সরে পড়ছে। মাঙ্গপাড়ার ছোট বড় সবাই বামুনপাড়ার দিকে সারি সারি হয়ে একবার করে যাচ্ছে আর লুটপাট করে যা পাচ্ছে নিয়ে ফিরছে। জামাকাপড় আর ধান এগুলোই বিশেষ করে লুটপাট হচ্ছিল। মাঙ্গদের জোয়ান ছেলেগুলো পিঠে ধানের বস্তা বয়ে বয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ফিরছে। বলতে গেলে পুরো গাঁটাই বামুনপাড়ার দিকেই ছুটছে। আগুনে জ্বালিয়ে না দিয়ে লুট করে নিয়ে এলে পরে খাওয়া যাবে, লুটপাটটা এ ভেবেই করছিল এরা আর কেউ জিজ্ঞেস করলেও এ জবাবই দিচ্ছিল। কথাটা নেহাৎ মন্দ বলেনি। গাঁয়ের বামুনপাড়া বেশ বড় পাড়া। পুরনো জমিদারের গাঁ এটা। আশেপাশের গাঁয়েতে যাদের জমিজমা আছে তারাও থাকে কিন্তু কাগলেই। অনেক উকিল, সরকারি কর্মচারীর বাস এ গাঁয়ে। তাছাড়া ছিল সঙ্ঘের বড় শাখা। এত এত বড়লোকের ধন দৌলত, গোলাভরা শস্য এই গরীব কাঙালেরা এক রাতেই লুটপাট করে পেরে উঠবে কেন? লোকেরা হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই তুলছে, মাঙ্গদের মধ্যে একজন কিছু না পেয়ে একটা হারমোনিয়মই তুলে নিলে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে, বাবা চৌকাঠের ওপর। বাইরে গিয়ে দেখি তো কে কি লুটে আনছে এই ভেবে যেই না চৌকাঠে পা দিয়েছি অমনি আমার পা পড়ল একটা মস্ত বড় কুড়ুলের ওপর।

"এটা কি?"

"দেখতেই তো পাচ্ছিস, কুড়ুল। তুই বাইরে কেন? যা, ভেতরে যা।"

মা ভেতর থেকে ডাক দিলে, "আন্দ্যা।" আমার জন্য চা করেছে। ভেতরে গেলুম, চারিদিকেই থমথমে, গরম গবম ভাব। ক্লাসের বামুন ছেলেদের নাম মনে পড়তে লাগল। যোশী, কুলকার্ণি, গুলবনা, মুজুমদার সবার নামই মনে এল আর ওদের কথা ভেবে পেটের ভেতর কেমন একটা হতে আরম্ভ করে দিল।

"মা, বাবা কুড়ুল নিয়ে বসে আছে কেন বলতো?"

"বামুনপাড়ায় সব বামুনদের ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আর বলে বেড়াচ্ছে বামুনদের সাথে যাদের যাতায়াত, লেনদেন আছে তাদের ঘরও জ্বালিয়ে দেবে।"

এবারে আমি রীতিমত ভয় পেলুম। মা বাবা হয়তো ভাবছে এ হট্টগোল ডামাডোলের মাঝে আমাদের বাড়িতেও হয়তো কেউ চলে আসবে, আমরাও তো এই সবে বামুনদের জমি ভাগ চাষের জন্য নিয়েছি। তা ছাড়া, যাদের জমি অর্থাৎ ভটেদের বাড়িতেও বাবা আড্ডা মারত। বামুনপাড়ায় হসুরকর উকিলের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ ছিল— মক্কেলের সাথে উকিলের। তাছাড়া মা ওখানে দুধ দিতেও যেত, জমির তরিতরকারিও নিয়ে যেত— এ সবই সেই দাদুর আমল থেকেই। আমিও তো কিছুদিন হল সঙ্ঘে আসাযাওয়া করছিলুম। বাবার ধারণা হয়েছে হয়তো বা এরা এসবের জন্যে আমাদের বাড়িতেও হৈ হৈ করে চলে আসবে, ঘরদোর জ্বালিয়ে দেবে। একজন হৈ চৈ তুলে দিলেই হল, ব্যস্ সবাই অমনি ওর পোঁ ধরবে। গাঁয়ের আবহাওয়া তো ভাল নয়, একটা কিছু হুজুগ হলেই হল। সবেমাত্র চাষের ফসল, ধান, শাকসব্জি ঘরে এনে

তোলা হয়েছে। বাবার মনে তাই নানারকমের সন্দেহ উঁকি মারছে। এ সময়ে আমাদের বাড়িতে আসার দুঃসাহস যদি কারো হত তাহলে তাদের দুতিন জনকে বাবা যে কুড়ুল দিয়ে জানেই মেরে দেবে তা বাবার চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে একপাও এখন বাবা নড়বে না। আমরা বাদে আস্ত গাঁ ঝেঁটিয়ে বামুনপাড়ার দিকে ধেয়ে গেছে, যা পাচ্ছে তুলে আনছে।

অনেক রাতে সব যখন শান্ত তখন বাবা বললে, "ঐ হট্টগোলের মধ্যে আমরাও যদি নেমে পড়তুম তাহলে যারা ঘর জ্বালাতে যাচ্ছিল, তারা আমাদের ঘরেও আগুন লাগাত।"

"তা কেন?"

"ওরা তখন বলে বেড়াত এই রতনু যকাতের বামুনদের সাথে গা শোঁকাশুঁকি আছে, ওদের চামচে। এখন ওখানে দৌড়ে গেছে, নিশ্চয়ই বামুনদের বাঁচাতেই গেছে। বামুনদের জিনিসপত্র যা পারে বাঁচিয়ে তুলবে এনে নিজের ঘরে। চল, আমরা রতনুর বাড়ি পোড়াই। এসব বলে সত্যি সত্যি যদি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিত, তুই তখন কি করতিস্? দেখতে দেখতে আমার এই নতুন বাড়ি চোখের সুমুখে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তা ছাড়া, হসুরকর উকিল হচ্ছে গিয়ে বামুনদের মাথা। আর ওর সঙ্গে আমার যে মাখামাখি আছে তা তো গাঁ শুদ্ধ লোকের জানা, তুই যে সঙেঘ যাস, সেও কি আর কেউ দেখেনি বলতে চাস?"

সে রাতে বাবা মা আর আমি কেউ ঘুমোলুম না, কথা বলতে বলতে সারারাত জেগেই কাটিয়ে দিলুম। বাবা একটা লাঠি আমার হাতেও গুঁজে দিয়েছিল। ভোর হলে জানতে পেলুম রাতে যারা ঘর দোরে আগুন লাগিয়েছে, লুঠতরাজ চালিয়েছে তাদের অনেকেই নাকি ধরা পড়েছে, পুলিস হাজতে ওদের আটকে রেখেছে। আসলে কিন্তু ধরা মাত্র চার পাঁচজনই পড়েছে। যারা সত্যি সত্যি আগুন লাগিয়েছে তারা সবাই বাইরেই দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পরের দিনের কথা। স্কুলে যাবার জন্যে এগারটার সময় বাড়ি এলুম। স্কুল সেদিন হয় নি। গতকালের ব্যাপারটা আরও জানবার জন্য বামুনপাড়ায় ঘুরতে গেলুম। গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা মোড়ে মোড়েই দলে দলে ঘুরছে। রাতে সব কিছু পুড়ে গেছে কিনা ওটা দেখাই বোধহয় ওদের ঘোরার উদ্দেশ্য। ওদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঘুরতে লেগে গেলুম, কানটা পড়ে রইল ওরা কি বলে তা শোনার জন্য।

অনেক কিছুই শোনা গেল। ঘরে আগুন দেবার সময় কেমন করে ওরা ঘর থেকে সবাইকে বার করেছে, কিভাবে, ওরা তাদের ভয় দেখিয়ে বলেছে বাড়ি থেকে বেরিয়ে না গেলে ঘর বাড়ি তো জ্বলবেই সেই সঙ্গে ওরাও পুড়ে মরবে। যারা ঘর বাড়ি ছেড়ে যেতে রাজী হয় নি, রাগারাগি করেছে তাদের কেমন করে সাত আট জনে মিলে চ্যাং দোলা করে ধরে তুলে নিয়ে দূরে কোথায়ও ফেলে দিয়ে এসেছে। কেমন করে বামুনদের বাড়িতে কাগজ আর কাপড়ের পুটলি পাকিয়ে তাতে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয়া হয়েছে। কেরোসিন কম পড়ে গেলেই চৌগুলেদের মুদিখানার দোকান থেকে টিন টিন নিয়ে আসা হচ্ছিল। চৌগুলে ভাবছে ভয়ে ভয়ে, কেরোসিন যাচ্ছে

যাক, ওর পরানটা থাকলেই হল। সে খুব ভাল করেই জানে কেরোসিন না দিলে ওরা ওর দোকানটাই দেবে জ্বালিয়ে। এ সময় এক ফোঁটা কেরোসিনও বাঁচিয়ে দোকানে বা বাড়িতে রাখতে ও মোটেই রাজী নয়, বরং মস্তানেরা এগুলো নিলেই ও খুশি। যদি কেউ বামুনদের ঘরের আগুন জল ঢেলে নেভাতে গেছে তবে মস্তানেরা ওকে শাসিয়েছে ঐ আগুনে হয় ওকেও ছুঁড়ে ফেলে পুড়িয়ে মারবে নয়তো ওর বাড়িঘরেও আগুন লাগিয়ে দেয়া হবে। বামুনদের ঘরের আগুন নেভাতে যে জলের প্রয়োজন সে জল দেয়াও বারণ ছিল। সে রাতে তাই বামুনদের ঘরদোরের আগুন নেভে নি, জ্বলতেই থেকেছে।

আমি কাছে গিয়ে আগুন দেখতে গেলুম। অনেক কিছুই চোখে পড়ল। আমি স্কুলের থলেটি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখে যাচ্ছি— একাই, বলতে গেলে এক্কেবারে দলছুট হয়ে। বড় বড় বামুনদের ঘর সব পুড়িয়েছে, তার মধ্যে উকিলরা আছে, আছে কোলহাপুরের চাকুরেরা, আর আছে সে সব বামুন যাদের প্রচুর জমিজমা আছে। সঙ্ঘের কর্তাদের বাড়িও বাদ যায়নি। দেওয়ানদের বড় বাড়ির তিন ভাই উকিল। বাড়ির একধারে নারকোল, পেঁপে, পেয়ারার একটা বাগান ছিল, ঐ একটা বাগানই আমাদের গরীবদের সম্বৎসরের চাষের জমির সমান। এ বাগানটাতেই তিন ভায়ের ছেলেরা ব্যাটবল বা অন্যখেলা খেলত, কখনও বা গাছের নীচে চেয়ারে বসে পড়াশুনা করত। গাঁয়ের চাষীদের বাড়ি থেকে দুতিন দফে দুধ আসত এখানে। আমাদের মোষও যখন বাচ্চা দিয়েছে তখন আমরাও দুধ দিয়েছি। আমি নিজেই তো কখনোসখনো দুধ নিয়ে এসেছি। বাড়ির ভেতরে যাবার উপায় ছিল না— অনুমতিও ছিল না। বাড়িটা বেশ বড়— অন্দর মহল, বাইরের মহল এ সবে ভাগ করা ছিল— অনেকবারই ইচ্ছে জেগেছিল ভেতরটা ঘুরে দেখে আসি একবার। বাগানের পেয়ারা গাছে পেয়ারা ভর্তি হয়ে থাকত, মনে হত একটা পেড়ে খাই, কিন্তু কোনোদিনই খেতে পাই নি। আজ বাড়ির পুরো ছাতটাই ভেঙে পড়েছে। কালরাতের আগুন এখন দিনের বেলাতেও ধিকি ধিকি জ্বলছে। বাগানের গাছের ছায়াতে তিনভাই তাদের বৌ, ছেলে মেয়ে ছেলের বৌ, নাতি-পুতি নিয়ে বসে আছে— লোকের সংখ্যাটা একটা বরযাত্রীদলের মতো হবে।

টকটকে ফর্সা বৌ আর মেয়েরা এর আগে কোনোদিন হয়তো বাড়ির বাইরেই আসে নি। ছেলেমেয়েরা রোজকার মতনই ছুটোছুটি করে খেলছে, বড়রা একজোট হয়ে বসে কি যেন ভাবছে। পরনে সাধারণ ঘরোয়া পোশাক।

বাড়ির ভেতরে একটা খোলা জায়গায় দরজার সামনেই স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে, টেবিল চেয়ার লেখার ডেস্ক— ঐ স্তূপ থেকে বেরুচ্ছে ধোঁয়া। আমি ছুটে সেখানে গিয়ে দেখি কয়েকটা বই পুড়ছে। তাত্যা উকিলের বড় ছেলে আমারই সঙ্গে পড়ত। এখন ক্লাস সিক্স-এ পড়ে। মনে মনে ভাবলুম দেখি তো ক্লাস ফাইভ-এর কোনো বই এখনও এ আগুনে ধিকি ধিকি করে জ্বলছে কিনা। অঙ্ক, মারাঠী আর বিজ্ঞানের বই ছাড়া ক্লাস ফাইভ-এর আর কোনো বই-ই তো আমার কাছে ছিল না। ক্লাস ফাইভে পড়াবার বিষয় তো আমার সম্বল ঐ তিনখানা বই ছাড়াও আরো অনেকই ছিল। ধোঁয়ার সামনে গিয়ে দেখি উকিলের বুড়ো বাপের লাঠি তখনও জ্বলছে সেখানে।

সেইটে দিয়ে কাগজের পোড়া ঢিপিতে খোঁচাতে খোঁচাতে পেলুম ক্লাস ফাইভ-এর ভূগোলের বই-এর অর্ধেকটা— তখনও পোড়ে নি। আর পেলুম দুটো খাতা, অর্ধেকটা পুড়েছে কিন্তু বাকি অর্ধেকটা ভাল আছে। যেখানে যেখানে নাম লেখা ছিল সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে ভূগোলের অর্ধেকটা বই আর সাদা দুটো খাতার অর্ধেকগুলো থলেতে পুরে দিলুম এক ছুট। তখন আমি দারুণ খুশি, আনন্দে লাফাচ্ছিলুম। অঙ্ক কষার জন্যে কিছু সাদা কাগজের ব্যবস্থা তো হয়ে গেল।

চারটে বড় বড় বাগান বাড়ি আর সাত আটটি বড় বসতবাড়ি বামুন পাড়ায় আগুনে পুড়েছে। ছোট ছোট বাড়িগুলির কিছু হয় নি। যেগুলো পুড়ল তাদের বাড়ির জিনিসপত্র, ধান ও অন্যান্য ফসল, টাকাপয়সা একজায়গায় জড়ো করে আগুন দিতে বা লুটপাট করে নিয়ে যেতে গাঁয়ের লোকেদের রাত কাবার হয়ে গেছে।

বামুনপাড়ার সব জায়গাতেই পোড়া জিনিসপত্র, কাগজ, কাপড় ইতস্তত এখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। যাদের ঘরে আগুন দিয়েছে তারা গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সেই সব বাড়িতে, যেগুলোতে আগুন লাগায়নি। সাকেশর বামুনের ঘরও জ্বালিয়ে দিয়েছে দেখে আমার খুব মন খারাপ হল। ব্রাহ্মণ সারাদিন শুদ্ধ বস্ত্র পরে থাকতেন, সারাটাদিনই তাঁর জপ-ধ্যান স্তোত্রপাঠ চলত। শুদ্ধ বস্ত্রে রামমন্দিরে মন্ত্র উচ্চারণ করে করে যেতেন, ফিরতেনও সেভাবেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে। তাঁর শুচিবাই কে না জানত? এখন কি হবে এই শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের বাড়ির, তাঁর স্তোত্রপাঠের বইগুলোর আর শুদ্ধভাবে তাঁর পূজো আর্চার জপ ধ্যানের? আমি চিন্তায় পড়ে গেলুম।

নিগড়িকর উকিলের অবস্থা এর চেয়েও খারাপ, আরও শোচনীয়। তিনি ছিলেন কাগলের সঙ্ঘের প্রধান। তাঁর তিন মেয়ে, এক ছেলে। তিনটে মেয়েই বড়, হয়তো বছর, দুবছরের পিঠেপিঠি হয়েছে। দেখতেও তিনজনেই প্রায় একই রকম ছিল। ওরা স্কুলে যেত একই সঙ্গে, ফিরতও একসাথে। গুজব রটে গেল কংগ্রেস দলের কমবয়সী ছোকরারা মেয়ে তিনটিকে নিয়ে পালিয়েছে। এরাও হাই স্কুলেই পড়ত। মেয়েগুলো নাকি ভারি অহঙ্কারী ছিল, কখনও কোনো ফাংসনে ওরা যেত না, তাই ওদের দেখাও যেত না। সঙ্ঘের প্রধানের মেয়ে বলেই নাকি ওদের লোপাট করে দেয়া হয়েছে। উকিল মশায় বা তাঁর বাড়ির অন্যদের অর্থাৎ ওঁর স্ত্রী এবং ছেলেদের কাছে পিঠে কোথায়ও দেখতে পেলুম না। তাই মনে হচ্ছে গুজবটা সত্যিও হতে পারে।

ঘুরতে ঘুরতে একসময় বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে হাজির হলুম। কোলহাপুর থেকে একটি ছেলে এসেছিল, তার থলেতে টাকার গাদাখানেক বান্ডিল ছিল। টাকায় কেউ হাত দেয়নি টাকাসুদ্ধ থলে আগুনে জ্বালিয়ে ছেলেটিকেও বাস স্ট্যান্ডেই মেরে ফেললে। অর্ধেক পোড়া নোটগুলোর কাছেই চুপ করে দাঁড়িয়েছিল একটি পুলিশ। সে কাউকে কিছুতে হাত লাগাতে দিচ্ছে না। সারা গাঁয়ে থমথমে আবহাওয়া, কেউ কাজে বেরোয় নি, প্রত্যেকেই নিজেদের ঘরবাড়ি সামলাচ্ছে। মাঠে কাজ করতে গেলে সে ফাঁকে তার বাড়িতেও আগুন লাগিয়ে দিতে পারে এ ভয় সব গরীব চাষী বা দিনমজুরদের মনেই ছিল। তাছাড়া আরেকটা গুজবও গাঁয়ে খুবই রটে গেল। যারাই বামুনদের সঙ্গে মিশেছে, কাজে লেনদেনের সম্পর্ক হচ্ছে তাদের একটা লিস্টি নাকি গোপনে তৈরি

হয়েছে। যথাসময়ে এদের ঘরদোরেও আগুন দেয়া হবে। অলিগলিতে পড়শীদের ভেতর যত শত্রুতা এতদিন চাপা পড়ে ছিল আজ যেন হঠাৎই সে সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। যার সঙ্গে শত্রুতা ছিল এবং এতদিন সেটা চাপা ছিল, সে এখন অকারণে এখানে সেখানে দলে ভিড়ে গিয়ে বলে বেড়াচ্ছে অমুকের সাথে বামুনদের লেনদেন ও অন্যান্য সম্বন্ধ আছে, অমুক বামুনদের রায়ত, নয়তো বা চাকর বা বন্ধু। এসব নানা কানাঘুষো ফিসফিস রটেই যাচ্ছে। মনে মনে সবাই বেশ ভয় পেয়েছে, বাড়ির বার হচ্ছে না তেমন। গাঁয়ের গরীবদের, বিশেষ করে মাঙ্গ ও মেথরদের ঘরে জোর তৎপরতা চলছে। বামুনদের বাসন-কোসন, হাঁড়ি-কলসি, ধান চাল, কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা তুলে তুলে ওরাই এনেছে কিনা। যে যা পেয়েছে বা পেরেছে ঘরে এনে তুলেছে। এ সব জিনিস এখন ওরা কোথায়ই বা রাখে, কি করেই বা লোকের চোখের আড়াল করবে সে সব লুটপাটের জিনিসগুলোকে তার চিন্তাতেই অস্থির। এসব গরীব কাঙালদের ঘরে এখন দুবেলাই উনুনে আঁচ দেয়া হচ্ছে, সবাই দুবেলাই পেটপুরে খাচ্ছে। সবে ফসল তোলা হয়েছিল, তাই ধান চাল লুট করে ভালই পাওয়া গেছে।

এদিকে খবরের কাগজগুলোতে তখন গান্ধীজীকে কিভাবে গুলি করে মারা হল তার বিশদ বর্ণনা প্রায় রোজই ফলাও করে বেরোচ্ছে। এসব খবর পড়ার পর গাঁয়ের থমথমে আবহাওয়া আরও গরম হয়ে উঠতে লাগল। যেসব বামুনদের ঘরে এখনও আগুন দেয়া হয়নি এবার তাদের পালা এ গুজব রটে যেতে দেরী হল না। মোড়ে মোড়ে লোকেরাও যেমনি জটলা করছে, পুলিশও কড়া নজর রেখেছে, ওদের বন্দোবস্ত আরও জোরদার করা হয়েছে। ফল হল এই লোকেরা তখন ঘরের বাইরে ভীড় না জমিয়ে এর বাড়ি তার বাড়িতে নানারকম গল্পগুজবে মেতে উঠল। রাতে মাঠ থেকে গোরু দুইয়ে দুধ নিয়ে সবে বাড়িতে ফিরেছি। দেখি বাবা প্রতিবেশী পরশু মাঙ্গ-এর সাথে বসে কথাবার্তা বলছে। দুধটা ভেতরে রেখে আমিও সেখানে এসে বসলুম। ততক্ষণে বিঠোবা আন্না দেওয়ানজী এসে গেছেন। হাতে একটা খবরের কাগজ গোল করে পাকানো। উনি কোলহাপুরেও কতটা এভাবে বাড়িঘরদোরে আগুন দেয়া হয়েছে তা সরেজমিনে দেখতে গিয়েছিলেন। খবরের কাগজটা সেখান থেকেই এনেছেন। বাবাকে কাগজটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই দেখ রতনু, বাপুজীকে কিভাবে ওরা মেরেছে। ছবিটা দেখ, দেখলেই বুঝতে পারবে।"

"দেখি, দেখি" বলে বাবা এগিয়ে গিয়ে কাগজখানা হাতে নিলে। পরশুও এগিয়ে এল।

"বাতিটা নীচু করে ধরতোরে খো-কা।"

আমি বাতি নীচে নামালুম। গান্ধীজীর হত্যার অনেক ছবি খবরের কাগজটায় ছেপেছে। দেওয়ানজী মাকেও ডেকে নিলেন, "তারা, আয় গান্ধী মহারাজের হত্যার ছবি দেখবি আয়। আর বাপুজীকে দেখতেও পাবি না, ছবিও ছাপাবে না আর।" মা ভাখরি করে হাতটাত ধুয়ে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এল। দেওয়ানজী ছবি দেখিয়ে সবাইকে বোঝাচ্ছিলেন। আমরা অবাক হয়ে গেলুম। তিনি বলে গেলেন, "আরে এখনও

তো কিছুই হয় নি। কোলহাপুরে বামুনদের বাড়ি দোকান সম্পত্তি জমিজমা একধার থেকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে লুটপাট করে ছাই করে দিয়েছে। আগে লুটপাট করে জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলে ফাঁকা দোকানে দিচ্ছে আগুন লাগিয়ে। এই তো চলছে।"

পরশু অবাক হয়ে শুধোলে, "সত্যি?"

"সত্যি নয় তো কি? কিছু বামুন ওখানে সোনার কারবার চালাচ্ছিল, কারুর হয়তো ঘড়ির দোকান ছিল, কারুর কাপড়ের, কারুর বা অন্য কিছুর কারবার। সব মাল রাস্তায় বার করে দিয়েছে, যে পারে নিক। যা বাঁচল তা দিল জ্বালিয়ে। এভাবেই তো চলেছে কিনা।"

"হায় রে, হায়," পরশু কপাল চাপড়ালে।

ওর মন বড়ই খারাপ। রাস্তায় এত মাল পড়েছে, সবাই এত মালপত্তর লুটেপুটে নিয়েছে, আর তার ভাগে কিছুই জুটল না।

"ঘড়ি তো খুবই দামী জিনিস, তাই না?"

"তবে কি?"

"যে পেরেছে দশ বিশটা ঘড়ি হাতিয়ে নিয়েছে, কি বল?"

"দশ বিশটা? এক একজন জামার ভেতরে, পকেটে মুড়ি মুড়কির মতো তুলে নিয়েছে, তা জানিস?"

"হায়, হায়। গাঁয়ে যদি এসব হত।"

"যা না, কোলহাপুরে চলে যা।" বাবা হাসতে হাসতে বলে ওকে।

"এখন আর ওখানে কি কিছু পড়ে আছে?" সেও হেসে হেসে জবাব দিলে।

"বামুনদের বড্ড বাড় বেড়েছিল। আর একবার গাঁয়ে ঘর জ্বালানো শুরু হলে ওরা টিট্ হবে।" দেওয়ানজী বলে চলেছেন।

"ওদের তো ভাল শিক্ষাই হল। এ জীবনে আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে বলে তো মনে হয় না এমন শুইয়ে দিয়েছে এনাদের।" বাবা বললে।

এটা শুনে দেওয়ানজী মোটেই খুশি হলেন না। গলা চড়িয়ে বাবাকে তিনি এটাই বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে বামুনদের এখনও তেমন কিছু ক্ষতিই হয় নি। এই তো মওকা, এখনই ওদের শায়েস্তা করার সময়। বাবা নেহাতই বোকা তাই এসব কথা বলছে।

বাবা বললে, "ও, তোমার বেশি বুদ্ধি না।

"তা এ বেচারারা তোমাদের কি ক্ষতি করেছে? কাগলের বামুনরা তো আর গান্ধী মহারাজকে হত্যা করে নি?"

"রতনুটা এমন রাম বোকা যে ওকে এই বোকা বলে ডাকলে ও আগে ভাগে গিয়ে সাড়া দিয়ে বসবে! একটু লিখতে পড়তে শিখলে তোর কাজে দিত রে রতনু। সব বুঝতে পারতিস। ওরে মূর্খ! গান্ধী মহারাজের খুন মানে কি আর তোর নরসু মেথরের খুন মনে করেছিস? রাতে মাঠে পাহারা দিচ্ছে আর চোর ডাকাত এসে জানে মেরে ধান টান সব তুলে নিয়ে গেল? গান্ধী মহারাজকে তো আর গামছা চুরি করা বা এটা সেটা হাতিয়ে নেবার জন্যে মারে নি। গান্ধী মানে সারা দুনিয়ার

সেরা লোক, খুব মান্যি-গন্যি লোক। এমন মানুষকে মেরে ফেললে দুনিয়ার কত ক্ষতি হয় তা জানিস? আমাদের দেশেব সর্বনাশ হয়ে গেল। এই সঙ্ঘের লোকেরাই তো ওঁর বিপক্ষে জটলা পাকিয়ে মেরে ফেললে ওঁকে। একজনে তো আর মারে নি। ভাড়াটে গুণ্ডা লাগিয়ে মেরেছে ওঁকে। সাধে কি আর বলছি বড্ড বাড়্ বেড়েছে এদের। মহাত্মা ফুলে, শাহু মহারাজ কি বলেন তা যদি পড়তে পারতিস তাহলে সব বুঝতে পারতিস। এরা এখনও পেশোয়াদের ফিরিয়ে আনতে চায়,” বিঠোবা আন্না এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে গেলেন।

“এখন আবার পেশোয়ারা কেমন করে আসবে?” বাবা তাকে শুধোলে।

“ কি করে আসবে আবার? এই কাগলের আসল রাজা কারা জানিস?”

“কাগলের রাজা আমাদের বাল মহারাজ,” পরশু তার মত জানালে। মাঝে মাঝে কথাবার্তায় সেও যোগ দেয়, কিছু বলে।

“দূর বোকা! তিনি তো আর আসল মহারাজ নন। আমি তোকে বলি শোন, কাগলের আসল রাজা হল এই সব বামুন উকিলরা, যাদের বাড়ি ঘর-দোর জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে তারা। জানিস, কাগলের সেরা সেরা সব জমিগুলো ওদেরই কবজায়? এদের জমিজমা আছে, এরাই জমিদার। এরাই উকিল, এরাই জজ, আইন আদালত এদেরই, আবার এরাই ব্যারিস্টার। তোর আমার মতো গাধারা শুধু মাঠে খাটবে, এর বেশি কিছু নয়। ওরা যেটাকে বলবে দেশের আইন, আমাদের সেটাকেই মানতে হবে। এরা বসে বসে খচখচ করে কাগজে কি সব লেখে। তোর মতো নিরক্ষর তাতে সই করে দেয়, পরে যা হবার তাই হয়। জমিজমা ঘরদোর যা আছে দেনার দায়ে নিলাম করে নেয়। তোদের জমিজমা এভাবেই তো ওরা গিলে খায়। সেজন্যই তো তোর এই কাঙাল অবস্থা, নিজের জমি বলতে কিছুই নেই আর বামুনদের সম্পত্তি পুড়িয়ে শেষ করা যাচ্ছে না।”

“চুপ কর দেওয়ানজী। তোর মামলার রায় তোর মনের মতো হয়নি বলে তোর রাগ হয়েছে তাত্যা দেওয়ানের ওপর। আমি কি আর জানি না ভাবিস? বামুনরা এ গাঁয়ের কোনো ক্ষতি করে নি। এরা কি এমনি এমনি এসে বসেছে আমাদের গাঁয়ে? এরা এসেছে এখানে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াতে পারবে, কোর্ট কাচারিতে ওকালতি করতে পারবে, এখানে বাজার হাট বসে সেখান থেকে কেনাকাটা করতে পারবে। দুধ টুধ পাওয়া যায়, তাই তো ওরা এ গাঁয়ে এসে বসতি করেছে। ওরা কারো অনিষ্টও করে নি, কারও পেছনেও লাগে নি। বরং টাকা নিয়ে কোর্ট কাচারির কাজ করে দেয়। তাতে তো আমাদের সুবিধেই হয়, তাই নয় কি? বামুনরা আমাদের কি খারাপটা করেছে, কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে? ওরা মাঠে জঙ্গলে পাখি মেরে বেড়াচ্ছে, না গাঁয়ে এখানে সেখানে এব তার জিনিস চুরি করে বেড়াচ্ছে? কি পরশু, হক কথা বলছি কি না বল? আজ গাঁয়ে ক'ঘর বামুন আছ বলেই না দিনের শেষে এক টুকরো ভাখরি জুটছে বামুনপাড়ায় ঘুরে। কেন মিছিমিছি বামুনদের গালমন্দ করছিস?”

“তোর বুদ্ধি তো আগেই খুইয়ে রেখেছিস। তোকে বলে কি হবে? তুই না জানিস ইতিহাস, না জানিস ভূগোল। একেবারে বোকা তুই। আচ্ছা আমি চললুম। কোলহাপর

থেকে ফিরে এসে এখনও বাড়ির দিকে যাই নি।" বিঠোবা আন্না বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

বাবা আর পরশু হাসতে লাগল।

"দেখ পরশু, দেওয়ানজীর রকমসকমই এরকম। খবরের কাগজে একটা কিছু দেখে এসে তাই নিয়ে বসে বসে বকবক করবে। বছরের পর বছর এতদিন ধরে যে রকমটি চলে আসছে তা সে মানবেই না, এ কি রকম কথা?"

বাবাব কথাগুলো পরশুর মনে ধরল, সে সায় দিয়ে গেল।

"ঠিকই তো, যার যা ধম্মকম্ম তা করলেই হয়। বামুনরা উকিল হবে না তো খেতখামারে লাঙল দেবে নাকি?"

বাবার চোখে একটা দুষ্টু হাসি দেখলুম। একটু থেমে বাবা তাকে শুধোলে, "এই আগুন লাগিয়ে ঘবদোর জ্বালাবাব সময় তুই তোর নিজের ধরমটা বজায় রেখেছিলি তো?"

পরশু হেসে ফেললে, "রেখেছি বৈ কি, নিশ্চয়ই রেখেছি। আর আমি একাই কি ধর্ম রেখেছি? মাঙ্গ মেথর সব ব্যাটা কাঙাল এই ধর্ম্ম ধরেই ছিল। সে সময় আমরা ওসব না সরালে রক্ষে ছিল? যেটা যেমন ছিল পুড়ে সব ছাই হয়ে যেত না? বাড়িতে ধান যখন এসেই গেছে, তখন আর কি? বুড়ো মুজুমদার বলে কি জানিস? বলে 'দেখছিস কি? তোল ও সব নয় তো এক্ষুনি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। নিয়ে যা সব। দিগে যা তোব ছেলেপুলেদের পেটে, খাক ওরা, খেয়ে বাঁচুক।' "

"বটে?"

"তবে আর বলছি কি? দরজায় দেখি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা তাঁকে দেখে চমকে গেলুম, থমকে গেলুম। মনে হল সেখানেই ওঁকে 'পেন্নাম ঠাকুরমশাই' বলে পালাই। ভাবলুম কত বড় মানুষ তিনি। তাঁব ঘরে ঢুকে তাঁর জাত কেনই বা নষ্ট করি? যাই অন্যখানে, অন্য ঘর দেখি। কিন্তু উনি নিজেই আমাদের এসব তুলে নিতে বললেন।

"দেখ পরশু, এ হল আসল বামুনের চেহারা। আসল মানুষও বটে, মানুষের মতো মানুষ।"

"পাশের গাঁয়ে দেশপাণ্ডে কি করেছে জানিস? সদর দরজায় হাতে বর্শা নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে শাসালে, "গান্ধীজী খুন হয়েছে বলে আমার ঘর দোরে আগুন দিতে এসেছিস। আগুন দিবি দে, তবে এই বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে রাখিস ধান চাল যা আছে এক দানাও তার তোরা কেউ পাবি না, সব এখানে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আর একটা কথা মনে থাকে যেন, সারা বছর কেউ যেন এখানে ধান চাইতে বা পয়সা ধার নিতে না আসে। এখানে যারা আজ লুটপাট করতে এসেছিস তাদের পরে কোনদিন এখানে দেখতে পেলে জ্যান্ত পুঁতে দেব সেটা মনে রাখিস, যা ভাগ।"" পরশু খুব রসিয়ে রসিয়ে পাশের গাঁয়ের কথা শোনালে।

"বাবা! বেশ জাঁদরেল তো বামুনটা!"

"তা হবে না? ও যে সে গাঁয়ের বড় ব্যাপারী। ওর ধান, ওর টাকায় দীন গরীবদের

পেট চলে সম্বৎসর।"

"তা, তারপর কি হল?"

"তারপর আর কি? সব ফিরে গেল। ঘরে আগুন দেবার জন্যে পাশের গাঁ থেকে যারা এসেছিল, এ গাঁয়ের লোকেরা তাদের হাতে পায়ে ধরে গাঁ থেকে দিলে বার করে। এ গাঁয়ের লোকেরাই তো ওদের ডেকে এসেছিল লুটপাট করার জন্যে। হ্যাঁ, যা বলছিলুম, দেশপাণ্ডের বাড়ি ঘর-দোর যেমনটি ছিল তেমনটিই রয়ে গেল, কোথায়ও একটু আঁচড়টি পড়ল না," পরশু তার গল্প এখানেই শেষ করলে না, বলে যেতে লাগল, "গাঁয়ে একরকম, আবার শহরে আরেক রকম। সেখানে আগে জিনিসপত্তর লুটপাট, তারপর ঘরদোর জ্বালিয়ে দেয়া। কাগলেও তো এমনটি হল। লুটেপুটে অনেকেই বেশ কামিয়ে নিলে এ ক'দিনে। এখানকার হাওয়ালদার এদের পাণ্ডা। বামুনদের ঘরে ঢুকে টাকা আর গয়না তুলে নিলে। এদিকে বলার সময় বলত, 'ভেতরে গিয়ে দেখছিলুম কেউ আছে কি না। আগুন একবার লেগে গেলে তো আর রক্ষে নেই কিনা,' এই সব ব'লে টলে নিজের চুরি চাপা দেবার চেষ্টা করত।"

"তাই না কি?" বাবা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

"তবে আর বলছি কি রতনু? সারা গাঁয়ের লোক জানে এ কথা। বেশি দূর যেতে হবে না, তোর গলিতেই থাকে, কংগ্রেসেব লোক, 'গান্ধীজী কি জয়' বলে গ্যাঁট গ্যাঁট করে বাড়ির ভেতর ঢুকত আর গয়নার বাক্স ভেঙে গয়না নিয়ে দিত এক ছুট। জানিস ওর বাড়িতে এক কারিগর এসে সোনা গলায়। রাত বারটার পর এসব কাজ আরম্ভ হয়। একটু নজর রাখিস, তক্কে তক্কে থাকিস, সব জানতে পারবি।"

"তা তুই কি কি তুলে আনতে পারলি, পরশু?" বাবা তাকে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করলে।

"আমি আর কিই বা আনব? যতটা না হলেই নয় ততটা ধান এনেছি আর কিছু বাসনকোসনও এনেছি। পয়সাকড়ি আমাদের নাগালে আসে নি। যতই হোক বামুনের ঘর তো, ভেতরে ঢুকলেই চোখে ঠাকুরের, আসন নয়তো সিংহাসন দেখতুম। ঠাকুর ঘরে ঢুকে ঘরটা অশুদ্ধ করব নাকি? কাজ নেই ওতে আমার। বৈঠকখানায় আর মাঝের ঘরে যা ধান পেয়েছি, কুড়িয়ে আমি তাই এনেছি। অনেকের অবশ্য সম্বৎসরের ধানের ব্যবস্থা হয়ে গেল। হয়তো জীবনে এই একটি বছর পায়ের ওপর পা তুলে একটু জিরিয়ে বসে খেতে পারবে ওরা। ধরে নে, গান্ধী মহারাজের পুণ্যের ফলেই এটা সম্ভব হল।"

গঙ্গু বামুন নাকি বাড়ির সাথে সাথে নিজেও পুড়ে মরতে চেয়েছিল। খবরটা বাবার কানে এসেছে। সত্যি কিনা পরশুর কাছ থেকে যাচাই করে নিতে চাইলে।

পরশু সায় দিলে, "হ্যাঁ রে, হ্যাঁ, আহা বড্ড গরীব বামুন ওরা। সবে নতুন বাড়িটা তুললে, তার বাড়িটাও দিলে জ্বালিয়ে? ওর ছেলেটার নাকি সঙ্ঘে যাওয়া আসা ছিল, বামুনের এই হল অপরাধ। আর কোনো কারণ নেই।"

বাবা আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, "দেখ পরশু এ বামুন গুণে ভবিষ্যত বলতে পারত। মাঠে বীজ রুইতে গেলে কখন বাদলা হবে তা ও ঠিক বলে দিত।

শেষে কিনা নিজের কপালে কি আছে সেটাই দেখতে পেলে না?"

পরশু খানিকক্ষণ বসে রইল চুপ করে। হয়তো তার চোখের সামনে গঙ্গু বামুনের কাকুতি মিনতি স্পষ্ট ভেসে আসছে। একটু গম্ভীর হয়ে বললে, "হ্যাঁ রে রতনু, ইংরেজের জমানা আর নেই, গেছে। এখন গান্ধীবাবার রাজত্ব এল। আর তা আসার পাঁচ সাত মাস হতে না হতেই গান্ধী বাবাকেই দিলে খতম করে। গান্ধী বাবা নাকি বলত এটা সাধারণ লোকেদেরই রাজত্ব, ওদেরই সরকার। তা লোকেরা কি এখন থেকে এভাবেই রাজত্ব চালাবে?"

"আমরা সাধারণ লোকেরা কি আর পারব এ রাজত্ব চালাতে? তুইই দেখ না কেন এ গলির বাসিন্দেরা পাশের গলির লোকেদের সঙ্গে এক হাত লড়ে নিচ্ছে। বামুনরা একদিকে, তো সারা গাঁয়ের লোক অন্যদিকে। মাঙ্গরা একদিকে, তো চামাররা আর একদিকে। তা এরকম হলে এ ছাড়া আর কি হবে বল?" দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা পরশুকে ব্যাপারটা বোঝাতে চাইলে।

"মোল্লারা আসবে। আমার তো মনে হয় পাঁচ সাত বছর গেলে আবার ঘুরে ফিরে ইংরেজই আসবে। আরে রাজ্য শাসন ওদেরই মানায়। ইংরেজের কালে লোকেরা লাঠির হাতলে সোনা বেঁধে ঘুরলেও ভয় পেত না।"

বাবা আর পরশুর এরকম কথাবার্তা অন্য লোকেরাও করে চলেছে, কথার পিঠে কথা জুড়ে। কত রকমের কথাই যে ওরা বলছে। গান্ধীজী মারা গেছে বলে যে কারো দুঃখ হয়েছে মনে হচ্ছে না, তাঁর খুনের জন্য বামুনদের ঘরদোর জ্বলে গেল, জিনিসপত্র, টাকা-পয়সা, ধান-চাল লুটপাট হল, বামুনদের কপালেই দুঃখ দুর্দশা এসে জুটল। "কার জিনিস কে ভোগ করে," এ ক'দিন এই শুনে আসছি। যারা ভোগ করছে লুটের মাল, তাদের দেখে মনে হবে যেন শ্রাদ্ধ বাড়ির খাওয়া খেয়ে ঢেকুর ওগড়াতে ওগড়াতে যে যার ঘরে মৌজ করছে।

যাক, বাবারও এ ধরনের কথাবার্তা শুনে বা বলে সময়টা মন্দ যাচ্ছে না। সবে ফসল তোলা হয়েছে ঘরে। লোকেরা একটু গা এলিয়ে বসার সময় এবং সুযোগ দুটোই পেয়েছে। মাঠে এখন আর কোনো কাজ নেই। কাজের অবসরে সময়টা তাই ভালই কাটছে।

গান্ধীজীর শব যাত্রার ছবি সরকার থেকে তোলা হলে যথাসময়ে সেটা সিনেমা হলে ছবি শুরু হবার আগে দেখান হত। সেই নিউজরীল দেখার জন্যে সিনেমা হলে লোকের সে কি ভীড়! সারা মাস ধরে লোকেরা সেটা দেখে বেড়াচ্ছে। বাবার মতো মানুষ, যে নাকি কোনোদিন সিনেমাই দেখেনি সেও একবার গিয়ে ওই ছবি দেখে এল। খাবার দোকানে 'বাপুজী কি অমর কহানী' রেকর্ডটি কলের গানে জোর চলছে সবাই ভীড় করছে সে শুনতে। এ মওকায় যে যা পারে দু পয়সা কামিয়ে নিচ্ছে।

"শাহমহারাজের ঘুম পাড়ানির গান" আমি পড়েছিলুম। একই ধাঁচে "গান্ধীজীর ঘুম পাড়ানির গান" নামে চার পাতার একটা বড় কবিতা খাতায় লিখে ফেলে ক্লাসে সেটা সুর করে শুনিয়েও দিলুম। মাস্টারমশাই আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে উৎসাহ দিলেন। গান্ধীজীর সম্বন্ধে আমার যা মনে হয়েছিল কবিতাটিতে আমি তাই ফোটাতে চেয়েছিলুম।

আমি তো আর বাপুজীকে চোখে দেখিনি, খবরের কাগজে যা বেরিয়েছিল তাই ছিল আমার সম্বল, সেগুলো পড়েই লিখেছিলুম। ওঁকে অমনভাবে মেরে ফেলেছে মনে করলেই আমার কান্না পেয়ে যেত, কেবলি মনে হত এমনটি কেন হল। সিনেমা হলে নিউজরীল দেখতে দেখতে আমার মনে আছে আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি, মনে হয়েছে আমার কোনো আপনজন যেন মারা গেছে।

এদিকে স্কুলের পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। মাত্র তিন চার মাস তো স্কুল করেছি, তাও সপ্তাহে এক দিন দুদিন কামাই গেছে, তাছাড়া চাষবাসেও লেগে থাকতে হয়েছিল, সে তুলনায় আমি ভাল নম্বর পেয়ে ক্লাসে সেকেণ্ড হয়ে পাশ করলুম। ফার্স্ট হল বসন্ত। মনে আছে পরীক্ষার ফল যেদিন বেরোল আমি আমাদের খেতে সত্যি সত্যি নেচে বেড়িয়েছিলুম। এত আনন্দ হয়েছিল। এবারে ক্লাস সিক্স, পরের বছর ক্লাস সেভেন। আমি বাবাকে বোঝালুম, "বছরে তিন মাস তো স্কুল বন্ধই থাকে, তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে একটা করে রোববার। সেটাও স্কুল বন্ধেরই দিন। রোজ ভোর হতে না হতেই আমি মাঠে চলে যাব, সেখানে বারটা অবধি কাজ করব, স্কুলে যেতে দেরী হয় হোক। দুপুরে খেতে জল দেবার কাজটা তোমরা কেউ করে নিও। জমিটা জল খাক। তারপর বীজ রোয়ার সময়, আখ মাড়াই করবার সময়, বা গুড় জ্বাল দেবার সময় আমি তো থাকবই। তখন কোনো কোনোদিন স্কুল কামাই করেও না হয় কাজটা তুলে দেব। এবারে তো আর দেরী নেই— দু বছর গেলেই আমি ক্লাস সেভেনের পরীক্ষা পাশ করে যাব, তারপর ভাল চাকরি কোথাও পেয়ে যাব নিশ্চয়ই। ততদিনে শিবাও একটু বড় হয়ে যাবে সেও তোমাকে খানিকটা কাজ এগিয়ে দিতে পারবে। তারপর আমার চাকরি ও জমির চাষ এ দুটোতে আমাদের সবার খাবার ভালই জুটে যাবে। দুবেলা তখন আমরা সবাই পেট পুরে খেতে পারব।" ক্লাস সিক্স-এ পড়তে বাবা যাতে বাগড়া না দেয় তার জন্য বাবাকে বোঝানো। আমি ঠিক করেই রেখেছিলুম ক্লাস সিক্সএ পড়বই। বাবাও কথাটা শেষ পর্যন্ত মেনে নিলে বলেই মনে হল।

ক্লাস সিক্স এ গান্ধী হত্যার ঘটনার রিপোর্টের কার্টিং জোগাড় করছিলুম। তখন এ হত্যার মামলা চলছে আদালতে, তাই সব খবরই পাওয়া যাচ্ছে। আমার বই পড়ার খিদেও বাড়ছে দিন দিন। স্কুলের ছোট লাইব্রেরিটায় গোখলে, তিলক, আগরকর, স্বামী বিবেকানন্দ এঁদের ওপর লেখা বই ছিল। আর ছিল সানে গুরুজীর প্রায় সব বই। লাইব্রেরির সেক্রেটারি বসন্ত পাটিল, তাই বই পেতে আমার কোনো অসুবিধেই হত না। সানে গুরুজীর লেখা আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। ওঁর "শ্যামচি আই" বা শ্যামের মা বইটি পড়ে কেবলি মনে হত আমার যদি এরকম মা আর বাবা থাকত তাহলে কি ভালই না হত! ভাবতুম সানে গুরুজীর গল্পের নায়কদের মত আমিও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হব, হতেই হবে।

অসুবিধে যতই হোক, বাধা বিপত্তি যতই আসুক, পড়াশুনা আমায় চালিয়ে যেতেই হবে এই আমার প্রতিজ্ঞা। আগরকরের চাইতে আমি আরও গরীব, তাঁর চাইতেও অনাথ বা একা। কাজেই যখন এমন কপাল নিয়েই এসেছি তখন আগরকরের চেয়ে

একটু বেশি কষ্ট ভোগ করতে হবে, এর বেশি তো কিছু নয়। কিন্তু এম. এ. পাশ আমাকে করতেই হবে। আগরকর একটি জামাই রাতে ধুয়ে রোজ পরতেন। আমার তো বলতে গেলে না ছিল একটাও আস্ত জামা, আর না ছিল সেটা কাচবার জন্য সাবান। আর বাড়িতে পড়তে বলবে, পড়াতে উৎসাহ দেবে এমন কেউই ছিল না। তা সত্ত্বেও আমি যে এত কষ্ট সহ্য করে পড়া চালিয়ে গেছি আর মনে মনে বড় হবার ইচ্ছেটা জাগিয়ে রেখেছি, তা ভেবেও আমার কত ভালই না লাগছে।

এদিকে দেখতে দেখতে স্বাধীনতা দিবসের দ্বিতীয় বার্ষিকী দিনটি এল। প্রথমবার তো আমি কিছুই দেখি নি, এবারে আমি চার পাঁচ দিন আগে থেকেই তৈরি হচ্ছিলুম। সেদিন স্কুল এমনিতে তো ছুটি, কিন্তু সকালে স্কুল খোলা। মাঠে সকালে না গিয়ে দুপুরে যাব ঠিক করলুম। নাইক মাস্টারমশায়ের দেয়া স্কাউটের পোশাকটি চার পাঁচ দিন আগে ধুয়ে রেখে দিয়েছিলুম। পেতলের একটা ঘটিতে জ্বলন্ত কয়লা দিয়ে জামাটা ভেজা থাকতেই ইস্ত্রী করে রেখেছিলুম। মাস্টারমশায়ের কথা মতন খাকী পোশাক পরে গলায় সবুজ রুমাল লাগিয়ে নিলুম। পতাকা উত্তোলনের পর স্কাউটের ছেলেরা সারাটা গাঁ প্রভাত ফেরী করে ঘুরবে। আমার ওপর পড়ল মার্চ সং গাইবার ভার। চার পাঁচ দিন ধরে রিহার্সাল দিয়ে দিয়ে নিজেকে একেবারে তৈরি করেই রেখেছিলুম। গানটা মনে মনে ভাঁজতে ভাঁজতে স্কুলের দিকে রওনা দিলুম।

সেদিন সারা গাঁয়ের লোক যেন নতুন করে সজীব হয়ে উঠল। সবাই চান সেরে নিয়ে গান্ধী টুপি পরে সেজে গুজে বেরিয়েছে— পূজো পার্বণের দিনে যেমন সাজে। বর্ষাকাল বলে খেত খামারে কাজ ছিল না— সবে বীজ রোয়া হল, হাত খানেক হয়েছে হয়তো গাছগুলো, অতটা বড় হয়নি যে সেখান থেকে তুলে মাঠে মাঠে লাগিয়ে দেবে। লোকের হাতে তাই এখন কিছুটা অবসর। সারা গাঁ লোকে লোকারণ্য। কেউ কেউ বাড়িতে পতাকা তুলেছে। বামুনপাড়া দিয়ে যাবার সময় দেখলুম অনেক বাড়িতেই দরজায় রঙোলী আঁকা, ছাতে উড়ছে জাতীয় পতাকা। গান্ধীজীর একটি ফটোতে মালা দিয়ে গাঁয়ের একটা বিশেষ জায়গায় সাজানো আছে— সবার শ্রদ্ধা সে জায়গাটাকে ভাবগম্ভীর করে তুলেছে। পঞ্চায়েতের অফিসেও ভীড় জমেছে। সেখানে জমায়েত হয়েছেন সরকারি ডাক্তার, উকিল, অফিসারেরা আর অনেক বামুন ও গাঁয়ের অন্যান্য বিশিষ্ট লোকেরা। পুলিশও প্যারেড করে ঘুরে গেল। এসবে আমার খুব একটা আগ্রহ ছিল না, আমার মন পড়েছিল আমাদের স্কুলে, কারণ সেখানেও অনুষ্ঠান আছে আর আমাকেও সেখানেই যেতে হবে। দেরী হয়ে যাচ্ছিল বলে ছুটতে ছুটতে চলেছি। আমিও পৌঁছেছি আর অনুষ্ঠানও শুরু হয়েছে। প্রথমেই '৪২ এর আন্দোলন সম্বন্ধে সিন্ধে সাহেব কিছু বললেন, এতে যোগ দিয়ে উনি জেল খেটেছেন, এ ব্যাপারে ওঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তারপর স্কুলের হল-এ গান নাটক এসবের অনুষ্ঠান হল। আমি "গান্ধীজীর দোলনা" কবিতাটি পড়লুম। অনুষ্ঠান শেষ হতেই আমাদের স্কাউটের প্রভাত ফেরী শুরু হয়ে গেল। বাঁশি, ঢোল, ড্রাম সবই বেজে উঠল। জনা পঞ্চাশ ছেলে ইউনিফর্ম পরে সারি সারি লেফট রাইট করতে করতে চলছে। জীবনে এই প্রথম ওর গাঁয়ে এভাবে এ পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাঁয়ে ছোট বড়, বুড়ো-বুড়ি, ছেলে-মেয়ে, বৌ-ননদ

সবাই বাড়ির সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছে। বসে বসে যারা হুঁকো টানছিল তারাও ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল।

আমি লাইনের বাইরে এসে একবার সামনে, একবার পেছনে গিয়ে "হামারা ভারত জানসে প্যারা" গানটা খোলা গলায় চড়া পর্দায় গেয়ে চলেছি। গান শেষ হতেই লেফট রাইট নির্দেশও দিচ্ছি। নাইক মাস্টারমশাইও সঙ্গেই ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল আমিই যেন লেফট রাইট নির্দেশ দিতে দিতে ছেলের দলটিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি। ঠিক যেমনটি যেমনটি বলছিলুম, গাইছিলুম ছেলের দলটিও তেমনটি করে বলছিল, গাইছিল। আমার ভেতরকার একটা সুপ্ত শক্তি যেন আত্মপ্রকাশ করেছে আজ। আমার মনে হল আজ আমি এই ছেলেগুলোকে যা নির্দেশ দেব ওরা তাই করবে। তার সাক্ষী থাকবে এ গাঁয়ের লোক, যাদেব চোখের সামনেই আমি হুকুম করব আর তা তামিল করবে ছেলের দল। আমার এই খাকি পোশাক, সবুজ রুমাল আর বুকের ওপর স্কাউটের ব্রোচ আজ আমাকে এনে দিয়েছে এক নতুন শক্তি। আমি আগে এত সোজা হয়ে কোনদিনই হাঁটিনি, এত উঁচু আমাকে কখনই দেখায় নি।

এক সময় প্রভাত ফেরী আমাদের গলিতেও ঢুকল। আমাকে এ পোশাকে ওভাবে হুকুম করতে দেখে গলির মেয়েরা অবাক হল, "ঐ দেখ, যকাতেদের আন্দ্যা না? মিলিটারী পোশাক পরে চলেছে, কাণ্ডখানা দেখ। মোষ চরাতে চরাতে ছেলেটা গানগুলো কখন শিখল?" আমার মা লক্ষ্মীকে কোলে করে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। পঞ্চাশ জন ছেলের সারিতে আমাকে ঐ রকম মিলিটারী পোশাকে ঘুরতে দেখে মায়ের বুক গর্বে ভরে উঠল। আশে পাশে যখন সব মেয়ে বউরা একবার আমাকে আর একবার মার দিকে তাকিয়ে দেখছিল তখন মার আরও আনন্দ হল। আমি যে আমার মারই ছেলে সেটা সবাইকে জানিয়ে দেবার জন্যই। আমি বাড়ির দরজার পাশ দিয়ে যাবার মুহূর্তে মা বলে উঠল, "তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিস দেরী করিস না যেন।" আমি মার দিকে তাকিয়ে 'আচ্ছা' বলে মার্চ-এব গানটা গাইতে গাইতে এগিয়ে গেলুম। আমার ওপর কত বড় দায়িত্বের বোঝা চাপানো আছে আমাকে এগিয়ে না গেলে চলে? হাবে ভাবে মাকে সেটাই বোঝালুম। মা ভাবলে এই পঞ্চাশজন ছেলের দলের পাণ্ডা হয়ে যে যাচ্ছে সে তারই পেটে জন্মেছে, সে তারই ছেলে। ক্ষণিকের জন্য হলেও গলির সবাইর কাছে মা আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়াল। যতক্ষণ না দলটা গলির মোড় ঘুরে অন্যদিকে না গেছে ততক্ষণ মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িযে আমাদের দেখেই গেল।

পনেরই আগস্টের জন্য স্কুলে মিষ্টিও খাওয়ানো হল সবাইকে। তাই খেয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বারটা বেজে গেল। দেখি মা অপেক্ষা করছে আমার জন্য। কত কথাই যে মা জিজ্ঞেস করলে, কত কথাই না মা জানতে চাইলে। আসল কথাটা এল খানিকক্ষণ পরে। মা শুধোলে, "গান্ধী নেহরুর রাজ্যে আগের টাকা পয়সা বাদ হয়ে যাবে?"

"হবে, আস্তে আস্তে হবে। ইংরেজ সরকার তাদের টাকা পয়সা তুলে নেবে, এর পর তার বদলে আসবে নতুন সরকারের টাকা।"

"তাহলে এসব টাকা পয়সা কি অচল হয়ে যাবে?" মাকে কিছু একটা চিন্তায়

ফেলেছে স্পষ্টই বুঝতে পারলুম।

"এক্ষুনি তো আর হচ্ছে না। আস্তে আস্তে হবে। যার কাছে পুরনো টাকা আছে সে ওগুলো বদলে নতুন টাকা নেবে।"

"তা, সেটা কখন হবে?"

"তা আমি কি করে জানব? আর কেই বা এসব জানবে এখন?"

"আমি কিন্তু জানি।"

"কি করে?" জানার খুবই কৌতূহল হল আমার।

"দাঁড়া তোকে দেখাই।"

এই বলে মা মই বেয়ে ঘরের ছাতের কাছের তাকটায় উঠে পড়ল। সারি সারি বাঁশ দিয়ে তাকটা করা হয়েছে। প্যাকিং কেস দিয়ে তৈরি মার একটা বাক্স সেখানে ছিল। এদিকে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে— মা সেই মিটমিটে আলোতে বাক্সের ডালাটা খুলে কাপড়ে বাঁধা একটা বোঁচকা হাতে নিয়ে নীচে নেমে এল। বোঁচকাটার ভেতরে উলের রঙচঙে একটা টুপি ছিল, মেলায় কেনা। কোনো উৎসবের দিনে মা তার কোলের বাচ্চাকে এই টুপি পরিয়ে নিয়ে যেত। বোঁচকাটায় মার একটা তোলা কাপড়ও ছিল। আনসার বিয়েতে কেনা। এমনি একটা কাপড়ের ভাঁজ থেকে মা পুরনো একটা কাগজের খাম বার করলে। হাত দিয়ে খামটা মুছতে মুছতে মা বললে, "পাঁচ ছ বছর আগে বাজারে একজন বুড়ো ঘুরছিল, মাথা ভর্তি পাকা চুল, পরনে খদ্দরের ধুতি আর জামা। সে বুড়ো দু আনায় চার আবার এই নোট বেচে দিয়ে গেছে।"

"নোট?"

"হ্যাঁ, সে বলছিল যুদ্ধ লেগেছে। ইংরেজ এ যুদ্ধে হারবে। আমাদের এদেশ স্বাধীন হবে। নেহরু গান্ধী এরা রাজত্ব করবে। তাদের রাজ্যে দু আনার এ নোটের দাম হবে এক হাজার, চার আমার নোটের দাম হবে দশ হাজার।" এই বলে মা তিনটি নোট বার করে বললে, "দেখ এগুলো নোট-এর মতো নোট। এর দাম কখনই কম হবে না।"

দেখলুম অচল সব টাকা, রং ছাপ যদিও আসল টাকার মতন। নোটে গান্ধী, নেহরু, সুভাষ বোসের ছবি ছাপা। অশিক্ষিত নিরক্ষর লোককে ঠকাবার মতো ছাপ সন্দেহ নেই, এরা একেই সত্যিকারের নোট বলে ভেবেছে। আমি ফিক করে হেসেই ফেললুম, মাকে বললুম, "এ নোটগুলো অচল, কোনদিনই চলবে না।"

"চলবে রে, চলবে। দেখছিস না টাকার মতোই দেখতে?"

"আচ্ছা মা, দু আনায় হাজার টাকার নোট কেউ দেয়, তুমিই বল? তোমাকে সাদাসিধে পেয়ে ঠকিয়েছে। ধান্দাবাজি করে টাকা কামাবার লোকের তো অভাব নেই, ওরা ঐ করেই তো ওদের পেট চালায়।"

"অনেকে তো কিনছিল, আন্দ্যা, সবাই কি আমার মতো বোকা যে ঠকবে? থাক, দেখি আর দু বছর," বলে নোটগুলো যেমন ছিল তেমনি কাপড়ের ভাঁজে মা রেখে দিল। বোঁচকাটা যখন খুব আস্তে আস্তে বাঁধছিল, মনে হল মা খুব নিরাশ হয়েছে। এক টাকা দিয়ে ত্রিশ বত্রিশ হাজার টাকা হবে এ স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে দেখে

খুব মনমরা হয়ে গেল মা। আমি মাকে যতই বোঝাই মা কিছুতেই বুঝতে চাইলে না। মার ধারণা দেশ যখন স্বাধীন হয়েছে তখন ত্রিশ হাজার টাকা অন্তত পাবেই। নিজের অত কষ্টে জমানো টাকা দিয়েই না সে নোটগুলো কিনেছে। সরল মন, মা ভেবেছে ঐ একটা টাকা দিয়ে ইংরেজের সাথে লড়াইতে সে দেশের লোককে সাহায্যই করছে। কেউ যে মাকে অচল টাকা দিয়ে ওভাবে ঠকাতে পারে তা মা ভাবতেই পারে না। মা নিশ্চয়ই আমার কথা বিশ্বাস করল না। রান্নাঘরের উনুনের সামনে বসে আবার রঙিন স্বপ্নের জাল বুনতে লেগে গেল।

খাওয়া হয়ে গেলে আমি মাঠে চলে গেলুম। আমাদের নতুন জমিটায় আর তার আশে পাশে অনেক গাছ ছিল। মাটি কালো তো, তাই এ জমিতে এত গাছ। গাছপালায় চারদিকটা সবুজ হয়ে থাকত। ঝোরার ধারে ঘাসগুলো যখন বর্ষায় দুলত, আমার মনেও সবুজের ছোঁয়া লেগে যেত, সুর আসত, গান আসত। আমার তখন কবিতা লেখার নেশায় পেয়েছে, আমি তার ছন্দ মেলাতে বসে যেতুম। ছোটখাটো জিনিসও মনকে নাড়া দিয়ে যেত, এন্তার কবিতা লিখে খাতার পর খাতা ভরে ফেললুম।

দেখতে দেখতে স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবস এগিয়ে এল। দালানে চূণকাম হচ্ছে। একটা করে ক্লাস খালি করে রং দেয়া হচ্ছে। পাশের ঘরে রং হচ্ছে দেখে পেচ্ছাবের ছুটিতে সেখানে গেছি রং লাগানো দেখতে। একটা দেয়ালে রং ঠিকমত লাগে নি মনে হল, রং এর মিস্ত্রীদের দেখালুমও সেটা। একজন শুনেই রেগে বললে, "আমি রং নীচ থেকে লাগাই বা ওপর থেকে লাগাই, ঠিক করি কি ভুল করি তাতে তোর কি, কোথাকার লাটসাহেবের ছেলে রে তুই?" বলেই রং এর বুরুশটা বালতিতে চুবিয়ে আমার সামনে জোরে ঝাড়লে। সে রং আমার জামা কাপড়ে লেগে আমাকে দেখতে হল ঠিক যেন চিতাবাঘের মতো। মাথার টুপি, জামা প্যান্ট সবেতেই রং এর ভীষণ দাগ লেগেছে। কাছে পিঠে যে সব ছেলেরা দাঁড়িয়ে ছিল ওদের হাসতে দেখে আরো অপমান হল। আমার চোখে জল এসে গেল আমি কাঁদতে লেগে গেলুম। এদেরই ভেতর একজন আমাকে টিচার্স রুমে নিয়ে গিয়ে যা ঘটেছে বলে দিলে। তখনও আমি কেঁদেই যাচ্ছি। গরীব, খুব পরিশ্রমী, পড়াশুনায় ভাল বলেই সবাই আমাকে চিনত। বরপে মাস্টারমশাই নতুন এসেছেন, আমার কথা হয়তো শুনে থাকবেন। তাঁকে আমি সব বললুম। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে তিনি বললেন, "কই, চল তো দেখি কে কি করেছে।" সেখানে গিয়ে ঐ লোকটাকে দেখাতেই তিনি তার মুখে কষে এক চড় মারলেন। ওকে বাঁচাতে অন্য মিস্ত্রীরা ছুটে এল। মাস্টারমশায় ততক্ষণে ওকে পালোয়ানের মতন তুলে ধরেছেন, "চল, তোকে বারান্দা দিয়ে নীচে ফেলে হাড়গুলো গুঁড়ো করে থলেতে পুরে দিই, চল। তোর সাহস তো কম নয়, আমাদের স্কুলের কাজ করবি আর আমাদেরই স্কুলের ভাল ছেলের অপমান করবি?" বলছেন আর মাস্টারমশাই ওকে পুতুলের মতো তুলে ধরছেন। অন্য মিস্ত্রীরা হাত জোড় করে মাপ চেয়ে নিয়ে ওকে ছাড়িয়ে নিলে, বললে, "অমনটি আর হবে না।" ওরা সবাই মিলে ঐ মিস্ত্রীটাকে ধমকালেও আচ্ছা করে। ওকে তখন ছেড়ে দিয়ে মাস্টারমশাই আমাকে বললেন, "চল, যকাতে চল।"

আমি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে গেলুম। তিনি নাগাপ্পাকে এক আনা পয়সা দিয়ে সামনের দোকান থেকে একটা সাবান কিনে আনতে বললেন। এদিকে নাইক মাস্টারমশায়কে বলে আমাকে একটা স্কাউটের পোশাক পরতে দিয়ে আমার পরনের জামা প্যান্ট টুপি সাবানটা দিয়ে কেচে নিতে বলে গেলেন। স্কুলেই চানটা সেরে নিলুম আর সাবানটা দিয়ে জামাকাপড়গুলো কেচেও দিলুম। সেদিন থেকে আমার একমাত্র চেষ্টা ছিল স্কুলে ভাল ছেলে বলে সুনামটা সব সময় বজায় রাখা। আমাকে যেন সবাই সবসময় ভাল বলে। পড়াশুনায় আরো বেশি করে মন দিলুম, সনগর মাস্টারমশায়ও এখন থেকে আমাকে আনন্দা বলে ডাকতে শুরু করে দিলেন।

বসন্ত পাটিল খুব ভাল ছবি আঁকত। আমারও খুব সাধ হল আমিও যদি ওর মতো ভাল ছবি আঁকতে পারতুম। ভাবতুম আমিই বা কম কিসে? এসব ভেবে চিন্তে এরপর থেকে যখন মোষ চরাতে যেতুম সঙ্গে থাকত কাগজ পেন্সিল, যখন যা মনে হত এঁকে যেতুম। ধারে কাছে যা দেখতুম, কাক মোষ, জলে বসে থাকা বক, গাছ, ছোট ছোট পাহাড়, রাখাল বসে আছে এসব কত কি যে আঁকতুম তার ঠিক নেই। সনগর মাস্টারমশাইকে আঁকাগুলো যখন দেখাতুম তিনি খুব বাহবা দিতেন, পিঠ চাপড়াতেন। সে বছর পরীক্ষার ফি তিন টাকা তো আমার হয়ে উনিই দিলেন। আমি 'এ' গ্রেড পেয়ে পাশ করেছিলুম। আমার আঁকা অনেক ছবিই উনি স্কুলের ঘরগুলোর দেয়ালগুলোতে টাঙিয়ে দিলেন। তার মধ্যে দুটো ছবি সত্যি সত্যি ভালো হয়েছিল, চোখে পড়ার মতো। একটা ছিল শিবাজী আর আফজল খাঁর মোলাকাৎ, অন্যটা ছিল তানাজী ভাস্কর্য থেকে দেখে আঁকা একটি স্কেচ। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রত্যেককে সচেতন করার জন্যেও আমি বেশ কয়েকটি ছবি এঁকে বিভিন্ন ক্লাসে ঝুলিয়ে দিয়েছিলুম। স্কুলে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে বসন্ত আর আমাকে তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হত। মাঠে গোরুমোষ চরিয়ে, চাষের জমিতে জল সেচেও আমি যে সময় করে পড়াশুনা চালিয়ে যাচ্ছি সেটাও ওঁদের বলা হত। অবশ্য এতে আমার সঙ্কোচই হত, ওগুলো কেউ জানুক এটা আমি চাইতুম না, কিন্তু অস্বীকার করার উপায়ও তো ছিল না।

মাঠে জল দিতে দিতে পদ্য লেখার নেশায় আমাকে পেয়েছিল সে তো আগেই বলেছি। একা থাকলে পদ্যের জন্য নানারকম বিষয় আমার মাথায় ভর করত! সৌন্দলেকর মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আমার মেলামেশা, যাতায়াত, আলোচনায় যোগ দেয়া এসব ক্রমেই বাড়তে লাগল। যেটুকু সময় করতে পারতুম তার মধ্যেও পারলে রাতের দিকেই যেতুম। এদিকে স্কুলে নাইক মাস্টারমশায়ের স্কাউটের গানগুলো গাওয়া, নাটক পালা এগুলো তো সাথে সাথে চলছিলই, এতে আমার একটু আধটু নামও হয়েছিল। এসবের জন্যই স্কুল আমি মোটেই কামাই করতে চাইতুম না। স্কুল কামাই করতে হলে আমার মন খুবই খারাপ হয়ে যেত। বাবার জন্যও বটে আবার মাঠে জমিতে এটা সেটা কাজের জন্যও বটে, স্কুল আমার প্রায়ই কামাই হত। বাবার ওপর এর জন্যে আমার খুব রাগ হত, মুখ বেজার করে রাখতুম। এদিকে রাগ করলে আবার বিপদও ছিল, আমাকে রাগ করতে দেখলে বাবা যেত খেপে, গালাগাল দিত, বলত দরকার নেই অমন স্কুলে। তখন কি আর করব? স্কুল কামাই করা ছাড়া গতি নেই। আবার সেই মাঠের

কাজে লেগে যাও। রোজের কাজ যত তাড়াতাড়ি সারা যায় সেরে ফেলতুম, আমার সারাদিনের কাজে একটাই চেষ্টা থাকত, যত তাড়াতাড়ি মাঠের কাজ সেরে মুক্তি পাওয়া।

গুড় জ্বাল সারা হলে সেবারে দেখা গেল মাত্র দুগাড়ি গুড় হয়েছে। জমির মালিকের পাওনাটাও তা থেকে উঠে এল না। সাবাবছর হাড়ভাঙা খাটুনির পরও বাড়ি যে শূন্য সে শূন্যই রইল, মাল তেমন এলই না। এত খাটা হল, কিন্তু তাতেও পেট ভরল কই? মালিক কুয়ো কেটে দেবে, তাতে অনেক জল হবে, গুড়ও তাহলে ভালই হবে এসব অনেক আশায় বাবা অনেক চড়া দামে জমিটা নিয়েছিল। সবই মিছে গেল, আমরা যেন পিষে মরছিলুম চারদিক থেকে।

মাঝে মধ্যে আনসা আসে এক বছরের বালুকে নিয়ে। বালুর জন্মের কিছুদিন আগে থেকে ও নিজের বাড়িতে উঠে গেছে। কাকার দেনা শোধ করে বাড়িটা মামা কিনে নিয়েছে। এ বাড়িতেই আনসাব ছেলের জন্ম হয়। প্রথম সন্তানই ব্যাটাছেলে হওয়ায় মামা তার নামকরণ-অনুষ্ঠান অর্থাৎ 'বারস' খুব ঘটা করেই করলে। আমাদের বাড়ির সবাই সেখানে লাড্ডু ও অন্যান্য খাবার খেয়েটেয়ে এলুম।

বাড়িতে বসে বসে আনসা হয়েছে বেশ তুলতুলে। আগে বোদে রোদে ঘুরে যে কালি পড়েছিল চোখে মুখে, তা সরে গিয়ে ওর আসল ফর্সা রং উঠেছে ফুটে। ওকে দেখে সময় সময় আমিও অবাক হয়ে যেতুম। আমারই দিদি এত ফর্সা এত সুন্দর দেখে আমার খুব গর্ব হত। রং যেন গাজরের মতো হচ্ছে দিন দিন। নিজের সংসারে থাকতও তেমনি রাজরানীর মতো। ওকে দেখে আমার কেবলি মনে হত আমরা সব ভাই বোন যদি ওর মতন সুখে থাকতে পারতুম, দুবেলা পেট পুরে খেতে পেতুম, তাহলে হয়তো দেখতে এমনি সুন্দরই হতুম, মানুষের মতোই বেড়ে উঠতুম। জল, ঝড়ে, রোদে, কষ্টে আমাদের আর মানুষ থাকতে দেয় নি, বাঁদর বানিয়ে দিয়েছে।

গুজরাতিদের বাগান থেকে মামা এটা ওটা মাঝে সাঝে আনে বাড়ির জন্যে। সবে কিনেছে যে মোষটা সেটাও বাচ্চা দিয়েছে। বাড়িতে ওর এখন প্রচুর দুধ। রোজ বাতে গুজরাতিদের বাগান থেকে এই মোষের জন্য মামা তাজা তাজা ঘাস নিয়ে আসত। মামা এখন সংসারী হয়েছে— ঘরকন্নার কাজে কতই না উৎসাহ।

হাটের দিন আমরা ভাইবোনেরা, আনসার পথ চেয়ে বসে থাকতুম। আনসা মাঠে ঘুরে ঘুরে বালুকে গাছপালা, জমির ফসল, গাছের ফুল, ফল, পাখি, বলদ, গাড়ি, প্রজাপতি সব দেখিয়ে বেড়াত। বালুকে কোলে নেবার জন্যে আমাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। ভাল খেতে পেত বলে বালু দেখতে মোটাসোটা হয়েছে, আমাদের খুবই ভাল লাগত ওকে কোলে তুলে নিতে। ওরই পাশে পাশে আমার মার সন্তানদের অর্থাৎ আমার ছোট ভাই বোনেদের যেন মনে হত বাগান থেকে উপড়ে ফেলা শুকনো, নির্জীব, মলিন, প্রাণহীন কতগুলো গাছ।

নয়

ক্লাস সিক্স-এর পরীক্ষা যথাসময়ে পাশ করে ক্লাস সেভেনে উঠলুম। বসন্ত ফার্স্ট হল, আমি সেকেন্ড। সপ্তাহে দু'তিন দিন স্কুল কামাই তো বাঁধা ছিল। ক্লাস সেভেনের পড়াটা সেভাবে নিলে তো চলবে না, সেভেনের পরীক্ষা স্কুলে নয়, বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে হয়। এ পরীক্ষা যে পাশ করে সে কেরাণি, মাস্টার, খাতা দেখার কাজ বা দালালের দোকানে দেওয়ানজীর কাজ খুব সহজেই পেয়ে যায়। এদিকে পরীক্ষায় বসতে গেলে স্কুলে কমপক্ষে একশ কুড়ি দিন উপস্থিত থাকতেই হতো নইলে ফর্ম পাওয়া যেত না। তাছাড়া আছে পরীক্ষার ফি— সেটাও দিতে হবে। বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্ন যে কেমন আসে তা বলা কঠিন। পরীক্ষা কোলহাপুরে গিয়ে দিতে হত। সেখানে পরীক্ষার তিন দিন গিয়ে থাকতে হবে। আমাদের গাঁ কাগল কোলহাপুর থেকে মাত্র বার মাইল দূরে। আমি যখন খুবই ছোট তখন একবার গিয়েছিলুম কোলহাপুরে। বাল মহারাজের প্রথম যখন ছেলে হল সেই সময়। ঠাকুরের মাথায় জল দিতে গিয়েছিলুম। এখন কোলহাপুরের কিছুই আর মনে নেই। পরীক্ষার তিনদিন মাঠের হাড়ভাঙা খাটুনি থেকে অন্তত রেহাই, এ ভেবে খুশি হয়েছিলুম ঠিকই, কিন্তু সেভেনের পরীক্ষা ছেলেখেলা নয়, অত হালকাভাবে নিলে বিপদ আছে, তাই ক্লাস সেভেনে উঠে একটা ভয় মনে মনে সবসময়ই থাকত। আমি ভেবে দেখলুম এ ক্লাসে আমার নিজের বই না থাকলে কেবলমাত্র ধার করে অন্যের বই-এর ওপর ভরসা করে পড়াশুনা করলে চলবে না। মনে আছে ক্লাস ফাইভ-এর বই একটা ছেলের কাছ থেকে আদ্ধেক দামে কিনেছিলুম। টাকাটা মা-ই দিয়েছিল। ক্লাস সিক্স-এ কিন্তু কপালে তাও জোটে নি। আমার কাছে মারাঠীর একখানা বই ছিল, জ্যামিতির বই ফাইভ-এর বইয়েতেই চলে গেছে, কিনতে হয় নি। কিন্তু বাকি সব বইই এর তার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়তে হয়েছে। কিন্তু সেভেনের পড়াশুনা তো সেভাবে করলে চলবে না। অনেক বইই সেভেনে পা'েট গেছে, পুরনো বইয়ে সব পাতা থাকে না। এসব নানা দিক ভেবে আমার এবারে খুব শখ হল নতুন বই কিনব— মলাটের কাগজে মলাট দিয়ে প্রথম পাতাতেই আমার নাম লিখব— বসন্ত যেমনটি করে। অন্যের পুরনো বই আদ্ধেক দামে কিনে পড়লে কেন জানি না মনে হত কারো এঁটো পাতে খাচ্ছি। নতুন কেনা বই হবে আমার একান্ত নিজেরই সম্পত্তি। নতুন বইয়ের গন্ধ শুঁকব আর পড়ব— এ আমার কতদিনকার সাধ। জীবনে অন্তত একবার নতুন বইয়ের মালিক হয়ে বই পড়ার সাধটা মেটাতে ইচ্ছে হল।

ছুটি শেষ হয়ে এল। এ দু'মাস রাতে মাঠে থেকেছি, বাবাকে থাকতে দিই নি যাতে বাবা একটু বিশ্রাম পায়। মনে মনে ভাবলুম এই সুযোগ যা দরকার তা এখনই বাবার কাছে চেয়ে নিতে হবে। একদিন সকালে কুয়োর কাছে চা গরম করে দিতে দিতে বাবাকে বললুম, "বাবা, এবারে কিন্তু আমার ক্লাস সেভেন, মাঠে সারাদিন

কাজ করে রাতে পড়াশুনা করব, তার জন্যে নিজের বই চাই। সবাই যে যার বই নিজেই পড়বে আমাকে কেউ ধার দেবে না। তাই এবারে নিজের বই না হলেই নয়। আর পুরনো বইয়েতেও আর চলবে না, সেভেনে অনেক বই পালটে গেছে তার জায়গায় নতুন বই এসেছে।"

"দেখি কি করি। কিনব'খন। যা, যা ওদিকটায় দেখ, আখের জল গড়িয়ে যাচ্ছে, ছুটে যা," বলেই বাবা বলদটার পিঠে মারল এক চাবুকের ঘা।

আমি তো আমার অবস্থাটা আর মনের ইচ্ছেটাও বাবাকে জানালুম। এদিকে স্কুল খুলে যাবার পরও মাস খানেক কেটে গেল, ক্লাসে পড়াশুনাও রীতিমত জোরদার চালু হয়ে গেল, বাবা কিন্তু বই কিনে দেবার নামও করে না। শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে না পেরে একদিন অত্যন্ত দুঃসাহসের একটি কাজ করে বসলুম। মার তখন নবম সন্তান আপ্পা কোলে। ছ'সাত মাস বয়স হল।

সেদিন মার শরীরটা ভাল ছিল না, শুয়েই ছিল। স্কুলে যাচ্ছি বলে মাঠ থেকে আমি বাড়ি চলে এসেছি। আমি যে বই কেনার ব্যাপারে বাবার পেছনে লেগে আছি সেটা মা জানত। মা নিজেও তো বাবাকে কতবার বলেছে, "বই কিনে দিলে কি হয়? এবার তো ক্লাস সেভেন হল। ভাল পাশ দিলে ভাল চাকরি পাবে। ছেলেটা সকাল থেকে সন্ধে অবধি মাঠে খাটে, তার মজুরি হিসেবে ধরেও তো বইগুলো কিনে দিতে পার।" জবাবে বাবা বলেছে, "আচ্ছা, আচ্ছা হবে'খন। এখন আমার কাছে পয়সা নেই। সবজি বেচে দেখি যদি কিছু পাই, নইলে কোলহাপুরের দালালের কাছ থেকে কিছু না হয় ধার করা যাবে।"

সেদিন ঘরে ঢুকেই মাকে বললুম, "মা, বাবা বই কিনতে বলেছে।"

"পয়সা?"

"ঘরের আলমারিতে আছে, সেখান থেকে নিতে বলেছে।" ঘরের দেয়ালে একটা খুপরি ছিল, সেখানে একটা কাঠের তক্তা লাগিয়ে টাকা পয়সা রাখার ব্যবস্থা ছিল। মা আমাকে সেখান থেকে পয়সা নিতে বলে দিল। খুপরিটার তালার চাবি ঝোলান থাকত রান্নাঘরের দেয়ালে, উঁচুতে। মা সে চাবি আমার হাতে দিলে। খুপরিতে দশটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা ছিল। আমি দশটা টাকা নিয়ে স্কুলে হাঁটা দিলুম। আট টাকা আর কয়েক আনা খরচ করে আমি ক্লাস সেভেনের দরকারী বইগুলোর বেশির ভাগই কিনে বইগুলো বাড়িতে রেখে দিলুম। মলাট দেবার কাগজ দোকানে না থাকাতে গলির একজনের কাছ থেকে পুরনো খবরের কাগজও চেয়ে এনে রেখে সন্ধের দিকে মাঠে চলে গেলুম। অনেক রাতে মাঠ থেকে ফিরে নতুন বইগুলোতে মলাট দিতে বসে গেলুম। ঘণ্টাখানেক পর বাবাও এল খেতে। আমি তখনও বই কেনার ব্যাপারটা বাবাকে জানাই নি। ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "বই কোথায় পেলি?"

"কিনেছি।"

"পয়সা পেলি কোথায়?"

"তোমার পয়সার খুপরি থেকে নিয়েছি।"

"কত?"

"দশ টাকার একটা নোট ছিল। সেটা ভাঙিয়ে বই কেনার পর এক টাকা ছ আনা ফিরেছে, আবার সেটা খুপরিতে রেখে দিয়েছি।"

"হারামজাদা! বই কেনা হয়েছে। একটু পয়সা বাড়িতে রেখেছিলুম। এখন খাওয়া জুটবে কি দিয়ে? কি খাব বলতে পারিস?" বলতে বলতে বাবা আমাকে লাথি মারতে মারতে দেয়ালের দিকে নিয়ে গেল। বাবার পায়ে চটি জুতো ছিল, তাই দিয়েই বাবা মুখেও মারছে আবার নীচের দিকে লাথিও মারছে। জুতোর ঘা মুখে পড়াতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, আমি ছটফট করছি আর মা মা বলে চিৎকার জুড়ে দিয়েছি। মা এগিয়ে এল আমায় বাঁচাতে, আমার হয়ে ওকালতি করে বাবাকে বললে, "কিনে দেবে আগে বলেছিলে কেন তবে? কত কষ্ট করে মন দিয়ে পড়ছে ছেলেটা, একবারও ওকে বই কিনে দিতে পারলে না?"

রাগে মার দিকে এগিয়ে এল বাবা, কিন্তু মা অসুস্থ তাই মারতে সাহস করলে না। মাথাটা আঁচল দিয়ে শক্ত করে বাঁধা, এবারে বাচ্চা হবার সময় মার খুব নাকি কষ্ট হয়েছে, ভারী ঝিমিয়ে গেছে। মারলে হয়তো মবেই যাবে এই ভেবে তখনকার মত শুধু নোংরা গালাগাল দিয়েই বাবা ক্ষান্ত হল। আমার দিকে ফিরে বললে, "যে দোকান থেকে বই এনেছিস সেখানে বইগুলো ফেরত দিয়ে আয় নয়তো তোকে জ্যান্ত পুঁতে দেব।"

"আচ্ছা" বলে তখনকার মতো মারের হাত থেকে বাঁচলুম। পরের দিন সেই দোকানটায় আমি গেলুম ঠিকই, কিন্তু দোকানীকে বললুম না কিছুই। রাতে বাড়ি ফিরে বাবাকে বললুম, "দোকানি বইগুলো ফেরত নিচ্ছে না।" বলার সঙ্গে সঙ্গে পিঠে পড়ল খানকতক কিল।

"দেখ না স্কুলে অন্য কোন ছেলে বইগুলো নেয় কিনা, রোজ রোজ এই মার আর ভাল লাগে না," বলে সেদিনকার মতো মারের হাত থেকে মা আমায় বাঁচালে। তিনদিনের দিন মার খেতে হল না। আমি দূর থেকেই বাবার চটি জুতো এড়িয়ে কাজে চলে যেতুম। আমি ঠিকই করে ফেলেছি, যা হবার হবে। মারলে মারবে, নাহয় মারই খাব। মরব তো আর না। জানে তো আর মেরে ফেলবে না। পাঁচ দিন মারবে, ছ'দিনের দিন থেমে যাবে। না হয় একটু বেশি কাজ করব, বাবার হয়তো তাহলে আর মারতে মন চাইবে না। বই যখন একবার কেনাই হয়ে গেছে তখন আর চিন্তা কি? আমার বইগুলো তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারে নি। আমি পড়াশুনায় মন দিলুম।

এবারে বাচ্চা হবার পর থেকে মার শরীর ফুলেছে, মার শরীরে আর কিছু নেই মাঠের কাজে মা আজকাল আর মোটে খাটতে পারে না। তাই আমাদের কাজ বেড়েছে। ধোণ্ডুবাঈকে মা বসে বসে শেখায় ছোট ছোট ভাখরি কি করে চাটুতে সেঁকতে হয়। ছোট বোনটা আমার, যতটুকু না ওর ক্ষমতা তার চেয়ে বেশি কাজ করে। কখনও ডালে নুন বেশি হয়, নয়তো ঝাল বেশি হল। তারও ছোট ছোট বোনেদের গায়ে দুঘটি জল ঢেলে গা মুছিয়ে দিত। হীরা দুটো মোষ আর ওদের বাছুরদের চরায়।

দুটো পা বেঁধে গোরুকেও সেখানেই সে চরায়। শিবার এখন নয় চলছে। সারাদিন সে ছাগল চরিয়ে বেড়ায়। হীরা আর শিবা দুজনেই কমজোরি বলে ওদের এই হালকা কাজ দেয়া হয়েছে। শিবা আখের পাতা, আরও এটা সেটা এনে ছাগলদের খাওয়ায়। ছাগলগুলোকে ও সত্যি সত্যি ভালবাসত, সকালে দুইয়ে মাঠে নিয়ে আসত একা একা। মাঠে ছাগল চরে বেড়াত একদিকে আর ও বসে থাকত আরেকদিকে। এখন ভাইবোনে মাটি খেলেও দেখার লোক নেই। মাটি খেয়ে মুখটা জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেলত। পায়খানা করতে হলেও বসত গিয়ে সেই অনেক দূরে। তাই ওদের পায়খানাও কেউ দেখতে পায় না আর মাটি খেলি কেন জিজ্ঞেসও কেউ করে না।

আমাদের কষ্ট দিন দিন বাড়ছেই। এ জমিটা যেন বোঝা হয়ে দাঁড়াল। কুয়ো খুঁড়ে দেবে বলেছিল, কিন্তু মালিক তার নামগন্ধও করছে না। এদিকে কুয়োর জলের আশায় বাবা জমিটা নিয়েছে চড়া খাজনায়। কুয়োতে যে ময়লা পড়েছিল তা আমাদেরই টেনে বার করতে হল। তাতে আড়াইশ মতো খরচা হয়ে গেল। তাতেও তেমন জল এল না। দু এক গাড়ি গুড় মাত্র হয়েছে এ বছর, ওতেই সারা বছর চালাতে হবে। খুবই লোকসান হল। ফসল যা হয়েছে তাতে কোনোরকমে খোবাকিটা হয়ে যাবে। বীজ রোয়ার সময় দালালের কাছে টাকা ধার করে নিয়ে এল বাবা। ফসলে তেমন লাভ হয় নি বলে পয়সা দিয়ে মুনিষ রাখা সম্ভব হয় নি। আমরা নিজেরাই তাই মাঠে খেটে মরতুম।

এদিকে মাও আর আজকাল আগের মতো ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে কাজে লেগে যেতে পারে না। আট আটটি ছেলেমেয়ের দেখাশোনা করতে গিয়ে মা বেচারার হাঁফ ধরে যায়। সব কাজের ভারটাই তাই ঘুরে ফিরে পড়ল এসে আমারই ঘাড়ে। কুয়ো থেকে জল-তোলা, বলদ খাটানো সব আমারই কাজ। খেতে জল নালা দিয়ে গড়িয়ে দেবার সময় একজনকে কুয়োর কাছে দাঁড়াতে হয়, আরেকজন দেখে জল গাছের গোড়ায় গেল কিনা।

সকাল সন্ধে এই জলের কাজে আটকে থেকে আমার স্কুলে যাওয়াই দায় হল। ক্লাস সিক্স অবধি পরীক্ষাটা না হয় স্কুলেই হয়েছে কিন্তু ক্লাস সেভেনে তো আর তা নয়। আমার মনের ভেতর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। একে তো স্কুলে যেতে পারছি না, তার ওপর বাবাকে মিষ্টি কথা বলে কুয়ো করে দেবার নাম করে জমির মালিক কি চড়া খাজনাতেই না জমিটা দিলে। এদিকে কুয়ো তো খুঁড়বার নামগন্ধ নেই। জমির খাজনা একটু কমাতে বললে এক পয়সাও কমায় না, খালি বলে 'দেখি।' ভয় হয় আমাদের গোটা পরিবারটাই না খেটে খেটে শেষ হয়ে যায়। জমির খাজনা তো ফি বছর পাই পয়সা অবধি মিটিয়ে দিতে হবে, বাকী রাখা চলবে না। বাকি পড়ে গেলে আমাদের ঘটি বাটি গোরু মোষ সব টেনে নিয়ে চলে যাবে। এ কিপটে বামুনটার মনে এতটুকু দয়ামায়া নেই। বাবার গাড়ি এবারে একদিনও ভাড়াই খাটে নি তাও বামুন বলে কিনা, "গাড়ির একদিনের ভাড়াটা দিলি নে?" এ বামুনের মামা ছিল উকিল। ছোটভাইকে পাঠিয়েছে কোলহাপুরে পড়তে। ওর নিজের ছেলেরা পড়াশুনা করে, তাদের অন্য কাজ করতে হয় না। আর এই বামুনদের জমিতে খেটে ওদের

গোলায় ফসল ভর্তি করে দিই আমরা, নিজেরা কিন্তু ভাল করে খেতে পাই নে। এদের ছেলেরাই ভাল খেয়ে পড়ে হবে উকিল, আর আমরা জমির খাজনা দিতে পারি নি বলে ভিটেমাটি দেনার দায়ে বিকিয়ে উঠব গিয়ে রাস্তায়। এসব দেখে শুনে বাবার মাথা আর স্থির রাখতে পারে না। আমি তো জানি স্কুলে যাওয়া আমার আর কিছুতেই হয়ে উঠবে না।

সেদিন স্কুলে না যেতে পেরে সারাটা দিন ছটফট করে মরেছি। স্কুলের রুটিন জানা আছে। সময় যত বয়ে যাচ্ছে ততই আমার চোখের সামনে পর পর পিরিয়ডগুলো, আর সে সময়কার মাস্টারমশায়দের চেহারা ভেসে উঠছে। মন্ত্রী মাস্টারমশাই এ ক্লাসে এখন কি অঙ্ক করাচ্ছেন? নাইক মাস্টারমশায় ভূগোলের কোন দিকটা আজকে পড়াচ্ছেন? ভাবছি, আর ক্রমেই মনমরা হয়ে পড়ছি। বাছুরকে দড়ি দিয়ে বাঁধলে সে প্রথমে ছটফট করবে বেরিয়ে যাবার জন্য, তারপর ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে মনটা একবার ভেঙে গেলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে পড়বে আর লড়বে না। আমারও আজ সে অবস্থাই হয়েছে।

সেই সকালে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বলদকে নিয়ে খেতে নেমে পড়তুম। তাদের দিয়ে মাঠে জল দিতে দিতে দুপুর গড়িয়ে যেত। তারপর পেটে একটু খাওয়া পড়ে শরীরটা যখন হেলে পড়তে চাইত তখনই ছোট ছোট আখের খেতে ঢুকে পাতা কেটে এনে বলদদের খাওয়াতে হত। এদের খাওয়ানো হয়ে গেলে ঘণ্টা দেড়েক সবাই বিশ্রাম পেত। বাবা দড়ির চারপাইতে চিৎ হয়ে শুয়ে দিব্যি নাক ডাকাতে লেগে যেত, মা বেচারা হয় গোবর দিয়ে দাওয়া নিকোবে নয়তো কাপড় কাচবে। বলদগুলোও পাতাটাতা খেয়ে চোখবুজে একটুখানি জিরিয়ে নিত। বাচ্ছারা খেতের বাঁধের দিকে ছায়াতে বসে বসে হয় খেলত নয়তো গালগল্পে মেতে থাকত। সেই ফাঁকে একটা গাছের তলায় বই খুলে মন দিয়ে পড়াশুনা করতে চাইতুম। ঐ ছিল আমার পড়ার অবসর। সব বুঝতে পারতুম, অঙ্কটা বাদে। আর যদি বা একটু হয়তো পরিষ্কার হয়ে আসছে বলে মনে হল, অমনি বাবা ডাকত, বলত "নে বইগুলো এবারে পুড়িয়ে ফেল। স্কুলে পড়ে কত টাকা কামাবি সে জানা আছে। যা এবারে বলদগুলো নিয়ে জলের কাজে লাগা গে যা।"

বইটই গুছিয়ে ফের আবার কাজে লাগতে হত। কোনো একটা বিষয় আদ্ধেক বুঝেছি কি না বুঝেছি, সে অবস্থাতেই ফেলে রেখে উঠতেই হত। যে বিষয়টি মোটামুটি পরিপাটি করে মাথায় গুছিয়ে নিয়েছিলুম, মাঝপথে এ ভাবে উঠে গিয়ে আধা খেঁচড়া হয়ে গিয়ে আবার সব এলোমেলো হয়ে যেত। মনে হতো ধ্যুৎ তেরি ছাই সব ভেস্তে গেল। অবশ্য বাবাকে এসব নিয়ে বলে কোনোই লাভ ছিল না। বাবার ঘুম শেষ হলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ভাবতে বসে যেত এরপর আমাদের কার ঘাড়ে কোন কাজটা চাপাবে। আমাকে কুয়ো থেকে জল তোলবার কাজে বলদ ধরতে বলেই নিজে উনুনের আঁচের সামনে এসে ভাল করে গুছিয়ে বসে হুঁকোটা সাজাতে লেগে যেত। কল্কেটা কাস্তের ডগা দিয়ে পরিষ্কার করে ভেতরের জমা পোড়া তামাকের ছাই এসব নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে বার করে পরিষ্কার করে নেবার পর তাতে তামাক পুরে উনুনের

এক খণ্ড জ্বলন্ত কয়লা দিত চেপে। তারপর তামাকটা আঙুলের নখ দিয়ে ভাল করে ঠেলে হুঁকোতে গুড় গুড় করে দিত টান। এভাবে চলবে বেশ কিছুক্ষণ। এদিকে আমি ততক্ষণে আখের খেতে জল ছাড়ছি। জল আস্তে আস্তে আখের গাছের গোড়া গড়িয়ে গেলে পরই বাবা আসত বলদের কাছে। আমাকে বলত, "তুই জল সব নালায় ঠেলে দি গে যা।" আমি আখের গাছে যেতে যেতেই এদিকে জলের ভিস্তি ভরে কুয়ো থেকে উঠে আসত। এভাবে জল দেবার সময় যে বলদ সামলায় সে আর অন্য কাজ করে না সে শুধু "মোটক্যা" মানে এই জলের ব্যবস্থাটাই সামলায়। তার সঙ্গে যে কাজ করে সেই "প্যানক্যা" বলদ জোড়া গোয়ালঘর থেকে বার করে, গোবর কুড়িয়ে গোয়ালঘর ঝেঁটিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়, যাতে বলদগুলো ফিরে এসে পরিষ্কার জায়গায় থাকতে পারে। এসব কাজ সেরে সে জলের দিকে যায়। পাঁচ মিনিট মতো বিশ্রাম তার কপালে জোটে অর্থাৎ যতক্ষণ না ভিস্তিটা ভরে যাচ্ছে ততক্ষণই তার বিশ্রাম। বাবা কিন্তু এই পাঁচ মিনিটের বিশ্রামটুকুও নিতে দিত না। সেই বিশ্রামটুকু তার নিজের জন্য চাই। শিবা আর হীরাকে গোবর তুলবার হুকুম দিত। ওরা গোয়ালঘর ঝেঁটিয়ে ধুয়ে পরিষ্কারও করত। আমাকে বলদের পেছনে লাগিয়ে নিজে হুঁকো টানতে টানতে উনুনের আঁচের সামনে বসে আরাম করত— কখনও চোখ বন্ধ করে, কখনও বা আধা খোলা রেখে।

স্বার্থপরের মতো বাবার এ কাণ্ড কারখানা দেখে আমরা ছেলেমেয়েরা অস্থির হয়ে যেতুম। জলের কাজ শেষ হলেই বাবা আবার আধা বন্ধ চোখে হুঁকো টানতে বসে যাবে আর কিছুক্ষণ বাদেই দড়ির চারপাইটাতে একটা কাঁথা পেতে দিব্যি একটা ঘুম দেবে। আমরা ছেলেমেয়েরা আখের পাতা কাটতে লেগে যেতুম, সময় পেলে কখনো সখনো মা-ও আমাদের সঙ্গে হাত লাগাত। বাবার কাণ্ড দেখে আমাদের ভীষণ রাগ হত, বলতুম "আচ্ছা মা, আমরা কেন পাতা কাটব আর বাবাই বা ছায়ায় পড়ে পড়ে ঘুমোবে? আমাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে বাবা কি মরে যাবে?"

"ওকে এ কথা কে বলবে বল? আমিই তো আছি তোদের সঙ্গে," এই বলে মা আমাদের চুপ করিয়ে দিত।

এমনও হয়েছে কখনও কখনও খাওয়া দাওয়ার পর আমরা আর কাজের জন্য উঠতে চাইতুম না। শরীর ঝিমিয়ে পড়ত। ওদিকে রোদ খাঁ খাঁ করছে। পেটে ভাত পড়লে মনে হত পায়ের জোর যেন আরো কমে গেছে। আমরা কাস্তে হাতে নিয়ে এদিক ওদিক করে সময় কাটিয়ে দিতুম। বাবা কিন্তু শুয়ে শুয়ে এরই মধ্যে বলতে শুরু করে দিয়েছে, "যা না, যা, গাছের পাতা কেটে নিয়ে আয় না।" আমাদের মনে হত বাবা নিজেই বা যাবে না কেন। আর কিছু না হোক গুটিকতক গাছের পাতা কেটেও তো আমাদের একটু সাহায্য করতে পারে। বাবা আসছে না দেখে ওকে রাগাবার জন্য বলতুম, "বাবা, তুমি যাবে না পাতা কাটতে?" বাবা কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করে উঠত, "সেই ভোর থেকে তো কুয়োর জল টেনে আর বলদ সামলাতে সামলাতে আমার হাত পা'র আর কিছু নেই। বলতো, আমি আর কত খাটব তোদের জন্যে? যা, যা, চার পাঁচটা পাতা কেটে আন গে যা।"

বলদগুলো যখন আমাকে ধরতে হত, তখন কিন্তু এ বিশ্রামটুকু আমার কপালে জুটত না। কিন্তু এ সব কথা কেই বা বলবে আর কেমন করেই বা বলবে? কথা বেশি বাড়ালেই তো পিঠে পড়বে দুম দুম কিল। আমার মনে হত বাবা যখন আমাদের বাপ হয়েছে তখন ওরই উচিত ওর নিজের সন্তানদের জন্য কষ্ট করা। যে কাজ ছেলেপিলেদের দিয়ে হয় না সেটা তো ওরই করা উচিত। এতো রোদে ছেলেদের না খাটিয়ে ওদের ছায়ায় বসিয়ে রেখে নিজেরই তো খাটা উচিত। মা তো কতো খাটে। কুয়ো থেকে জল টানার সময় বাবা তো বলদের পেছনে দাঁড়ানো ছাড়া আর কিছুই করে না। মা আর আমরাই তো বলতে গেলে বাবাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি। আমাদের পড়াশুনা বন্ধ করে আমাদের এ ভাবে কাজে লাগানোটা কখনই আমার ঠিক মনে হয়নি। কিন্তু বাবার কাজের ধারা বা চিন্তার গতি কোনটাই তো পাল্টাবার নয়।

গোরু গাধার মতো মার খেয়ে বই কিনেছিলুম ঠিকই, কিন্তু বই কেনার পর কেঁদে কেটে দশ পনের দিনও স্কুলে যেতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। সারা মাস আকাশে মেঘের দেখা নেই। শেষে এক সময় সত্যি সত্যি ধূম বৃষ্টি নামল। খেতের কাজ তখন হুড়মুড় করে করতে হল। বীজ রোয়ার জন্যে জমি তৈরি করতে হবে। তারপর বীজ ফেলতে হবে। জমিতে সার দেয়া দরকার। খেতের যে দিকটা বাঁধের দিকে পড়ছে সেখানে আগাছা, ঝোপঝাড়ের জঙ্গল সব তুলে ফেলে পরিষ্কার করতে হবে। কুয়োতে যা জল আছে সেটা তুলে দিতে হবে আখের খেতে। এত কাজ করতে হবে, কিন্তু চাকর তো একটাও নেই। বাবাই যা গাট্টাগোট্টা আছে, আমাকে বাদ দিলে অন্য ছেলেপুলেরা তো সব রোগা টিঙটিঙে। আমি ছাড়া বাবার সঙ্গে আর কাজটা করবে কে? আমাকেই তো বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজে নেমে যেতে হবে।

বর্ষা নেমেছে ভাল করেই। বীজও রোয়া শেষ। জমিতে দেবার আগে সেখানে লাঙলও পড়ে গেছে। মোষ ছাগলদের দানাপানি দেয়া আর তাদের চরানো ছাড়া আর যেন করার কিছু নেই। আমার হাতে অবসর আছে, তাই স্কুলেও যেতে পারছি। সূয্যি ওঠার আগেই মাঠে চলে এসে খাওয়ার সময় অবধি ওখানেই থেকে তারপর ফিরে আসতুম। একটু একটু করে পড়া শুরু হয়েছে। আমি বন্ধুদের সঙ্গে বসে জ্যামিতি, ভূগোলের অঙ্ক, পাটিগণিতের অঙ্ক কষে যাচ্ছি। এভাবে দু আড়াই মাস একটানা স্কুলে যেতে পারলুম মোটামুটি কামাই না করেই।

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা যেই এগিয়ে এল, অমনি আবার আমার কামাই করা ফের শুরু হয়ে গেল। সেই একঘেঁয়ে কাজ। কুয়োতে বলদ খাটাও, আখের খেতে জল না দিলেই নয়, বর্ষার আনাজপাতি হচ্ছে, সেখানেও জল দেবার দরকার আছে। আমাদের গাঁয়ে দুবার হাট বসে, বর্ষার এই আনাজপাতি সেখানে বেচতে গেলে, মাঠ থেকে সেসব কেটে হাটে বেচতে হবে। চিনে বাদাম আছে, লঙ্কা, ঝিঙে, ঢেঁড়স আছে সেসব হাটের আগের দিন সন্ধেয় একটা একটা করে আঁটি বেঁধে তৈরি করে রাখতে হত। স্কুল করে এসব কাজ হত না, স্কুল তাই কামাই হত। এরই মধ্যে হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। ভোরে কোনরকমে বলদ কুয়োতে লাগিয়ে জল তোলা,

দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ বাবার হাতে পায়ে ধরে কোনোরকমে স্কুলে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পরীক্ষায় বসে যাওয়া। কখনও বা বসে ভাখরি খেতে পেতুম, কখনও বলদ সামলাতে সামলাতে নাকে মুখে দু একটা গ্রাস গিলে আবার কাজটা সেরে ফেলা। কখনো আবার ভাখরি আর তরকারি বেঁধে নিয়ে চলে যেতুম, দিনের প্রথম পরীক্ষাটা দিয়ে বাগানে বসে বসে খেয়ে নিতুম। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষাটা এভাবেই দিলুম, পরীক্ষার ফল ভাল হলো না। কোনোরকমে পাশ করে গেলুম। অল্প দিন পরেই দেয়ালীর ছুটি পড়ে গেল, আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। এ ক'দিন অন্তত মাস্টারমশাইরা কাউকে নতুন কিছু পড়াবেন না, আর আমিও সেগুলো থেকে বাদ পড়ব না।

ছুটি শেষ হতে না হতেই টেস্ট পরীক্ষা এসে গেল। মাস্টারমশাই সবাইকে জোর কদমে পড়তে বলে দিয়েছেন। কয়েকটা বিষয়ে আমি কাঁচা ছিলুম। মাস্টারমশাইদের সবারই আমার ওপর খুবই সহানুভূতি ছিল কিন্তু আমার পড়া তো ওঁরা এসে করে দেবেন না, আমার পড়া আমাকেই তো করতে হবে আর পরীক্ষা পাশও আমাকেই করতে হবে। সময় পেলেই পড়তে বসতুম ঠিকই, কিন্তু কোন কিছু বুঝতে না পারলেই মনটা খারাপ হয়ে যেত। হতাশ হয়ে ভাবতুম আমি আর তাহলে পাশ করব কি করে? সব গোলমাল হয়ে যেত। মনের এ অবস্থা বাড়ীতে কেউ বুঝতেই পারত না। যেমন করে হোক টেস্ট পরীক্ষা পাশও করতে হবে আর ফর্মও পেতে হবে। এদিকে মাঠের কাজও শুরু হয়ে গেল, টেস্টও এসে গেল, একই সঙ্গে। মাঠের কাজ করলে আর পড়াশুনা করব কি করে? বাবাকে যতই বোঝাতে যাই না কেন, বাবা কিছুতেই বুঝবে না। বাবাকে কত করে বলতুম, "বাবা, আমার টেস্ট পরীক্ষা তো এসে গেল, মাঠে এ ক'দিন জলটা তুমিই ছাড় না।"

"আর এদিকে আমার আখের খেতের কি হবে? গাছগুলো শুকিয়ে যাবে না? তখন পেটে কি পড়বে? তোর জন্য ফসল যাবে নষ্ট হয়ে? স্কুলে না গেলেও আমার কোনো ক্ষতি নেই, ওরকম স্কুলে মুতে দি গে যা।"

মনে মনে ছটফট করে মরছি। কি যে করব বুঝে উঠতে পারছি না। একদিন বাবাকে বললুম, "ভোরে উঠে কুয়ো থেকে মাঠে জল ছাড়তে লেগে যাব, এগারটা অবধি জল দেয়া চলবে তারপর দুপুরে স্কুল করে এসে আবার জল দিতে লেগে যাব আর সেটা চালাব অনেক রাত অবধি।" এ ব্যবস্থাতে বাবার আপত্তি ছিল না কারণ বাবা দেখলে খেতে তাহলে তো দু দুবার জল পড়ছে। আমি অবশ্য দুপুরের ছুটিতেই স্কুল থেকে চলে আসব এ শুধু মুখেই বলতুম, আসতুম না। সেই পাঁচটায় সব ক্লাস শেষ করে তবেই ফিরতুম। মাঠ থেকে স্কুল তো প্রায় মাইল দেড়েক দূর। স্কুলে যেতে যেতেই তো বেজে যেত সাড়ে বারটা একটা। আড়াইটেয় হতো হাফ ছুটি— তখন চলে এলে আমার কি লাভ হত? খালি পেটে অকারণে ছোটাছুটিই সার হত। ভাখরি খেয়ে সময় নষ্ট করতুম না, একগ্রাস ভাত কোনো রকমে গপ গপ করে গিলে ফেলতুম, ভেবে নিতুম বাড়ি ফিরে পেট ভরে খেয়ে নিলেই হবে। অবশ্য বেশির ভাগ সময় এ ব্যবস্থাও বানচাল হয়ে যেত, না হত খাওয়া, না হত বিদ্যে, কোনোটাই কপালে জুটত না। তাই আমি পাঁচটা অবধি স্কুলেই থেকে যেতুম।

স্কুল থেকে ফিরে বাবার রক্তবর্ণ চক্ষু আমার কাছে খোলা তলোয়ারের মতোই যেন পথ রোধ করে দাঁড়াত, বাবার গলা আর গালাগাল কানে ভেসে আসত। মনে মনে বাবার দাবড়ানি কল্পনা করতে করতে স্কুলের ব্যাগ বাড়িতে রেখে বাবার হাতে মার খাবার জন্য মাঠের দিকে এগিয়ে যেতুম।

"এত দেরী যে? এই যে বললি এক বেলা স্কুল করবি?"

"পরীক্ষার বিষয়ে খুবই দরকারী কতগুলো কথা মাস্টারমশাই বলবেন বললেন কিনা, তাই থেকে যেতে হল।"

বাবা মাস্টারমশাইকে একটা নোংরা গাল দিয়ে রাগ ঝাড়লে। কখনো কখনো এরকম অবস্থায় নিজের কাঁধের চাবুকটা দিয়ে আমার পিঠেও সঙ্গে সঙ্গে পড়ত এক ঘা, জোরে শব্দ হত। কখনও চাবুকের হাতল দিয়ে পাছায়, ঊরুতে মারত, আবার কখনো গালাগালের ওপর দিয়েই ব্যাপারটা তখনকার মতো মিটে যেত।

যাক গে, এসব করার ফল হল এই যে মাঝখান থেকে এক বেলার জন্যে স্কুল যাওয়াটাও বন্ধ হয়ে গেল। আমার ভীষণ রাগ ধরে গেল। এ কি! বাবা কিছুতেই শুনবে না? শেষে আমি বারটার সময় খাবার জন্য বাড়িতে না গিয়ে সোজা স্কুলে চলে যেতে শুরু করে দিলুম। কুয়ো থেকে মাঠে জল ছাড়তে স্কুলের ব্যাগ হাতেই চলে যেতুম। আখের সারি সারি গাছে জল দিতে দিতে মাঝখানে একটু শুকনো জায়গা দেখে সেখানে বইয়ের পাতা খুলে দুধারে দুটো পাথর চাপা দিতুম। জলের ভিস্তি ভর্তি হয়ে ওপরে ওঠা অবধি ঐ খোলা বইটা পড়ে যেতুম। এভাবে দু মিনিটের বেশি বই পড়ার সময় পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। দু মিনিট পর পর তাই আমি বই থেকে ভিস্তি আর ভিস্তি থেকে বই এ ভাবে হেঁটে যেতুম। এরকম করে যেটুকু পড়া হত সেটাই আমার লাভ মনে হত। বই তো হাতে ধরতে পারতুম না, খেতে জল ছাড়তে ছাড়তে হাতে কাদা মাখামাখি হয়ে যেত। এদিকে হাতটা যে ধুয়ে আসব তারও উপায় নেই, তার আগেই ভিস্তি ভরে উঠত। এক সারি আখের গাছে জল দিয়ে অবশ্য হাত ধুয়ে বই তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য সারিতে যেতে হত।

আমি রেগে মেগে স্কুলে চলে গেলে মা ছটফট করত, কারণ আমি সূয্যি ওঠা থেকে দুপুর বারটা অবধি একটানা কাজ করে স্কুলে যে চলে গেছি সেটা তো খালি পেটে, কিছু না খেয়েই। সকালে আধখানা বাসি ভাখরি দিয়ে চা খাবার মধ্যেও তো এই। এতে অবশ্য ছটফট করা ছাড়া মার আর কিছু করার ছিল না। দুপুরে আখের গাছে জল দেয়াটা মা-ই আমার হয়ে দিয়ে দিত। কখনো হীরাও সে কাজটা করত। এসব দেখে বাবা ভাবত আমাকে স্কুলে পাঠানোর পেছনে মারই কারসাজি আছে— যদিও সেটা পুরোপুরি মিথ্যে। আমি লুকিয়ে স্কুলে পালিয়ে গেলে বাবা মাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিত। এক একদিন এমনও হয়েছে বাবা মাকে দিয়ে কুয়ো থেকে জল তুলিয়েছে একটানা সন্ধে অবধি। মা মুখ বুজে সয়ে গেছে, কিছু বলে নি। মাকে গাল দিত, "হারামজাদী, তুইই তো ওকে স্কুলে যাবার উসকানি দিয়েছিস। এত সাহস ওর, আমাকেই না বলেই চলে গেছে। তুই ওর ভাখরি বন্ধ করে দিতে পারিস না? যা, ওর হয়ে আজ রাত অবধি মাঠে জল দি গে যা," বলে বাবা মাকে লাগিয়ে

দিত জল দেবার কাজে।

"আমি ওকে উসকাই নি, আমি বুদ্ধি দেবার কে? ও কি এখনো সেই ছোটটি আছে? এত করে ছেলেটা বলছে ক্লাস সেভেনের পড়াটা শেষ করবে, তা তুমি কানেই নিচ্ছ না? রোজ রোজ ওকে ধমকাচ্ছ, মারধোর করছ, ছেলেটা না খেয়ে খেয়ে মরেই যাবে। তোমার ভাখরিটা তাহলে বেঁচে যায়, তাই তো? আকাশে একটু ফর্সা হতে না হতেই ছেলেটা মাঠে চলে আসে, তারপর বারটা অবধি গতরে খেটে যায়, সেটা কার জন্যে শুনি? তোমাব জন্যে খাটে না? আমাদের সংসারের জন্য খাটে না? আমাদেরি ছেলে মনে করে একটু কাছে টেনে নিলে কার কি ক্ষতি হত? বয়স কম, মাথা গরম করে ছেলেটা যদি কোথাও চলে যায় তাহলে কি হবে?"

"যাক, যেখানে খুশি জাহান্নামে যাক্। এমন হতভাগা ছেলে পুষে কি করব? আমার বাপ যদি বলত 'রতনু বোস তো বাপ আমার' আমি তক্ষুনি কুকুরের মতো ওখানেই টুপ করে বসে পড়তুম। আমি বাপের কোনো কথা অমান্যি করি নি। সংসার ঘরদোর কি সুন্দর রেখেছিলুম। আর এই বোম্বেটে ছেলেটা কিনা জমির কাজে হাতই দিতে চায় না। ভাবছে স্কুলের নাম করে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াবে। ভাবাচ্ছি দাঁড়া। ওকে বাজে নেশায় পেয়েছে, আমি কি জানি না তুই তাকে মারের হাত থেকে বাঁচাস? তোর আঁচলের তলায় ও যা মনে চায় তাই করে বেড়াচ্ছে। দেখবি কাল এ ছেলেই আমাদের মাথায় চেপে বসবে।"

"ঐ তো একরত্তি ছেলে, তা সত্ত্বেও এত খাটছে, এত খেটেও তো পাশ করছে। আর তুমি কিনা মিছিমিছি ওকে গাঁয়ে যাবার বদনাম দিচ্ছ?"

"ঠিকই বলছি, খাটাখাটি না করে ছেলেটা এল্লমার নাম করে ভিক্ষে করবে'খন গাঁয়ে গাঁয়ে। আর তুই আর আমি এই ন'টা ছেলের সংসারের ভাব গলায় বেঁধে বসে থাকব। ছেলেপিলেরা কাজে আসবে, সে আশা ছাড়।"

"ক্লাস সেভেন পাশ করলে ছেলেটা চাকরি পাবে, তখন মাইনে আসবে। তখনও কি সকলের পেট ভরবে না?"

"আর ততদিন আমরা কি খাব? আমি একা একা কত খাটব? আমার সাথে শক্ত সমত্থ কেউ কাজ না করলে চলে? তুই কি চাস যে ঐ রোগা টিঙ্টিঙে ছেলেপুলেদের আমার চারপাশে বসিয়ে রেখে আমি হাঁ করে শুধু এসব দেখেই যাব? এসব হচ্ছে বলেই তো মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আরও কিছুদিন এভাবে চললে গোরু মোষ যা আছে সব বেচে দিয়ে জমির খাজনা দিতে হবে। তারপর আর কি? লোটা কম্বল হাতে নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ালেই হবে। তখন তো ভিক্ষে করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।"

"কপালে ভিক্ষে করা থাকলে কে খণ্ডাবে? আমাদের পেটে এক গুষ্টি ছেলেপুলে এসেছে তা তার বোঝা ঐ ছেলেটুকুর মাথায় চাপাই কেন? ওর কি দোষ? আমাদের বোঝা আমাদেরি টানতে হবে। কষ্ট যদি হয়ও তবে সেটা আমাদেরি সইতে হবে।" এক এক সময় মার ভয় ডর চলে যেত, বাবাকে তখন এমনি কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিত। এভাবেই চলেছে আমার স্কুলে যাওয়া আর স্কুলে যাবার নিষেধের লুকোচুরি

খেলা। অনেক দিন এক নাগাড়ে স্কুল কামাই হলে বাবাকে ফাঁকি দিয়ে স্কুলে হাজিরা দিতুম আর বাড়ি ফিরে মার খেতুম।

এমনি একদিনের কথা। বাবাকে বললুম, "বাবা, আজ আমাকে স্কুলে যেতে হবে। মাস্টারমশাই আজ পুরোন অঙ্কের প্রশ্নগুলো করে দেবেন।"

"হুঁ। আর দুপুরে জমিতে জল দেবে কে? তোর বাপ? রোজ রোজ স্কুলে যাব বলে বায়না ধরিস কেন?"

এমনভাবে বলত বাবা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে খেতের ফসল শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, তাই যাও কিছু পয়সা আসত খেত থেকে তাও যেন হারাতে হচ্ছে এই ফসল শুকিয়ে যাবার জন্যে। বাবার তাই সব সময় ভয়। মা বা ভাই বোনদের তো অন্য কাজও থাকে, সব সময়ই তো আর ওদের পাওয়া যায় না জল দেবার জন্যে। সে জন্যই খেতে জল দেবার লোক আমি ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যেত না, আর তাই স্কুলে যাবার নাম করলেই বাবার মাথা গরম হয়ে যেত। আমি সবই বুঝতে পারতুম কিন্তু পুরোপুরি মেনে নিতে পারতুম না। ভাবতুম বাবার জমি বাবাই বুঝুক, খাটুক, যা খুশি করুক। আমার গোঁ আমিই বা ছাড়ব কেন?

বাবার মুখ ঝামটা খেয়ে খেয়ে আমার সহ্য শক্তির শেষ সীমায় যেন পৌঁছে গেছিলুম। "আমি ঠিকই যাব" এই বলে জলের দিকে এগিয়ে গেলুম। বলদ যতক্ষণ টেনে যাচ্ছে আমিও ততক্ষণ জল ছেড়েও যাচ্ছি। দিনের মাঝামাঝি এসেও দেখি বাবা বলদ ছাড়ছে না। আমিও আর ধরে থাকতে পারছি না, খিদেও পেয়েছ খুব জোর। মা খাবার ঝুড়ি নিয়ে এসেছে। বাবা কিন্তু জলের কাজটা তখনও করেই যাচ্ছে, থামবার নামগন্ধও নেই। আমার কান্না পেয়ে গেল। না খেয়ে স্কুলে যেতেও পা সরছে না। সেই মুহূর্তে আমার মনে হল এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। এখানেও এত কষ্ট করব আবার পড়তে গিয়েও কত বাধা তার চেয়ে এ জীবনটা শেষ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল চীৎকার করে বাবাকে বললুম, "এবারে কুয়োটা ছাড় না" বলেই আমি গাঁয়ের দিকে ছুটলুম। বাবাও চেঁচাতে চেঁচাতে এল পিছু পিছু গাঁয়ের ঢোকার মুখ অবধি। আমাকে তখন কে পায়? এক নিমেষে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলুম।

স্কুলে যখন পৌঁছুলুম তখন বেলা একটা। দেড় মাস হল স্কুলে নতুন হেডমাস্টার এসেছেন, বেশ কড়া। ছাত্ররা দেরী করে এলে তাঁর সেই ক্লাস শেষ হওয়া অবধি দাঁড়িয়ে থাকতে হত। ফার্স্ট পিরিয়ডেই হাজিরা নিয়ে নেয়া হতো। ছেলেরা জানত নিদেনপক্ষে একশ কুড়ি দিন উপস্থিত থাকতেই হবে তা না হলে পরীক্ষায় বসতেই দেবে না, তাই গাঁয়ের বা গাঁয়ের বাইরের সব ছেলেরাই ভয়ে এসে যেত তাড়াতাড়ি। আর আমি কিনা হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হাজির হলুম একটার সময়। হেডমাস্টার মশায় অঙ্ক বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, তাঁরই ক্লাসে আমি এলুম দেরী করে।

"আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক। কটা বাজে এখন খেয়াল আছে? আপনাকে স্বাগত জানাতে হবে নাকি?" বলে উনি আমার দিকে তাকালেন।

আমি চুপ করে আছি, বলার তো কিছু নেই। আমি দেরী করে আসার অপরাধে

পায়ের কাছে বই এর ব্যাগটা রেখে ক্লাসে দাঁড়িয়েই রইলুম। মাস্টারমশাই ওভাবে ব্যঙ্গ করে কথা বলেছেন, ছেলেরা সবাই আমাকে দেখে হাসলে। তিনি নতুন এসেছেন তাই আমার অবস্থাটা ওঁর জানা ছিল না। কি করেই বা ওকে সব কথা বলি তাও বুঝে উঠতে না পেরে কান্না পেয়ে গেল, আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লেগে গেলুম। কাঁদছি আর চোখ মুছছি। পাশে বসেছিল মধুকর, আমাদের গলিতেই থাকে। ও আমার অবস্থা খুব ভাল করেই জানত। মাস্টারমশাইকে বললে, "এরা খুব গরীব, সকাল থেকেই ও চাষের জমিতে খাটছে, কাজ শেষ করে এখন আসছে। ওর বাবা ওকে কিছুতেই পড়তে দেবে না, আর ও-ও পড়বে, আর স্কুলে আসবে।"

মাস্টারমশাইর গলার স্বর হঠাৎ পালটে গেল। "আমি জানি, ওর নাম যকাতে না?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"সত্যি, যকাতে, তোকে স্বাগতই জানাতে হবে। তোর কথা আমি সব শুনেছি। যত দেরীই হোক তুই স্কুল কামাই করিস না, এমন কি বিকেল চারটে হলেও চলে আসিস" আমার কাছে এসে পিঠে হাত রেখে মাস্টারমশাই বললেন। এবারে আর কান্না চেপে রাখা গেল না, আমি কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লুম। গায়ে জামা তুলে চোখ মুছতে মুছতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলুম।

"কাঁদিস না, এসব দিন কেটে যাবে। যা, মুখ চোখে জল দিয়ে আয় গে। একি, তোর পায়ে এত কাদা কেন?" পায়ের দিকে তাকিয়ে খেয়াল হল, মাঠে জল দিতে দিতে যে কাদা পায়ে লেগেছে তা এখনও আছে। বাবা তাড়া করায় পা ধোবারও সময় পাই নি, ঐ কাদাপায়েই ছুটে চলে এসেছি। স্কুলে আসতে আসতে সে কাদা পায়ে শুকিয়ে গেছে, সেই পা নিয়েই চলে এসেছি।

মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকালেন, কি যেন ভাবছিলেন। তাঁর তখনকার স্নেহময় ব্যবহার ভোলার নয়। মনে হল স্কুলের প্রতি আমার টানটা উনি বুঝতে পেরেছেন। মুখে শুধু বললেন, "যা, পা ধুয়ে আয়।"

সেদিন স্কুলের পর আমি আনসার কাছে গিয়ে পেট ভরে খেলুম। এসব হুড়োহুড়ির ভেতর একদিন টেস্ট পরীক্ষাও শেষ হয়ে গেল। দুটি বাধা পার করেছি। তৃতীয়টা আছে এখনও, একশ কুড়ি দিন উপস্থিত থাকার ব্যাপারটা। মনে মনে ভাবছি গুড় তৈরি হয়ে গেলে বাবা কথা দিয়েছে আমায় স্কুলে যেতে দেবে, বাধা দেবে না।

গুড় জ্বালা দেবার আগের তোড়জোড়, তারপর গুড় বানানো তারও পরে সে গুড় বেচা এ করতে করতে আমার দিন পনের স্কুল কামাই হয়ে গেল। এগুলো বাড়ির মেয়েদের বা বাচ্ছাদের দিয়ে হবার নয়। তাই আমাকে বাধ্য হয়ে এসব কাজ করতে হত। রাগ করে লাভ কি? তাহলে তো পুরো সংসারটাই ভেসে যাবে। তাই আমি সবই চুপ করে সয়ে গিয়ে স্কুল কামাই করতুম। মন ছটফট করত, রাতে মধুর বাড়ি গিয়ে পড়া বুঝে আসতুম। ওর খাতায় চোখ বুলিয়ে পড়া অনেকটাই হয়ে যেত। আর স্কুলেও যে পড়া অনেকটাই এগিয়ে গেছে ওর খাতা থেকে সেটাও বুঝতে পারলুম।

গুড় করা হয়ে গেলে বাবা বললে, "এবারে বীজ রুইতে হবে। জমিতে লাঙল দিয়ে বীজের গাছগুলো জমিতে সারি সারি করে লাগিয়ে দিয়ে তোর ছুটি।"

কথা শুনে পিত্তি জ্বলে গেল— এতে তো আরও দিন দশেক নষ্ট হবে। গুড় বানানোর সময় বাবা কি একটা দিন মজুর রাখতে পারত না? ইচ্ছে করলেই পারত, কিন্তু তা তো করবে না। সব কাজ আমাকে দিয়েই করাবে যেন প্রতিজ্ঞা করেছে। আমিও রেগে গিয়ে স্কুলের সময় হলেই হাতের কাজ যেমন আছে তেমনি ফেলে রেখে স্কুলে চলে যেতুম। দু তিনদিন পর পর এভাবেই কাটল। চার দিনের দিন এভাবে বেরিয়ে পড়েছি বাবা পেছন থেকে আমাকে থামতে বলে ছুটে আসছে। আমি তখন দৌড় লাগিয়েছি। স্কুলে যখন হাজির হলুম তখন প্রায় দুটো বাজে। ইতিহাসের ক্লাস, মাস্টারমশায় ইতিহাস পড়াচ্ছেন। হঠাৎ বাবা সেখানে ধূমকেতুর মতো এসে হাজির, সঙ্গে আমাদেরই গলির একটি ছেলে, অনেক দিন আগেই স্কুল ছেড়েছে সে। ক্লাসগুলো কোথায় হয় সেটা দেখাবার জন্যই বোধহয় সে সঙ্গে এসেছে। সে বেচাবা বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল।

"আমার ছেলে এসেছে?"

"কে?"

"আমি রত্নাপ্পা যকাতে, ছেলের নাম আনন্দা।" দরজায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবা বলে যাচ্ছে। বাবার গলা কানে আসামাত্র আমার হাত পা বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

"এই তো এখানে বসেছে।"

"ওকে একটু দরকার আছে, বাড়ি নিয়ে যেতে হবে," খুব ঠাণ্ডা গলায় বাবা চলে গেল। মাস্টারমশায় কিছু বুঝতে পারছেন না, তাকিয়ে বললেন 'যা'। মাস্টারমশাই বা আমি কেউই কোন কিছু ভাববার সময়ই পেলুম না, বাবা সেসময় আমাদের দেয় নি। আমি বুঝলুম স্কুলের ভেতর একটা তামাসা করে লাভ নেই। এক হাতে স্কুলের ব্যাগটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলুম। অন্য হাতটার কব্জি খুব শক্ত করে ধরে বাবা হেঁটে চলেছে, বলছে, "চল বাড়ি, কাজ আছে।" বলার ধরন দেখেই বুঝতে পারলুম বাড়িতে অভ্যর্থনাটা কিরকম হবে। শীতের দিনেও আমি ঘামছি তখন। কিন্তু না ছিল কিছু বলার, না ছিল করার। চুপ করে বাবার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি হাঁটছি। তাড়াতাড়ি এজন্যে যে, রাস্তার লোক যেন বুঝতে না পারে বাবা আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাকে এভাবে হাঁটতে দেখে বাবা হাতের মুঠি একটু ঢিলে করে দিলে। রামমন্দিরের চৌরাস্তার কাছে ততক্ষণে এসে গেছি, রাস্তা ফাঁকা, দুপুরে রোদে খাঁ খাঁ করছে। হঠাৎ কি মনে হলো কে জানে, বাবার হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে স্কুলের ব্যাগটা ফেলে দিয়েছে দৌড়। যখন দৌড়ুচ্ছি তখন পিঠে হঠাৎ কি যেন একটা পড়ল আর চোখের সামনে লাল কি যেন দেখলুম, কানের ভেতর ভোঁ ভোঁ করছে। বেশিদূর এভাবে যেতে পারি নি, পাঁচ-সাত পা ফেলেই মাথা ঘুরে মাটিতে পড়ে গেলুম। ততক্ষণে বাবা আমাকে ধরে ফেলেছে আর পায়ের চটি খুলে আমার মুখে আর গায়ে পেটাতে শুরু করে দিয়েছে। আমি সামনে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না। বাবা হয়ত ভেবেছে আমি হড়কে পড়ে গেছি তাই ওর কব্জায় এসে গেছি। যাক গে, বাবা

যেমন মেরে যায় তেমন মেরেই যাচ্ছে, রোজই যা করে, বুঝতেই পাচ্ছে না যে আমি মাটিতে পড়েই আছে উঠতে পারছি না।

পথে যারা কাজে যাচ্ছিল তাদের অনেকেই আমি কেবল মারই খেয়ে যাচ্ছি দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, বাবাকে জিজ্ঞেস করলে, "ওকে মারছ কেন, ও কে?"

হঠাৎ এভাবে লোকগুলো এসে বাবাকে প্রশ্ন করায় বাবা একটু হকচকিয়ে গিয়ে জবাব দিলে, "আমারই ছেলে বাবু, মোটে কথা শুনতে চায় না।"

"ঠিক আছে, কাল সকালে থানায় এস" সেই বাবু বাবাকে বললেন। তার সামনে যে পাহারাদার যাচ্ছিল তাকে বলে গেলেন, "কাল একে থানায় হাজির করো। ওকে ভাল করে চিনে রাখ।"

আমার চারধারে তখন বেশ ভীড় জমেছে। স্কুলেও তখন হাফ ছুটি হয়েছে। পুলের ওপারে যে ছেলের দল যাবে তারাও আমার চারধারে ভীড় করে ফেললে। মাথাটা একটু ঠিক হতেই আমি ব্যাগটা তুলে আবার বাড়ির দিকে হাঁটা দিলুম। আমার পিছু পিছু বাবা, আর তারও পিছু পিছু আমাদের গলির সেই ছেলেটি।

পর দিন বাবা পঞ্চায়েতের কাচারীতে গিয়েছিল কিনা জানি না। এদিকে স্কুলে পড়তে আসার জন্যে বাবা যে চৌরাস্তার মোড়ে আমাকে মেরেছে সে খবর সারা স্কুলে ছড়িয়ে গেল। সব মাস্টারমশাইদের কানেও সেটা গেল। আট-দশ দিনের ভেতর আমাদের গলির সনগর মাস্টারমশায় বাবার সঙ্গে কথা বলে গেলেন। মানে মাস্টারমশাই বাবাকে সেই ছোটবেলা থেকেই চেনেন। বাজারে বাবার সঙ্গে মাস্টারমশাইর দেখা। নাইক মাস্টারমশাইর সঙ্গেও দেখা হল গাঁয়ের বড় ডাক্তার বাবুরাও ঘাটগের ডাক্তারখানায়। তিনিও বাবাকে এ ব্যাপারে কথা বললেন। সৌন্দলেকর মাস্টারমশাই তো আমাদের বাড়িতেই চলে এলেন। সবার মুখে একই কথা, ছেলেটা বুদ্ধিমান, এতদিনই কষ্ট করে যখন ওকে পড়িয়েছ এখন আর দুতিন মাস পড়ালে কি ক্ষতিটা হবে? ক্লাস সেভেনের পরীক্ষা পাশ করলে কোথাও চাকরি একটা পেয়েই যাবে, তখন তো ও তোমাকে বসে বসেই খাওয়াবে। তাহলে ওর পেছনে লেগেছ কেন এরকম ভাবে? পরীক্ষা তো এসে গেল, এখন নিয়ম করে স্কুলে ছেলেকে পাঠিয়ে দিও। পরীক্ষার শেষে তো আবার সেই ছুটি তখন তো বাড়ির কাজ করতেই পারবে। দত্তাজীরাও দেশাই-এর কাছে মা আর আমি আবার গিয়ে সব কথা বললুম। বাবা অবশ্য বামুনদের এ জমিটা নেবার পর থেকে এ বাড়িতে তেমন একটা আসে না, তাছাড়া ওঁরাও এখন কাগল থেকে উঠে গিয়ে বেশির ভাগ সময় কোলহাপুরেই থাকেন। কেবল দত্তাজীরাও কখনো-সখনো কাগলে আসেন। তাই বাবার সাথে দত্তাজীরাওয়ের দেখা-সাক্ষাৎ হবেই তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

যাহোক, এতগুলো লোকের কাছ থেকে একই কথা শুনে কাজ কিন্তু ঠিকই হল। বাবা বার্ষিক পরীক্ষার আগে আমাকে নিয়মিত স্কুলে যেতে দিত, দুমাস ঠিক মতোই স্কুলে যেতে পারলুম। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই আমি বলদ ধরে কুয়ো থেকে জল টানার কাজে লেগে যেতুম। জল গড়িয়ে গড়িয়ে আখের খেতে যাচ্ছে দেখতে পেলে বলদের নাকের দড়িটা আমি বাবার হাতে ধরিয়ে দিয়ে চলে যেতুম

কুয়োর দিকে। জলের কাজ শেষ হলে সোজা স্কুলের পথে হাঁটা দিতুম।

দেখতে দেখতে স্কুলের প্রতিষ্ঠাদিবস চলে এল। এবার বিশেষ বছর পড়েছে, একটা মিলন অনুষ্ঠান হবে, তাতে ক্লাস ফাইভ থেকে সেভেনের ছাত্রদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আমি গান, কমিক, অভিনয়, বীরপুরুষদের জয়গাথা, পোয়ারা, সবেতেই পার্ট নিয়েছি। সবার ভেতর আমারও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। আমার গলা ভাল, অভিনয় ভাল করতে পারি, পার্ট মনে রাখার ক্ষমতা আছে, সেজন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বড় বড় অংশগুলোর ভার পড়ল আমারই ওপর।

অনুষ্ঠান এত ভাল হয়েছিল যে শিক্ষাবিভাগের যে বড় কর্তা এখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে পিঠ চাপড়ে প্রশংসা করলেন। নাইক মাস্টারমশায় আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় যা বললেন তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তিনি বললেন, "ছেলেটি বুদ্ধিমান, তবে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। পড়াশুনা চালাতে গিয়ে ওকে অনেক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, যার অনেকটাই আমাদের চোখে দেখা বা কানে শোনার বাইরেই থেকে যায়।" এ শুনে তিনি আরও উৎসাহ দিলেন, বললেন, "আরও অনেক পড়বে, অনেক জানবে।" তাঁরও কথাতে আমি নতুন করে শক্তি ও সাহস পেলুম।

অঙ্ক আর জ্যামিতিতে যারা কাঁচা ছিল তারা নাইক মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ত। তিনি নামমাত্র পারিশ্রমিক নিতেন। নিজের বাড়ির কাছেই একটা খালি ঘরে তিনি পড়াতেন, ছেলেরা অনেক সময় রাতে ওখানেই শুয়ে কাটিয়ে দিত। ভোরে উনি ওদের পড়া ধরতেন। নাইক মাস্টারমশায় আমাকে সেখানে পড়তে যেতে বললেন। আমি পয়সা দিতে পারব না বললুম। উনি বললেন, "আমি কি তোর কাছে চেয়েছি? সময় পেলে চলে আসবি, ছেলেদের সঙ্গে বসে অঙ্ক করবি।" ফর্ম জমা দেবার দিন অবধি দেখা গেল মাত্র নিরানব্বই দিন ক্লাস করেছি, একশ দিনও ক্লাস করতে পারি নি, আর একশ কুড়ি দিন থেকে আমার হাজিরা একুশ দিন কম। তা সত্ত্বেও মাস্টারমশাই আমাকে ফর্ম দিলেন, বাবাকে না জানিয়ে মা পরীক্ষার ফি আমায় দিল আর সে ফর্ম ও ফি জমাও পড়ে গেল। মাস্টারমশাই আমায় বললেন, "হাজিরা কম হয়েছে, সে কথা কাউকে বলিস না।" দুটি ছেলে আমার চেয়ে বেশি দিন হাজির থেকেও ফর্ম পায় নি। মাস্টারমশাই-এর আমার ওপর অনেক আশা ছিল।

ক্লাস সেভেনের পরীক্ষা তো দিলুম। মনে আছে পরীক্ষার চারটে দিন খুব ভাল কেটেছিল। সেই ভোর থেকে বেলা দশটা অবধি টানা পড়ে গেছি, বলতে গেলে জীবনে এই প্রথম তিন চার দিন একটানা পড়ার সুযোগ পেলুম। অর্থাৎ পড়া, খালি পড়া আর কোনো কাজ নয়। অনেক দিন উপোসী থেকে হঠাৎ পেট ভরে খেতে পেলে যেমন হয় আমার অবস্থা যেন অনেকটা তেমনি। পরীক্ষা হয়ে গেলে একচোট লম্বা ঘুম লাগালুম। সকালে মধু সনগর আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙালে। পরীক্ষা দিয়ে কাগলে ফেরার দিন মনটা খারাপ হয়ে গেল, কেবলি মনে হচ্ছিল পড়ার পর্বের এখানেই ইতি, এবারে চাকরি করার পালা।

কাগলে ফিরে এসে আবার মাঠের কাজে লেগে গেলুম। এদিকে পরীক্ষার রেজাল্টের

জন্যও ছটফট করছি, এমনিতে তো পাশ করা নিয়ে কোনো ভয় ছিল না, ভয়টা ঢুকে গেল সনগর মাস্টারমশাইর কথাগুলো মনে করে। সেটাই বলব এখন।

যতগুলো পেপার ছিল তার উত্তর কিন্তু আমি খুব তাড়াতাড়ি লিখে শেষ করেছিলুম। কোথাও কোনো আটকায় নি। আমার কাছে সব খুব সহজ লেগেছিল। অঙ্কের পেপার তো আমার দুঘন্টাতেই হয়ে গেল, পেপার কিন্তু তিনঘন্টার। দেখে-টেখে মনে হল না যে আর কিছু করার আছে। মা যে মোয়া সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিল, বলে দিয়েছিল "দুটো পরীক্ষার মাঝখানে দুটি খেয়ে জল খেয়ে নিস" সেই নতুন কড়াপাকের গুড় দিয়ে তৈরি মুড়ির মোয়ার একটি পরীক্ষার হলে আমি নিয়ে গিয়েছিলুম। সে মোয়ার কথা মনে পড়ে গেল, আমি আর দেরী না কবে খাতাটা সুপারভাইজারের কাছে জমা দিয়ে বেরিয়ে এলুম।

ভদ্রলোক খাতাটি পেয়ে একবাব আমার দিকে তাকালেন, আমি তাড়াতাড়ি খাতাটা টেব্‌ল্-এ রেখে থলে হাতে বেরিয়ে এলুম। খিদে পেয়েছিল, মোয়ার কথা হলে থাকতেই মনে পড়ছিল। একটা গাছের তলায় বসে মোয়া খেতে লেগে গেলুম। এদিকে সনগর মাস্টারমশাই দুপুরের খাবার নিয়ে কাগল থেকে এসেছেন, তাঁব চোখ পড়ল আমার ওপর। কার কেমন পরীক্ষা হল সে খোঁজ নিচ্ছিলেন, আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "তুই বাইরে কেন?"

"হয়ে গেছে।"

"হয়ে গেছে তো কি হয়েছে? সময় শেষ না হওয়া অবধি সিটেই বসে থেকে খাতাটা ভাল করে দেখে নিতে হয়।"

"দেখে নিয়েছি।"

"দেখা হয়ে গেলেও, আবার দেখবে, বাব বার দেখবে। দেখতে দেখতে কোনো ভুলটুক হয়ে থাকলে চোখে পড়ে যাবে। বোকা কোথাকার।" আমি চুপ করে রইলুম। "আর কখখনো এরকম করবি না। অঙ্কের পেপারে কেউ এরকম করে?" মাস্টারমশাই আরেকবার ধমকালেন।

আমার প্রথম পরীক্ষার দিনও পনের মিনিট আগেই লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। যা লিখেছি ঠিকই লিখেছি এ বিশ্বাস নিজের ওপর আমার ছিলই। সনগর মাস্টারমশাই-এর বকুনি খেয়ে মনের ভেতর ভয় ঢুকে গেল। কেবলি মনে হল তিনটি পরীক্ষাতেই হয়তো ফেল করে যাব।

পরীক্ষার পরের দিনগুলো দুশ্চিন্তায় কাটছে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি পরীক্ষার ফল বেরুল কোলহাপুরের "পুঢ়ারী" (নেতা) কাগজে। আমাদের তালুকে আমি ফার্স্ট হয়েছি, বসন্ত পাটিল হয়েছে সেকেণ্ড। আমার খুবই আনন্দ হল, মনে হল আমি জিতে গেছি। খবরের কাগজে আমাদের নাম ছেপে দিয়েছে। এই প্রথম ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখলুম। কাগজে নাম ছাপলে দেখতে কেমন লাগে তার জন্যে তিন চার দিন শুধু ছাপানো নামটাই দেখতে লাগলুম। ভাবছি, সব ক'টা কাগজে তিন নম্বর পাতায় আমার নাম ছেপেছে আর সবাই তা দেখছে। ভেবেও কি আনন্দ! মাকে সব বলে খবরের কাগজটা দেখালুম। মনে আছে, যেদিন পরীক্ষার রেজাল্ট

বেরোয় সেদিন আমি বাড়িতেই ছিলুম। মাকে বলেছিলুম, "মধু সনগর সবাইকে পেড়া খাওয়াচ্ছে, আমিও খাওয়াব, পয়সা দাও।" মা বলেছিল, "অত পয়সা আমি কোথায় পাব? মাস্টারমশাইদের, গলির জানাশোনা পড়শিদের পেড়া খাওয়াতে গেলে এক হাঁড়ি ভরতি পেড়া চাই। এই চার আনা পয়সা দিলুম, আঙুল দিয়ে গুঁড়ো করে আমাদের এখানকার দেবতার মন্দিরে এক চিমটি এক চিমটি করে রাখ গিয়ে। যা বাকি থাকবে, বাড়িতে এসে ভাইবোনদের হাতে একটু দিস। তাহলেই হবে।"

সন্ধে হতে না হতেই আমি হাত পা ধুয়ে ধোয়া কাপড় পরে মার দেয়া চার আনা পয়সা নিয়ে বাজারে গেলুম। অনেক রাত অবধি গৈবির মোড়ে মিষ্টির দোকান বসত। যারা দেবদর্শনে আসে তারা এখান থেকে পেড়া, ধূপ ধুনো নিয়ে ভেতরে ঢোকে। এখানে চিনির পেড়াই পাওয়া যায়। দেখতে হাতের মুঠির মতো বড়। আমি চার আনার পেড়া কিনে ভেতরে ঢুকে ঠাকুরকে পেন্নাম করে আধখানা পেড়া গৈরিব সামনে যেখানটায় ধূপ জ্বলছিল সেখানে রাখলুম। ওখানকার মুজারর চোখে বড় বড় করে আমার দিকে তাকালে। ধূপ মিষ্টি এসব আগে ওর হাতেই দিতে হয়, সেই দেবতাকে দেয়। ওটাই নিয়ম কিনা, ঐরকমই চলে আসছে। ধূপ ঠাকুরের সামনে দিতে দিতে ও বিড় বিড় করে কি যেন আওড়ায় আর পুণ্যার্থীর মাথায় একটু ধুলোর ভস্ম লাগায়। আমি তো আর এসব করি নি। যা কিনেছি তার আদ্ধেকটাই ঠাকুরকে দিয়ে দিলে আমার চলবে কেন? তাই তো আমি মোটে আধখানা পেড়াই ভেঙে ঠাকুরকে দিয়ে নিজেই নিজের কপালে ধূনোর ভস্ম ছোঁয়ালুম। মনের আনন্দে আমি লাফাতে লাফাতে গৈরির চারধারে প্রদক্ষিণ করে এলুম, তারপরেই চলে এলুম হনুমানের মন্দিরে। এবার অজান্তে পা আমাকে নিয়ে চলল রামমন্দিরের দিকে। আমাদের সেই পুরনো স্কুল। মন্দিরের বিশাল পাথরের চৌকাঠ এবার কিন্তু খুব সহজেই ডিঙোলুম। শ্বেত পাথরেব রামজীর মূর্তিটির সামনে আধখানা পেড়া রেখে ঘণ্টা বাজিয়ে দিলুম। এককালে যে ঘণ্টাতে আমার হাত যেত না আজ কিন্তু অতি সহজেই সে ঘণ্টা বাজানো গেল। ঘণ্টার মাঝখানটায় হাত দিয়ে ধরে থাকলুম। পুরনো দিনগুলোর কথা মনে হতেই চোখ ছলছল করে উঠল। আস্তে আস্তে তিন চার বার ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলুম। তার শব্দ সারা মন্দিরে ছড়িয়ে পড়ল। আমার চোখের সামনে যেন এসে হাজির হলেন ক্লাস ফাইভ-এর সাকেকার মাস্টারমশাই, সেই ছিপছিপে, রোগা চেহারা, গায়ে কালো ডোরাকাটা কোট আর চোখে মোটা চশমা— চালশে পড়া, একটু কুঁজো, সেই মাস্টারমশাইকে স্পষ্ট দেখতে পেলুম যেন অথচ মাস্টারমশাই তো আর বেঁচে নেই। মনটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে মন্দিরের বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর বিঠোবা রখুমাই আর হনুমান দর্শন করেই সোজা বাড়ি। পথে দুটো মিষ্টির গুলি আমি নিজেই মুখে পুরে দিলুম। মার কথায় একটা পেড়া বাবাকে দিয়ে পেন্নাম করলুম। বাবা খুশি হয়ে বললে, "ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। কাল মাস্টারমশায়কে খবরটা দিয়ে বলবি চাকরির কোনো খবর পেলে তোকে বলতে। চাকরি পেলে মাঠের কাজের জন্য একটা লোক রেখে দেয়া যাবে।"

"ঠিক আছে।" বুঝলুম চাকর রেখে বাবা এবার বিশ্রাম নেবে। পরদিন রাতের

খাওয়া একটু তাড়াতাড়ি সেরে নাইক মাস্টারমশায়ের বাড়ি গিয়ে স্কুলে চাকরির কথাটা পাড়লুম। মাস্টারমশাই বললেন, স্কুলে চাকরি করতে হলে কম করে আঠার বছর বয়স হওয়া চাই, আমার তখন মোটে পনের। আমাকে তাহলে তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। আমার মনটা দমে গেল, খুব ইচ্ছে ছিল স্কুলে পড়াব।

কিন্তু তিনটি বছর কিছু না করে থাকার অর্থই হচ্ছে আবার মাঠে গিয়ে কাদায় আর জলে পা ডোবানো। সেটা মনে হতেই মনটা খিচড়ে গেল। বাড়ি ফিরে দেখি বাবা সবে মাঠ থেকে ফিরেছে। নাইক মাস্টারমশায় যা বলেছেন বাবাকে সেটা বলতেই বাবা স্কুলের সব মাস্টারমশাইকে এক ধার থেকে গালাগাল দিতে শুরু করে দিল। "ছেলেকে পড়ালে সে চাকরি পাবে আগে এসব মিথ্যে কথা বলে এখন আর গা করছে না।" আমি মাঝের ঘরে বসেছিলুম, বাবা ভেতরের ঘরে খাচ্ছে। খেতে খেতেই বলে যাচ্ছে, "এই মাস্টাররা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে হারামজাদারা এই ছেলেটিকে স্কুলের নেশা ধরিয়ে দিয়ে এদিকে আমার জমির কাজের বারটা বাজিয়ে দিলে।"

"তোমার খেতে লোকসান করিয়ে ও বেচারীদের কি লাভ? ওদের মিছিমিছি গালাগাল দিচ্ছ কেন? ছেলেটার বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে দেখেই তো ওরা পড়াতে বলেছে। এতে ওদের দোষটা কি?"

"তুই চুপ কর হারামজাদী!" বাবা এবারে মুখ খারাপ করতে শুরু করে দিলে, "তুই এসবের বুঝিসটা কি? স্কুলে নাকি অনেক জায়গায় আন্দ্যার আঁকা ছবি দেয়ালে ঝুলিয়েছে। সনগর মাস্টার বলছিল। তুই ভাবছিস এতে আন্দ্যার খুব নাম হচ্ছে। আমি কিন্তু ওদের আসল মতলবটা ধরে ফেলেছি।"

"আসল মতলব আবার কি?"

"সেটা বুঝলি না? ছেলেদের পড়াতে গেলে তো ছবি লাগে। আন্দ্যা সেগুলো এঁকে দিয়েছে বিনি পয়সায়। ছেলেটো নিজের গাঁট থেকে রঙ্ কাগজ কিনে হাতের কাজ ফেলে রেখে দিয়ে মাস্টারকে ছবি এঁকে দেয়। এসব ছবি দেখে মাস্টারের ওপরওয়ালা মাস্টারের সুখ্যাত করে, বছর বছর মাইনেও বাড়ায়। ছেলেরা যারা বুদ্ধিমান, ভাল করে পড়ে নিজে নিজেই ভালভাবে পাশ করে যায়। কিন্তু বাহবাটা পায় তো সেই মাস্টারই, এরকম পরীক্ষার ফল হলে মাস্টারের মাইনে বাড়ে কি বাড়ে না, বল? আসল মতলবটা হল এই। মাস্টার ছেলেটাকে জমির কাজ থেকে তুলে এনে ওরই সর্বনাশ করলে, আমাদেরও সর্বনাশ হল।" মাকে খুব পণ্ডিতের মতো বাবা এই 'আসল মতলব'টা বোঝালে।

শুনে আমি তো অবাক হয়ে ভাবলুম এসব বুদ্ধি বাবার মাথায় এল কি করে? অবশ্য এখন বাবাকে বুঝিয়ে লাভও নেই, বুঝতেও চাইবে না। তাই আমি চুপ করেই রইলুম।

আমি তখন অন্য কথা ভাবছি। চাকরি ছাড়া তিন তিনটি বছর কাটবে কেমন করে? বয়স তো আর বাড়ানো যাবে না, স্কুলের রেকর্ডে যে তারিখ দেয়া আছে তা তো আর বদলাবার নয়। কোনো কিছু কূলকিনারা করতে না পেরে মনমরা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লুম। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে আমার কপালে আবার সেই জল,

মাটি, কাদাই ঘুরে ফিরে ফিরে এল। সেখানেই ভাইবোনদের সাথে আরো তিনটি বছর পচে মরতে হবে। তারপরেও যে এ থেকে মুক্তি পাব কিনা তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাবা হয়তো বলবে, "গতরে খাটৃ, ক্ষেতে খামারে কাজ করলে কেউ না খেয়ে মরে না, বুঝলি? অন্য ছেলেদের মতো চাকরি খুঁজে বেড়াতে হবে, এমন কোনো কথা আছে?"

দু চোখের পাতা এক করা দায় হল। গরমও পড়েছে প্রচণ্ড। গায়ে চাদর রাখা যাচ্ছে না। আকাশে চাঁদ উঠতেই মা আর আমি বিছানায় উঠে বসলুম। একধারে ছ'টা ভাই বোন গাঢ় ঘুমে। তাদের নীচে একটাই সতরঞ্চি, বস্তা খুলে জুড়ে জুড়ে সেলাই করা হয়েছে। বোনগুলোর মুখে চুল এসে পড়েছে এলোমেলো। শিবার ফোলা ফোলা গালে লালা গড়িয়ে পড়ে সেখানেই শুকিয়ে গেছে। লক্ষ্মী সরতে সরতে চলে এসেছে একেবারে পায়ের দিকে। তার গায়ে পা দিয়ে শুয়ে হীরা। সবার গায়েই কালকের সারাদিনের কাজের পর ময়লা, ঘামে ভেজা ছেঁড়া জামা-প্যান্ট। একবার গায়ে চড়ালে সে জামা খুলবে তিনদিন পর সেই চান যখন করবে। বাড়িতে অন্য কোনো কাজ এসে গেল তো, ব্যস, তিনদিনে একবাব চান সেটাও হয়ে উঠত না। এই ভাইবোনদের দেখে আমার কান্না পেয়ে গেল। আমিও তো এবারে এদেরই একজন হয়ে মরব তিলে তিলে। চাকরি পেলে বিছানায় পেতে শোবার একটা সতরঞ্চি এদের জন্য হয়তো কিনতে পাবতুম। তাহলে এদের গায়ে মেঝেটা অন্তত লাগত না, মেঝের ঠাণ্ডায় ওদের গা হাত পা ঠাণ্ডা হত না। মাইনের টাকায় বছরে একবার অন্ততঃ ওদের জামা প্যান্ট করে দিতে পারতুম। আমার কপালে কি এত সুখ লেখা আছে?

পায়খানা থেকে এসে মা চা করলে। আজ হাট বসবে। দিন ফর্সা হবার আগেই মাঠে যেতে হবে আনাজপাতি তুলতে। ভাইবোনদের মা ঘুম থেকে উঠিয়ে দিলে। সকলে মুখ ধুয়ে চা খেয়ে নিয়ে যে যার কাজে লেগে গেল। ঘরদোরে ঝাড়ু পড়ে গেল, গোবর দিয়ে নিকোনোও হয়ে গেল। ভাইবোনেরা সব ছাগল গোরু মোষ চরাতে মাঠের দিকে এগিয়ে গেল, আমিও চললুম তাদের সাথে সাথে। মা আর ধোণ্ডু বাড়িতেই রয়ে গেল। তাড়ার সময় কাজে লাগবে সে ভেবেই মা ওকে রেখে দিয়েছে সঙ্গে। চটপট করে দুজনে মিলে হয়তো সেরখানেক গম নয়তো বজরা যাঁতায় বসে পিষে ফেলেছে। হয়তো বা এরই মধ্যে দুধ দিয়ে এসেছে বাড়ি বাড়ি। ধোণ্ডু হয়ত উনুন লেপে ফেলেছে, চাটু সেজে রেখেছে। মা ফিরে হয়তো চটপট ভাখরি সেঁকতে লেগে গেছে চাটুতে। এদিকে ধোণ্ডু এতক্ষণে বোধহয় ঢেঁড়স কেটে নুন আর ঝাল মেখে সেটা ভেজেও রেখেছে। তাই তো দুজনেই দিন ফর্সা হতে না হতেই জলখাবাবের সময় ভাখরি আর ঢেঁড়স ভাজা নিয়ে চলে এসেছে মাঠে। বাবা আর ভাইবোনেরা মাঠে গেছে ঝুড়ি নিয়ে। আমিও গোবর নিয়ে তাদের পিছু পিছু গেলুম। ভাইবোনগুলো সব্জী তুলে গোছ করে রাখছে। হীরা খেতের ধারে বসে তড়বড় করে কলাপাতা কেটে ধনে পাতার আঁটি বাঁধছে। খেতের নালার জলের মধ্যে চার বছরের লক্ষ্মী বসে বসে ধনেপাতার শেকড়ের কাদা ধুয়ে পরিষ্কার করছে। একবছরের আপ্পা খেতের ধার দিয়ে এদিক-ওদিক হামাগুড়ি দিয়ে খেলছে। বাবার সাথে আমি, শিবা আর সুন্দরা

খেতের সব্জি ঢেঁড়স, ঝিঙে গাছের গোড়া খুঁড়ে যাচ্ছি। ধোণ্ডুর সাথে মা এসে খেতের একপাশে ভাখরির ঝুড়িটা রাখলে। সবাই এই দেখে যে যেখানে ছিল ছুটে এসে জলে হাত ধুয়ে ঢেঁড়স আর ভাখরি নিমেষে শেষ করে ফেললে। নালার ওপরের দিকের পরিষ্কার জল ঢাকনায় তুলে নিয়ে ভাইবোনেরা সে জল খেলে। সব্জিপাতি ধুয়ে পরিষ্কার করে সকালের কাঁচা রোদে ঝুড়িতে পোরা হল। বোঝাটাও যে বইবে সে অনুযায়ীই বাঁধা হল। ভাইবোনদের সাথে মা গেল হাটে তরিতরকারি নিয়ে। বাবা আর আমি কুয়োতে যা জল ছিল সবটাই তুলে জমিতে বার করে দিলুম। জল কিছুটা যাবার পর দেখি ভাইবোনেবা সবজি বাজারে রেখে মাঠে ফিরে এসেছে। মা-ই ওদের পাঠিয়ে দিয়েছে। ধোণ্ডু বাড়িতেই রয়ে গেছে, দুপরে খাবার জন্য ভাখরি সেঁকে তো ওকেই রাখতে হবে। জমিতে জল ছেড়ে ভাইবোনেদের নিয়ে আমি গেলুম আখের খেতে ক'টা আখের পাতা তুলে আনতে। 'তোরা এগো, আমি তামাক খেয়ে এই এলুম বলে,' বাবা বললে। বুঝলুম বাবা টালবাহানা করছে। আখের দিকে তখন আমরাই এগিয়ে গেলুম, বাবা আর আসবে না বুঝেই নিলুম। অবশ্য বাবা সঙ্গে না থাকলে আমরা খুব ভালই থাকতুম। বাবা থাকলে আমাদের কথা তো বলতে দেবেই না, যে কোনো ছুতোছাতায় দোষ খুঁজে বেড়াবে, গাল দেবে। আমরা মন খুলে গল্প করতে পারি না। এখন নিজের মনে গল্প করতে কবতে আখের পাতা ছিঁড়তে লাগলুম। যার যা মজার গল্প জানা আছে বলতে লাগল, আমাদের সময় কেটে যাচ্ছিল ভালই।

দুপুরের খাবার নিয়ে ধোণ্ডু চলে এল, তাকিয়ে দেখি সূয্যি তখন মাথার ওপরে উঠে গেছে। ততক্ষণে আমরা প্রত্যেকেই দুতিনটে করে পাতা তুলে ফেলেছি। আমরা সবাই ছাউনির তলায় চলে এলুম। গোরুমোষেদের সামনে আখের পাতা একটু একটু করে বিছিয়ে দেয়া হল, বলদদের একটু বেশি দিলুম। বাবা এরই মধ্যে খাবার ঝুড়ির কাছে বসে গেছে হাতে ভাখরি নিয়ে শুকনো তরকারি খেয়ে যাচ্ছে। খেতে খেতে ধোণ্ডুকে জিজ্ঞেস করলে, "সবজি বেচা হল?"

"এখনও বেচা শেষ হয় নি, এবারে শেষ করে মা খেতে চলে আসবে।"

মার জন্যে একধারে ভাখরি রেখে ধোণ্ডু হাটে চলে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা সবাই আমগাছের ছায়ার তলায় বসলুম গিয়ে এ সময়টাই যা একটু জিরিয়ে নেবার সময়। ঘরে বসে এখন আর গল্প করা চলবে না, বাবার ঘুমের সময় এটা, আমাদের কথা কানে গেলে হয়েছে আর কি। তাই চুপচাপ ঐ ছায়াতে বসে মার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলুম। চারপাশে রোদ বড় কড়া, গরম হাওয়া আখের গাছের পাতাগুলোকে ঝলসে দিচ্ছে, যতটুকু দরকার সে জলটুকু না পেয়ে পেয়ে আখগুলো শিটকে গেছে। আসলে এ সময় আখের গাছ থেকে পাতা না তোলাই ভাল, কিন্তু গোরু মোষের খাবারের তো অভাব তাই বাধ্য হয়ে আমাদের পাতা তুলতেই হত। খড় তো প্রায় শেষ, কোনোমতে হয়তো আর এক মাস টেনেটুনে চলবে, তার বেশি নয়। একবার বৃষ্টি হয়ে গেলে আখের খেতে ঢুকে আর গাছ থেকে পাতা কাটা যাবে না, তখন মাঠে ভীষণ কাদা থাকবে। তাজা পাতা তখন আর কোথায় পাব? তাই তো শুকনো পাতা, ঘাস এসব দিয়ে মাস দুই চালাতে হয়। বীজ রোয়ার সময়

পাতা কেটে আনার ফুরসৎই হত না কারো, সবাই তখন এত ব্যস্ত থাকত। তাই তো সময় থাকতে থাকতে আমরা আখের একদম গোড়া অবধি পাতা তুলে ফেলতুম। ফল হত এই, আখ যেত শুকিয়ে। শুকনো গাছের গোড়া, শেকড় এসব দু তিনবার করে বলদগুলোর সামনে দেয়া হত, যা খেত খেত। যেটুকু খেত না তা আবার ভাল করে গুছিয়ে জড়ো করে রেখে দেয়া হত। যা কড়া রোদ, রোদের তেজে গাছপালা শুকিয়ে ঝিমোচ্ছে যেন। জমির কালো মাটি গরমে তেতে পুড়ে সুজির দানার মতো হয়ে গেছে। আমাদের চোখের সামনেই এসব দেখতে পাচ্ছি, ছায়ায় বসে এসবই গল্প করে যাচ্ছি। একসময় মা হাট থেকে ফিরে এল, মাকে দেখে আমরা সবাই একটু নড়েচড়ে বসলুম। সবার জিভে জল, মা নিশ্চয়ই হাটে খাবার কিনেছে, কি এনেছে? আমরা নিজেরা এ নিয়ে বলাবলি করছি, সুন্দরা আর লক্ষ্মী এক্কা দোক্কা খেলছিল, খেলা ফেলে দৌড়ে চলে এল। হীরা বসেছিল গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে—একাই। সেও আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। আপ্পা একটা বস্তার ওপর বসে আখের একটা ডাল নিয়ে খেলছিল। শিবা আর আমি কোনরকমে মাথায় বালিশ দিয়ে একটু শুয়েছিলুম, আমরাও উঠে বসলুম। আশেপাশের শান্ত ছায়াও যেন ঝিলমিল করে উঠল সেসময়। মা সোজা খেতের ধারে এসে ঝুড়ি থেকে পুঁটলি বার করে খুলে ফেলল। সবাই হেসে ফেললে। শিবা ওর প্যান্ট ঝাড়তে ঝাড়তে 'মা গো' বলে এগিয়ে এল। ধোণ্ডীর চোখ আগ্রহে গোরুর মতো বড় বড় হয়ে গেল। আপ্পাও হামাগুড়ি দিতে দিতে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়েছে। "দাঁড়া, সব্বাইকে দেব।" শিবা আব্দার করে বললে, "আমার কিন্তু দুটো।" মা কথা বলতে বলতে সবাইকে মোয়া দিচ্ছে। একটা বাড়তি ছিল মা সেটা বাবার জন্য রেখে দিলে। মা নিজে আধখানা খেয়ে বাকি আদ্ধেকটা আপ্পাকে দিয়ে দিলে। যেন কত মণ্ডা মিঠাই না খাচ্ছে এভাবে ভাইবোনেরা ঐ মোয়াই মহা আনন্দে হাত চেটে পুটে খেতে লাগল।

মা জিজ্ঞেস করলে, "আখের পাতা কেটেছিস?"

"না তো কি? পাতা কেটে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা সবে এই বসেছি মাত্র," শিবা মাকে জানায়।

"আর তোর বাবা?"

"বাবা? মাঠে জল দেবার পর ঘরে বসে বসে ডিম পাড়ছে," আমি হাসতে হাসতে বললুম।

সবাই একটা একটা করে মোয়া খেয়ে জল খেয়ে নিলুম। কিছুক্ষণ পরই মা আমাদের তাড়া লাগালে, "হয়েছে হয়েছে অনেক জিরোনো হয়েছে এবার তোরা ওঠ তো ঢের কাজ পড়ে আছে। শাক-সবজির খুব টান।"

"গরমের দিন, টান তো থাকবেই।"

"আখের এক বান্ডিল সন্ধেবেলায় বাজারে নিয়ে চল।"

"এই গরমকালে বলদগুলোর খাওয়াই ভাল করে জুটছে না। তাদের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে বাজারে বেচলে বাবা কিন্তু সত্যি এবারে জুতো পেটা করবে আমাদের," আমি মাকে সাবধান করে দিলুম।

"সে আমি দেখব'খন। বলদগুলোর খাবার কম কি আমি জানি না ভাবছিস? কিন্তু করব কি? এদিকে আমাদের দানাপানি কেনার পয়সাও তো নেই, সাত-আট আনার জোগাড় তো করি গিয়ে, একবেলার মতো সবার দুমুঠো যাহোক জুটবে।"

"মা, আখের গাছে এখন কি আর পাতা আছে?" আমি মাকে জিজ্ঞেস করলুম।

"খুঁজে পেতে দেখ গিয়ে যা আছে বার করতে হবে। তা না হলে পেট কেটে বাদ দিতে হবে। চল, চল, কাস্তে ধরবি চল। নষ্ট করবার মতো সময় নেই," মা উঠে পড়ল।

আমরা ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ লাগিয়ে দিলুম, "এখন নয়, এখন পারব না। আমরা এই তো এক্ষুণি আখের খেত হয়েই আসছি। মা গো, আখের জঙ্গলে গেলে দম বন্ধ হয়ে যায়, ঘাম ছুটতে থাকে।"

"আখের পাতা কাটতে গিয়ে ঘেমে গেছি, হাতের চামড়া চিড়বিড় করছে। হাত যেন কাঁটাগাছের মতো হয়েছে। আমি আর এখন যাচ্ছি না," হীরা সরু গলায় জানিয়ে দিলে। "ওরে, পাতা বেচে পয়সা পাব, সে পয়সায় মোয়া কিনব" মা সবার সামনে মন বুঝে ছড়া করে বলছে। লোভ দেখাচ্ছে। ছাগলের সামনে গাজর ধরে যেমন ছাগলকে লোভ দেখায়।

"কাজ নেই আমাদের মুখরোচক জিনিসে," দূর থেকে শিবা তখনও তার কথা বলেই যাচ্ছে পাথরের ওপর বসে।

সুন্দরা মিন মিন করে বলে উঠল, "এই খটখটে রোদে ঘরের বাইরে কেউ থাকে?"

"যা যা একটা করে আঁটি তুলবি এক-এক জনে, পাঁচজনে পাঁচটা আঁটি হলেই হবে। তোর বাবা আর আমি দুটো করে তুলব। লক্ষ্মী আর আপ্পা খেতের ধারে খেলবে'খন, চল, চল, আর দেরি করিস না," অনেক কষ্টে ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মা নিজের জামার হাতার ভাঁজ থেকে ক'টা পয়সা বার করে সবচেয়ে ছোট আর সবার চেয়ে বড় অর্থাৎ আপ্পা আর আমাকে বাদ দিয়ে প্রত্যেকের হাতে একটা করে পয়সা দিলে। ওরা এতেই খুশি, "একটা আঁটি পাতাই কাটব কিন্তু।"

মা-ও তাতেই রাজি। সবাই উঠে গিয়ে ঘরে গিয়ে কাস্তে হাতে বেরিয়ে এলুম। আখের খেতে জল তেষ্টা পাবে তাই সবাই কুঁজোর জল গড়িয়ে খেয়ে নিলে। এদিকে আমাদের এই চেঁচামেচিতে বাবার ঘুম গেল ভেঙে। বাবা চোখ মেলেছে দেখে মা জিজ্ঞেস করলে, "কি, হল জিরোনো?"

"হ্যাঁ," বাবা একটু নীচু গলাতেই জবাবটা দিলে।

"এই নাও, মোয়া খাও," মা একটা মোয়া বাবাকে দিলে।

বাবা তড়াং করে উঠে পড়ে মুখ ধুয়ে মোয়া খেতে খেতে বললে, "মোয়া আনলে কেন? এতে কি আর পেট ভরে? তার চেয়ে এ পয়সা দিয়ে জোয়ার বা চাল কিনলে কাজে দিত। সবার পেট ভরত।" বাবার সবসময়ই ঐ এক কথা, এক বুলি।

"ছেলেমেয়েদের জন্য এনেছিলুম" বলেই মা চুপ করে গেল।

"সবজি বেচে কত পেলে?" আঙুল চাটতে চাটতে বাবা জিজ্ঞেস করল।

"ছ' টাকা।"

"বেশ হয়েছে, অনেক হয়েছে।"

"গরমের দিন, জায়গায় জায়গায় কুয়োর জল শুকিয়ে যাচ্ছে। মাঠে আখ আগলে বসে আছে চাষীরা। হাটে-বাজারে শাক-সবজি আর আসবে কোত্থেকে?" মা বলে।

"তা বটে। বাজার করেছ?" বাবা জিজ্ঞেস করলে।

"করেছি। তিন টাকার জোয়ার, দু টাকার চাল আর তেল নুন কিনেছি বাকি বার আনা দিয়ে।"

"তা হলে চার আনা বেঁচেছে তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"ভালই হয়েছে। খেয়ে পরেও যদি একটু পয়সা বেঁচে যায় তাহলে মনটা খুশি হয়," বাবা চার আনা বেঁচেছে বলে খুশি হয়ে গেছে। জল খেয়ে উনুনের আঁচের সামনে বসল গিয়ে।

"ওঠ, ছেলেমেয়েদের সাথে সাথে দু আঁটি পাতা তুলে আনি চল,' মা বাবাকে তাড়া লাগায়।

"ছেলেমেয়েরা পাতা তুলেছে তো একটু আগেই," বাইরের কড়া রোদের দিকে তাকিয়ে বাবা জবাব দিলে।

"চল, আরো দুটো করে আঁটি না আনলেই নয়। ঘরে মোটে চার আনা পয়সা আছে। শুনে এলুম কন্ট্রোলে নাকি চিনি এসেছে। চিনিটা ধরে বাজারে বেঁচে দিলে দুচার আনা ঘরে আসবে। আখের পাতা হাটে নিয়ে যেতেই হবে, চল ওঠ।"

"আচ্ছা, আমি হুঁকোয় দুটো টান দিয়েই আসছি। তুমি এগোও।"

"চল, চল," এবারে মা আমাদের তাড়া দিয়ে উঠে পড়ল, আমরাও মার সাথে সাথে উঠে পড়লুম।

কড়া সূয্যির তাত মাথায় নিয়েই আমরা আখের খেতে ঢুকে পড়লুম আর ঝপাঝপ পাতা কাটতে লেগে গেলুম। ঘামে সারা গা লেগে গেছি, ঐ ঘাম মুছতে মুছতেই হাত আমাদের চলছে সমানে। ঘামাচিতে গা চিড়বিড় করছে, রোদের তাতে মাটি ফুটিফাটা। আমাদের কিন্তু তাতে কোনো পরোয়া নেই, উৎসাহে খুবই মেতে উঠেছি। মা আমাদের সাথে কাজ করে হাত লাগিয়ে আমাদের খুব উৎসাহ দিচ্ছে, খুব চাঙা করে তুলছে। মাকে দেখে মনে হবে সন্তানদের কাঁধে ভর দিয়ে মা তার ঘরকন্না সুষ্ঠুভাবে চালাবার কি আপ্রাণ চেষ্টাই না করছে! বাবা কিন্তু ঘরে বসে হুঁকোতে তামাক খেয়েই যাচ্ছে, নড়ার নামগন্ধও নেই, যেন পাথরের মূর্তি।

আমার মনে হল, মার কথা ভেবেই এ জমির কাজ আমাকে চালিয়ে যেতে হবে। আমরা মায়ের ছেলেমেয়েরা মাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি, অন্যদের কারো কপালে যখন পড়াশুনা নেই, তখন আমার কপালেই বা তা জুটবে কি করে? এবার থেকে ওদের সাথে আমাকেও ওদেরই মতন কাদামাটির জীবনে নেমে পড়তে হবে, এভাবেই জীবন কাটাতে হবে। বাবা নড়েচড়ে কাজ করবার পাত্র নয়। মনের ভেতর এসব চিন্তা এসে হাজির হয় আবার তা এলোমেলো হয়ে মিলিয়েও যায়।

দশ

আমার সিনেমা দেখার নেশাটা এবার এক নতুন আকারে দেখা দিলে। এমনিতেই স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখরই ছিল। যে বই বেশি ভাল লেগে যেত তা দেখতে গিয়ে বিভোর হয়ে যেতুম, চারপাশের জগৎ সম্বন্ধে কোনো খেয়ালই থাকত না। আর বার তিনেক দেখলে নাচ, গান, অভিনয় এসব আমার মুখস্থ হয়ে যেত। সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের বা তাদের মুখের ভাব, চোখের চাউনি, কথাবার্তার ধরন, চলাফেরা, তাদের গানের কথা, সুর সব মনে করতে চাইলে যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত। এভাবেই আমি চারটা মারাঠী বই মিঠ ভাকর ("নুন ভাখরি"), জীবাচা সখা ("প্রাণেব সখা"), "মায়াবাজার" পুঢ়চ পাউল ("পরের পদক্ষেপ"), আখের জামল ("অবশেষে মিল") এসব আমার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। আমি নির্জন জায়গায় বসে নিজের মনে মনেই এসব বইয়ের গল্প, তাদের সংলাপ আওড়াতুম, গান গাইতুম, পাত্র-পাত্রীদের নকল করে অভিনয় করতুম। "প্রাণের সখা" আর "পরের পদক্ষেপ" আমার এত ভাল লেগেছিল যে আমি তা খাতায় লিখেই ফেলেছিলুম। গলির ছেলেদের এগুলো মুখে মুখে বলে যেতুম। ছেলেগুলো এসব পড়ার জন্যে আমার খাতা ধার নিত।

বসন্ত পাটিল হাই স্কুলে পড়া চালিয়ে যেতে পারল না। তার বাবা মা ছিল না, দিদিমার কাছে মানুষ। দিদিমা বিধবা বুড়ি, নিজে রোজগার করে নিজের পেট চালায়। বসন্তের ছেলেবেলাতেই ওর মা মারা গেছে।

বাপ আবার বিয়ে করেছে, ছেলের খোঁজ খবর নেয় না। বসন্ত একটা ছোটখাটো ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে। সে ছবি আঁকতে ভালবাসে, ড্রইং-এ দুটো পরীক্ষাও দিয়েছে। এক শেঠজী শহরে একটি নতুন সিনেমা হল খুলেছে, বসন্ত সেখানে ছবি আঁকে। পুরনো সিনেমা হলগুলোতে তো তার বেশ জানাশোনা ছিল, নতুন ছবি আসার কথাবার্তা হলে সে ছবির বিজ্ঞাপন বসন্ত আঁকত, তার নীচে বসন্তের নামও লেখা থাকত। ওকে দেখে আমার মনে হল আমিও এভাবে ছবি আঁকি না কেন? আমি রাতে বসন্তের ঘরে গিয়ে বসতে আরম্ভ করলুম আর ও কিভাবে আঁকে তা দেখে নিলুম। একদিন বাজারের ছবি বাঁধানোর দোকান থেকে কাঁচ কিনে তাতে একটা নতুন বইয়ের নাম ছাড়াও আরো অনেক কিছু এঁকে প্রভাত থিয়েটারের মালিককে পাঠিয়ে দিলুম। কোন দাম নিলুম না। সে তো মহাখুশি।

এবার আমি সিনেমার ছবি বিজ্ঞাপনসুদ্ধ আঁকতে লেগে গেলুম। এ সুযোগে মাঝে মাঝে এক একটা বই বিনি পয়সায় দেখে নিতুম। বছর দুবছর এভাবেই কাটিয়ে দিলুম।

অনেক সময় বাবা হয়তো জিজ্ঞেস করলে, "কিরে আন্দ্যা, রাতে জমিতে পাহারা দিতে যাচ্ছিস তো?"

"একলা যাব?"

"যা, না।"

আমি আস্তে আস্তে বলতুম, "আচ্ছা যাচ্ছি," ভাবখানা করতুম যেন কত বড় কর্তব্য করতে যাচ্ছি। মনে মনে কিন্তু এতে আমি খুব খুশিই হতুম। রাতে খামারেই থেকে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা থিয়েটারে চলে যেতুম। আজকাল রাতে একা একা মাঠে যেতে আমার আর তেমন ভয় করত না। একা একা নানা কথা ভাবতে ভাবতে হাঁটতে আমার ভালই লাগত। বই পড়ে, সিনেমার গান গেয়ে, ঘুমিয়ে পড়তেও ভালই লাগত। আমার সঙ্গী বলতে ঐসব অবলা জীবগুলো, আমার যা কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সে তো কেবল ওদেরই সাথে।

দিনের বেলায় একা মাঠে কাজ করে মাঝে মাঝে বাড়িতে এসেও শুতাম। একঘেঁয়ে হয়ে যেত বলেই যে চলে আসতুম তা নয়, হয়তো গাঁয়ে নতুন কিছু এসেছে, সেটা দেখা চাই তাই চলে আসতুম। আমরা ভাইবোনেরা মাঠে কাজ করতে করতেই এসব ঠিক করে ফেলতুম। মার তাতে কোনো আপত্তি ছিল না। পুজো পার্বণে শহরের মেলায় বিনি পয়সায় অনেক কিছুই দেখা যেত। মা তো বুঝত বাবার বদমেজাজ আর ছেলেমেয়েদের কষ্ট দেবার বদ অভ্যেসের ফলে ছেলেমেয়েদের কোনো সাধ-আহ্লাদই তো পূরণ হয় না, দিনরাত তাদের কপালে খাটুনি আর কষ্ট ছাড়া আছেই বা কি? তাই দিনে কাজ-টাজ সেরে রাতে যদি ঘণ্টাখানেক কোথায় একটু ঘুরেই আসে তাহলে এমন কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? বরং একটু আমোদ-আহ্লাদের স্বাদ পেলে কাজে উৎসাহ উদ্যম বাড়বে বই কমবে না। গাঁয়ে থেকে গাঁয়ের মেলাই যদি দেখতে না পেলে তবে গাঁয়ে থাকাই বা কেন? তাই মা আমাদের যেতে কখনই মানা করত না।

রাতে বাবা খামারে যাবে, তার আগে আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ার ভান করে পড়ে থাকতুম। এদিকে খাওয়া-দাওয়ার পর মা ঘর গোছাচ্ছে। বাবা বসে আছে একা একাই ভূতের মতো। কিছুক্ষণ এভাবে কাটানোর পর বিরক্ত হয়ে বাবা মাঠের দিকে রওনা দিত। এখন বাবা আট-নটি সন্তানের বাপ।

"আচ্ছা আমি চললুম, ভোরে ওদের সকাল সকাল পাঠিয়ে দিও," বলে বাবা হাঁটা দিলে। আমরা এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়তুম। বাঁচা গেল, বাবা বাড়ি নেই।

ভাইবোনেদের মেলাতে সামলে রাখার ভার মা দিয়েছে আমার ওপর। আমি সবার বড়, তাছাড়া গাঁয়ের রাস্তাঘাট আমার সব চেনা। আমি একাও মেলাও গেছি কতবার। মা-ই আমাকে ওদের সবাইকে নিয়ে গিয়ে একটু ঘুরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসতে বলত। আমরা তাই সবাই যেতুম এ ওর হাত ধরে ধরে হীরা, শিবা, ধোণ্ডু, সুন্দরা, লক্ষ্মী, সব্বাই। পরনে ছেঁড়া জামা, মলিন মুখ, উস্কো-খুস্কো চেহারা, এলোমেলো চুল। শিবার গাল ছিল ফোলাফোলা, এদিকে হীরা চলত হাঁপাতে হাঁপাতে। কিন্তু মনে সবার খুব আনন্দ, কোথায় কোন ক্লান্তির ছাপ নেই।

বিয়ের মরশুমে আতসবাজী জ্বলত গাঁয়ে। আমাদের গাঁয়ে বাজী পোড়ানোটা চলে আসছে অনেকদিন ধরে। গাঁয়ে বাজীর দোকান বলতে আব্বাস আলাসকরের পুরনো দোকানটাই বোঝাত। কোলহাপুর এমন কি তার বাইরেও কোনো মিছিলে, জন্মদিনে

বা নামকরণের দিন এ দোকান থেকেই জিনিস যেত। সারা রাত আলাসকাররা গাঁয়ের আকাশে বাজীর নানারকম চমৎকার খেলা দেখিয়ে তবে ফিরত। গাঁয়ের বাজার বসত বেশ বড় জায়গায়। সারা দিনের হৈ চৈ ভীড় সব ফাঁকা হয়ে গেলে আলাসকাররা মাটিতে একটা লোহার পাইপ গেঁথে দিত। বেশ ভারী পাইপ, তোপের মতনই বড় ঘের তার। তাতে বারুদ ঠেসে যখন ওড়াত, তার আওয়াজখানাও ঠিক তোপের মতনই হত আর সে আওয়াজ শুনে সারা গাঁটা যেন জেগে উঠত। শব্দটা শোনা যেত আগেই, তারপর বারুদের গোলাটা আকাশে ফেটে গিয়ে আলোয় আলোয় সারা গাঁ ঝলমল করে উঠত। সে গোলার আলো গরীবের ঘরের ফুটো ছাতের ভেতর দিয়ে গিয়ে পড়ত তাদের বিছানায় বা তাদের হাঁড়িকুড়ি বাসনকোসন এ সবেতে। আকাশের দিকে তাকালে মনে হত সারা আকাশে কে যেন কতশত রঙিন কাগজ ছড়িয়ে দিয়েছে। বারুদের খেলার এটাই ছিল শেষ খেলা আর তা দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে যেত। এ খেলার আগে আগে হয়ে যেত পদ্মচক্রের, ঝর্নার খেলা, মনে হত ফোয়ারায় আকাশকে রাঙিয়ে দিয়েছে। এসব খেলা দেখে আমরা ছোটরা অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখেই যেতুম। গাঁয়েতে কোনো বড়লোকের বাড়িতে বিয়ে বা সেরকমই কোনো উৎসবে সাবা গাঁয়েই সে আনন্দের ঢেউ এসে পড়ত। বামুনের বাড়িতে বিয়ের উৎসবে বাজীর এ খেলা দেখিয়েই উৎসবের সমাপ্তি হত। বামুন ছাড়া অন্য জাতির ধনীদের বাড়ির উৎসবে মিছিলের আগে আগে হত ছোট ছোট লাঠি নিয়ে নাচ, তরোয়াল বা গ্যাস-এর আলো নিয়ে খেলা, চলত সারারাত ধরে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে এসব খেলা দেখানোর রেওয়াজ ছিল, চলত ঘন্টার পর ঘন্টা। বিছানা ছেড়ে, রাতের ঘুম চুলোয় যাক বলে যে যেমনটি থাকত সেভাবে উঠে আসত এসব দেখতে। ভোরবেলায় মিছিল তার সারা গাঁ চক্কর মারা শেষ করে বাড়ি ফিরে আসত। বিয়ের মাসে এ নিয়ে লোকের মুখে মুখে অনেকদিন ধরেই চলত কথার ফুলঝুরি। কার মিছিলে কি কি দেখিয়েছিল লোকের তা বায়োস্কোপের মতো মনে গেঁথে থাকত, আলাদা করে আর তা জানাতে হত না। বিয়ের মরশুমে আর বর্ষাকালে কিছুদিন যেন গাঁয়ে কোনো কাজকর্ম থাকত না। গলিতে গলিতে চলত এ সবের মহড়া, আর এ সব মহড়া থেকেই যাদের খুব ওস্তাদ মনে হত তাদের বেছে নেয়া হত। গলিতে দাঁড়িয়ে এসব দেখলে নতুন নতুন কত খেলাই যে শেখা যেত সারা রাত কোথা দিয়ে কেটে যেত। যে বাড়িতে ছারপোকার উপদ্রব ছিল খুব, তারা আগে ভাগে গিয়ে এসব দেখে বেড়াত, রাত আদ্ধেক কাবার করে তবে বাড়ি ফিরত।

বিয়ের মানত থাকলে সে বিয়ের পর খণ্ডোবাব উদ্দেশে রাত জাগা হত। বেশির ভাগ সময়ই এসব হত বর্ষাকালে। মন্দিরে এল্লামার যোগিনীরা গাইত গান, কীর্তনিয়ারা নেচে নেচে কীর্তন করত।

যাদের উৎসাহ বেশি তারা বিয়ের পর প্রথম সপ্তাহেই মানত পূরণ হয়েছে বলে মন্দিরে চলে আসত। তখনই খুব ঘটা জাঁকজমক করে উৎসব হত। একদিন লোকেরা যেমনি আমোদে মেতে থাকত তেমনি ভগবানের অপার মহিমার কথাও স্মরণ করে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াত। ধনগরদের বাড়িতে বিয়ে হলে তা আর কথাই ছিল না। ওদের

নিজেদের গানই চলত তিনচার রাত ধরে, বসে বসে শুনতে বেশ মজাই লাগত। ওখানকার জাগ্রত দেবতা বিরুবাকে নিয়ে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শোনা যেত, সে সব শুনে আমার মন চলে যেত কোনো কল্পনার রাজ্যে। ধনগরদের ঢোল, করতাল একবার বাজতে শুরু হলে আর রক্ষে নেই থামবে গিয়ে সেই ভোরে। আশেপাশের লোকের ঘুমের দফা গয়া। ঠাকুরেরই গান, কীর্তন হত বলে এ নিয়ে কেউ কিছু আর বলত না। জেগেই যখন আছে তখন আর কি করে? বসেই পড়ত সবাই গান শুনতে। ধনগররা থাকত আমাদের পাশের গলিতে, তাই ওদের এসব গান আমরা অনেক শুনেছি।

আমাদের গাঁয়ের বাইরে পাটিলদের বাড়ি পেরিয়ে এলম্মা দেবীর একটি মন্দির ছিল। সেখানে বছরে একবার করে মেলা বসত। আমাদের আর আশেপাশের প্রায় দশবিশটি গাঁয়ের যোগিনীরা আসত সে মেলায়। ওদের প্রত্যেকের একটা দল থাকত। আর প্রত্যেকটি দলে একটা বড় পাত্রের মাঝখানটায় এলাম্মার মূর্তি বসান থাকত। সে পাত্রে যে যা ধান চাল দিত জমা হত। মূর্তির নাকে থাকত মুক্তোর নথ, বড় বড় চোখ, টিকোলো নাক, ফোলা ফোলা সুন্দব নাকের গর্ত, মূর্তিটা সত্যি ভারি সুন্দর ছিল। দেখেই শ্রদ্ধায় চোখ বুজে প্রণাম করতে ইচ্ছে হত। সারাক্ষণ যোগিনীরা গান গেয়ে যেত। সারা গাঁয়ের লোক এসময়টা অন্ন প্রসাদ আর শুকনো প্রসাদ দুই-ই পেত। দীনদরিদ্ররা রাস্তার দুধারে সারি সারি বসে যেত প্রসাদের জন্যে।

দেবী এলাম্মাকে আনা হত শেষ রাতে। দেবীর যাবার রাস্তায় বিছানো থাকত সুন্দর কাপড়, তার ওপর দিয়ে দেবী আসতেন। গাঁয়ের প্রধান প্রধান এলাকাগুলোতে দেবীকে ঘুরিয়ে এনে পরে দেবীর বিসর্জন হত। এ দৃশ্য না দেখলেই নয়। যোগিনীরা চান সেরে নিজেদের সবচেয়ে সুন্দর কাপড় পরে সেজেগুজে এসেছে। ধোপার ছেলেরা নীচে রাস্তায় কাপড় বিছিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে গেছে আর সে বিছানো কাপড়ের ওপর দিয়ে সবচেয়ে সুন্দরী যে যোগিনী সে আসছে সবার আগে আগে, হাতে তার দেবী এলাম্মার পাত্র, গলায় মিষ্টি সুরেলা গান, মাথা নম্রতায় ঈষৎ নোয়ানো। ছোকরারা সুন্দরীকে দেখবার জন্যে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ঠেলাঠেলি লাগিয়ে দিয়েছে। এর পিছু পিছু আসছে অন্য যোগিনীরা, তারাও গাইছে। ওদের নাক বোঁচা, রং কালো হলেও চাপ সেরে চুল আঁচড়ে পরিপাটি হয়ে আসত বলে ওদেরও দেখতে সুশ্রীই লাগত। মেলার দুটো দিনে অনেক পয়সাওয়ালা লোকের ভীড় হত। স্ফূর্তিবাজ শৌখিন এই সব ধনীরা যুবতী যোগিনীদের বায়না ক'রে তাদের রাখত, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতাও হত। বায়নার ব্যাপারটা ছিল বলেই আস্ত তালুক থেকেই ভাল ভাল যোগিনীরা তাদের মেয়েদের নিয়ে ঠিক হাজির হত এ মেলায় আর ঘুরে ঘুরে নিজের মেয়েদের দেখিয়ে বেড়াত।

কাপড়ের ওপর দিয়ে যোগিনীরা হেঁটে যাবার এ দৃশ্য দেখার আমার বড়ই সাধ ছিল। ইয়েল্লু যোগিনী দেখতে সত্যি একেবারে দেবীর মতোই সুন্দরী ছিল। সে যেন একটা রাজ্যের মহারানী। তার হাঁটার ভঙ্গীতে, গলার গানে যুবকদের মনে দিত দোলা। গাঁয়ের শেষ সীমান্ত থেকে ভীড় ঠেলতে ঠেলতে গাঁয়ের মাঝখানে এসে পড়ত। আমার

তো মনে হয় না এই সুন্দরী যোগিনীকে কখনও ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে কোনদিন ঘুরতে হয়েছে। আমাদের গাঁয়েরই একজন নামকরা ডাক্তারের সে রক্ষিতা। শৌখিনবাবুরাও মাঝে সাঝে ওকে এটা-ওটা উপহার পাঠাত। একটা দোতলা বাড়িতে থাকত। বেশ সচ্ছল অবস্থা হলেও নির্দিষ্ট দিনটিতে ও ঠিকই ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরোত। কারণ ওটাই ছিল নিয়ম। সঙ্গে তার থাকত কোনো একটি গরীব যোগিনী। তাকে সঙ্গে করে দেবীর বার স্মরণ করে পাঁচটি বাড়িতে যেত সে। এই বিশেষ দিনটিতেও কোনো কোনো শৌখিন ধনী তাকে কম্বল পেতে বসিয়ে তাতে এলাম্মা দেবীর মূর্তি রেখে গান গাইবার ফরমাস করত। তার পাত্রে অনেক ধান চাল দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে অনেক কিছু পাইয়েও দিত এভাবে।

মুসলমানদের কিছু কিছু পরবেও সারা গাঁ যোগ দিত। যেমন আল্লাবা ও গৈবির উর্স্। সব ধর্মাবলম্বী লোকেরাই উর্সে যোগ দেবেই। আমাদের স্বজনদেরই একজনের বাড়িতে পীর বসতেন, তাঁকে সবাই শ্রদ্ধা ভক্তি করত, বউরা মানত করত, পীরের নামে ছেলেমেয়েদের নাম রাখত আর পীর বলেই ডাকত। এ ধরনেরই আরেকটা নাম হত "নালসাহেব"। আল্লাবা উর্সে পাড়াগাঁয়ের অনেকেই সঙ সাজত। এদের সব জাতি-ধর্মের লোকই থাকত। একজন কুমোর এমনিতে সারা বছর হয়তো ভাল মানুষের মতো কাটিয়ে দিলে, গোরুর মতোই শান্ত। সেও এ সময় কিন্তু সঙ সাজবে। সিদ্ধগিরিকুমোর খুব পাকা অভিনেতা, দিনে সে তিন-তিনটি সাজে দেখা দিত আর এন্তার পয়সা রোজগার করে নিত। সারা গাঁ ওর অভিনয় দেখার জন্য হাপিত্যেশ করে বসে থাকত। আমিও ওর পিছু পিছু ঘুরে ওর অভিনয় দেখতুম। আমাদের গাঁয়ের লোকের এসব কলাকৌশলে পারদর্শিতা এভাবেই বাইরের লোকেরা জানতে পারত। ধনীরা যেমন পাটিল, জমিজমার মালিকেরা, ব্যবসায়ীরা, সুদের কারবারী বা দোকানদাররা এরা সবাই এই সঙ যারা সাজত তাদের যোগ্য মর্যাদা দিয়ে যার যা বখশিস পাওয়া উচিত তা ওদের দিত। সিদ্ধগিরির টাকা রোজগারের বহর দেখে আমারও মন চাইত এভাবে টাকা রোজগার করতে। ভাবতুম আমিও ওরকম সঙ সাজি না কেন? কোনো কোনো সময় খেতে বাবা হয়তো একটানা আটদশ দিন এল না তখন আমি সঙ সেজে ছোট ভাইবোনদের দাঁড় করিয়ে অভিনয় করে যেতুম। এ ব্যাপারে শিবা আমাকে সাহায্য করত।

উর্স্-এর সময় আমরা নতুন জামাকাপড় পরতুম। কারণ, কিছুদিন আগেই দেয়ালী গেছে, তখন নতুন জামাকাপড়গুলো পেয়েছি। একটু আধটু ফসল ঘরে এসেছে মাঠ থেকে, তাই উরস-এর সময় মা আমাদের সবাইকে দু আনা করে হাতে দিত, যা ইচ্ছে তা কেনবার জন্যে। দু আনা পেয়ে আমরা তো দারুণ খুশি। আমি আর ভাইবোনেরা এক দঙ্গল রাতে চলে যেতুম বড় বাড়িতে বাঈনাচ হচ্ছে দেখতে হবে না?

আমাদের গৈবি দেবতার গায়ে পাঁচদিন চাদর পরানো হত। আমাদের গাঁয়ের লোকেদের কাছে এ চাদর পরানো জাঁক করবার মতনই একটা ব্যাপার ছিল। ঢাক ঢোল বাজিয়ে বাঈজীরা নাচতে নাচতে যেত সে চাদর আনতে। খুবই সম্ভ্রম আর মানমর্যাদার সাথে আনা হত সে চাদর। এরপর বাজারেও এক চক্কর ঘোরা হয়ে যেত আমাদের। লক্ষ্মী

আপ্পার জন্যে কেনা হত খেলনা। আমাদের বোনেরা হাতে নতুন চুড়ি পরে কি আনন্দই না পেত— আহ্লাদে আটখানা। এদিকে শিবাকে সাথে নিয়ে গিয়ে আমিও একটা তামাসা* দেখে নিতুম।

বড় বাড়িতে থিয়েটারের সাথে যে ভজন হত তা শুনে ভাইবোনেদের নিয়ে ফিরতুম।

সবাই মিলে এসব দেখতে ভারি মজা লাগত, মনে মনে একটা চনমনে ভাব এসে যেত। ঝপাঝপ পা ফেলে লাফিয়ে লাফিয়েই যেন যেতুম সবাই। সবার মুখেই হাসি.আর উচ্ছলতা। খাঁচায় আটকে থাকা পাখিকে ছেড়ে দিলে ওর যেমন মনের অবস্থা হয় আমাদেরও তাই হত— সে পাখিটার মতনই যেন যাচ্ছি উড়ে উড়ে। এতক্ষণ ধরে যা দেখে এসেছি, ফেরার পথে তারই গল্প হত আমাদের মধ্যে। এত বক বক করতুম যে ঘুম কোথায় পালিয়ে যেত। এ সময়টা যেন আমাদের একটা সম্পূর্ণ অন্য জগতে কাটল। দারিদ্র্যে মলিন আমাদের মুখ এ জগতে এসে যেন আবার ধুয়ে মুছে ঝকঝকে হয়ে যেত।

বিয়ের মরশুম থেকে শুরু করে দেয়ালী আর উরস্ অবধি গাঁয়ে একটা না একটা কিছু লেগেই থাকত। আমরা ছোটরা কোনোটাই না দেখে ছাড়তুম না। আজকাল মা-ও আর আমাদের তেমন কড়া শাসনে বাঁধত না, আমাদের নিজেদের মতো করে থাকতে দিত। ক্লাস সেভেন থেকেই দেখেছি মা আমাকে একটু আলগা দিয়েছে। সারাদিন মাঠে ঘাটে কাজের শেষে রাতে আমরা কি দেখলুম তাই নিয়ে বসত আমাদের গল্পের আসর। বাবা এসব শুনে ফেলত, আমরা জানতেও পেতুম না। রাতে এসব দেখে বেড়াবার ব্যাপাবে আমিই পাণ্ডা বাবা সেটা বুঝতে পেরেছে। বাবার মত হচ্ছে এসব আমোদ-প্রমোদ অলক্ষ্মীরই শহরে, মানুষকে কাঙাল, হতশ্রী করে ছাড়ে আর ভাইবোনেদের এসবে নেশা ধরানোর ব্যাপারে আমি নাটের গুরু। কিন্তু এতে যে মারও সায় ছিল সেটা বাবার জানা ছিল না। তাছাড়া আমরা যে রাতে যেতুম তা বাবার সামনে কখনই বলে বেড়াতুম না। এ নিয়ে মনে মনে বাবা আমার ওপর ভীষণ রেগে ছিল, তা বেরিয়ে পড়ল দেয়ালীর সময় কি লক্ষ্মীপুজোর দিনে।

উর্স্-এর বাকি আর মাত্র চার দিন। তখন চার-পাঁচ দিন আমাদের খুব আনন্দ হৈ চৈ-এর ভেতর কাটবে। দেয়ালীর লক্ষ্মীপুজোর দিন খাশবাগের কুয়োতে বন্দুকের গুলি দিয়ে ফাটানো হত নারকোল আর তা দেখবার জন্য সারা গাঁ ভেঙ্গে পড়ত। সাড়ে চারটের সময় বন্দুক তরবারি নিয়ে বাজনা বাজাতে বাজাতে ঘোড়া হাতি সঙ্গে করে মিছিল আসত বাগানের সে কুয়োর ধারে। পঁচিশজন বন্দুকধারী পুলিশ আর নানারকম পোষাকপরা সেপাই জড়ো হত সেখানে। খাশবাগটি ছিল কাগলের মহারাজার সম্পত্তি। বাগানটা প্রায় কুড়ি একর জমিতে আর কুয়োটিও খুব সুন্দর চৌকো করে গড়া আর তেমনি গভীর।

হাতি ঘোড়ার এ মিছিলের সাথেই আসত এক বস্তা নারকেল। প্রথম পাঁচটি নারকেল উঁচু থেকে জলে ছুঁড়ে দেয়া হত, জলও সমানে নড়তে থাকতো। কুয়োর ধার থেকে টিপ করে জলেতে নারকেল ফাটাতে হত। যে পারত ফাটাতে, সারা গাঁয়ে উঠত

* মহারাষ্ট্রে গ্রামবাসীর চিত্তবিনোদনের জন্যে জনপ্রিয় বাঈনাচ

তার জয়ধ্বনি। একটা নারকেল ফাটানো হলে, সমানে নারকেল ফাটিয়েই যেতে হবে। এভাবে অসংখ্য নারকেল জলে ফেলা হত আর ফাটানো হত, দেখতে ভারি মজা লাগত। হাতি ঘোড়া ফিরে গেলে একগাদা ছেলে নারকেল খেতে পারে বলে দিত কুয়োর জলে ঝাঁপ। এখান থেকে যে নারকেল তুলতে পারত তার সে কি ডাঁট। দশেরার দিন একজন আরেকজনকে একটি বিশেষ গাছের পাতা সোনা মনে করে দেবার যে রীতি চালু ছিল, তার চাইতে একটুও কম ছিল না এই গভীর কুয়ো থেকে নারকেল কুড়িয়ে আমার আনন্দ।

আমি সকাল থেকেই বাবাকে বলে রেখেছি নারকেল ফাটানো দেখতে যাব, যা কাজ থাকে তা আগে ভাগেই সেরে ফেলব। বাবা রাজিও হল। খেতে আগাছা খুবই বেড়েছে, আমরা ক'জন মিলেও টেনে তুলে তা যেন আর শেষ করতে পারছিলুম না। তিন তিনটি মজুর দিন আমাদের এখানে কাজ করছে, আমিও তাদের সাথে কাজ করে যাচ্ছি। সূর্যি ডুবছে দেখে আমি মরিয়া হয়ে বাবাকে বলেই ফেললুম, "আমি যাচ্ছি তাহলে!"

"কোথায়?" বাবা জিজ্ঞেস করলে, যেন আকাশ থেকে পড়েছে ভাবখানা এমনি। সকালে আমাদের যা কথা হয়েছে সব যেন ভুলেই গেছে। আমি ভীষণ দমে গিয়ে বললুম, "বা রে? নারকেল ফাটানো দেখব না?"

"ওতে দেখবার কি আছে? ফাটা নারকেল দেখিস নি কখনো? যা মেলা বকিস নি, যা কাজ বাকি আছে চুপচাপ সেরে ফেল। দেখছিস তো আগাছা চারধারে কত বেড়ে আছে।"

"আমি যাবই যাব। সেই সাত সকালে কাজে লেগেছি। আমি তো সকালেই তোমাকে বলেছিলুম তখন তাহলে 'হুঁ' বলেছিলে কেন?"

"হুঁ বলেছি বেশ করেছি। তাতে কি যায় আসে রে, হারামজাদা? এই দেখছিস কাস্তের হাতল। নারকেল ফাটানো দেখতে যাচ্ছে, দেখা ছাড়া যেন আর কিছু জানে না। এসব হল কাঙালের লক্ষণ। কতদিন বলেছি এসব ছাড়, তা বারণ করলে তুই শুনিস নাকি?"

"আমি যাবই যাব। কাজ করিয়ে নেবার বেলায় তুমি তো খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে দিব্যি খাটিয়ে নাও," বলতে বলতে আমি উঠেই পড়লুম।

"যেতেই দাও না বাপু ওকে, বাছা আমার," একজন বুড়ি মজুরনি আমার হয়ে সুপারিশ করলে। সে হয়ত বুঝেছে আমাকে ঠকানো হয়েছে।

"এখনও দেরী আছে, দুপুরও শেষ হয় নি, যে কাজটা হাতে নিয়েছিস সেটা শেষ করে যা," বাবা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বুড়িটার সামনে নিজেকে সামলে নিলে। হয়তো বুঝেছে সে যে কথা দিয়ে কথা রাখে না সেটা মজুরনিরা ধরে ফেলেছে। তাই একটু সাবধান হল।

হাতের কাজটা শেষ করতে করতে আরো আধঘন্টা কেটে গেল। আমি খুব চটপট কাটা পাতাগুলো গুছিয়ে জামা বদলাতে ঘরের দিকে গেলুম। বাবা সব দেখেছে। যেখানে ছিল সেখান থেকেই হেঁকে বললে, "যতক্ষণ মজুরনিরা কাজ করছে ততক্ষণ

আমি এক পাও নড়ছি না। ঝোরার ধারের ঘাস তোকেই কেটে এনে বলদগুলোকে দিতে হবে। ওদের সন্ধেবেলায় খেতে দেবার কোনো ঘাস নেই।" আমার তখন কাঁদ-কাঁদ অবস্থা। নারকেল ফাটানো দেখার পথে বাগড়া দেবার আর বাকি রাখে নি বাবা। হাঁটাপথে খাশবাগে যেতে আধঘণ্টা লেগে যায়। এদিকে যেদিককার ঘাস কাটতে বলেছে তা কাটতে আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো লাগবেই। বাবাকে মনে মনে গাল দিতে দিতে ঝোরার দিকে এগিয়ে গেলুম। কোন দিককার ঘাস আগে কাটব তাই ভাবছি। এরই মধ্যে বন্দুকের গুলির প্রথম আওয়াজটা কানে এল। কি যে করব বুঝতেই পারছি না। সামনের ঘাস বেশ লম্বা লম্বা দেখা যাচ্ছে। বাবা এদিকটার ঘাস পাশের জমির মালিকের কাছ থেকে কিনে নিয়েছে। আমাদের ঝোরার ধারে লম্বা ঘাস মোটে থাকত না। তাছাড়া এর আগে দু দুবার কাটাও হয়ে গেছে। কোনোরকমে ঘাস একটু বেড়েছে। সে ঘাস কেটে বান্ডিল করতে হলে আমার ঘণ্টা কেটে যেত আর দিনও শেষ হয়ে আসত। তাই আমি সামনের ঘাস কোনোরকমে চটপট কেটে একটা বান্ডিল করে ফেলে সেটা তুলে নিয়ে ঘরের দিকে এগোলুম। এদিকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ সমানে ভেসে আসছে কানে। এতক্ষণে সব নারকেল বোধহয় ফাটানো শেষ হয়ে গেল।

ঘাসের দিকে তাকিয়েই বাবা জিজ্ঞেস করলে, "এ ঘাস তুই কোত্থেকে আনলি?"

"ঝোরার সামনের দিকটা থেকে এনেছি" বলে ঘাসের বাণ্ডিলটা নীচে রাখতে না রাখতেই বাবার হাতের কাস্তের লোহার মুঠোটা পড়ল আমার পিঠে। বাবার দিকে ফিরতেই বাবার এক ঘুসি লাগল এসে আমার নাকে আর নাক ফেটে রক্তের ফোয়ারা আমার জামার সামনেটা ভাসিয়ে দিলে। আমাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিয়ে উঠল নারকেল ফাটানো দেখতে যাবার তাড়ায় আমি কেন সামনের দিকের ঘাস কেটেছি? আমি ঐ রক্ত পড়া অবস্থাতেই মাঠের সীমানার দিকে লাগালুম দৌড়। গায়ে রক্ত দেখে মা ছুটে এসে বললে, "ঐ পোড়া নারকেল ফাটানো দেখার জন্যে মার খাচ্ছিস কেন? তোর তো জানটাই যাবে এবারে।" বাবার সঙ্গেও এক চোট কথা কাটাকাটি হয়ে গেল মার। বন্দুকের আওয়াজ তখনও কানে আসছে, ক্রমশ শব্দের সংখ্যাও বাড়ছে আর হচ্ছেও আরও তাড়াতাড়ি। ততক্ষণে মা আমার মাথা আর নাক জল দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে। সেই যে সেবার নারকেল ফাটানো দেখতে পেলুম না, এরপর নারকেল ফাটানো আর আমার দেখাই হয় নি।

এদিকে বাড়ির অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ থেকে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। খেতে বছর বছর লোকসান বেড়েই চলেছে। সেবার আমাদের দেয়ালীতে কোনো উৎসব করা গেল না। মা মুড়ি আর ঝুরিভাজা দিয়ে একটু চানাচুর বানাল, এই যা হল। সবাই দেয়ালীর দিন এক মুঠো করে পেতে না পেতেই গেল ফুরিয়ে। পরবের দিন আমাদের না আছে আনন্দ, না আছে বিশ্রাম আমরা মাঠে কাজ করলুম। এবারে কারো গায়ে নেই নতুন জামা— সবাই পুরনো জামাই তাপ্পি দিয়ে পরেছি। মোটা সুতো দিয়ে তাপ্পি দেয়া ময়লা সে জামা। তবে দেয়ালীর দিন আমরা সব্বাই চান করে নিলুম। আর সব, রোজ যেমন চলে তাই। সেই বাসি ভাখারির জলখাবার,

তারপর সবাই মিলে গোরু মোষ ছাগল নিয়ে মাঠে যাওয়া। আমি গেলুম বাবার চা নিয়ে।

সেদিন 'মার সঙ্গে আমরা সবাই দুপুরে গাছের তলায় বিশ্রাম করছি দুদণ্ড। মা শুয়ে শুয়ে নিজে নিজেই বলে যাচ্ছে, "কি ঠাট ছিল শ্বশুরের আমলে যেন রাজার হাতি চলেছে, আর এখন? আমার কর্তার আমলে চলেছে কাঙাল বলদের রাজত্ব।"

সেদিনটা ছিল ভাইফোঁটার দিন। ঘরে সব বোনেরা তাদের তিন ভাইকে আরতি করে ফোঁটা দিলে। একটাই আধুলি ভাইরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোনদের দিয়ে নিয়ম রক্ষা করেছে। আনসাবাঈ ভাইফোঁটায় আসেনি, তাকে ডাকতেও কেউ যায় নি কিনা। ভাইফোঁটার দিন নেমন্তন্ন করলে তাকে আর তার ছেলেকে একটা নতুন জামা দিতেই হত। আমার মায়ের মনে এ ভয় ছিলই, তাছাড়া মার আর মামার ভেতর কি নিয়ে যেন ঝগড়া হয়েছে তাই মামা আর ফোঁটা নিতে আসে নি এবার।

আমরা ভাইবোনেরা সব মাঠেতেই কাজ করছিলুম। সন্ধে হয়ে এসেছে। কাস্তে চালাতে চালাতে আমি মাকে বললুম, "মা, আনসাকে এবারে ভাইফোঁটাতে বলা হয়নি?

"সে আসতে পারে না? একই গাঁয়েই তো থাকি। ভাইদের এরই মধ্যে ভুলে গেল নাকি?"

"আমরা ঠিকমতো বললে নিশ্চয়ই আসত। তবে আমাদেরও তো এই হাল। কোন সময় ডাল থাকে তো ভাখরি থাকে না, আবার ভাখরি যদি জুটল দেখ গিয়ে সঙ্গে খাবার ডাল নেই। সেই বা আসে কি ভরসায়? সে তো জানে লোকনিন্দার ভয়ে তোমাকে কিছু একটা দিতেই হবে ও এলে। এইসব ভেবেই হয়তো ও নিজের বাড়িতেই চুপচাপ বসে আছে," আমি মাকে বোঝালুম।

"হবেও বা, ভগবানই জানেন," মার গলায় স্পষ্টই একটা বিষাদের রেশ।

আমরা সবাই চুপ করে গেলুম। দিনের সব কাজ শেষ হল। মাকে দেখে মনে হল কি যেন ভেবেই যাচ্ছে। ঘরের দিকে আমরা যাবার তোড়জোড় করছি এমন সময় মা বললে, "আন্দা, তুই যা তো আনসার কাছে। যাবার পথে জঙ্গমার বাগানে আন্নাকে পাবি, তার কাছ থেকে একটা পান চেয়ে নিবি। বলবি দুটো পান আর এক টুকরো সুপুরি দাও। ওটা নিয়ে যাস। ও যদি ফোঁটা দেয় ওকে পান দুটো দিবি আর বলবি 'এ বছর আমাদের এভাবেই কাটছে, এইটাই খুশি মনে নে।' এই বলে চলে আসিস।"

"ঠিক আছে," বলে আমি রওনা দিলুম। একটা ফুটো তামার পয়সাও বোনকে দেবার নেই বলে মনটা বড় খারাপ হল। আনসাকে আমি খুবই ভালবাসতুম। আনসার বাড়িতেও আমার আলাদা একটা খাতির ছিল, ওর বাড়িটা আমার আর একটা আশ্রয় মনে হতো। যখনই ওর কাছে গেছি ও আমায় খাইয়ে দিয়েছে। আমার নিজের বাড়ীতে যা না পেয়েছি, আনসার ওখানে তা পেতুম। মাঝে মধ্যেই ও ঘরে চানাচুর, লাড্ডু, পিঠেপুলি কত কি-ই না বানাত। দোকান থেকে খাবার আনলে আনসা তা থেকে আমাকে দেবেই। চায়ের সাথে মাখন খেতে দিত। আট-দশ দিন পরপরই লুকিয়ে চুরিয়ে হলেও আমি আনসার বাড়ি যেতুমই। আমার পড়াশুনায় উৎসাহ দিত মামা,

আমায় পড়া চালিয়ে যেতে বলত। মাঝে মাঝেই আমার হয়ে বাবাকে বলত' "পড়ছে যখন তখন দাও না পড়তে? কেন শুধু শুধু ওর পেছনে লেগে ওকে ঝুটমুট হয়রানি করছ?"

আনসার বাড়িতে গিয়ে তাই আমার আরাম হত। আজ অবশ্য আমি অন্য পরিস্থিতিতে আনসার বাড়ি এসেছি। আমাদের বাড়ির অভাবের চাপে আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি, মনটা খুবই দুর্বল ছিল। পকেটে পান দুটো মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে ধরে দেখছি, খুব অপমান বোধ হচ্ছে। এক পয়সায় দশটা পান পাওয়া যায়, আর এক পয়সায় একটা আস্ত সুপুরিও মেলে। আমার পকেটে আছে মাত্র দুটি পান আর একটা সুপুরির দশ ভাগের এক ভাগ। তাই নিয়ে কিনা চলেছি আমি ভাইফোঁটা নিতে। কান্নায় বুক ফেটে আসছিল, চোখ দিয়ে কেবল জল গড়াতে দেরী এই যা।

আনসা বাড়িতে একাই ছিল। ছেলে বালু মেঝেতে শুয়ে। আনসা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের সবার খবরাখবর নিলে, খামার থেকে সোজা এসেছি জানতে পেরে চা করে খাওয়ালে। আনসাকে আজ খুব চুপচাপ মনে হল, মাঝে মাঝেই কাশছে। ডাক্তারখানায় গিয়ে ওষুধও এনেছিল শুনলুম। গাঁয়ে বড় ডাক্তার আছে। তার কাছে গিয়ে ইনজেকশনও নিয়েছে, একটু যেন সেরেছে তাতে। টুকিটাকি কাজও করছে এখন। আমি ভাবলুম আনসার কাশি আসছে হয়তো সেজন্যই কথা কম বলছে, না হলে হাঁফ ধরবে। আনসা কথা বলছে না দেখে আমি চুপচাপ, দুজনেই চুপ করে বসে আছি। আমি আর ভাইফোঁটার কথা তুলতেই পারলুম না ওর কাছে। কেমন যেন অপমানবোধ হল। কথা যা ছিল তা শেষ হয়ে গেল, আনসা ফোঁটা দেবার জন্য কোন আয়োজন করছে না দেখে আমি উঠে পড়লুম।

"আজ উঠি রে।"

"আচ্ছা," বলে আনসা চুপ করে গেল।

তখনও আমি ভাবছি আনসা এবার হয়তো বলবে ফোঁটা নিয়ে যা। কিন্তু তা হল না। আনসা যেমন ছিল, তেমনি চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইল। আমি রাতের আঁধারে বেরিয়ে পড়লুম। মনে মনে কত কথাই ভাবছি, 'আনসা, শেষ পর্যন্ত ভাইফোঁটাই ভুলে গেলি?' না কি আমার পরনে ময়লা ছেঁড়া জামা দেখে ওর মনেই হয় নি যে আমি ফোঁটা নিতে এসেছি? দিদির কাছে ছোট ভাই এ দিনে এসে ফোঁটা না নিয়ে কি করেই বা ফিরে যায়? এ কেমন করে হয়? আমি বাড়ি ফিরে মার কোলে মাথা গুঁজে কাঁদতে লেগে গেলুম। মা তো অবাক, "কি রে? কি হলো, আনসা কিছু বলেছে?"

"মা, আনসা আমায় ফোঁটা দেয় নি, ভাইকে ভুলে গেছে, এমনি পাঠিয়ে দিয়েছে আমায়।"

"ও এই কথা! ওর গায়ের ওপর মুতে দে। ছাড় তো, ও নিয়ে ভাবছিস কেন? তোর চার-চারটে বোন আছে বাড়িতে, ওদের বল আবার তোকে ফোঁটা দিতে।"

এতেও আমার কান্না থামল না। চারজন বোন সকালে ফোঁটা তো দিয়েইছে, দেয় নি তো শুধু আনসা। সেদিন রাতে জলের বাইরে মাছের মতো ছটফট করছি। পরে

মাকে আনসা এসে বললে, "ভাইফোঁটা ছিল সকালে, ও এসেছিল রাতে। আমি কি করে জানব ও এসেছে ফোঁটা নিতে?"

দেয়ালী শেষ। তুলসীর বিয়ে* হল আর তার সাথে সাথেই গাঁয়ে লেগে গেল বিয়ের মরশুম।

মার মনে হীরার বিয়ে নিয়ে ভাবনা ঢুকেছে। হীরার খুব বেশি বয়স যে হয়েছে, তা নয়। তের কি চৌদ্দ হবে। গ্রামদেশে মেয়েদের অবশ্য এ বয়সেই বিয়ে হয়। ওর বয়সী দু একজন মেয়ে আমাদের গলিতেই থাকে, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে, একটু আধটু শ্বশুর ঘরও করে এসেছে।

মারই আপন মামা কাগলেই থাকত, আমাদেরই মতো ভাগে চাষ করত। এক বামুনের পাঁচ ছ'একর জমি ছিল তার চাষে। একার পেট ওতে ভালই চলে যেত। বুড়ো হয়েছে, বউ তার আগেই স্বর্গে গেছে, দু মেয়ে এক ছেলেকে রেখে। মেয়ে দুটির বিয়ে হয়ে গেছে। বড়জন কাছাকাছিই থাকত, বুড়ো বাপকে ভাখরি করে খাওয়াত। মামার ছেলে সবার ছোট, বছর সতের আঠার হবে। মার এ মামা শেষে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মাকে বললে, "তারা, আমি আর বেশি দিন নেই রে। খুব বেশি হলে...... ছ'মাস, বড় জোর এক বছর আয়ু আছে আমার। আমার এ ছেলেটার বিয়েটা আমি যেন মরবার আগে দেখে যেতে পারি, দেখিস। এই আমার শেষ ইচ্ছে।"

মা অমনি বলে বসল, "মামা আমার মেয়েকে আমি দেব তোমার ছেলের হাতে, তোমার দরজায় বিয়ের মণ্ডপ খাটাতে বলে দাও গে।"

এ কথা বাবাকে বলতেই বাবা গেল রেগে। বাবাকে না জিজ্ঞেস করেই মা বিয়ের পাকা কথা দিয়ে এসেছে—বাড়ির কর্তাকে একবার জিজ্ঞেস করে তার মতটা নেবে তো? অবশ্য মার তখন আর কোনো উপায় ছিল না। মার মামা যখন কথাটা পেড়েছিল তখন মার মনে মামার চিন্তাটাই ছিল সবচেয়ে বেশি, সে সময় কথা দেয়া ছাড়া অন্য কিছু মা ভাবতেই পারে নি। নিজেদের ভেতরে যে রক্তের টানের ভালবাসা আছে তা বোঝাবার জন্যই মা এ কাজ করেছে। তাছাড়া, এতে তার মেয়ের পাত্রও জুটে গেল, মেয়ের বিয়েটাও হয়ে যাবে, মার কাছে এও কম নয়।

বাবার আঁতে ঘা লেগেছে, বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি কেন? মার মনের ভাব তাই বাবা বুঝতে চায়নি। চোখ বড় বড় করে রেগেমেগে জিজ্ঞেস করলে, "আমার সব মেয়েদের তুই তোর জ্ঞাতির দিকেই নিয়ে ফেলছিস রাক্ষুসী?"

ব্যাপারটাতে মেয়ের বিয়ে জড়িয়ে আছে দেখে মা ঝগড়াটার আর জের টানলে না।

কেনাকাটার ফর্দ করার সময় বাবা আবার ঠিক ঝগড়া শুরু করে দিলে। মা এসব দেখে কুয়োতে ঝাঁপ দিতে চলল। পাড়ার সবাই তখন মা আর বাবা দুজনকেই বোঝালে। বাবাকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বলল, "তুই বোকা না কিরে রাত্নাপ্পা? তোর

*মহারাষ্ট্রে দেয়ালীর পর খুব ঘটা করে তুলসীর বিয়ে হয়।

মেয়ে রুগ্ন, সারা গা ফোলা, ওর যে বিয়ে হচ্ছে এই তো তোর ভাগ্যির কথা। আর তুই কিনা ওর বিয়েটাই দিচ্ছিস ভেঙে? রাস্তার ভিখিরিকেও নিয়ে যা বললে সেও তোর এ মেয়ে নেবে না। অত দেমাক কিসের তোর? মাথা গরম না করে ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখ।" বাবা এবারে বুঝলে আর হীরার বিয়েটা ভালভাবেই হয়ে গেল। মার মামার ছেলে শঙ্কর অর্থাৎ বিয়ের পাত্র, সে ছিল চাষী। কিন্তু সেও দেখতে কেমন যেন অসুস্থ অসুস্থ। গায়ের রঙ হলদেপানা, মুখটা একটু খালি ফোলা, আর হাতপায়ের নখও কেমন যেন চিড় খাওয়া চিড় খাওয়া। আমি মাকে একবার জিজ্ঞেসই করে ফেললুম।

"আচ্ছা মা, শঙ্কর কি অসুস্থ? ওর গায়ের রঙ, হাত পায়ের নখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?"

মা বললে, "না, না তা কেন হবে? মামার একমাত্র ছেলে শঙ্কর। রোজ দুধ দই এসব খায়। কুস্তি করে তো, তাই ওর মুখ ফোলা দেখেছিস। গায়ের রঙ খুব ফর্সা তুই তাকেই হলুদ ভাবচিস। আর হাত পায়ের নখ? সেও তো মাটিতে জলে কাদায় কাজ করে তাই ওরকম হয়েছে। এবার বিয়ে হল তো, বছরখানেক যাক, দেখবি চেহারায় কেমন জেল্লা বেরোবে, কেমন নাদুস নুদুস হবে। ওর যে বোনের বিয়ে হয়ে গেছে সে তো মহা চালু, ও কি শঙ্করের দেখাশোনা করে নাকি?" এসব বলে মা আমাকে বোঝাতে চাইলে বটে, কিন্তু আমার মনে খটকা একটা লেগেই রইল। তাছাড়া, তখনই একটা টিকটিকিও যেন মনের ভেতর সত্যিসত্যি বলে টিক টিক করে উঠল। সেজন্যই আমার আরও ভয় করছিল। তবে হীরার বিয়েটা হয়ে গেছে ভেবেই আমার ভাল লাগছে। ওর যে কখনো বিয়ে হবে ভাবিই নি। তাই আমি আর এ নিয়ে কথা বাড়ালুম না।

মাস চারেক বাদে মার সে মামা মারা গেল। শঙ্করের দিদি ওর পুরো সংসারটা নিয়ে শঙ্করের বাসায় উঠল এসে আর বসলও কর্ত্রী হয়ে। শঙ্করের তো মা নেই, তাই এ দিদিই বলতে গেলে হীরার শাশুড়ি হয়ে বসল।

আমাদের বাড়িতে দুটো কাজের লোক কমে গেল, তাই পুরো কাজটার একটু অদলবদল করতে হল। হীরার মোষগুলো এখন ধোণ্ডুবাঈ চরায়। ধোণ্ডু আট ন বছরেরটি হলো। পাঁচ ছ'বছরের সুন্দরা মার সাথে সাথে রান্না করে। লক্ষ্মী আর আপ্পা একসঙ্গে খেলা করে। শিবাকে বাবা মাঝে মাঝেই জলের দিকে টেনে নিত। সামান্য কারণেই বাবা খামার থেকে গাঁয়ে ফিরে যেতে শুরু করে দিল, পুরো খেত জমি দেখাশোনা করার ভার পড়ত শিবা আর আমার ওপর। সকালে একবার যদি বাবা গাঁয়ে গেল, ফিরত সেই বারটায়। ততক্ষণে জমিতে জল ছাড়ার কাজ শেষ। ব্যস্, কোনো কাজ নেই, খাওয়া-দাওয়া সেরে দড়ির চারপাইতে শুয়ে পড়ত, বিশ্রাম নিতে। তারপর সন্ধেবেলা এই টুকিটাকি হালকা কিছু কাজ করলে কি করলে না, হয়তো বলদের জন্য গুটিকতক চারাগাছ কেটে আনলে নয়তো কিছুক্ষণের জন্য মাঠে জল দিলে। আর একটা কাজ যেটা খুব করত সেটা হচ্ছে কারণে অকারণে গালাগাল দেয়া। বাবা অনেক দূর থেকে শুনিয়ে শুনিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গাল দিত। আশে পাশে

যারা থাকত বা কাজ করত তারা শুনে হাসত। কখনও আমাদের বোনেদেরও এমন নোংরা গালাগাল দিত যে যারা শুনত তারাই লজ্জা পেয়ে যেত। ওরা যখন এ নিয়ে বাবাকে দু কথা শোনাত, ধমকাত, বাবা তখন নিজের সাফাই গাইত, বলত, "আমি তো গাল দিয়েই থেমে গেছি, জুতো পেটা তো আর করি নি। দয়াই তো করেছি বলতে হবে।"

বাবার বদমেজাজের যথেষ্ট কারণ ছিল, যদিও তখন আমরা এসব কিছু বুঝতুম না। এমনিতেই তো আমাদের অভাবের সংসার, তার ওপর বামুনের এ জমিটা ইজারা নিয়ে বাবা খালি ফতুরই হয়ে যাচ্ছিল, লোকসানের পর লোকসান, রাত দিন খেটেও হাতে কিছুই থাকে না; এসব সব মিলে বাবাকে প্রায় পাগলের মতো করে দিয়েছে। আমরা শুধু দেখতুম বাবা গাল দিচ্ছে, মারধোর করছে, খাটাখাটি তেমন একটা করে না, গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছে। কেন যে কবছে তখন তো আর তা বুঝতুম না, কিন্তু এসব কাণ্ডকারখানা বাবার কাছ থেকে আমাদের অনেক দূরে নিয়ে গিয়েছিল, আমরা সব ব্যাপারে মাকেই আঁকড়ে ধরতে শিখে গেলুম। মা যা করত সবই ঠিক, আর বাবা যা করত সবই ভুল আমরা এটাই ভাবতে শুরু করে দিলুম। মা যা করবে তাতে আমরা সবাই আছি, কারণ মা তো সেগুলো আমাদের ভালর জন্যই করছে। মা আমাদের সঙ্গে নিয়ে অনেক কাজ করত। এসব কাজ জানতে পারলে বাবা আমাদের বিপদে ফেলতে পারে বুঝতুম, তাই খুব সাবধানে আমাদের চলতে হত। সাহসও লাগত। বাবার এসবে মোটে সায় ছিল না। বাবার কেবল এক কথা, 'খেতে খেটে যাও।' মার এসব কাজেব কথা বাবা জানতে পারলে মাকে ধমকে ধমকে আর রাখত না। তাই তো এসব কাজ আমরা বাবাকে না জানিয়ে সারতুম। অনেক ছোটখাটো জিনিসই এভাবে বাবার কাছে গোপন রাখা হত। মা আর আমরা জানতুম, মার সাথে আমাদের খুব ভাব। মাকে কোনো কথা বললে মা বুঝত, কিন্তু বাবা তো তা নয়। বাবার মানসিকতা ভিন্ন রকমের। বাবার ছিল রাগ, কুঁড়েমি, একরোখামি আর চিরকাল যা দেখে এসেছে বা শুনে এসেছে সেটাকেই আঁকড়ে ধরে থাকা। মা ভেবে ভেবে যা করবে স্থির করত, বাবার মানসিকতায় সেগুলো সম্ভব হত তো না-ই, বাধাই পেত। তাই খুব যখন একঘেঁয়ে লাগত তখন আমি মাঝে মাঝে কম্বলা পিসির কাছে গিয়ে বসে থাকতুম। সেখানে একটু শান্তি পেতুম, মনটা হালকা হত। পিসির অবস্থা ভাল, সংসার ভালভাবেই চলে যাচ্ছে। ছেলে বাবু এখন সমর্থ হয়েছে, রোজগার-পাতি করে। পিসির নিজেরও আয় আছে। আলাদা হয়ে যাবার সময় পিসি একটা ভাল জাতের মোষ কিনে এনেছিল কোলহাপুরের বাজার থেকে, জমান যা পয়সা ছিল তাই দিয়ে। সে মোষ বছরখানেক দিলে খুব দুধ। এর পরের বর্ষাটায় মাঠে চরছে এমন অবস্থায় একদিন বাজ পড়ে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই মারা যায়। পিসি যেন জলে পড়ে গেল, হাল ছেড়ে দেবার মতো অবস্থা, মোষটা মরে যাওয়াতে লোকসান হলো প্রচুর। যেটুকু জমানো পয়সা হাতে ছিল তা গেল মোষ কিনতে। সে মোষ চলে গিয়ে যা সম্বল ছিল সবই তো গেল। তখন থেকেই পিসি কাজ ধরলে; একটা ফসল কাটা জমি সে নিলে। অবশ্য ওতে পিসির কোনো লাভই হয় নি বরং লোকসানই

হয়েছে। বাবুকে পিসি ক্লাস ফাইভে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মা ব্যাটা দুজনেই এখন কাজে যায়।

বাবার নজরে এসেছে একটা লোক পিসির কাছে যাতায়াত শুরু করেছে, আসতে যেতে পিসির ঘরে খেত থেকে সের সের ধান এনে দেয়, রাতে পিসির বাড়িতে রাত দশটা অবধি বসে থাকে। সাবা পাড়া এটা জানে। এ নিয়ে কানাঘুসো, ফিসফিসানি চলছে। মার কানেও এসেছে আর মা বাবাকে বলেওছে।

পিসিকে বাবা যখন বলতে গেল, তখন পিসি ফোঁস করে উঠল, সাপের লেজে যেন পা পড়েছে। "আমার ব্যাপারে একদম নাক গলাতে এসো না। যেদিন আলাদা করে দিয়েছ, সেদিন তুমি আমার কাছে মরামানুষ আর আমিও তোমার কাছে মরেই গেছি ধরে নাও। এখন কি তুই আমাকে না আমার ছেলেকে খাওয়াচ্ছিস, তোর ধড়ফড়ানিটা কিসের জন্য? তুই তোর দিকটা দেখ, আমাকে আমার দিকটা দেখতে দে।"

"তুই যদি মাথা উঁচু করে মানসম্মান নিয়ে থাকতে পারিস থাক না কেন? তোকে কি আমি বারণ করেছি?"

"আমি আমার মানসম্মান দেখব'খন তুই তোরটা দেখ।"

"এমন বেয়াড়াপানা করলে তোকে আমি ঘর থেকে বার করে তোব শ্বশুরবাড়ির দেশে পাঠিয়ে দেব, সেখানে বসে বসে গুয়ের ঘুঁটে দিস গে যা।"

"বটে! আমার ওপর দাদাগিরি ফলাচ্ছিস। জানিস, আমি তোকে মোটেই ভয় পাই না। আমি আমার নিজেব জোরে এ সংসার পেতেছি, আমি থাকি আমার বাপের ঘরে। তুই কি ভাবচিস আমার জন্য ঘব তুই বেঁধে দিয়েচিস? জানিস তো এ গাঁটা রতনু যকাতের নয়, এটা বাল মহারাজেব গাঁ। কাগল থেকে আমায় তাড়াবি তুই? ওসব মতলব ছাড," পিসি যে খুব রেগে গেছে তা বুঝতে বাবার বাকি রইল না, সব ভেবে চুপ করেই গেল। আর কোনো উপায় নেই— এ হচ্ছে ঘরের ঝগড়া। পাড়ায় সেটা নিয়ে গেলে নাক তো বাবারই কাটা যাবে। পিসির চালচলন তাই বাবা দেখেও না দেখার ভান কবে এর পর এ নিয়ে কোনো কথাই বললে না।

এটা অবশ্য অনেক কাল আগের কথা। ছোকরাটি বছর দুয়েকের ভেতরই টাইফয়েডে মারা যায় আর এ ব্যাপারটাও ওখানেই শেষ হয়ে যায়। তাছাড়া, বাবারও এখন বয়স-হয়েছে পঞ্চাশ ধরে ধরে পিসি বাবার চেয়ে বছর দেড়েকের ছোট। যেকালে মানুষের এসবে মতিগতি হয় সে বয়স দুজনেই পেরিয়ে এসেছে, পিসিরও সে তেজ আর নেই। কিন্তু ঐ ব্যাপারটা নিয়ে দুভাই বোনে কথা বন্ধ হয়ে গেল। পরেও এরা আর কখনই অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেনি। খুব দরকার পড়লেই এ ওর সাথে কথা বলত, নইলে নয়। দুজনের সংসারের চেহারাও আলাদা। পিসির অবস্থা ভাল, মা ব্যাটা দুজনে খেটে খায়, আনন্দে আছে, কষ্ট নেই। খুব ঠেকে গেলে বা কোনো লোক জোগাড় করতে না পারলে এই বাবুও আমাদের জমিতে দু-একদিনের জন্য এসে খেটে দিত। আমার বাবা আর পিসির ঝগড়া এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। আমিও সুযোগ পেলেই পিসির ওখানে বসতুম গিয়ে। আমার জন্মেরও আগের কত গল্পই না পিসির কাছে

শুনতুম তখন। পিসি বাবার ওপর সব সময়ই রেগে থাকত। বলত, বাবা নাকি ছোটবেলা থেকেই কুঁড়ের বাদশা, বসে বসে খেতে ভালবাসত আর আলালের ঘরের দুলাল হয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকত। একদিকে বলছে, আবার সেইসঙ্গে বাবাকে গাল দিয়ে ঝালটাও মেটাচ্ছে। আমি মনে মনে এতে খুশিই হতুম। আমিও পিসিকে বলে যেতুম আমাকে বাবা কিবকম অত্যাচারই না করে। পিসি চা করে দিত আমি খেয়ে-টেয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়তুম। বাড়িব কেউই এসব জানতেও পারত না।

বাবুরও সিনেমার নেশা ছিল। ওর কাছে সিনেমাব গল্প শুনতুম। তামাসাব গান "লাউনি" ও সরু গলায় মিষ্টি করে গাইতে পাবত, আমাব শুনতে ভাল লাগত, ওভাবে গাইতে চেষ্টাও করতুম। বাবুর সঙ্গে আমাব খুবই আড্ডা জমত।

এগার

স্কুলে পড়া আবার শুরু করা আমার বোধহয় আর হয়ে উঠবে না। কবিতাই এখন আমার নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠছিল। আমি আমার নিজের অনুভূতিগুলোই কবিতায় লিখে যেতে লাগলুম। পড়াশুনার পাট তো চুকে গেছে, তাই কবিতা লিখেই আনন্দ, ছন্দ মিলিয়েই আনন্দ। সারাদিন একা একা থেকে আমি আমার অনুভূতির ভেতরে ডুবে থাকতুম। অনেক কবির লেখাই আমার মনে গভীর রেখাপাত করতে শুরু করলে। তাদের লেখা পড়ে, তাদের রচনার ধারার থেকেই আমি নিজের চেষ্টায় আমার নিজস্ব অনুভূতিগুলোকে ছন্দোবদ্ধ করতে লেগে গেলুম।

আমার কেবলি মনে হত আমাদের বাড়ির অর্থের অভাব, শিক্ষার অভাব, আমাদের এই অশিক্ষিত কুলম্বীজাতের কুলম্বী সংসাবে আমি যেন বন্দী। আমি বেঁচে থাকতে এর কোনো পরিবর্তন আশা করাই যায় না। এভাবেই একদিন এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। হয়তো আমাদের খেতের ধারে ঝোরার দিকেই আমাকে পোড়াবে নয়তো কবর দেবে। এসব চিন্তাই আমাব মনের মধ্যে অহরহ এসে আমাকে অস্থির করে তুলত, মনটা বিষণ্ণতায় ভরে যেত। নিজেকে লাথি ঝাঁটায় তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো মনে হত।

ক্লাস সেভেনের পরীক্ষা পাশ করার পর মামা আমাকে একটা প্যান্ট আর একটা সার্ট পুরস্কার দিয়েছিল। ওগুলো আমি আলাদাভাবে যত্ন করে সরিয়ে রেখেছিলুম। মাঠে কাজ করতে যাবার সময় অন্য ময়লা জামা প্যান্ট পরে যেতুম। মাঠে নামবার সময় একটা ল্যাঙ্গোট আর একখানা সস্তাদরের মোটা থানের কাপড়ের হাতকাটা জামা পরে কাজ করতুম। তখন আমাকে আর চেনা যেত না। দুপুরে বিশ্রামের সময় কবিতার সঙ্গে উপন্যাস, ছোট গল্পও পড়ে যেতুম। গল্প উপন্যাসের পাত্রপাত্রীগুলো কেমন যেন সুখী প্রাণ। তাদের যেন পেট নিয়ে, খিদের জ্বালা নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিল না। তাদের বাবা মা ছেলেমেয়েদের মন বুঝে বুঝেই চলে, কোনো মারামারি বিবাদ-বিসংবাদের বালাই নেই। তরুণ-তরুণীর প্রেম, ভালবাসা গল্পের বিষয়বস্তু হবেই। আমি ভাবতুম আমার জীবনে কই এসব তো দেখি না, শুধু কি টেনে হিঁচড়েই চলতে হবে, কেবল কষ্টই কি পেয়ে যেতে হবে?

যে জগৎ আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, গল্প উপন্যাসে সে জগৎটাকে যেন আমি খুঁজে পেতুম, তাদের সঙ্গে কথাও বলতুম, তাদের অন্তরেব কথা জানতে পেরে যেন কত অন্তরঙ্গ হয়ে যেতুম। মনে মনে হলেও গল্প উপন্যাসের ঐ জগতে বিচরণ করে নিজেকে খুব কৃতার্থ মনে হত।

আমার পড়ার ব্যাপারে কোনো বাছবিচার ছিল না, হাতের কাছে যা পেতুম তাই পড়তুম। কথা খুব একটা বলতুম না। বলাব লোকও থাকত না। অনেক সময় গেছে যখন মাঠে জল ছাড়ার সময় কেবল আমিই আছি। ফলে অনেকটাই অন্তর্মুখী। তখন

এই বইয়ের জগতে মন ঠাঁই পেত, আর আমিও তাতে ডুবে থাকতুম, বাস্তবের সাথে তখন কোনো সম্পর্কই থাকত না।

আমার যখন অবস্থা এরকম, বাবা মা তখন আমার বিয়ের কথা ভাবতে বসলে, আমার মন বোঝবার জন্যে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিলে। একদিন দুপুরে খামারের ঘরটার পাশে বসে একটু বিশ্রাম করছি, সেই সঙ্গে ছবি আঁকাও চলছে। পেছনের দিকের আবর্জনার টিবি থেকে একটা কয়লার টুকরো তুলে তাই দিয়ে এঁকে চলেছি। ভেতরের ঘরে বাবা আর মা কথা বলছে, বাইরে থেকে শোনা যাচ্ছে। "আগে ছিল স্কুলে যাবার গোঁ, কিছুতেই বার করা যাচ্ছিল না, সেটা যদি বা গেল এখন এ কি আপদ! সারাদিন বইয়েতে ডুবে থাকে আর অস্থির অস্থির ভাব! কি হবে বুঝতে পারছি না, চাষবাসে ওর মন নেই সে তো জানি," বলে বাবা মাকে আবার জিজ্ঞেস করলে, "আচ্ছা, রাতে ও বাড়িতে থাকে?" জবাবে মা বলে, "কোথায় থাকে? ফিরে চা খেয়েই পালায় গলির স্কুলেব অন্য ছেলেদের কাছে।"

এসব কথাবার্তার পর বাবা মা ঠিক করলে ওরা আমার বিয়ে দেবে। ওদের ধারণা বিয়ের পব বৌয়ের খাতিরে আমার ঘর আর খামার দুটোতেই মন বসবে। ওদের মতে আমার বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। "মাঠে ঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন মেয়ের তো অভাব নেই, ছেলেটা এদেরই কোনো একটার পিছু ধবলে কি করবে?"

"তা, এ ধরনের কিছু কি ও করেছে নাকি?"

"করেনি এখনও, কিন্তু মাহারদের এশার মতো হতে কতক্ষণ?"

"সে ছোঁড়া তো শুনলুম একটা মেয়েকে নিয়ে ছ'মাস হল পালিয়েছে। বিয়ের বয়স হলে, তা ছেলেই হোক বা মেয়েই হোক, এ ধরনের ঘটনা ঘটেই থাকে।"

বিয়ের ব্যাপারে বাবার খুব আগ্রহ। মাকে বললে, "দেখ জিজ্ঞেস করে, বিয়ে করবে নাকি? বৌয়ের গুণে হয়তো চাষের কাজে মন দেবে, স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে তখন কাজ করবে।" বাবা হয়তো ছেলের বিয়েতে একটু আমোদ-আহ্লাদ করতে চায়। আমি বাবা-মার মতলবটা টের পেয়ে আরো সাবধান হয়ে গেলুম। আসল কারণটা কিছুটা বোঝা গেল। বিয়ে দিয়ে দিলে আমি আর পড়াশোনা চালিয়ে যাবার নামও নেব না, গোয়াল ঘরে গোরুর মতো চিরকালের জন্যে বাঁধা থাকব আর ওদেরই মতো মাঠে খেটে মরব। তার জন্যই বিয়ের ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমার বড় মামার মেয়ে আক্কা আমার থেকে পাঁচ ছ'বছরের ছোট হবে। তার বয়স যখন পাঁচ সাত এরকম হবে তখনই মার আর মামার ভেতর এ নিয়ে কথা হয়ে গেছে। আমি তখন ক্লাস ফোর কি ফাইভে পড়ি। মা আর মার দাদা ভেবেছে বেশ মানাবে আমাদের দুজনদের, মামাও মেয়েকে পড়াচ্ছে। যে বছর মেয়েকে নিয়ে মামা কাগলে এসেছিল তখনই নাকি সব পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে। আর কথা দেয়া হয়ে গেছে বলেই নাকি মা মেয়েটিকে চুড়িও পরিয়ে দিয়েছে। মেয়েটি এখন ক্লাস ফাইভে পড়ে। এ সম্বন্ধ মারও খুব মনে ধরেছে, বাবারও অমত নেই। তাহলে আর আটকাচ্ছে কিসে? এবারে গলায় বিয়ের ফাঁস পরিয়ে আমাকে ভাল করে ধরা হোক, সাদা কথায় মোটামুটি মতলবটা হল এই।

পরের দিনের ঘটনা। জমিতে জল দেয়া শেষ, দুপুরে ভাখরি খাওয়াও শেষ। আমরা তিনজন আখের পাতা কাটছি। তখন মা একটু একটু করে কথাটা পাড়বার মতলবে বললে, "হ্যাঁরে আন্দা, দেয়ালীতে তোর মামা ঘুরে গেল আমাদের এখানে তোর মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

দাদা বলেছে, "আন্দা এখন বড় হয়েছে, লায়েক হয়েছে। আমার মেয়েও তো আর সে ছোটটি নেই, দুতিন বছর পরেই বিয়ের যুগ্যি হবে। এ বছর আর নয়তো সামনের বছর ওদের বিয়েটা দিয়ে দিলেই তো হয়। বিয়েটা আমাদের চোখের সামনে হয়ে গেলে আর দুশ্চিন্তাটা থাকে না, চোখ বুজলেও খেতি নেই।"

আমি আর ভণিতা বাড়তে দিলুম না, বললুম, "আমি এখুনি বিয়ে করছি না।"

বাবা আমার জবাব শুনেই রেগে আগুন, কিন্তু রাগ দেখালে না, চেপে রেখে বললে, "সময়মত বিয়ে হলেই ভাল হয়রে। তোর বয়সী সনগরদের দু তিনটি ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বিয়ে হলে, ছেলেপুলেও তাড়াতাড়ি হবে, সংসারে সুখের দিনও তাড়াতাড়ি আসবে।"

"দরকার নেই সুখের। আগে আমার পড়া শেষ হোক, তখন ভাবা যাবে," আমি খুব ধীরে অনেকটা নিজেকেই যেন বললুম কথাটা।

"তোর পড়া আগুনে ফেলে দে নয়তো জলে ডুবিয়ে দিগে যা, হারামজাদা কোথাকার! এত বাড় বেড়েছিস! বিয়েটা এখন না করলে করবি কখন? দাড়ি গোঁফ গজালে বিয়ে করবি মনে করিচিস?"

আমি চুপ, কোনো কথা বললুম না দেখে বাবা আরো রেগে গেল।

"একটা কিছু বল, জবাব দে, নইলে এই দেখেচিস কাস্তে? তোর মাথায় বসাব", সত্যি সত্যি কাস্তেটা তুলে ধরলে বাবা।

আমি কেবল নিজেকে একটু সরিয়ে নিলুম।

"আমার বিয়ের জন্যে এ বাড়িতে কারো কিছু আটকাচ্ছে? বিয়ের পর তো সেই বাচ্চাকাচ্চার নতুন মিছিল শুরু হয়ে যাবে। আর কি হবে? যারা এখন আছি তাদেরই দুবেলা দুমুঠো পেটে দানাপানি জোগাড় করতে পরান অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে, আবার নতুন নতুন পেট বাড়িয়ে হবেটা কি শুনি?"

ব্যস্, আমার এ কথা বাবার দুর্বল জায়গায় ঘা দিল। আমি তো জানতুম মা আর ছেলেপুলে চায় না, কিন্তু বাবার সংযমের অভাবেই মার পেটে বাচ্চা আসছে। আমাকে নিয়ে মার দশটা সন্তান, তার ভেতর দুটো মরে বেঁচেছে।

"শালা! আমার সন্তান নিয়ে কথা! জন্মাবার সাথে সাথে মরলি না কেন রে অজন্মা! না কি, আমার ঘাড়ে শনি হয়ে বসবি তাই? হারামজাদা!" বলে আমি সরে যাবার আগেই বাবা কাস্তের ভারী হাতলটা দিলে বসিয়ে আমার পিঠে, যন্ত্রণায় কুঁকিয়ে উঠে 'মাগো' বলেই চেঁচিয়ে উঠলুম, "এবার তোমার ছেলেমেয়েদের পেট তুমিই ভর গে যাও, আমায় তার জন্য টানাটানি করতে এস না।" তারপরেই এক দৌড়ে বেরিয়ে গেলুম। আস্তে আস্তে আমার সাহস বাড়ছিল আর বাবার কথার পিঠে

কথায় জবাব দিতে শুরু করে দিয়েছিলুম। বাবার ওপর মনটা এমনিতেই বিষিয়ে ছিল।

যাক গে, বিয়ে নিয়ে এরপর আর কেউ কথা তোলে নি। আমার মতটা অনেকটা এরকম— আমি ভাবতুম বিয়ের সময় তো আর চলে যাচ্ছে না, বিয়ে তো করলেই হল। লেখাপড়া শেখার বয়স একবার চলে গেলে কিন্তু গেল— সে সময়টা ফিরিয়ে আনতে গেলে এক জন্ম ঘুরে আসতে হবে। কিন্তু লেখাপড়াটা চালিয়ে যাব কি করে এই নিয়ে দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। বাবার ওপর খালি রাগ হত। আমার স্কুলে পড়া বন্ধ করে দিয়েছে, সবসময় নোংরা গাল দেয়, কুঁড়ের বাদশা, রাজ্যির কাজ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে— এ সবের জন্যে বাবা আমার দুচোখের বিষ ছিল। কাজের চাপে আমি শেষ হয়ে যাচ্ছিলুম। শেষে আর না পেরে আমি চালাকি করতে লেগে গেলুম— ইচ্ছে করেই কাজে ভণ্ডুল করে রেখে বাবাকে খেপাতুম। শেষ পর্যন্ত তো আমাকে দিয়েই কাজ তুলতে হবে তাই বাবা এখন রাগ দেখিয়ে আর গালাগাল দিয়েই ঝালটা মিটিয়ে নিত, গায়ে আর হাত তুলত না। তাছাড়া গায়ের জোর আমারই বা কম কিসের?

জোয়ার কাটার সময় পাঁচ ছ'দিন ধরে জোয়াব কাটা হচ্ছিল। দানাগুলো ভাল করে না শুকোলে সেগুলো ছাড়ানো যায় না— সেজন্যে মাঠের ভেতরেই গর্ত করে ফসল কেটে ফেলে রাখা আছে শুকোবাব জন্যে। এদিকে শীতও পড়েছে তেমনি। জমি এখন ফাঁকা— মাঠে ফসল নেই, তাই হিমেল হাওয়ায় হাড় কাঁপুনি শীত। জামার 'পরে জামা পরে মাথাটা কাপড় দিয়ে আঁটসাঁট করে বেঁধে ঘোঙরী মুড়ি দিয়ে কোনোরকম শোওয়া। শীতে বড্ড কাবু হতুম। এরপর আছে রাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠে মাঠে টহল দেয়া। ফসল কেটে আঁটি বেঁধে যেখানে রাখা আছে তার চারধার দিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিতেই হত। চুরি করে নেবার এই তো সময় চোরেদের। শীতের রাতে জোয়ারের খেতে ঢুকে চুপি চুপি ফসল বস্তায় করে নিয়ে চলে যেত। কাটা ফসল শুকোতে দেয়া আছে হয়তো— তাবও নিস্তার নেই সেগুলোও বস্তায় করে নিয়ে পালাবে। রাতটা তাই বলতে গেলে জেগেই কাটাতে হত— সারা রাত ঘুমোবার জো ছিল না।

গায়ে একটা জমা চড়াব, বাবা বলে উঠল, "জামা পরে আর কাজ নেই রে আন্দা, গা গরম থাকলে ঘুমটা গাঢ় হয়, চোর তাহলে ঝেঁটিয়ে সব নিয়ে যাবে।" ব্যস্, গায়ে শীত বস্ত্র না দিয়েই শুতে হল। তাবপর একটু যদি বা দু চোখের পাতা এক হতে যাচ্ছে, বাবা বলবে, "ওঠ্‌রে আন্দ্যা, মাঠটা একটু ঘুরে আয়।"

"এই একটু আগেই তো ঘুরে এলুম।"

"হারামজাদা, তারপর একটা ঘণ্টা কেটে গেছে। আমিও এরই ভেতর একবার ঘুরে এসেছি। তখন তো তোর নাক ডাকছিল, ওঠ এবারে। তোর একটুখানি ঘুমে হয়তো আমার সম্বৎসরের ফসল লোপাট করে দেবে।"

আর কি করব, উঠতেই হত। ফসলের সময়ে দিনেরাতে এক মুহূর্তের জন্যও ফুরসৎ মিলত না। জমিতে মাটি খুঁড়ে ফসল রাখার জায়গা তৈরি হত, তাতে জল দেবার পর, তার ওপর দিয়ে বলদ হেঁটে যেত, মাটির ঢেলা পিটিয়ে সমান করা

হত। সারাদিন ধরে হয় মাঠে জল দাও, নয়তো বলদের খাবারের জোগাড় দেখ নয়তো আর কিছু কর। একটা না একটা লেগেই থাকবে সারাদিন। যত রকমের হয়রানি।

রাত জেগে দিনে কাজ করে ফল হত এই যে রাতে সারাক্ষণ ঘুমই পেয়ে যেত। দিনেও শরীর চলতে চাইত না, একটু আরাম চাইত। বাবার গালাগাল তাই দিন নেই রাত নেই শুনতেই হত। অবশ্য বাবারও খাটুনি হত, দিনের শেষে বাবা হয়তো এসে বলত, "যা তো ভাখরি নিয়ে আয় তো।" গাঁয়ের দিকে যাবার চাড় আমারও কিছু কম ছিল না। বাবার ধান্দা ছিল অন্যরকম। এ ফাঁকে বাবার দু তিন ঘণ্টার তোফা ঘুম হয়ে যেত। রাতে খাবারের এ সময়টাতে চুরি করতে বড় একটা কেউ আসত না— ফলে বাবার বেশ গাঢ় ঘুমই হত। আমার কিন্তু কোন বিশ্রামই হত না। ফসল কেটে জমিতে ফেলে শীষ থেকে দানা আলাদা করা হচ্ছে। দিনের শেষে শুরু করে শেষ হল গিয়ে রাত দশটা সাড়ে দশটায়।

এমনি একটি দিনের কথা। সেদিন মা ভাখরি এনেছে মাঠে। দু মুঠো চালও এনেছে এই সঙ্গে। আমাকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে বাবা ভাতটা রান্না করলে। কাজ সেরে খেতে খেতে সেদিন প্রায় এগারটা বেজে গেল। বলদগুলোকে জাবনা দিয়ে মাঠেই একটা শুকনো ঘাসের চাটাইয়ের 'পরে বস্তা পেতে ঘোঙরী মুড়ে শুয়ে পড়লুম। কখন যে ভোর হয়ে গেছে জানতেই পারি নি। দিন পড়তে না পড়তেই গাছ থেকে জোয়ারের দানা আলাদা করার কাজ শুরু হয়ে যেত, সারাদিন চলত তাতে হাওয়া দেয়া, তারপর দিনের শেষে বস্তায় ভরে জোয়ার ঘরে তোলা হত। তাই ভোর থাকতে থাকতেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে জোয়ারে হাত দিলুম। ফসল গোছাবার কাজটা আমার ওপর দেয়া আছে কারণ আমিই শক্ত সমর্থ জোয়ান। বাবা আমায় বলেছে যে বাবা থাকবে গোবর, কাদা এসব পরিষ্কার করার দিকে আর আমাকে থাকতে হবে জোয়ারের দিকটায়। সেখানে বাঁশের মাচার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঁচু থেকে হাওয়া দিতে হয়। দিনের আলো থাকতে থাকতেই এ কাজ শেষ হওয়া চাই। আমি 'আচ্ছা' বলে কজে লেগে গেলুম। এমন কাজের চাপে ঘুমটাই ভাল হল না। সেই কত ভোরে উঠেছি। জোয়ারের গাছে আছাড় মেরে গাছ থেকে দানা আলাদা করতে লাগলুম আর বলদের জাবনা যেখানে বোঝাই করা ছিল সেখানে তুষগুলো ঠেলে দিয়ে জমা করতে লেগে গেলুম। বাবা দেখছি গোবর বার করতে ভারি ব্যস্ত, অন্য কিছুতে মনই নেই। ততক্ষণে রোদ উঠেছে মাথার ওপর। আমি আর বাবু দুজনে মিলে ফসলের তুষ হাত দিয়ে নেড়ে চেড়ে বার করে দিলুম— ঝড়তি পড়তি যেটুকু ছিল সেগুলোকে। সকাল থেকে সেই এক কাপ চা ছাড়া পেটে তো কিছুই পড়ে নি। যখনি হাওয়ার বেগ আসছে তখনই বাবুর হাতের জোয়ারের গামলার তুষ ঝাড়া হয়ে যাচ্ছে। এক একটা গামলা এমনিভাবে শেষ হতে না হতেই আমি আর একটি ভরা গামলা এগিয়ে দিচ্ছি। হাওয়ার বেগ কখন আসবে তার জন্যেও হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতে হত। বাবা নীচে বসে জোয়ারের বস্তায় বাড়ি মারছে আর মনে মনে ভেবে নিচ্ছে এবারে কত বস্তা জোয়ার হবে। ভাবছে, 'দুমণ বেশি বই কম হবে না।' যা আছে মনে মনে, মুখে তাই বলে দিচ্ছে। বাবার পুরো বিশ্বাস ছিল ভগবানের ওপর। বাবার ধারণা, যেহেতু বাবা কারো

ক্ষতি করে নি তাহলে ভগবানই বা তাকে কম দেবে কেন? 'এত ভক্তি করি ঠাকুরকে ঠাকুর নিশ্চয়ই দু এক মণ জোয়ার বেশিই দেবে আমাকে' এই হল বাবার বিশ্বাস। এ সব চিন্তা করার ফল হল এই বাবার ঠাকুরের ওপর শ্রদ্ধাভক্তি আরো বেড়ে যেত আর আচার-বিচারের দিকে আরও বেশি নজর দিতে লেগে গেল। মাঠে যে গর্ত করা হয়েছিল তা থেকে কত জোয়ার সরল আর কত রইল এ দিকে বাবার কড়া নজর থাকত। জোয়ারে হাওয়া দেবার আগে বাছাই জোয়ার একটা পাত্রে ঢেলে সমান করে রাখতে হত— এটাই রীতি। এসব নিয়ম ঠিক ঠিক মানা হচ্ছে কিনা তার দিকেও বাবার একই রকম কড়া নজর থাকত। সেই সাত সকাল থেকে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে বসে শরীর কাহিল হয়ে নুয়ে পড়ত। গায়ের জামাতে জোয়ারের তুষ ঢুকে সারা শরীর চুলকোচ্ছে, কিন্তু হাত দিয়ে চুলকোবার উপায় নেই অমনি বাবা বলে বসবে, "চুলকোস না, এতে লক্ষ্মী বিরক্ত হন।" কি আর করি, থেমে যেতুম। তাও এরই মধ্যে মাঝে মাঝে হাত অবাধ্য হয়ে চুলকোতে লেগে গেলেই বাবা আবার চেঁচিয়ে উঠত রাগে। পুব দিকে মুখ করে এক দিক ধরে জোয়ার ভরতে হত। পাত্রের আকারটা অনেকটা চাঁদের ষোল কলা পূর্ণ হবার একটু বাকি থাকলে চাঁদকে যেরকম দেখতে হয় সেরকম। এর একটু অন্যরকম হলে বা এঁকে বেঁকে গেলে আর রক্ষে নেই বাবার ভারি রাগ হত। এভাবে চাঁদের মতো করে রাখলে চাঁদ যেমন বেড়ে চলে চাষীর ফসলও তেমনি বেড়েই চলবে এই ছিল চাষীদের বিশ্বাস। জোয়ারের পাত্র যতবারই ভরতে যাও না কেন এভাবেই ভরতে হবে। ফসল এদিক সেদিক চলে গেলে হাত দিয়ে তা সমান করে দিতে হত। আমার রাগ হয়ে যেত, কারণ আমি এসব মোটেই বিশ্বাস করতুম না। আমি মনে করতুম যখন জোরে হাওয়া দেয় তখনই জোয়ার চটপট ভরে রাখা ভাল। কিন্তু বাবার সঙ্গে পেরে উঠবে কে? জোয়ার ভরতে গেলে ঝুঁকে ঝুঁকে ভরতে হয় বলে পিঠটা ব্যথায় একেবারে শেষ হয়ে যেত। বাবার আড়ালে মাঝে মাঝেই তাই বসে বসে ভরতুম। দেখতে পেলেই বাবা বলত, "কি রে আন্দা বসলি যে বড়? তোকে কতবার না বলেছি লক্ষ্মী এতে বিরক্ত হন?" তারপরেই উঠিয়ে দিত। বাবা নিজে কিন্তু বসে বসেই কাজ সারত, অবশ্য বসে করবার কাজই বাবা হাতে নিত। আমার পিঠে কতটা ব্যথা হয়েছে বাবা সেজন্য জানতেই পারত না। জোয়ার ভরতে গিয়ে আমার হাত তুষে ভরে যেত আর সেই সঙ্গে চুলকোনি। পাত্রটা ভ'রেই আমি সেজন্য তালি বাজিয়ে তুষ ঝেড়ে ফেলতুম। আর রক্ষে নেই— অমনি বাবার চিৎকার আর গালাগালি, "আবার তালি বাজাচ্ছিস, বারণ করেছি না? হারামজাদা! তুষ তোকে খুব জ্বালাচ্ছে তাই না? আর লক্ষ্মীকে এমনভাবে ঝেড়ে ফেললে তিনি থাকবেন ভাবছিস? আর একবার তালি বাজিয়ে দেখ তোর হাত চেঁছে ফেলি কিনা।" বাবা যখন দেখত না তখন আমি জোয়ারের পাশে বসে পড়তুম। আবার সেই বকুনি, যখনই দেখে ফেলত। বলত, "হ্যাঁ বোস্ বোস্, আরও বোস। ওভাবে জোয়ারের পাশে আরাম করে বসে থাকলে লক্ষ্মী কখন চলে যাবেন, টেরও পাবি না। হারামজাদা কোথাকার! ওঠ ওঠ মরলে কাল দেখব'খন তোকে।"

"সকাল থেকে কত আর দাঁড়াব? কেন তুমি বোস না? তুমি বসলে লক্ষ্মী বুঝি

পালায় না? আর আমি বসলেই পালিয়ে যায়?" আমি রেগে মেগে বলে ফেলতুম।

"মুখের ওপর জবাব? মেরেই ফেলব। জোয়ার পেটাতে গেলে দাঁড়ান যায় না, ঝুঁকে পেটান যায়? কি খাস? খাবার না গু?" বাবার অভ্যেস মতো নোংরা গাল শুরু হয়ে যেত। গাল না দিলে তো বাবার শান্তি হত না। জোয়ার যেখানে রাখা হত সেই গোলার কাছে বাবা আমাদের কথাই বলতে দিত না। কথা বললে নাকি লক্ষ্মী থাকে না। নিজে কিন্তু সমানে আমাদের সঙ্গে বক বক করে যেত— কোন দরকারে যে কথাগুলো বলত তাও নয়। নিজে যে বক বক করে যাচ্ছে সেটা বোধহয় বাবা নিজেও বুঝতে পারত না। আমাদের মুখে অবশ্য তালা দিয়ে রাখতে হত। বাবার বকবকানি শুনে মাঝে মাঝে আমার খুব হাসি পেত— আমি হাসছি দেখলে মনে মনে রেগে গুম হয়ে থাকত আর সুযোগ পেলেই আমার ওপর তার ঝাল মেটাত। আমিও তেমনি। সুযোগ পেলেই শোধ নিয়ে নিতুম। এই ঝাল মেটানো আর তার শোধ নেয়ার ফলে বাবার আর আমার ভেতর শুধু যে দূরত্বই বেড়ে যাচ্ছিল তাই নয়, চাষ আর চাষীদের ওপর ঘেন্নায় আমার থুতু ফেলতে ইচ্ছে করত।

বাবু আজকাল মাঝে মাঝেই আমাদের এখানে কাজ করতে আসত। বিশ্রামের সময় আমরা একান্তে বসে গল্প জুড়ে দিতুম। বাবা যে আমাকে মারে আর গালও দেয় আর আমিও যে বদমায়েসি করে তার শোধ নেবার চেষ্টা করি সেটা বাবুর নজর এড়ায় নি। সে আমাকে বলত, "তুই তোর বাবার হাতে মার খাস, গাল শুনিস কেন? সে যা করতে বলে সেভাবে কাজ করলেই পারিস?"

আমি বলি, "ধ্যেৎ! আমার এই মাঠে চাষের কাজ করতেও ইচ্ছে করে না, আর বাবার সামনে দাঁড়াতেও ইচ্ছে করে না।"

"এসব বলে কোনো লাভ আছে, বল? যাই বলিস না কেন, তুই তো সেই চাষাই। সেই কুলম্বিদেরই একজন তোকে পেটে ধরেছে আর যতই হোক ও হল গিয়ে তোর বাবা। তুই ওর থেকে সরে পালিয়ে গিয়ে যাবিটা কোথায়? শেষ অবধি তো তোকে এখানেই থাকতে হবে।"

"কেন? আমি আরো পড়তে চাই, চাকরি করতে চাই।"

"ও সব ভুলে যা, আন্দ্যা। তোর স্কুল আজ অবধি কতবার বন্ধ হয়েছে বল তো? অন্তত বার দু-তিন তো হবেই। তোর বাবা চাইলে কি তোকে পড়াতে পারত না? তাছাড়া, চাষবাস করলে ক্ষতি কি? আমাদের বড়রা কি বলে জানিস? ওরা বলে সবচেয়ে ভাল চাষবাস তারপর ব্যবসা আর তারপর চাকরি।"

"তাহলে আমরা বাড়িসুদ্ধু সবাই মাঠে খেটে খেটেও দিনের পর দিন আরও ভিখিরি হয়ে যাচ্ছি কেন, বল তো?"

"তোর বাবার চাষের কথা রাখ। গাঁয়ের মিয়ালাল, রামু আপ্পা, চৌগুলে, রত্নু শেঠজী ওরাও চাষা নয় কি? মাঠে চাষবাস করেই তো ওরা বাড়ি ঘর-দোর করেছে। তুই তো সব জানিস, বাবা।"

"ওদের কথা ছাড়। ওদের নিজেদের জমি আর আমাদের ভাগের চাষ।"

"ভাগের চাষ হয়েছে তো কি হয়েছে? গাঁয়ে গুচ্ছের লোক ভাগের চাষ করে

পয়সাও কামাচ্ছে আর দুটো পয়সা জমাচ্ছেও। তারপরই না নিজে জমি কিনেছে। যাদব দাদুর আবার নিজের জমি কবে ছিল বল? এখন তো ও কুড়ি একর জমি নিজের নামে লিখিয়েছে। ইচ্ছে থাকলেই সব করা যায়, বুঝলি? পাঁচ-দশ বছর খাটলে তোর অনেক হবে, একটা কেন চারটে কাজের লোক রেখে তখন চাষ করতে পারবি আর পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করতে পারবি। তোর বাবার কথা ছাড়, ও তো এক নম্বরের কুঁড়ে আর তার ওপর মুখে সব সময় নোংরা গাল। তুই অন্তত চাষবাসটা মন দিয়ে ভাল করে কর, বাড়ির লোকগুলো একটু সুখের মুখ দেখুক। তোর স্কুলে পড়ে কি হবে?"

আমাদের ভেতর এরকম কথা প্রায়ই হত, বাবু এভাবে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করত। ওর সঙ্গে কাজ করতে খারাপ লাগত না, সত্যি কথা বলতে কি ওর জন্যই মাঠের কাজে এবার আমার মন বসেছে। মাঝে মাঝে দরকার হলেই বাবু আমাদের জমিতে কাজ করতে চলে আসত। রাতে আমি যেতুম ওর কাছে। বাবু এখন আর আগের মতো নেই, এখন সে ধীর স্থির রীতিমত সংসারী। খুব কাজেরও হয়েছে। বাবা ভেবেই রেখেছে যতই হোক বাবু হল গিয়ে ঘরের লোক, নিজের বোনের ছেলে, তাকে জমিতে চাষের কাজে লাগিয়ে নিজে সে যদি গাঁয়ে বা শহরেও যায় তাহলেও বাবু কাজে নিশ্চয়ই ফাঁকি দেবে না। সেজন্যই বাবা ওকে কাজে লাগাত। বাবু কাজে এলে আমার মন বুঝে চলত, আমিও তাই ওর কথা শুনতুম, ভেবে নিতুম ও যা বলছে হয়তো ঠিকই বলছে। ধীরে ধীরে কাজে আমার বেশি করে মন লাগল, ভাবলুম খুব করে চাষবাস করি না কেন? তাহলে তো অনেক ফসল হতে পারে। মন দিয়ে কাজ করতে লাগলুম। মনে হল স্কুলের কথা না তুললেই তো হল, তাহলে বাবা চুপ মেরে যাবে। তাছাড়া, বয়স তো আমারও বাড়ছে, আমিও তো বড়ই হচ্ছি। বাবা কি আর আগের মতন চলবে? এখন তো বুঝে চলা উচিত।

ফসল কাটার সময় এসে গেল, গুড় জ্বাল দেবার ব্যবস্থাও হল। গাঁয়ে সব চাষী লাঙল মাঠে নামিয়ে দিলে। বাবা আমাদের বাড়িব দুটো বলদ নিয়ে মাঠে লাঙল চালায়। দু তিন বছর ধরে এভাবেই চলছে। বলদগুলো বড় রোগা, হাড় বেরিয়ে গেছে। ভাল খাবার খেতে পেত না ওরা। ওদের কপালে জুটত শুধুমাত্র শুকনো খড়, ও খেয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকা যায়। ওরা লাঙল টানলে ফলাটা মাটির ভেতর ঢুকতই না ভাল করে। ওপর ওপর যেন আলতোভাবে বুলিয়ে যেত। লাঙলে বেশি জোর দিলে বলদগুলো পা না তুলে স্রেফ এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত। আমাদের আশেপাশে চাষীরা কখনও ছ'টা, কখনও বা আটটা বলদ দিয়ে জমিতে লাঙল দিত। নীচের মাটি এক হাত অবধি আলগা হয়ে যেত, তাতে মাটি ছানতও ভাল, ফসলও তেমনি ভাল হত। বাবাকে আমি তাই বললুম, "এবার ছ'টা বলদ দিয়ে লাঙল দিই জমিতে। এ ক'বছর দুটি বলদে লাঙল দিয়ে তো দেখলে ফসল মোটেই ভাল পাওয়া যাচ্ছে না, বছরের পর বছর জোয়ারের ফলন কমেই যাচ্ছে।"

বাবা বললে, "তা, টাকাটা আসবে কোত্থেকে? হপ্তায় চার-চারটে দিন লাঙল দিতে হয়। রোজ দু জোড়া, চার দিনে ক'টাকা হয় বলতো? ঐ পয়সায় জোয়ার

কিনলে দু মাস সবাই খেতে পাবে।”

শেষ পর্যন্ত সেই দুটো বলদ নিয়েই জমিতে লাঙল দেয়া হল। গাছের গুঁড়িগুলো সব উপড়ে ফেলা হল। এর ফলে জমিতে যে আগাছা ঘাস এসব ছিল তা একবার দুবার জল হতেই সব মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ফি বছরই এ আগাছার ঝাড় যেন বেড়েই উঠছিল। ভেবেছিলুম এ বছর ছ'টি বলদে লাঙল দিয়ে এসব আগাছার ঝাড় সব মূলসুদ্ধ টেনে একেবারে নির্মূল করে দেয়া যাবে। গরমের সময় মাটি শুকনো হয়ে আলগা হবে, চিড়্ খাবে, আর তখন সে চিড় খাওয়া মাটিতে আগাছা টেনে বার করা কঠিন হবে না। সারা মাঠটা তখন সুন্দর হয়ে যাবে। কিন্তু তা আর হল কই? সেজন্যই কখনো সখনো বোনেদের আর শিবার ওপর আমার কাজ ছেড়ে দিয়ে জমিতে নেমে পড়তুম আর খুব মন দিয়ে আগাছা খুঁজে বার করতুম। বড় লাঙল চালাবার মুরোদ না থাকলে এ ধরনের দুর্ভোগ কপালে থাকবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? একদিন এমনি আগাছা খুঁজে বার করছি, এমন সময় বাবা আমাকে ডাক দিলে, “এদিকে আয় তো।” কাছে যেতেই আমাকে বলদের দড়ি ধরিয়ে বললে, “জলটা তোল।”

“কেন?”

“দেশাই শেঠ ডেকে পাঠিয়েছেন। মেয়েটা খবর এনেছে। দেখি উনি কি বলেন। কোলহাপুর থেকে এসেছেন মনে হয়।”

“এক্ষুনি না গেলেই নয়? রাতে তো গাঁয়ে ফিরবেই, তখনি না হয় হয়ে এসো,” আমি ঠিক জানতুম দেশাই এমন কিছু জরুরি কাজের জন্য তলব করেন নি। অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ না হলেও উনি এমনিভাবে ডেকে পাঠাতেন।

“নে, নে, দড়িটা ধর, খুব হয়েছে। আমাকে আর বুদ্ধি দিতে হবে না। বড়লোকেরা যখন ডাকে তখুনি যেতে হয়। বুঝলি?”

“দেখি না এই আগাছার একটা গোছা বেরোয় কিনা?”

“আবার কথা বাড়ায়? আগাছার নাম করে বাচ্চাদের কাজে লাগিয়ে এখানে বসে বসে কাটাবি এই তোর মতলব, না? এভাবে তো আমাদের সবাইকে পথে বসাবি তুই।”

আমি চুপ করে দড়িটা নিয়ে নিতেই বাবা মাথায় পাগড়ি বেঁধে চলল গাঁয়ের দিকে।

এবারে আখ লাগাব ওপরের দিকের জমিটায় এরকমই ভেবে রেখেছি। জমিতে লাঙল দেয়া হয়ে গেছে। জমিটা এক ধার দিয়ে উঁচু হয়ে যাচ্ছিল। নালার জল জমিতে দিতে গেলে মাটি সরিয়ে কষ্ট করে জল ঠেলতে হত ওপরে। যে জল দিত তার পরিশ্রম আর হয়রানির একশেষ হত। আবার একরাশ জল জমে গেলেও মাটি ফেটে হুড় হুড় করে সব জল নেমে যেত গড়িয়ে, ফলে কত জল শুধু শুধু নষ্ট হত, মাটি দিয়ে জল আটকানো মুস্কিল হত। বলদগুলো কষ্ট করে প্রাণপণে জল ঢেলে যেত কিন্তু এত করেও জল সেই নষ্টই হত। জল আটকাবার কাজটাও আমাকেই করতে হত। অবশ্য মাঝে সাঝে শিবার ওপরেও এ কাজের ভার দিয়ে দিতুম। কিন্তু ও বেচারা রুগী মানুষ একাজ পারে কখনও? খানিক বাদেই কাঁদতে লেগে যেত।

তারপর আর কি? সেই আমাকেই আবার একাজে হাত লাগাতে হত। এতে গাছে জল কমে যেত। জল কম দেখে বাবা যেত খেপে, বলত, "জল কম কেন রে, হারামজাদা? নিশ্চয়ই জল দেয়া ফেলে রেখে খেলতে বসে গিয়েছিলি?"

আমি তাই অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করলুম যে, জমিতে লাঙল দেবার পর খাল যেখানটায় কাটা হয়েছে সেখান থেকে মাটির ঢিবি দিয়ে বাঁধের দিক দিয়ে একটা খাল কেটে জল রাখার বন্দোবস্ত যদি করে ফেলতে পারি সেটাই হবে পাকাপাকি ব্যবস্থা আর আমিও এ ঝামেলা থেকে নিস্তার পাব। তবে খাল কাটা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। চারটে লোকের কম করেও দু তিন দিনের কাজ। আমাদের বাড়ির সবাই হাত লাগালে কাজটা করতে চারদিন লেগে যাবে।

বাবাকে বললুম, "এবারে এ জমিতে আখের চাষ করব। বাঁধের ধারে খাল কেটে নিলে আর জল দাঁড়াবার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হবে না কখনো।"

বাবা বললে, "খাল কেটে কি হবে? এতদিন তো খাল ছাড়াই বাঁধ বেঁধেই জল টানা হয়েছে। আটদিনে একবার জল দিলেই তো হয় ওখানে, বর্ষায় তা-ও লাগে না। তার জন্যে লোক খাটিয়ে ক'টা দিন বরবাদ করে হবেটা কি? তারচেয়ে ও সময়টায় শাক-সবজি তুলে ফেললে কাজে দেবে।"

এদিকে মাঠে বীজ রোয়া সারা হয়েছে ততদিনে, গাঁয়ের রাস্তায় সার ভর্তি গাড়ি আসছে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ির আবর্জনা তো চার-পাঁচ গাড়ি হবে, বেশির ভাগটাই হল গিয়ে ছাই। অন্য চাষীরা সেই সংক্রান্তি থেকে গাঁয়ে সার তুলে নেবার জন্যে গাড়ি ঘোরাত আর সার কেনা সারা হলে গাঁয়ের শেষ সীমানায় সব সার নিয়ে গিয়ে একরাশ করে ফেলত। একবার বর্ষা শুরু হলেই এই সার গাড়ি দিয়ে টানতে টানতে নিজের নিজের জমিতে নিয়ে যেত। মাঠের দিকে যেতে ঐ সব সারভর্তি গাড়ির যাওয়া আসা চোখে পড়ত। এসব দেখে মন আমার চনমন করে উঠত, এবার তো সার তৈরির কাজে আমাকেও নেমে যেতে হবে। সার না দিলে ফসল তো তেমন জোরদার চাঙ্গাই হয়ে উঠবে না। আমাদের জমির যা হাল, ওখানে ঘাস আর জোয়ার একই রকম দেখতে লাগে। জমিতে সার দিলে তবেই না ফসল ফলবে, নইলে তো হবে আকন্দের জঙ্গল। বাবাকে তাই বোঝাতে চাইলুম, "বাবা, এবার ভাল করে সার তৈরি করি চল। গেল চার-পাঁচ বছর জমিতে মোটে সার পড়ে নি-- ফলনটা আসবে কোত্থেকে?"

"সার টানতে পয়সা লাগবে না? ঘরে খাবার কেনবার পয়সা জোটে না, বাবু আমার সার টানছেন। তা সে পয়সা আসবে কোথা থেকে শুনি?"

"গুড় বানানো যখন হয়ে গেছে তখন তা থেকে কিছু পয়সা সরিয়ে রেখে একটা কিছু করা যাবে 'খন।"

"গুড়ে পয়সা বাঁচে নি। আমি দালালের কাছ থেকে আগে থেকেই ধার করেছিলুম। গুড় বেচার সময় সে ধারের টাকা উসুল করে নিয়েছে। এবারে বাকি রয়েছে জমির মালিককে খাজনা দেয়া। সেই একশ টাকা যে করেই হোক জোগাড় করে দিতে হবে," এই বলে বাবা আমাকে থামিয়ে দিলে।

আমি তাও বলেই যাচ্ছি, "সার না দিয়ে কি পারা যাবে ?"

"সে পরে দেখা যাবে 'খন। এবারে গুড় বেচে টাকাই আসে নি। আমি আর কি করি বল ?"

"সার দেয়া হয় না বলেই তো ফসল ভাল হয় না, আর ফসল ভাল হয় না বলেই পয়সাও ভাল পাওয়া যায় না। এবারে আখ চাষে তো ঐ একই অবস্থা হয়েছে। যেমন করেই হোক, ধার করে হলেও সার দিয়ে ফলন এবারে ভাল করতেই হবে।"

প্রত্যেকের জমিতে বীজ রোয়ার পর ভেড়া ছেড়ে দেয়া হত। আমাদের জমিতে তার কোনো বালাই ছিল না। বছর বছর ধনগরদের পেছনে খরচ করতেই হত। টাকা নিয়ে ওরা ভেড়ার দুটো একটা দল দিত ছেড়ে মাঠেতে। কিছু না দিতে পারলে অন্তত জোয়ার দিতেই হত অদের। যে চাষী জোয়ার ছাড়া অন্য জিনিস দিতে পারত সে তার জমিতে আগেই ভেড়ার দল পেয়ে যেত। আমাদের খেতে ভেড়া আসত অনেক দেরীতে। ভেড়ার নাদিতে সার হয় খুব ভাল, সেজন্যই প্রত্যেক চাষীই ধনগরদের আগে ভাগে নিয়ে যেত ওদের জমিতে। এ বছর আমাদের কাছে ভেড়া এল একেবারে বর্ষার সময়। আর সেও কেন এল তার আসল কারণটা বুঝতে পারলুম অনেক পরে। এবারে জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ্টি হয় নি। আষাঢ়ে দু-একবার জল নামল। তাতেই বীজ রোয়ার জন্য তাড়াহুড়ো লেগে গেল। এভাবে বৃষ্টির পর জমিতে ভেড়া ছাড়লে আরো কাদা কাদা হয়ে মাটি আরো ঘেঁটে যায় তার ফলে মাটি আরেকবার ছানতে হতো বীজ রোয়ার সময়। সেজন্য এ সময় ভেড়া মাঠে বড় একটা কেউ ছাড়ত না। আর ঐ জন্যেই ধনগররাও ওদের ভেড়া ধার নেবার জন্য যে দাম দিতে হত তা কমিয়ে ফেলেছে, ওদের রোজগার এখন প্রায় নেই বললেই চলে। তাই তো বাবার মত যারা খুব ঠেকায় পড়েছে তাদের ওরা জিজ্ঞেস করে বেড়াচ্ছে, "কি গো, ভেড়া বসাবে নাকি তোমাদের জমিতে ? যা পার দিও।"

বাবার হল লোভ, গিলল টোপটা আর সেই ভেজা মাটিতেই ভেড়াদের বসালে নাদি ফেলবার জন্যে। পুরো জমিটা ঘেঁটে একশা। সে বর্ষার কাদার ভেতর বাবা আর আমি তিন রাত ধরে ভেড়া চরালাম। ফলে যা হবার তাই হলো। বীজ রোয়া হ'ল ঠিকই কিন্তু তা হলো ওপর ওপর, মাটির ভেতরে বীজ ঢুকলই না। তাতে আবার আদ্ধেক বীজ পাখিতেই খেয়ে নিল। শেষে দেখা গেল, গাছ খুব কম হয়েছে, বছর বছর যেটুকু বা হতো এবারে তার আদ্ধেকেরও কম হবে।

এদিকে বৃষ্টিও আরম্ভ হয়ে গেল। আমি মাঠ আগলাতেই রয়ে গেলুম। একা একা খেতে রাত কাটাতুম, বেশ লাগত। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে যা বই পাওয়া যেত, পিদিমের আলোয় তা পড়ে ফেলতুম। এ বর্ষায় আমার গোরু বিয়োল। এবারেও এঁড়ে বাছুর হল। আগের এঁড়ে বাছুরটার গায়ে সাদা আর লাল দাগ, কপালে চাঁদের মতো তিলক, ভারি সুন্দর দেখতে। দু তিন বছর বাদে নতুন এঁড়েটার সাথে জুড়ে দিয়ে মাঠে এক জোড়া বলদ নামিয়ে দেব মনে করে আমি আগের এঁড়েটাকে খুব যত্ন করতে লেগে গেলুম। বর্ষায় ওকে সবুজ তাজা ঘাস ভাল ডালপাতা এসব খাওয়াই, গায়ে হাত বুলিয়ে পরিষ্কার করি। ওরা গা একদিকে যতই চকচকে হচ্ছে আমার

উৎসাহ তেমনি বেড়ে যাচ্ছে। এখন ওর কি তেজ! একটা পাথরের খুঁটির সাথে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখলে কি হবে, ও সেই খুঁটিকে ধাক্কা দিয়ে লম্ফ ঝম্ফ করে, খুঁটিটা টেনে উপড়ে ফেলবার উপক্রম। অচেনা লোক দেখলে কেউটে সাপের মতো ফোঁস করে। দেয়ালীতে বাছুরটা অনেক বড়, প্রায় দ্বিগুণ, হয়ে গেল। ওর ঐ তাগড়া চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার মন ভরে যেত, হাঁ করে চেয়ে থাকতে মন চাইত।

দেয়ালী শেষ হতেই আখ মাড়াই করার সব বন্দোবস্ত হয়ে গেল। আখের দর দাম বায়না মরশুম পড়ে গেল হৈ চৈ করে। যে যার গুড়ের খরিদ্দার খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ ব্যাপারে চাষীদের ভেতর বেশ রেশারেশিও টের পাওয়া যায়। ফি বছরের মতো এবারেও বাবা এ কাজে নেমে পড়লে। আখ মাড়াই করার খরচ জোগাড় করতে বাবা গেল দালালের কাছে টাকা ধার করতে, কিন্তু দালাল টাকা দিলে না। সারা বছর ধরে ওর কাছ থেকে অনেক টাকা ধার নেয়া হয়েছে। তাই খালি হাতেই বাবাকে ফিরতে হল। বাবা বুঝতে পারছে না এখন কি করা। জমির খাজনা ভীষণ বেড়ে যাবার দরুণ জমি থেকে লাভ তো দূরের কথা, হচ্ছে কেবলি লোকসান আর তা বছরের পর বছর বেড়েই চলেছে। জমির মালিক খাজনা এক পয়সাও কমাতে রাজি নয়, কুয়োটাও খুঁড়ে দিতে রাজি হল না, বললে, "আমি তো আর লিখে কড়ার করি নি যে এ সময়ের ভেতর কুয়ো খুঁড়ে দেব আর তা নাহলে খাজনা দেব কমিয়ে। বলেছি খুঁড়ে দেব, ব্যস।"

জমির মালিক এখন এরকমই বলছে। বাবার মনটা গেল ভেঙে। মালিককে খাজনা না দিলে মালিক যখন খুশি বাড়ি চড়াও করবে এসে। এদিকে দালালের কাছের প্রচুর ধার, সেগুলো নিয়েও ভাবনা। আখের রস জ্বাল দেবার সময়ে এল, অথচ দালাল আর টাকা দিতে রাজি নয়। বাড়িতে খাবাবের লোকেব সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পয়সার অভাবে জমিতেও সার পড়ছে কম। খেতে খাটবার মতো জোয়ান তো তেমন কেউ নেই, বাবারও বয়স হচ্ছে। ফসল কম হচ্ছে দেখে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, দালাল একটি পয়সাও ধার দিচ্ছে না দেখে বাড়িতেই বসে রয়েছে হাত-পা গুটিয়ে, মাঠে আমি একাই।

সকালে শিবা এল, সঙ্গে এল চা আর ছাগল। জিজ্ঞেস করলুম, "বাবা কোলহাপুর থেকে ফিরেছে?"

"রাতেই ফিরেছে।"

"টাকা পেয়েছে?"

"পায়নি বলেই তো মনে হয়।"

"কি করে বুঝলি?"

"বাতে বাবা আর মা-তে ঝগড়া হচ্ছিল। বাবা বলছে এ সময় মার গলার হারটা থাকলে কাজে দিত। সে যখন হবার নয় তখন মামার অবস্থা তো ভাল ওর কাছ থেকে গলার হারের টাকা নিয়ে আখের রস জ্বাল দেবার খরচাটা না হয় তুলে নেয়া যাবে।"

"তারপর?"

মা বললে, 'জন্মে অবধি আমি সে হার চোখেও দেখিনি, আর তোমার বাপ আমার বাপকে কখন সেটা দিয়েছে তার খবরও আমি জানি না। এখন আমার বাপ তো মরে গিয়ে জমিতে সার হয়ে পড়ে রয়েছে, পার তো তার থেকেই চেয়ে নাও।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? খুব ঝগড়া। বাবা এখন ঠিক করেছে গোয়াল থেকে এঁড়ে বাছুর বার করে বেচে দিয়ে টাকার জোগাড় করবে। একে একে এদের সবাইকে বেচে দিয়ে জমির খাজনা মিটিয়ে দেবে।"

আমার বুক ধড়াস করে উঠল। কি করব বুঝতে পারছি না। চা খেয়ে শিবা আর আমি কাজে লেগে গেলুম।

এর চার পাঁচ দিন পরের কথা। বাবা রাতে গাঁয়ের বাড়িতে শুতে গেছে, আমি সকালে উঠে গোবর কুড়োচ্ছি, গোয়ালঘর ঝেঁটিয়ে সাফ করে শেষবারের মতো নোংরা তুলে ফেলতে যাব, এমন সময় দেখি দুটো লোক বাবার পিছু পিছু আসছে পাগড়ি দোলাতে দোলাতে। দেখেই বুঝলুম ষাঁড়ের বায়না হয়েছে। আমাকে একবার জিজ্ঞেসও করলে না, বায়না হয়ে গেল। এঁড়ে বাছুরটার গায়ের গড়ন, রং, ওর তেজ দেখে ওরা খুব খুশি, দর ঠিক হয়ে গেল, বায়না হয়ে গেল, ঠিক হল পরদিন দুপুরে ওরা টাকা দিয়ে বাছুরটা নিয়ে যাবে। ওদের সামনে বাবাকে আমি কিছুই বলতে পারলুম না, বাবাও ওদের সঙ্গেই গাঁয়ে ফিরে গেল। রাতে খাবার সময় বাড়ি ফিরে দেখি, বাবা বাড়ি নেই, আখ মাড়াই করবার ধান্দায় লোকজন জোগাড়ে ব্যস্ত। মা খেতে আসতেই আমি মাকে স্পষ্ট বলে দিলুম এঁড়ে বাছুরটি বেচা চলবে না। ওকে বাড়ির বলদটার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে জোড়া করব, তাতে চাষ হবে এই আমার ইচ্ছে। আর, পুরনো বলদগুলো বেচে দেব।

বাবা আসতে আমরা সবাই খেতে বসলুম। সবাই একসঙ্গে হবার এটাই সময় আমাদের। কথাটা আমি তখন পাড়লুম।

"এঁড়ে বাছুরটা বেচে দেবে নাকি?"

"বেচা হয়ে গেছে।"

"এঁড়ে বাছুর বেচো না। খুব তেজী ও। গোরুর আর একটি এঁড়ে বাছুর হলে বছর দুয়ের ভেতর ওকে কাজে লাগান যাবে, তিন বছরের ভেতরই একটা জোড়া বলদ হয়ে যাবে। এ জোড়াটা হয়ে গেলে আগের জোড়াটাকে বেচে দেয়া যাবে। ততদিনে পুরোন বলদ দুটোর আর থাকবে না কিছুই, দম শেষ হয়ে যাবে, ওরা তখন তো লাঙল আর টানতেই পারবে না।"

"ও সব তো জানি, কিন্তু আখের রস জ্বাল দেবার জন্যে তো টাকা চাই, সে টাকা আসবে কোত্থেকে? জান দিয়ে ফেললেও একটা আধলাও ধার পাওয়া যাচ্ছে না।"

"সে তোমার ব্যাপার, তোমার পয়সা তুমি যেখান থেকে পার জোগাড় কর গে যাও। এঁড়ে বাছুরটি বেচা চলবে না, এই বলে দিলুম। এক জোড়া আমি বানাবই বানাব," রেগে মেগে বলে উঠে পড়লুম।

মাও আমাকে সায় দিয়ে বললে, "ও তো ভালর জন্যই বলছে, খারাপ তো কিছু বলেনি। এবারে যাও বা একটু জমির কাজে ছেলেটা মন দিলে, তাও বুঝি ভেস্তে যায়। বাড়ির বলদ দিয়ে জোড়া করতে চাইছে, করুক না ক্ষতিটা কি?"

এতেও লাভ হল না। বরং বাবা আরো রেগে গিয়ে ক্ষেপা হনুমানের মতো লম্ফ ঝম্ফ লাগিয়ে দিলে, "হারামজাদী। যা না এবারে কোলহাপুরের বাজারে আমাকেই বেচে দিগে যা। বলি, আখটা মাড়াই হবে কোন চুলোর পয়সায়? ও যা বলছে আমি কি তা ভাবি নি, না বুঝি নি? তুই চলছিস তোর ছেলের বুদ্ধিতে, এদিকে বামুনের ব্যাটা বসে আছে রাবণের মতো দশটা হাত বাড়িয়ে, জমির মালিক কি না সে। আমাকে বাঁদর মনে করে একনিমেষে গিলে ফেলবে আর আমার ঘরবাড়ি কেড়ে নিয়ে রাস্তার ভিখিরি করে ছাড়বে। এসব ভেবেছিস?"

বাবা খুব মিছে কিছু বলে নি— বেচারার হাত-পা বাঁধা, একেবারে নিরুপায়। আমরা চুপ করে গেলুম, এরপর কথা বাড়ালে আমাদের চাবকে লাল করে দেবে। হাতির বাচ্চার মতোই তেজ ছিল বাছুরটার। চোখের সামনে দিয়ে সে চলে যাবে পরের গোয়ালে। আমার কান্না পেয়ে গেল। বছর খানেক এত খাটলুম কোনো লাভই হল না। আমাব মন একেবারে ভেঙে গেল—এবার খেত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে মন।

মা বললে, 'জন্মে অবধি আমি সে হার চোখেও দেখিনি, আব তোমার বাপ আমার বাপকে কখন সেটা দিয়েছে তার খবরও আমি জানি না। এখন আমার বাপ তো মরে গিয়ে জমিতে সার হয়ে পড়ে বয়েছে, পার তো তার থেকেই চেয়ে নাও।'

তৃতীয় ভাগ

এক

এবারে বর্ষার জল যখন নামল, তখন কুয়ো থেকে জলও আর টানতে হল না। মাঠে তেমন বিশেষ কাজের চাপও নেই। যেদিন বৃষ্টির ঝাপটা বেশি থাকে সেদিন আর সবজি তোলা হয়ে ওঠে না। গোরু মোষ ছাগলদের ডালপাতা কাটতে হয়—বাইরে হলে মাথায় চাপে চটের বস্তা—আর নইলে ঘরেই পাতা কাটো বসে বসে। এসবের পরও হাতে সময় থাকে। তখন আর কি করব? গোরুর গলায় দড়ি বা মুখ আটকাবার মুখোস তৈরির কাজে হাত দিতুম। ঘর থেকে খেতে দেরী করে এলেও ক্ষতি ছিল না। বর্ষাকালে অনেক সময়ই আমি বাড়িতে গিয়ে শুতুম, মাঠে কখনো বাবা, কখনো আমি ভাগাভাগি করে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছি আর ওদিকে বই যা পাচ্ছি সব পড়ে শেষ করছি।

জুলাই মাস থেকে সনগর মাস্টার মশায় আঁকার ক্লাস শুরু করে দিলেন। আঁকার একটা পরীক্ষা তো আমি আগেই দিয়ে রেখেছিলুম, 'এ' গ্রেডও পেয়েছিলুম। ফর্ম জমা দেবার সময় টাকাটাও এই মাস্টারমশাইই দিয়েছিলেন। আমাব আঁকাব হাত খুব ভাল ছিল বলে মাস্টারমশাই আমাকে খুব ভালবাসতেন। এখন তো আর আমি স্কুলে যাই না। মাস্টারমশাই থাকতেন আমাদেরই গলিতে। একদিন গাঁয়ের বাইরে পায়খানা করতে গেছি, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা। বললেন, "স্কুল ছেড়েচিস্, অন্তত আঁকার পরীক্ষাটা দিয়ে দে। আঁকার জন্য তো আর সারা বছর খাটতে হবে না। আমার বাড়িতে সকালে আঁকার ক্লাস বসে। এখন তো বর্ষা নেমে গেছে, মাঠে তেমন কাজ না থাকলে, আসিস না আমার ক্লাসে, ঘণ্টাখানেক না হয় রইলি। বলিস তোর বাবাকে।"

"আচ্ছা, স্যার।"

"আঁকার সেকেণ্ড পরীক্ষাটা পাশ করলে, চাকরি পেতেও সুবিধে হবে। তাছাড়া ভাল আর্টিস্ট হতে পারবি।" কথাটা মাস্টারমশায় মন্দ বলেন নি, আমার মনে ধরল। সত্যি তো, স্কুলে না গেলেও আঁকতে তো পারি। মাঠে একঘণ্টা দেরী করে গেলেও চলবে বাবা বলেছে। বাবা হয়তো ভাবছে এখন বর্ষাকাল, দড়িটা একটু না হয় ছাড়লুমই। তাতে ছেলের যদি চাষের কাজে মন বসে, মন্দ কি? যাক, আমার ভালই হল, যখন যেমন সময় পাই আঁকার ক্লাসটা করি। যেদিন মাঠে কাজ থাকত, বাবা সেদিন অনেক আগে থেকেই জানান দিয়ে রাখত, "সকালে তাড়াতাড়ি আসিস। না বললে তো আবার তুই ছবি এঁকেই যাবি, আর উঠবি না।" "আচ্ছা, আচ্ছা হবে'খন" বলে আমি চলে যেতুম। কোনো কোনো দিন কথামত সকাল সকাল আসতুমও, আবার কখনও ইচ্ছে করেই দেরী করতুম। একটু দুষ্টুমি করার লোভ হ'ত। বাবা ধমকাত, আমি কিছু বলতুম না, চুপ করে থাকতুম। সব শুনে যেতুম।

আঁকার ক্লাসে কখনো সখনো নতুন কাগজ পেতুম। বেশির ভাগ সময়ই মাস্টারমশায়ের আলমারি খুলে পুরনো ছবি বার করে তার উল্টোপিঠে আঁকতুম। তিন মাস এভাবে

চলার পর দেয়ালীতে পরীক্ষা হত।

মামা যেখানে কাজ করত সেখানে তাত্যাবা নামে মিস্ত্রীকে বরখাস্ত করা হয়েছে, এখন ওর জায়গায় মামাই কাজ করবে। মামাব তাতে লাভই হল। মামার নীচে এখন কুড়িজন ড্রাইভার কাজ করে। তাদের দিয়ে ছোটখাটো অনেক কাজ করিয়ে বেশ ভালই রোজগার বাড়ানো যায়। এ ছাড়াও একটা খেতের সব ভার মামার ওপর আছে, ঐ খেতের সব কিছু মামাই দেখাশোনা করত।

এ সুযোগে আনসা আরেকটা মোষ কিনে নিলে। আনসার এ মোষগুলো মামার জমির মালিকের জমিতে চরে বেড়াত। আনসা এর পরেই দুধের ব্যবসায়ে নেমে গেল। ফসলের সময় মালিকের ধানের বস্তাগুলো থেকে একটি চুপি চুপি আনসার বাড়িতে ঠাঁই পেত আর সম্বৎসরের খোরাকির চিন্তাও সে সঙ্গে দূর হ'ত। যখন গুড় তৈরি করা হত সে সময় টুকরো টুকরো গুড় জমে যেত, সে গুড় আনসা হাটে গিয়ে বেচে দিত। সংসারে তিনটি প্রাণী, স্বামী স্ত্রী আর বছর দুয়েকেব একটি বাচ্চা। মামার মাইনেতে তাই হাত পড়ত না, সেটা পুরোপুরি জমত। কালে কালে মাইনের এ জমানো টাকা থেকে গয়না গড়াললো আনসা।

মামা ওর মনিবের কত কাজই যে করে দিত। তাত্যাবার মতো মামা তো কেবল মিস্ত্রীই ছিল না, অনেক দিকই মামা সামলাত। চাকরি থেকে যাকে ছাড়ানো হল সে কি করত— ইঞ্জিন খারাপ হলে তা সারিয়ে দিলেই ওর কাজ শেষ, ও তখন গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াত। মামার ব্যাপারটা ছিল অনারকম। জমির অনেক কাজও মামাই সারত। যেমন মনিবের জমিতে দু দুটো কুয়ো, তাতে পাম্প বসানো। মামা তাও সামলাত। সব দিক দেখলে এতে মনিবের লাভই হত, আর ঠিক সেইজন্যেই ধানের একটা বস্তা রাস্তা ভুলে যদি মামার বাড়িতে চলেই যেত তাহলে মনিব সেটা দেখেও না দেখার ভান করত। আর আমাদের বাড়ি? আমাদের বাড়িতে তো দুবেলা খাবারই সমস্যা ছিল। হীরা আটদিন যদি বা শ্বশুব বাড়িতে রইল, দু মাস এসে থাকল বাপের বাড়িতে। আমার নীচে সাত ভাইবোন, সবাই ছোটছোট, শক্ত কাজের লায়েক হয় নি কেউ। বড় বড় কাজগুলো তাই আমাকে একাই করতে হয়। কখনো মা খাবার যদি আনত তাকে সাতটা টুকরো করা হত। কখনো মা পেয়ারাও আনত। আস্ত একখানা পেয়ারা আমরা চোখে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না, ছোট একটি টুকরো পেতুম। মুখে দিয়েছি কি দিই নি, পেটে চলে যেত, পেয়ারার গন্ধই শুধু লেগে থাকত মুখে। খেয়ে আশ মিটত না কখনও। ছোলামুড়ি আনলে অবশ্য এক বাটি করে পেতুম, তাতে আমাদেরই বাগানের চিনেবাদাম মিশিয়ে বেশ মুখরোচক খাবার হল ভেবে কত আনন্দেই না তা খেতুম! মনে আছে একবার মা খুব কষ্ট করে তিনটে বেশ গোলগাল পুষ্ট আঙ্গুরের থোকা এনেছিল। হাটে আঙুর খুব একটা উঠত না। কাগজের ঠোঙার সে আঙুর ভাগ করে আমরা সব ভাইবোন দুটো করে পেলুম। প্রথম একটা আঙুর আমি দাঁতে চিবুলুম বেশ মিষ্টি, স্বাদও বেশ। পরেরটাই শেষ কিনা, তাই আর ওভাবে খেতে মন চাইলে না, অনেকক্ষণ ওটা গালেই পুরে রেখে দিলুম আর গালে আঙুর থাকায় মুখে যে জল পড়ছিল তাই বসে বসে গিলতে

লাগলুম। ভাবছি, আবার আঙুর খেতে হলে সেই এক বছর বসে থাকতে হবে। এ গাল ও গাল এভাবে আঙুরটাকে অনেকক্ষণ ঘোরালুম, ফেরালুম। একসময় আঙুরটা মুখের ভেতর ফেটে গিয়ে আমার সারা মুখ রসে ভরিয়ে দিলে। বাধ্য হয়েই আঙুরটাতে তখন চিবুতেই হল আর গিলতেও হল, যদিও মোটেই এভাবে শেষ করে দিতে মন চাইছিল না। শুধু আঙ্গুরের বেলায়ই নয়, হাট থেকে কোন জিনিস কিনে আনলেই আমাদের এ দশা হত। এ জন্যই আমরা ভাইবোনেরা হাটের দিন এলেই আনসার অপেক্ষায় চাতকের মতো বসে থাকতুম। আনসা প্রায় প্রত্যেক হাটের দিনই বালুকে কোলে নিয়ে মাথার ওপর একটা হাঁড়ি চাপিয়ে তার মধ্যে একটা পোটলা আনত, হয় বাড়িতে নয় মাঠে। সে হাঁড়িতে আমাদের জন্য খাবার থাকতই আর সেটা আমরা ভাগ করে খেতুম। মার থেকেও আনসা বেশি আনত। পরে মার সঙ্গে কাজের কথা সেরে, ভাইবোনদের সঙ্গে ঘন্টাখানেক থেকে নিজের বাড়ি ফিরত। আমি ভাবতুম আনসা রোজ এলে বেশ হয়। আনসার বাড়ি গেলেও আমি কিছু না কিছু পেতুমই। অনেকটা তেলে সাতলানো, অনেক মশলা দেয়া হবে আর খুব ভাল ফোড়ন দিয়ে তৈরি ডাল আর ভাখরি—অন্তত এটা পাবই আর তা খেতেও আমার খুব ভাল লাগত। আমাদের বাড়িতে কোনোরকমে লঙ্কার গুড়ো দিয়ে জোলো ডাল হত তাতে কোনো মশলাই পড়ত না। আনসার বাড়ি গেলে আনসা আমায় তিন আনা দিত সিনেমা দেখার জন্যে। দরকার পড়লে মাকেও আনসা টাকা ধার দিয়ে মার ঠেকা সামলাত। কখনো বা আনসা ভাল গুড়ের ডেলা পাঠিয়ে দিত, তাই দিয়ে মা চা করত।

হায়! এসব আর বেশিদিন চলল না। আজকাল আনসা মাঝে মাঝেই অসুখে পড়ে, ঘুস ঘুসে জ্বর হয়, কাশি বাড়তেই থাকে। মামা আনসার জন্যে ওষুধ পথ্যি করে। কাগলে সরকারি ডাক্তারখানা বেশ ভাল। মামার অবশ্য সেই সরকারি ডাক্তারখানার ডাক্তারের সঙ্গে বনিবনা ছিল না। বয়সকালে ডাক্তার যে রক্ষিতা রেখেছিল তাকে দু একবার মামার সঙ্গে একসাথে দেখেছে। এদিকে গাঁয়ের এর চেয়ে ভাল ডাক্তারও আর নেই। তাই আনসার অসুখটা যে কি তা কেউ ধরতেই পারলে না। এভাবে পাঁচ ছ'মাস কেটে গেল। মা তারপর আনসাকে সেই ডাক্তাবের কাছেই নিয়ে গেল, মা সে বাড়িতে দুধ দিতে যেত। ডাক্তার অবশ্য আনসা যে মামারই বৌ, আর মামা যে মারই ভাই সেটা জানত না। মা এসব কথা তো ডাক্তারকে বলেনি। ডাক্তার বলেই দিলেন, "এ অসুখ এখানে সারবার নয়, আমি চিঠি দিয়ে দিচ্ছি ওকে কোলহাপুরে নিয়ে যাও।" মা মামাকে সব বুঝিয়ে বললে। যথাসময়ে মামা আনসাকে কোলহাপুরে নিয়েও গেল। সেখানে আনসা ভর্তি হয়ে গেল, আর চিকিৎসাও চলতে লাগল। অতদূরে আনসাকে আমরা দেখেতে যেতে পারতুম না, মা দু একবার গিয়েছিল এই যা। আমাদের তো সারাদিন পেটের চিন্তায় খেতে খাটতে হত। বালুর খুবই কষ্ট হল, আড়াই বছরের শিশু যেন অনাথ হয়ে গেল। পাঁচ ছ'মাস পর বর্ষায় আনসা আবার কাগলে ফিরে এল। ততদিনে রোগে ভুগে সে আদ্ধেক হয়ে গেছে, যেন একটা কঙ্কাল। আনসার অসুখ নিয়ে বাড়িতে কোনো কথা হত না, আনসার শরীর ভাল যাচ্ছে না, বড্ড ভুগছে এই যা বলা হত। এমনিতেও গাঁয়ে কারো অসুখ-টসুখ হলে

তার রোগ নিয়ে আলোচনা করার রীতি ছিল না। লোক জানত ওর অসুখ করেছে এ পর্যন্ত। কাগলে আনসাকে মামার মালিকের কারখানায় রাখা হল। কারখানা তখন বন্ধ ছিল, যেখানে সেখানে কলকব্জা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে, যে কারখানাটা চালু ছিল তারই ঝড়তি পড়তি যা কিছু। ধানভানার কল, গম ভাঙার যাঁতা, তেল পেষাইর কল সবই এখন অচল হয়ে পড়ে আছে। ভেতরটা ফাঁকা, আলো হাওয়া খেলে। এখানেই আনসাকে এনে তোলা হয়েছে কারণ আনসাদের গলির ঐ বাড়িতে তেমন আলো হাওয়া ঢোকে না। বাড়িটা নীচু, আর দক্ষিণ উত্তর খোলা কিন্তু একটা জানালাও নেই। ঘুলঘুলি দিয়ে যা আলো হাওয়া আসে। এমন চাপা বদ্ধ ঘরে আনসাকে রাখা ঠিক হবে না ডাক্তার বলেই দিয়েছেন, ওকে রাখতে হবে খোলামেলার মধ্যে। তাই এ কারখানায় রাখা হয়েছে আনসাকে। মামাকে কেউ জিজ্ঞেস করলে মামা তাই বলত। কারখানার পাশেই মালিক শেঠজীর ঘর। সেখানে পাঁচজন মেয়ে কাজের জন্য আছে— মাঠে যারা কাজ করে তাদের খাবার রান্না করে। এখান থেকে মামা সহজেই আনসার জন্যে গরম তাজা খাবার আনতে পারে।

আনসাকে ওখানে রাখার তিন দিনের দিন মামা আমাদের বাড়ি এল। বেশ রাত করেই। মা তখন রান্না ঘরে রাঁধছে, আমিও ওখানেই বসে। আনসার অসুখের কথা, ওষুধ পথ্যির খরচের কথা বলার পর মামা মাকে বললে, "দিদি, আমি ভাবছি আনসাকে এখানে এনে রাখব।"

"নারে সোনা আমার, এখানে এনে কাজ নেই," মা বলে উঠল, "এখানে ঘরে বসে ওকে কে দেখাশোনা করবে? তুই তো ওখানে ওকে দেখছিস। এখানে কি আমাদের কোনো ফুরসৎ আছে, আমাদের ঐ যে কথায় বলে না পাছা চুলকোবার সময়টুকু পর্যন্ত নেই। দিন শুরু হতে না হতেই ছেলেপিলে নিয়ে আমায় মাঠে দৌড়ুতে হয়। আনসাকে দেখাশোনা কে করবে বল? এখানে কেউ বসে থাকে?"

"কেন, আমিই দেখব। বালু এখানে বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলো করবে। আমাদের তো হচ্ছেই, ঐ শিশুটারও রাস্তার কুকুরের মতো অবহেলা হচ্ছে। তোমরা না হয় দিনের বেলাটায় বালুকে মাঠে নিয়েই চলে যেও তোমাদের সাথে। আমি যেতে আসতে নজর রাখব বাড়ির ওপর।"

"না ভাই, এতে ঝগড়া বেঁধে যাবে, এখান থেকে শেঠজীর কারখানা তো তেমন দূরে নয়, তুই ভেবে নে না আনসাকে তুই আমাদের কাছেই রেখেছিস? পারলে আমি না হয় তোমাদের খাওয়া-দাওয়ার একটা বন্দোবস্ত করে দিই সেখানে? আনসাকে ওখানকার ঐ খোলামেলার মধ্যেই রাখ। এখানে আনলে ও ওর বাবার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। তুই তো ওকে জানিস ভাল করেই। ও ভাববে ওর বাড়ির সব খাবার দাবার অন্যের পেটেই চলে যাচ্ছে।"

"খরচের কথা ভেবো না, খরচ যা লাগে আমি দেব।"

"খরচ দিলেও এ বাড়িতে লাভ নেই, কর্তার সন্দেহ ঠিকই হবে। মেয়েটা ওখানেই থাক। পারলে সকাল সন্ধে আমি না হয় ওর দেখাশোনাটা করে আসব।"

"বেশ, তাহলে বালুকে রাখ তোমরা। ও বাচ্চাদের মধ্যে খেলা করে বাড়ুক।"

"না না, তানি ওর দেখাশোনা করছে করুক। বালুর এখানে অযত্নই হবে। আমার ছেলেপিলেরা ভাখবির টুকরো ডালের জল মিশিয়ে খেয়ে বড় হয়েছে। এক বেলা ভাত জোটে, তো আরেকবেলা জোয়ারের খুদ। ভাল্লুকের খাওয়া রে ভাই, ভাল্লুকের খাওয়া। তোর ছেলের কি এসব সইবে? বালুও যদি আজ বাদে কাল অসুস্থ হয়ে পড়ে আর আমার ছেলেপিলের মতো রুগ্ন হয়ে যায়, তাহলে তুই তো আমাকেই দুষবি? তানি ছেলেটাকে রাখছে রাখুক। ওব ঘবে ছোট ছেলে নেই, তাই ছেলের জন্যে তুই যা খাবার দিবি তা বালুর পেটেই পড়বে। এ বাড়িতে তুই যা আনবি তা আমার ছেলেমেয়েরা ভূত পেত্নীর মতো কেড়েকুড়ে খেয়ে নেবে। তোর ছেলের ভাগে আর কিছুই থাকবে না।"

আনসা মাস দেড়েক ঐ কারখানাতেই রয়ে গেল। মা মাঝেসাঝে দেখে আসে, রোজ যেতে পারে না, মার কাজের কোনো শেষ থাকত না। মার মনে বাবা সম্বন্ধে একটা ভয় চিরদিনের মতোই এমন গেড়ে গিয়েছিল, সে ভয় মার মনে চামচিকের মতোই অনববত ঘুরে বেড়াত। তাছাড়া, মা বুঝেছে আনসাকে মামা খুবই যত্নে রেখেছে।

আনসা কারখানার সেই ছাতের তলায় থাকতে চায় না, জায়গাটা ওর মোটে পছন্দ নয়। এর আগে পাঁচ ছ মাস কোলহাপুরে হাসপাতালে কাটানোটাও ওর অসহ্য ছিল। সারাদিন এভাবে বিছানায় শুয়ে থাকা ও আর সইতে পারছিল না। কলাই করা থালায় নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট খাওয়া আনসাকে খেতে হয়— ও যে অসুস্থ তাই কলাই করা থালা ওর জন্যে। যে শরীর এত হেঁটে চলে বেড়িয়েছে তা এখন বাঁধা পড়েছে। হাসপতালে ও মামাকে কাকুতি মিনতি করত, "আমি বাড়ি যাব, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল, মরতে হয় সেখানেই মরব, এ পোড়া হাসপাতালে নয়।" শেষে রুগী যখন ডাক্তারেব চিকিৎসার বাইরে চলে যেতে বসল, তখন আনসাকে ডাক্তার গাঁয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

সকালে আনসার সেবাযত্ন করে তাকে ওষুধ পথ্যি দিয়ে মামা চলে যেত খেতে— মেসিনগুলো ঠিকমতো আছে কিনা দেখতে, আবার খাবার সময় ফিরে আসত। সে সময়টা আনসা ঐ কারখানায় ভূতের মতো একা পড়ে থাকে। বিরাট সে জায়গা, কত উঁচু তার চালা, অতবড় জায়গা আনসাকে যেন গিলে খেতে আসে। চারিদিকে ভূতের মতো পড়ে আছে অচল যাঁতা, চাকি, ধান্‌ভানার কল, তেলের কল। একটুও নড়ন চড়ন নেই কোথাও। এভাবে এ পরিবেশে থাকা আনসা আর সইতে পারছে না; বাকি জীবনটা কি বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাটাতে হবে? এসব ভাবে আর শুয়ে শুয়ে কাঁদে। নিজেই নিজের সঙ্গে কথা বলে, বাবা, মা, মামা, নিজের ভাগ্য সবাইকেই সে গালমন্দ করে। একটা লোক নেই কথা বলার, পড়াশুনা করে নি, তাই বইও পড়তে পারে না। কিছু দরকার পড়লে হাঁকডাক দিলেও শোনার কেউ নেই। সেই মামা যখন আসবে তখন ওকে বলতে পারবে, নয়তো যেমনটি শুয়ে থাকা তেমনি শুয়ে থাকতে হবে সারাটা দিন। ফলে দিনে দিনে আনসা খিটখিটে হয়ে গেল।

ওষুধপত্র, পথ্যি, ডাক্তার যা বলে দিয়েছেন মামা সবই দেয় আনসাকে নিয়মমতো, কিন্তু আনসা এসব খেতে চায় না। সবেতেই ওর অরুচি, অনিচ্ছা। অনেক সময়

ওষুধ মুখে দিয়েই হয়তো গিলে ফেলে। খাবার বড়ি মাড়ির ভেতর ধরে রেখে মামার অলক্ষ্যে মুখ থেকে বার করে বিছানার তলায় লুকিয়ে রাখে। পরে পায়খানার গামলায় ফেলে দেয়। এটা ওটা খেতে চায়, ডাক্তারের নিষেধ থাকায় মামা তা খেতে দিতে পারে না। ওষুধের বড়ি ফেলে দেয় জানতে পেরে মামা আনসাকে বকাবকি করে। আবার হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের ওপর রাগ করে নিজেই কাঁদে।

"মর, মর, আমাকে আর কত জ্বালাবি? হপ্তায় তিরিশ টাকা শুধু ওষুধের পেছনেই বেরিয়ে যায়, আর সে ওষুধ কিনা তুই থু থু করে ফেল্লে দিস? আমি আর কি করতে পারি?"

"আমি আর ওষুধ খাব না, কাজ নেই আমার ওষুধ খেয়ে, এবার আমায় শান্তিতে মরতে দে। আমি আর পারছি না ঐ ওষুধগুলো গিলতে," আনসা মিনতি করে।

মামাও আর পেরে উঠছে না। মামা তো ওর সাধ্যমতন সেবা যত্ন করে যাচ্ছে, বৌকে সারিয়েই তুলতে চায়, তার জন্যে জলের মতো টাকাও খরচ করছে, যা আছে সব বিলিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু আনসা তো বেঁকে বসেছে কিনা, সে না খাচ্ছে ওষুধ, না দিচ্ছে মামাকে মদত। মামা রেগে যায় আনসার ওপর কিন্তু ওই পর্যন্তই, আনসাকে তো আর তাই বলে মারতে পারে না, বা ওকে জোর করে চোয়াল খুলে ওষুধও খাওয়াতে পারে না। কেবল জিজ্ঞেস করে, "ওষুধগুলো না খেয়ে ফেলে দিচ্ছ?" এই পর্যন্ত। সব পয়সা জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছে, যেন পায়খানার পাত্রে ঢেলে নষ্ট করা হচ্ছে। কিন্তু আনসারও দোষ নেই, বেঁচে থাকার ইচ্ছেটাই ওর চলে গেছে। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে, ভাবছে মোটে কুড়ির ঘরে তো বয়স ওর, এরই ভেতর কিনা এত ভোগান্তি। আনসা আবার পড়াশুনাও করেনি, শিক্ষার অভাবটা ওর জ্বলুনিটাই দেয় বাড়িয়ে। ছেলে বালুরও চরম অযত্ন হচ্ছে, ওকে ওর মার কাছে রাখা যাবে না, বারণ আছে। মাত্র আড়াই তিন বছর বয়সের ঐ কচি শিশু দূর থেকে ফ্যাল ফ্যাল করে মার দিকে চেয়ে থাকে অসহায় ভাবে। তানা মাসি একটুক্ষণের জন্য ছেলেকে কোলে নিয়ে দূর থেকে মাকে দেখিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায়। মা পনের দিন হয়ে গেল আনসার কাছে যায় নি। আমি কিন্তু একদিন বাদে বাদেই গেছি, ওর পায়ের কাছে বসে কথাবার্তা বলেছি, কখনো বা আনসার পা টিপেও দিয়েছি। পা টিপতে একটু সঙ্কোচ হত, আমরা বলতে গেলে তো একই বয়সের, ও আমার চেয়ে দু চার বছরের বড় হবে এই যা। আমরা একই সাথে খেলেছি, ঝগড়া করেছি, মারামারি করেছি। সেই আনসা এখন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে আর আমাকেই কিনা তার পা টিপে দিতে হচ্ছে? বুড়ো যারা, বড় যারা যেমন বাবা মা, ওদের পা টিপতে কোন সঙ্কোচ হত না। আনসা তো আমারই মতন, ওর পা কি করে টিপি? আমি রোজই বাড়ি ফিরে আনসার খবর নিতুম। মা একবার রাতে আমাকে নিয়ে আনসার কাছে এল, অনেক দিন দেখা হয় নি, আনসারও সারবার নামগন্ধ নেই। পনের দিন আগে মা-তে আনসাতে ঝগড়া হয়েছিল। মা যে ওকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে না এতে আনসার খুবই অভিমান হয়েছে। আনসা বাবা মাকে সোজাসুজি গাল দেয়, শাপশাপান্ত করে, "আমি তোদের ঘরে না জন্মে অন্য যেকোন গরীব ভিখিরির ঘরে

জন্মালেও কাজে দিত, সেই ভিখিরি বাপমায়ের বাড়িতে অন্তত শেষ নিশ্বাসটা সুখে ফেলতে পারতুম।” আনসা ভাবছে ওর বাপ মা কঠিন পাথর হয়ে গেছে, ওদের মনে দয়া মায়া বলে কোনো বস্তু নেই। আনসার কি দোষ? ও কি জানে ওর মা কি দোটানায় পড়েছে আর ওর মনেব অবস্থাই বা কিরকম? মা আনসার গালি, শাপশাপান্ত শুনেও কিছু বলে নি। চুপচাপ চলে এসেছিল। আনসা মাকে নানা সময়েই অনেক কিছু দিয়ে সাহায্য করেছিল। আনসা ভাবে ওর মা এসব সব ভুলে গিয়ে এখন আর পাঁচজনের মতনই ওর ব্যাপারে নিস্পৃহ, উদাসীন। এ দুঃখ রাখবার আর ওর জায়গা নেই, আমার ওপরই এক চোট ঝাল মিটিয়ে নিলে।

পনের দিনের মাথায় একদিন মা আনসার কথাটা তুললে বাবার কাছে।

“আনসাকে বাড়িতে নিয়ে আসব?”

“কেন? ঘরে তোমার ধান ফুরোচ্ছে না বুঝি?

“লিঙ্গাপ্পা তো ওর খরচ দেবেই।”

“কাজ নেই খরচ দিয়ে। ওকে তার চেয়ে বল তোমার গলার হারের টাকাটা দিক আগে।”

বাবা এখনও গলার হার হারানোর শোকটা ভুলতে পারছে না। বাবার হঠাৎই মনে হয়ে যায় মার ভাইয়ের তো অবস্থা ভাল, ও কেন তাহলে মাকে হারটা গড়িয়ে দিচ্ছে না? বাবার ধারণা মামা আমাদের এই অভাবের সংসারে সাহায্য শুধু করতে পারে না, করা উচিতও।

বাবার এসব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ কবে থেকে পরে মা বললে, “এই পোড়া গলার হারের কথা এখন থাক। নিজের পেট থেকে যে মেয়ে বেরিয়েছে তার সম্বন্ধে কি ভেবেছ, কি করবে ঠিক করেছ, তাই বল আমায়। মেয়েটা তো মরতে বসেছে।”

বাবা রেগে গেলে গালাগাল ছাড়া কথা বলেনা, এবারও বললে, “তুই হারামজাদী, আমার মেয়ের সর্বনাশ করেছিস, তুই আমার মেয়েকে খেয়েছিস। ঐ পচা আমের হাতে মেয়ে দিয়ে আমার মেয়েকেও পচিয়েছিস।”

আনসার চেয়ে মামা বছর বার তের বড় হবে। যৌবনে মামার বাইরে নিষিদ্ধ জায়গায় অবৈধ সম্পর্কের ফলে রোগ হয়, পূঁজ পড়ে। শেষে মামা দত্তাজীরাও দেশাইয়ের জানাশোনা কোলহাপুরের এক ডাক্তার দেখিয়ে, ওষুধ খেয়ে, ইনজেকশন নিয়ে সারায় এ রোগ। সেই থেকে বাবা মাঝে মাঝে মামার কথা উঠলেই তাকে পচা আম বলে। বাবার ধারণা মামার রোগ ওপরে ওপরে সারলেও ভেতরে রয়েই গেছে আর মামার ঐ রোগের জন্যই আনসারও এই কালব্যাধি।

বাবা একবার রেগে গেলে মা বাবার সঙ্গে নরম গলায় কথা বলত, নয়তো চুপ করে যেত, নইলে বাবাকে দিয়ে কিছু করান যেত না। কিছুক্ষণ পব বাবার রাগটা কিছুটা পড়ে গেছে ভেবে মা আবার কথাটা তুললে, “তাহলে মেয়েটা কি শেষ পর্যন্ত মরেই যাবে নাকি?”

“ওকে ওর কর্মফল ভুগতে দে। তোর ভাইকে বল এবার ওর ব্যাপার ওই দেখুক। এখানে তুই আনবি বলছিস, তা তুই কি ডাক্তার না ব্যারিস্টার? ও, সে যা করছে

করতে দে।" আনসার দুঃখ বোঝার মতো মন বাবার নেই, তাছাড়া একবার রেগে গেলে আনসার কথা কে ওকে বোঝাবে?

পনের দিন কেটে গেল। মা ছটফট করে মরছে, কিছু করতে পারছে না। আজ আমার কাছে আনসার বাড়াবাড়ি যাচ্ছে শুনে ওকে দেখতে যায়। কারখানার দরজার কাছাকাছি আসতেই মামার গলা শোনা গেল। মামা আনসার ওপর রাগারাগি করছে, মামার ওপর আনসারও আক্রোশ। ও মামাকে যা ইচ্ছে তাই বলে গাল দিচ্ছে।

"কি হয়েছে রে লিঙ্গাপ্পা?" বলতে বলতে মা দরজা ঠেলে ভেতরে গেল। পনের দিন পর হঠাৎই মাকে দেখে আনসা জোরে কেঁদে উঠল, ওর শরীরে হাড় ক'খানা ছাড়া আর কিছুই নেই, কিন্তু পেট পাহাড়ের মতো উঁচু। কোলহাপুরে যাবার আগেই ওর পেটে সন্তান এসেছে। ডাক্তার চাইছিলেন পেটের সন্তানটিকে মেরে ফেলতে, নইলে মার প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে এটাও বলেছিলেন, কিন্তু আনসাই রাজী হয়নি! ভগবানের দেয়া গুপ্তধন ভেবেই ও এতদিন সন্তানটিকে পেটে ধরে আগলে রেখেছে।

"কাঁদচিস কেন আনসা?" মা কাছে গিয়ে বললে। মাকে কাছে পেয়ে আনসা মার গলা জড়িয়ে ধরে আরও কাঁদতে লেগে গেল, "মা, আমার আর বাঁচার সাধ নেই, আমি আর বাঁচব না। আমাকে আমার ভাইবোনদের মধ্যে থাকতে দাও। আমাকে আমার বালুর কাছে গিয়ে বসতে দাও, আমাকে ভাখরি খেতে দাও চাটনি দিয়ে। ওষুধ, বড়ি খেলে এখন আমার বমি পায়, ওগুলো আমি আর খেতে পারব না। নুন ছাড়া রান্না খেয়ে খেয়ে প্রাণ আমার যায়। আমায় তুমি বাড়ি নিয়ে চল মা।" এই বলে আবার চেঁচামিচি লাগিয়ে দিলে। মার বুক ফেটে কান্না এল। আমারও ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। মামা কিন্তু খুব রেগে গিয়ে বললে, "হারামজাদী! তোর আপন বাবা মা হলে তোকে মেয়ে বলে বুকে টেনে নিয়ে বাড়িতে তুলত। তুই আবার ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কাদচিস কেন? তোর কেঁদে কোনো লাভ আছে? এখানেই দু' চারদিন আরও থাক, তারপর মর গে। আমিও গলার ফাঁস থেকে মুক্তি পাই।"

"বাবা লিঙ্গাপ্পা, এভাবে কথা বলিস না বাবা। আমার মেয়ের ভার আমিই নিতে পারব, কাউকে নিতে হবে না। এক্ষুনি জানুকে খবর পাঠিয়ে ওর ঘোড়ার গাড়িটা আনিয়ে নে আর আমার মেয়েকে আমার বাড়ি পৌঁছে দে। তারপর ওর কপালে যা আছে তাই হবে, বাঁচলে বাঁচবে, মরলে মরবে," আনসার কষ্ট মা আর দেখতে পারছিল না, তাই বলেই ফেললে কথাটা। মামারও খুব দুঃখ হল মার কথা শুনে। এতদিনের ওর দুঃখ কষ্টের কথা, আনসার অসুখে ওর কত না দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে আজ মাকে তাই শোনালে মামা। তার ছোট ভাই হলে কি হবে, মা ওকে দূরে ঠেলে দিয়েছে, কই, ভাই বলে তো কাছে টেনে নেয় নি। তার বাচ্চা কচি শিশু বালুর কত দুর্দশা হল, অবহেলায় পড়ে রইল তা দেখেও ওর দিদি মানে আমার মার মনে একটু দয়া, একটু করুণাও হল না, মামা এসব বলে মাকে দুষতে লাগল। মামা ভীষণ রেগেছে বোঝা গেল।

যাক গে, মায়ের পেটের ভাই বোন শেষ পর্যন্ত এক জোট হয়ে গেল আর পরদিন সকালে আনসাকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসা হল।

মামা এভাবে মাকে দুষছে দেখে মার আঁতে ঘা লাগল। মার জেদ চেপে গেল মেয়েকে বাঁচাবেই, এখন আর মা বাবাকেও পরোয়া করে না, যা হবার হবে। মেয়েটা তো বাঁচুক, মার একমাত্র লক্ষ্য তাই।

ওষুধপত্র নিয়মমত খাওয়ান হচ্ছে, আনসা যা খেতে চাইছে মা তাও ওকে খেতে দিচ্ছে। আনসার শরীর সারছে না, কিন্তু মন একটু ভাল। ঘরের ফিকে আলোতে বসে এটা ওটা খায়। মামা সকাল সন্ধ্যায় এসে আনসার যত্ন আত্তি করে।

মা বলে আনসাব এবার সাত মাস শেষ হতে চলল, আট দশ দিন পরেই আট মাসের পোয়াতি হবে। আরও দু মাস গেলে বাচ্চা হবার সময় হবে, এর মধ্যেই ওর শরীরটা সারিয়ে ফেলতে হবে, গায়ের জোর কিছুটা ফিরিয়ে আনতেই হবে। এই ভেবে মা জেদ করেই ভাল করে খাওয়াচ্ছে ওকে।

এদিকে মাঠে বসে মার আর বাবার বেদম ঝগড়া লেগে গেল। মা বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়লে বাবার ওপর। "পরপর এতগুলো ছেলেপুলে হবার সময় মনে ছিল না? ওদের এখন না দেখলে হবে? এখন পালিয়ে জমিতে গিয়ে লুকিয়ে থাকলেই কি মিটে গেল? তোমার জন্যে ছেলেপুলেগুলো আর কত খাটবে? ওদেরই বা কে দেখবে শুনি?"

"যা খুশি কর গে যা," বাবা হাল ছেড়ে দিলে। আনসার কষ্ট বাবা যে বুঝতে পারছিল না বা বাবার মনেও কষ্ট হচ্ছিল না তা নয়, তবে আনসার দায়িত্ব নিতে বাবা রাজী নয়।

মাসখানেক এভাবেই কাটল। আনসার কান্নাকাটি খিটিমিটি অনেকটাই কমে গেল। ওর চারপাশে এখন ওর ভাইবোনরাই ঘুরে বেড়ায়, কাজ করে। কারো না কারো সঙ্গে ও বসে বসে গল্প করে, ওর জন্যে আনা মিশ্রী, বেদানা মোসাম্বির টুকরো একে তাকে বিলিয়ে দেয়। বালু আমাদের আপ্পারই বয়সী। সে, আপ্পা আর লক্ষ্মী এক সঙ্গে এক জায়গাতেই খেলে।

এদিকে আমার ড্রইং এর পরীক্ষা এসে গেল। তিন দিন মাত্র বাকি। আমাদের মোষের বাছুরও হয়েছে। মোষের প্রথম দিনের দুধের মিষ্টি, আমার খুব পছন্দ। দুদিন এ দুধ আমি খুব করে খেলুম, তারপর কোলহাপুরে গেলুম পরীক্ষা দিতে। পরীক্ষা চলবে তিন দিন ধরে, এক দিনের খাবার সঙ্গে বেঁধে নিলুম। পরের দিন সনগর মাস্টারমশাই কাগল থেকে সবার ভাখরি নিয়ে যাবেন। কোলহাপুর কাগল থেকে বার মাইল, আমরা কোলহাপুরেই রয়ে গেলুম।

কোলহাপুরে শাহপুরীতে আবাজীর মুদিখানার একটা দোকান ছিল, আমরা সবাই ওখানেই গিয়ে উঠলুম। পরীক্ষার হল কাছেই। প্রথম দিন ভালই কাটল। সন্ধে সাতটায় সনগর মাস্টারমশাই কাগলে গেলেন, পরের দিন সকাল নটা দশটার মধ্যে সবার খাবার নিয়ে ফিরবেন। সেদিন রাতটা সকলের খুব মজায় কাটল, শাসন করবার, বকাবকি করবার, ধমকাবার কেউ নেই, সবাই সব্যর রাজা। দ্বিতীয় দিনও বেশ কাটল। রাতে মাস্টরমশাই আমাদের সাথেই শুলেন। আমরা খুব গল্পে মেতেছি, আমাদের এই বাঁধন ছাড়া, শাসন ছাড়া জীবন দারুণ লাগছে। তাছাড়া কিছু একটা শিখছিও,

পরীক্ষা দিচ্ছি ভালভাবে, বাড়ির ঐ হতাশা আর অভাবের পরিবেশ থেকে দূরে আছি ভেবে আমার আনন্দ কে দেখে, একেবারে ফেটে পড়ছে। খুব হাসাহাসি চলছে, মাস্টার ছাত্র সবাই একসাথে হাসছি। শেষে মাস্টারমশাই আমাদের থামিয়ে দিলেন, "অনেক হয়েছে, অত হাসতে হয় না, কালকে পরীক্ষা আছে, খারাপ হলে কাঁদতে হবে।" আমরা সবাই চুপ করে গেলুম, একটা মাত্র পরীক্ষা বাকি ছিল। রাত যখন এগারটা তখন ঘুমিয়ে পড়লুম। পরের দিন দোকান থেকে গরম গরম ডাল কিনে বাসি ভাখরি দিয়ে খেয়ে পরীক্ষা দিতে যাব বলে তৈরী হচ্ছি। হাঁটা পথে পনের মিনিট। এগারটায় পরীক্ষা। শেষ হতেই কাগলে ফেরার বাস ধরতে হবে, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে। মুদিখানার দরজায় সাড়ে দশটা এরকম হবে, এমন সময় আমার খুড়তুতো ভাই শঙ্করকে দেখলুম, সে আর বসলে না, বললে, "আন্দা, আনসার বাড়াবাড়ি হয়েছে, তোকে এখুনি বাড়ি ফিরতে হবে।"

আমার রক্ত এক নিমেষে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শঙ্কর পড়ে হাই স্কুলে, মাস্টারমশাই ওর কথা মন দিয়ে শুনে বললেন, "আজ তো পরীক্ষার শেষ দিন। দুপুরে দুটোয় পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমরা সবাই তো কাগলে ফিরছিই।"

শঙ্কর বললে, "ওকে এক্ষুনি নিয়ে যেতে বলেছে।" মাস্টারমশাই এবার শঙ্করকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করে অবস্থাটা জেনে নিলেন, শঙ্করও ইংরেজিতেই জবাবটা দিলে। আমার মনের ভেতর দিয়ে একটা কালো টিকটিকি যেন টিক টিক করে উঠল, হাত পা অবশ হবার মতোন। তাও একবার মনে হল শেষ পরীক্ষাটা দিয়েই যাই, অনেক সাধ্যি সাধনা করে ড্রইং এর পরীক্ষায় বসবার সুযোগ যখন পেয়েছি, তখন মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য এ সুযোগ নষ্ট করা ঠিক হবে না। আমি শঙ্করকে বললুম, "এই শেষ পরীক্ষাটা দিয়েই তোর সঙ্গে ফিরব।"

"না, না তোব বাড়িতে তোকে এখুনি নিয়ে যেতে আমায় বলে দিয়েছে, এখন গেলে যদি বা ওর সাথে একটু কথা বলতে পারিস, আনসার খুব বাড়াবাড়ি।"

"আমি কি করব, মাস্টারমশাই?"

"আমি আর কি বলব বল? তোর বাড়ির লোকেরা খবর দিয়ে বলে পাঠিয়েছে। শোন শঙ্কর, এ ছেলে এখন বাড়ি ফিরে কি করবে? একটু ভেবে দেখ, আজ ওর শেষ পরীক্ষা, এই টুকুর জন্য একটা বছর নষ্ট করবি বাবা? ভেবে দেখ।"

"না স্যার, বাড়িতে সবাই ওর জন্যে বসে আছে। ওকে যেমন করে হোক ধরে নিয়ে যেতে আমায় বলেছে।"

আনসার টানে আমি বেরিয়ে পড়ে কাগলে ফিরে এসে আমাদের গলির মোড়ে এসেছি, বাড়ি আর মাত্র শত খানেক পায়ের রাস্তা এমন সময় শঙ্কর বললে, "আনসা কাল রাতেই মারা গেছে, এখন আর কিছু নেই।"

আমি শুনে ধপ করে মাটিতে বসে পড়লুম।

শঙ্কর বললে, "ওঠ, হাতের থলেটা দে আমায়।'

আমি থলেটা ওর হাতে দিয়ে বাড়ির দিকে সাঁ সাঁ করে ছুটে গেলুম। বাইরের ঘরে সবাই বসে, আমাকে দেখেই মামা জোরে কেঁদে উঠলে, "আন্দা তোর আনসা

চলে গেছে তোকে ছেড়ে...”

আমি মামার পাশে গিয়ে বসলুম। গতকাল রাতে আমরা যখন খুব হাসি, গল্পে মেতে ছিলুম, আনসা তখনি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। রাত দশটা নাগাদ নাকি ওর প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়। তার শরীরে তো কোনো জোর ছিল না, তাই পেটের সন্তানটি বেরোতে পারছিল না। এদিকে আনসারও যন্ত্রণা হচ্ছে খুব, যেন একটা কাঠবিড়ালীর মাথাটাকে চিমটে দিয়ে চেপে ধরে আছে আর সে কাঠবিড়ালী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। এক ঘণ্টার ওপর হয়ে গেল, বাচ্চাটা পেটের ভেতর দম বন্ধ হয়ে মরে যাবাব উপক্রম। শেষে মিশনারী হাসপাতালের মেমসাহেব ডাক্তারকে ডাকা হলে তিনিও এলেন আর সেই মুহূর্তে বদ্ধ জায়গা থেকে পেটের বাচ্চাটা রক্তেব বানের সাথে এক ধাক্কায় বেরিয়ে এল। আনসা ঐ অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করেছে, “কি হয়েছে?” কে যেন জবাবে বললে, “ছেলে হয়েছে।” আনসা যেন খুব শান্তি পেল, ওর স্বামীর বংশে ও দু দুটো ছেলে দিতে পেরেছে এই সান্ত্বনায় সে চোখ বুজলে। যতটুকু রক্ত ওর ঐ শুকনো শরীরটায় অবশিষ্ট ছিল তা আনসা যেন ওর ঐ সন্তানের জন্য, ওর ঐ গুপ্তধনের জন্যই, অতি যত্নে এতদন আগলে রেখেছে। দুদিন পব ঐ ছোট্ট অসহায় হতভাগ্য মাতৃহীন শিশুটিও মার বুকের দুধ খুঁজতে খুঁজতে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল।

যে দুঃখ যন্ত্রণা আনসা ওব অসুখেব সময় পেয়েছে তা যেমন আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারছিলুম। তেমনি এসময় বাবা, মা, মামা ওদের প্রত্যেককে চিনে নিতেও আমার অসুবিধে হয় নি, ওদেরও ঠিক বুঝে নিলুম। সবই খুব কাছে থেকে দেখেছি, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আনসা আমাব জন্য অনেক করেছে, যখন ঠেকায় পড়েছি তখন ও আমায় পয়সা দিয়েছে, আম্মার পড়ার ব্যাপারে সব সময় উৎসাহ দিয়েছে, যখনই আমার মন খারাপ হত, তখন মনে হালকা করতে আমি ওরই কাছে দুদণ্ড গিয়ে বসতুম, ওকে বলতুম আমার মনের যত দুঃখের কথা, আমি আর ও মনের দিক থেকে খুব কাছাকাছি ছিলুম। আমার জীবনে নিঃসঙ্গতার, আমার সব দুঃখের, শোকের একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জায়গা ছিল এই আনসা।

পাড়ার ঝি বৌদের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই মা বলত, “আমি একটা রাক্ষুসী, ওকে মোষের প্রথম দিনেব দুধের মিষ্টি দু তিন দিন ধরে যদি না খাওয়াতুম তাহলে এরকম হত না।” মার ধারণা মোষের সেই প্রথম দিককার দুধ খুব গরম, হজম করা শক্ত, সে দুধ খাবার ফলেই সময়ের অনেক আগেই আনসার প্রসব বেদনা শুরু হয়ে যায়। আনসা আমারই মতো এ মিষ্টি খেতে খুব ভালবাসত।

পরে আমরা জেনেছিলুম আনসার টি বি হয়েছিল। এ রোগ একবার হলে সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকা যায় না। আনসাকে সারাবার কোনো উপায় ছিল না। ওর যখন শেষ অবস্থা ডাক্তার তখনই ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। লোকজন থেকে, ওর ছেলে থেকে, ওকে দূরে রাখতে, ওকে খোলামেলার মধ্যে রাখতে ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন। মামা এসব কথা কাউকে বলে নি, বললে আনসার সেবা যত্ন ঠিক মতো হত না। ‘আমার যা হবার হোক’ বলে মামা আনসার সেবাশুশ্রূষা করেছে। আনসাকে সত্যি

সত্যি ভালবাসত মামা। এমনিতেই এর আগে আনসা দু দুবার মরতে মরতে বেঁচে গেছে। সেই একবার প্লেগ-এর সময় আনসাকেও প্লেগে ধরলে কিন্তু সময়মতো কোলহাপুরে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা হয়েছিল তাই আনসা সে যাত্রা বেঁচে গিয়েছিল। তারপর সেই কুয়োতে ঝাঁপ দিতে যাওয়া, তখন ওকে আমিই বাঁচিয়েছিলুম। এর চাব পাঁচ বছর পর তো আনসা সত্যি সত্যি একেবারে চলেই গেল, মামার জন্য রেখে গেল একটি পুত্রসন্তান আর অখণ্ড শূন্যতা।

দুই

আনসা মারা যাবার পনের দিন পর মামা কাজে গেল। কোলহাপুর যাবার সময় মামা ওর দুটি মোষ শেঠজীর বাগানে বেঁধে রেখে গিয়েছিল, মোষগুলো বাগানের ঘাস খেত আর শেঠজীর বাড়িতে ওদের দুধ যেত। মা বাবা ভেবেছিল মামার দুটো মোষই তো দুধ দেয়, তাই কিছুদিনের জন্যে হলেই বা কি একটা মোষ হয়তো আমাদের এখানে বেঁধে যাবে। কিন্তু মামা তা করে নি। মামা রওনা হবার আগে মা-ই কথাটা পেড়েছিল, "তুই যখন থাকবি না তখন তোর মোষ নিয়ে অসুবিধে বুঝলে আমার এখানে রেখে যেতে পারিস, আমরা ওদের দেখাশোনা করব।"

মামা বললে, "না, দিদি। বলতে গেলে আমার মোষ ঐ শেঠজীর বাগানের ঘাসপালা খেয়েই বড় হয়েছে। মালিকের জমির সবচেয়ে ভাল চারার বাণ্ডিল তো পড়ে এসে আমারই বাড়িতে। এই মালিকের চাকরির টাকা বাঁচিয়ে বাঁচিয়েই তো প্রথম মোষটা আমি কিনলুম। তারপরে আরেকটা হল। কিছুদিন মালিকের বাগানেই বাঁধা থাক ওরা, মালিকের ঘরেই না হয় ওদের দুধটা যাক। মালিকও খুশি হবে আর আমার মোষদুটোও যত্নে থাকবে।"

মা আর কি বলবে, শুধু বললে, "তুই যা ভাল বুঝিস তাই কর।"

মামা মাকে বুঝিয়ে বললে,"আমি এখন যে কোলহাপুরে যাব তাতেও মাইনে আমাকে শেঠজী ঠিকই দিয়ে যাবে। শেঠজী যখন আমার জন্য এত করে, তখন আমাকেও তো শেঠজীর জন্য কিছু করা দরকার, ঠিক কি না?"

"তা তো বটেই, তা তো বটেই," মুখে মা বললে বটে, কিন্তু মনে মনে রাগ করলে আর সে রাগটা মেটাল যখন বাবার কাছে মেয়ের কথা উঠল। মা বললে, "নিশ্চয়ই 'তোমার' মেয়ে লিঙ্গাপ্পাকে বুদ্ধিটা দিয়ে গেছে।" বাবাও ছাড়বার পাত্র নয়, বললে, "তোমার ভাইয়ের মনটা গুয়ের মতো, তাই এ বুদ্ধি ওরই।" মা আর বাবা এভাবেই ঝগড়া করত, ওদের রাগের মাত্রা আর লোভের বহর দেখে মনে মনে হাসতুম। আমি ভাল করেই জানতুম কাজটা মামা ঠিকই করেছে। সবার অজান্তে মামা আমার সাথে দেখা করত, খাবারের দোকানে নিয়ে যেত, চানাচুর, ভাজাভুজি খাওয়াত। আনসা মারা যাবার পর যতদিন সে শোকের ছায়া আমাদের পরিবারে ছেয়ে ছিল ততদিন সব ঠিকঠাকই চলছিল, বালুও ছিল আমাদের কাছেই। আমাদের ছোট ভাইটা বালুর চেয়ে চার পাঁচ মাসের ছোট, তার সঙ্গেই সে খেলা করে মেতে থাকে। সবাই যা খায় বালুও তাই খায়। জমিতে কাজের জন্য আসবার সময় ওকে কোলে কে নেবে এনিয়ে আমাদের সমস্যা হতো। হীরাই বালুকে আর আপ্পাকে খেতে নিয়ে আসত। তবে বালুর চেয়ে আপ্পাই ওর কোলে বেশি থাকে। বালু বেচারা বেশির ভাগ সময়ই হেঁটেই আসে আর ফেরেও হেঁটেই। বালু আপ্পার চেয়ে একটু বড় ছিল বলে ওকে কোলে নেবার লোক পাওয়া যেত না। সন্ধেবেলা কাজ না থাকলে বালুকে

আমিই কাঁধে নিয়ে ফিরতুম, কখনও কখনও শিবাও ওকে নিত। আমাদের বাড়িতে ভাতের চেয়ে জোয়ারের খুদ রান্না করেই বেশির ভাগ সময় খাওয়া হত। চাল কিনে খাওয়ার মতো পয়সা আমাদের থাকত না। পানসে জোলো ঘোলের সাথে জোয়ারের খুদই আমাদের খেতে হত। দুধ আমাদের সব বেচে দিত, যেটুকু বাঁচত তা দিয়ে দই পেতে তাতে জল ঢেলে অনেকখানি ঘোল করা হত। নামেই ঘোল, আসলে সাদা জল বই তো নয়। গোড়ার দিকে বালুর এ খাওয়া সহ্য হত না, পেট ছাড়ত। খিদে পেলে বেচারা মার কাছে খাবার চাইত। মা আর কিই বা দেবে, মাব থাকতই বা কি? ঘরে থাকত চিনেবাদাম তাই মা তাকে পকেট ভরে দিত। ঐ আধকাঁচা চিনেবাদাম খেয়ে বালুর পেট আরও ছাড়ত, সারতেই চাইত না। মামা সবই বুঝতে পাচ্ছিল। রাতে বালু আমাদের সঙ্গেই শুত। মামা ফেরার পথে বালুর জন্য কিছু একটা নিয়ে ফিরত আর আপ্পা আর বালুকে তা ভাগ করে দিত। ছোট্ট লক্ষ্মী ওদেব মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত। মামাও এক দৃষ্টিতে বালুকে দেখত, দেখেই বোঝা যেত মামার মনে অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক সন্দেহ। বালু মামার দেয়া খাবাব যেভাবে মন দিয়ে খেত তাতে মামার মনে হত ছেলেটা সকাল থেকে বোধহয় না খেয়েই আছে। মা মরা ছেলের মায়ের অভাবটাই কি মামার মনে তখন জেগে উঠত? হতেও পারে। বালু বেচারা তো জানেই না ওর মা ওকে ছেড়ে চিরদিনের মতোই চলে গেছে। একথা ভেবে মামার খুবই কষ্ট হত, ছেলেটিকে কাছে টেনে ছাতের দিকে চেয়ে চেয়ে একসময় শুযে পড়ত।

সকালে বালুকে দেখাশোনাটা মামাই করত। ওর হাত মুখ ধুয়ে দিত, চান করাত, পায়খানা কবাত। ওব পায়খানা হয়ে গেলে মামা ভাল করে তা দেখত আর পাছা ধুইয়ে দিতে দিতে চিন্তায় ডুবে যেত। মাকে হেসে হেসে বলত, "বালু বাবু আজ শুধু জোয়ারের খুদই হেগেছে।"

"কাল তো ও শুধু জোয়াবের খুদই খেযেছে কি না। সারা দিন ছেলেটা খাই খাই করে, কিছু একটা তো দিতে হয় আর কিই বা দিই বল তো? ওর তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়?" মা বলে।

"তা বটে, কিন্তু জোয়ারের খুদ ওর হজম হয় না।"

"আমি আর কি করব বল? বাড়িতে সবাই যা খায় ওর কপালে তাই জুটবে।"

মামা আব কিছু বলে না, চুপ করেই থাকে। বালুর যে অযত্ন হচ্ছে সেটা মামার চোখে পড়ে। বালুর মতো মামাও যেন এ বাড়িতে অনাথ হয়ে গেছে। সকালে উঠে মামা বালুর সব কাজ সেরে নিজের কাজ সারে। তারপর চা খেয়ে কাজে বেরিয়ে যায়। দুপুরে মামা শেঠজীর চাকরদের জন্য যে খাবার আসত তাই খেত। রাতে আমাদের সঙ্গেই খেত আর তার বিনিময়ে হাতে একটা কিছু নিয়ে আমাদের বাড়িতে ঢুকত। ধান, তরকারী, মোষের জন্য ভাল ঘাস এসব ছাড়াও কখনো সখনো মার হাতে টাকাও দিত। এ সত্ত্বেও আমরা সবাই খেতে বসলে কোনো একটা ছুতো করে বাবা মার সাথে ঝগড়া লাগিয়ে দিত আর, বাবার যা স্বভাব, ঝগড়া করতে করতেই মাকে নোংরা গাল দিত। মামা এসব চুপ করে শুনে যেত। আসলে এ গালটা বাবা দিত

মামা আর মামার মাকে লক্ষ্য করেই। এক এক সময় যখন আর সইতে পারত না তখন মামা বলে উঠত, "এখন খাওয়াটা শেষ করতে দেবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মার শেরাদ্ধ না করছ ততক্ষণ আমাকে বসে থাকতে হবে?"

"তুই খা না, আমি কি তোকে কিছু বলেছি? ঐ মাগীর পাছার পোকা কিলবিল করছিল তাই এসব বলছিলুম," এভাবে মিথ্যে বলে কথাটা এড়িয়ে যেত, কিন্তু বাবার যে গায়ে জ্বালা হচ্ছে সেটা বোঝা যেত। বাবা ভাবত মামা আর বালু বুঝি ফোকটেই এখানে খাচ্ছে। মা হাজারবার বাবাকে বলেছে যে মামা রোজই কিছু না কিছু একটা নিয়েই আসে। কিন্তু বাবা তা বিশ্বাস করত না, বাবা ভাবত এরা ভাইবোনে ওকে ঠকাচ্ছে, ওর বাড়িঘর লুটেপুটে খাচ্ছে। ওদিকে মামাও ভেবে পায় না কি করবে? সে বেচারা বেকায়দায় পড়ে কোণঠাসা হয়ে আছে। ছেলেকে যে দিদিমার কাছে রেখে ঘর ছেড়ে দেবে তা সম্ভব নয়। মামার ভয়, মামা চলে গেলে ছেলের যত্ন হবে না, হয়তো এ অযত্নের ফলে এ ছেলেটাকেও হারাতে হবে। আবার ওর জামাইবাবু যে কেবল ওর জন্যে ওর দিদির ওপর এসব জুলুম চালাচ্ছে তা তো আর মিথ্যে নয়। মা যখন মাঠে যেত তখনই বাবার জুলুম অন্য আকারে শুরু হয়ে যেত। সাত আটটি সন্তানের রান্নাবান্না সেরে আসতে আসতে মার খানিকটা দেরী হয়েই যেত। পুরো পল্টন নিয়ে মাথার ওপর খাবারের ঝুড়ি চাপিয়ে খেতে আসতে আসতে মার এগারটা বারোটা বেজে যেত।

"এত দেরী যে?" বাবার রাগ আরম্ভ হয়ে গেল।

"ছেলেপিলেদের সব সামলাতে দেরী হয়ে গেল।"

"সারা গাঁয়ের লোকের খাবার জোগাড় কর গে ঘরে বসে, তাহলে আর দেরী হবে না" এই বলে বাবা মার বাপের বাড়ির লোকদের লক্ষ্য করে গাল দিতে লেগে যেত।

"সারা গাঁ" মানে যে মামা আর বালু তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হত না।

কখনো যদি বাচ্চারা আগে খেয়ে নিত তাহলে বাবার ভাগের ভাখরিতে টান পড়ত। ব্যস্, বাবার রাগ আরও বেড়ে যেত, "ঐ হারামীদের পেট ভরিয়ে তুই এদিকে তোর সোয়ামীকে উপোসী রাখছিস হারামজাদী। এখন আর সোয়ামীর কথা ভেবে কি হবে? তোর ভাইই যদি তোকে দেখবে তাহলে যা না, যা ঐ মালীদের গলিতে যা। গিয়ে গু দিয়ে ঘুঁটে দিগে যা।" মা কিছু বলত না, চুপ করে সয়ে যেত। "হারামজাদী! তোরা দু ভাই বোনে মিলে আমাকে খেতের চাকর বানিয়ে রেখেছিস," এই বলে বাবা মুখে খাবারের গ্রাস তুলে দিত। মামা আর বালু ঘরেই শুত, বাবাকে শুতে হত খেতে। মামা ঘরে শোবার পর থেকেই এ বন্দোবস্ত চলে আসছে। বাবা দেখছে বাপ ব্যাটা মজা করে ঘরের ভিতরের গরমে আরাম করে শুচ্ছে আর ওদের জন্য বাবাকে খেতে ঠাণ্ডার মধ্যে শুতে হচ্ছে। ফল হল এই মাস দুয়ের ভেতরেই মা আর মামার ভেতর ঝগড়া শুরু হয়ে গেল, মামাকে মা নিজের জ্বালার কথা বলতে গেল, মা আর পারছিল না, মামাকে বললে, "তুই যা তোর বাড়িতে, একটা বৌ নিয়ে আয় ঘরে, নয়ত একটা মেয়ে মানুষ রাখ গে, কিন্তু তোর জন্যে এ বয়সে

সোয়ামীর গঞ্জনা আর সয় না।" এরকম অশান্তির ভেতর একদিন সত্যি সত্যি মামা বালুকে নিয়ে চলে গিয়ে ওকে তানার কাছে রাখলে। মামার নীচে যে কুড়িজন ড্রাইভার কাজ করত, তানা তাদেরই একজনের মা। তানার তিন ছেলে, বড়টি মামার তলায় ড্রাইভার, মেজটি মজুরের কাজ করত আর ছোটটি পড়ত স্কুলে। শেঠজীর চাকরদের ভাখরি বানাত এই তানা। তানার ছোট ছেলে হবার পর তানার স্বামী সন্ন্যাসী হয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে, কোথায় কেউ জানে না। ঘরে কোন বাচ্চা ছিল না, তাই বালুর ওপর তানার খুব মায়া পড়ে গিয়েছিল। আনসা যখন অসুখে পড়েছিল তখন তানা আনসাকে মাঝে সাঝে সাহায্য করত, আনসাকে চান করিয়ে ওকে গরম ভাত, সুজি এসব করে খাওয়াত। তানার স্বভাবটা ছিল খুবই শান্ত আর গোবেচারা ধরনের। কাজ সেরে ফেরবার সময় ঐ ড্রাইভার ছেলের সাথেই ফিরত, সঙ্গে থাকত ছাগলের জন্যে ডালপাতা, নদীর ধারে কচি ঘাস এসবের বাণ্ডিল। তানা বালুর যত্ন আত্তি করত ভাল করেই, মামা এর জন্যে ওকে কিছু টাকাও দিত। বালু এভাবেই তানার কাছেই মানুষ হতে লাগল। মামা শেঠজীর সাথেই খেত, ক্ষেতে যখন শেঠজীর জন্যে খাবার আসত তখন মামার জন্যও আসত। মামা আর বালুর এরকম লক্ষ্মীছাড়া অবস্থা দেখে আমি মনে মনে বাবা আর মার ওপর রেগে যেতুম কিন্তু মাঝে সাঝে মামা আর বালুকে দেখে আসা ছাড়া, করার আর আমার কিছুই ছিল না।

তিন

শেঠজীর খেতে যারা সারা বছরের জন্য কাজ করত, সেই সব চাকরদের ভাখরী পৌঁছে দেবার জন্য একজন মেয়ে ঠিক করা ছিল। প্রত্যেক খেতে চার পাঁচটা করে চাকর থাকত, মামা যে ক্ষেতটা দেখাশোনা করত সেখানে ছ'টা চাকর কাজ করত। ওরা যখন একসঙ্গে খেতে বসত, মনে হত ঠিক যেন লাইন পড়ে গেছে। মামাও তাদেরই মধ্যে একজন হয়ে মিলে মিশে খেত। চাকররা যদিও শেঠজীব ওখানেই খেত, তবুও আট দশ দিন বাদে বাদেই ওদের বৌরা স্বামীদের মনোমত খাবার রান্না করে নিয়ে চলে আসত খেতে, স্বামী স্ত্রী একই সঙ্গে কোনো গাছতলায় বসে খেত, গল্প করত। খাওয়া আর কথা বলার পালা শেষ হলে ফেরার সময় বৌরা খেত থেকে কিছু সবজি, জ্বালানি কুড়িয়ে কাড়িয়ে গাঁয়ের দিকে পা বাড়াত। যাবার আগে ওদের স্বামীদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে, মামা ওদের বেশ কিছুক্ষণ ছুটি দিয়ে দিত, বেচারারা নিরিবিলিতে একটুক্ষণ কাটাকই না। নিজের মনেও দুঃখ উথলে উঠত, আনসার কথা বারবার মনে পড়ে যেত। একা একা ইঞ্জিনের ধারে বসে আনসার কথা যত ভাবত ততই ওর কান্না উঠে আসত। বালু পরের বাড়িতে মানুষ হচ্ছে ভেবে ওর মনও বালুর দিকে পড়ে থাকত, নিজের ছেলেকে মামা খুবই ভালবাসত, স্নেহ করত। মাঝে মাঝে আর থাকতে পারত না, উঠে গিয়ে চলে যেত গাঁয়ে। সেখানে বালুকে নিয়ে ঘণ্টাখানেক বাজারে এখানে সেখানে ঘুরে পছন্দমত কিছু ওকে খাইয়ে বাড়িতে রেখে এসে খেতে ফিরে আসত। ফেরাব পথে নিজের মনেই আনসার কথা বলে, আনসা ওকে সুখের স্বাদ দিয়েছে, ওর ভাল দিন, সুখের দিন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল বলা যায়। এর আগে তো ও অনাথ বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে এদিক সেদিক। তারপর ক্রমে ক্রমে পাটিলের গোরু বাছুর চরাতে চরাতে মামা পাটিলের ইঞ্জিনের খবর নিয়েছে, ড্রাইভারের সঙ্গে সঙ্গে হাতে কলমে কাজ করেছে। মামার বুদ্ধি আছে, চোখ কান খোলা, তাই অনেক কিছুই শিখে নিতে পেরেছে সেই ফাঁকে। ক্রমশ শেখা এ বিদ্যেটা আরও বেড়েছে, ও আরও অনেক নতুন কিছুও শিখেছে। এর পর মামা গোরু চরানো রাখালের কাজ ছেড়ে দিয়ে ওর মালিকের খেতে ড্রাইভারের কাজ নিয়েছিল, বছর দুয়েক সেখানে কাজও করেছিল, তারপর সেটাও ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে। তারপর কত কীই না করলে, তাঁত বুনলে, আটার কলে কাজ করলে, ট্রাক, প্রাইভেট গাড়িতে ক্লীনারের কাজও করলে। ইঞ্জিনের কারখানায় মজুরি পেত ঘণ্টা হিসেবে। ইঞ্জিনের কাজে মামার দারুণ আগ্রহ, দারুণ উৎসাহ, অনেকটা পাগলামিই আছে বলা যেতে পারে। এই পাগলামিই ওকে নিয়ে গেছে নানা জায়গায়। শেষে এই শেঠজীর খেতে এসে মামা বসলে একটু স্থির হয়ে আর সেই স্থির হয়ে বসাটা সম্ভব হয়েছিল আনসারই জন্যে। এই যে এক জায়গায় স্থির হয়ে কাজে লেগে গেল, তার ফলে এখানেই মামার উন্নতি হল, শেষে খেতের পুরো দায়িত্বটাই মামাকেই দিলে শেঠজী। খেতের

পুরো ভার পাবার ফলে, খেতের যা ফসল তার এটা ওটা মামা বাড়িতে আনতে পারত, আর আনসাও সেগুলো লক্ষ্মী মেয়ের মতো, পাকা গিন্নীর মতো গুছিয়ে সংসার করে সচ্ছলতা এনেছিল সংসারে, আনসার সংসার ফুলে ফলে বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু এই বাড় বাড়ন্তের ভেতরেই এল চরম আঘাত। আনসার স্মৃতি মামার হাত পা অবশ করে দিত, যেখানে সেখানে বসে পড়ত।

তারপর একটা সময় এল যখন মামা চাকরদের সঙ্গে বসে আর খেতে চাইত না। চাকররা তার অধীন, মামা বলতে গেলে খেতের একরকম মালিকই বলা চলে। শেঠজী কখনো সখনো সন্ধেয় একটা চক্কর মেরে যায়, ঠিকই, কিন্তু দায়িত্বটা পুরোটাই মামার ওপর। শাক, সবজি ধানের চাষের বন্দোবস্ত মামাকেই করতে হয়, তারপর ফসল যখন উঠে যায় সেটা বেচে দেবার ভারও মামার ওপর। আর বেচে যা টাকা আসত তা মামা পৌঁছে দিত শেঠজীর ঘরে। গাড়ি ভরতি করে করে চাল, জোয়ার, আখ মামা পৌঁছে দিত শেঠজীর বাড়িতে। ফসলের কিছু কিছু চাকরদেরও মামা দিত, ওরাও সেজন্য মামার ওপর খুব খুশি। এসবের পর মামা ভেবে দেখলে চাকরদেব সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা না করাই ভাল। নিজের সম্মান নিজের কাছে এবং নিজেকেই তা বাঁচিয়ে চলতে হবে, নয়ত চাকররা ওকে মানবে কেন? কিছুদিন মামা ওর ভাখরিটা আলাদা করে রেখে চাকরদের খাওয়া হয়ে গেলে নিজেরটা খেয়ে নিত। ক্রমে এটাও মামার পছন্দ হচ্ছিল না। চাকররা নিজেদের ভেতর বলাবলি করত, "এও তো আমাদেরই মতন চাকর।" কেউ বা বলে, "তবে নামে সরদার," কেউ ফোড়ন কাটে, "ঐ নামেই সরদার, ও পর্যন্তই। আর সব তো আমাদেরই মতন, আমরাও মালিকের কাছে খাই, ও-ও খায়, এক জিনিসই তো খাই। আবার পেটে যে একই খাবার যায় শুধু তাই নয়, আমাদের মত সেও যা খায় তাও তো মালিকের জমিতেই হেগে আর সার ফেলে। তা বললে কি হবে বাবুর শখ হয়েছে আলাদা বসে খাবেন।" মামার কানে কথাটা যেতে মামার মনে হল যেন বিছে ওকে কামড়ে দিয়েছে, কথাগুলো এমনিভাবে বিঁধল ওকে। মামা ভাবে এভাবেই শেঠজীর জমিতে সার ফেলেই বাকি জীবনটা কাটবে নাকি? শেঠজীর জমিতে ফসল ফললেই মামার আনসার কথা মনে এসে যেত। সে বেঁচে থাকলে কিছু ঘরে নিয়ে যাওয়া যেত। আনসা ভাল ফোড়ন দিয়ে ডাল রেঁধে খাওয়াত, মুখে লেগে থাকবার মতন। আনসার হাতে সেঁকা একখানা ভাখরি খেলেই ওর পেট ভরে যেত। ধান কাটার সময় মামার মনে হল, "ইস্, আজ যদি আনসা বেঁচে থাকতো তাহলে এক বস্তা চাল বাড়িতে সে জমাতে পারতো, এতে ওদের সম্বৎসরের খোরাকিটা হয়ে যেত। গুড় তৈরী করবার সময় যখন আসে তখন মামার হয়রানির একশেষ। মালিকের যে ক'টা খেতে আখের চাষ হয়, সব ক'টাতেই আখ মাড়াই করবার কল বসাতে হয়, সব ক'টা খেতেই টহল মেরে বেড়াতে হয়। গুড় যতক্ষণ তৈরী না হচ্ছে ততক্ষণ পুরো দায়িত্বটাই তো মামার ওপর কি না। যেতে আসতে মামা গুড়ের এক আধটা টুকরো নিয়ে আসে। এই সময়টায় কাগলের আশপাশের গাঁ থেকে মামার ডাক পড়ত, আখ মাড়াই করবার কলটা খারাপ হয়ে গেলে তা সারাবার জন্যে। মামা সারারাত কাজ করে অচল কল মেরামতি করে

খেতের আলের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে ফিরে আসত। এ সময়টায় মামা প্রচুর গুড়ের পাটালি পেত, আর আনসা সে সব তুলে জমিয়ে রাখত। বর্ষাকালে গুড়ের দাম যখন চড়ত, আনসা এসব গুড় তখন একটু একটু করে বাজারে বেচে দিত, এ থেকে দুটো বাড়তি পয়সা আয় হত। মোষের দুধ বেচেও এভাবেই বাড়তি দুটো পয়সা রোজগার করত আনসা। এ সময়টাই তো একটু টাকা পয়সা রোজগারের সময়। আনসা না থাকাতে মামার প্রাণটা আঁকু পাঁকু করে, হাত কামড়ায়। সে যদি এভাবে বিবাগী হয়ে দিন কাটায় তাহলে ওর ছেলেটা তো ভিখিরি হয়ে ঘুরে বেড়াবে পথে পথে। মামা এটা বুঝতে পেরেছে যে ওকে এ পৃথিবীতে এখনও অনেক দিন থাকতে হবে। এভাবে কুকুরের মতো মনিবের ভাখরির টুকরো খাবার আর পেটের ছেলেকে আরেকজনের কাছে মানুষ করতে ফেলে রাখার যে জীবন ওর, তাতে না আছে সাধ না আছে আহ্লাদ।

গ্রীষ্মে কাজ শেষ হ'লো, এর পর এল বর্ষা, মাটি ভিজল, বীজ রোয়া হ'লো। এ সময়টায় আসে বলদ পার্বণ বেঁদুর। সেদিন মামা বালুকে সাজিয়ে পরিপাটি করে নিয়ে এল আমাদের বাড়ি। বহুদিন বাদে মামা আর বালুকে একসঙ্গে দেখে মার ভাল লাগল। মাঝে এ সময়টায় দুজনের কথাবার্তা বন্ধ ছিল, ঘরে বসে আনসার কথাই কেবল মার মনে পড়ে যেত থেকে থেকে। নববর্ষে অর্থাৎ "পাড়ওয়াতে" বলদের পার্বণ-এ বেঁদুরে আনসা ভাইবোনেদের জন্য কিছু না কিছু আনতই। এবার মামা এসেছে একা বালুকে নিয়ে, দেখে মা চোখের জল আটকাতে পারলে না।

"এতদিনে দিদিকে মনে পড়ল, আসতে পারলি তা হলে?" এই বলে মা মামার হাত থেকে বালুকে টেনে নিলে, "হ্যাঁরে বালু, দিদার কথা তোর মনে পড়ে দাদুভাই?"

দুজনে বসে বসে আনসার কথা উঠতে কিছুক্ষণ কেঁদে হালকা হলো। মা বললে, "আজ যখন পরবের দিনে এসেই পড়েছিস তখন তোরা দুজনে এখানে খেয়েই যা," বলে তাদের রেখে দিলে।

"দিদি, এবারের ফসল আমাদের কোনো কাজে এল না। দু এক মন জোয়ার, মন খানেক ধান কুড়িয়ে নেয়া যেত, চলে যেত বছরটা। মুগের ডাল ছাড়াও অন্য ডাল, লঙ্কা সবই পেতে পারতুম, সাত আট ডেলা গুড় পেতে পারতুম আর তা জমিয়ে রাখা যেত। দুটো মোষের দুধ তো এখনও শেঠজীর বাড়িতেই যায়। এ দুধের পয়সায় ঘরের খরচ চলে যেত আমার। সব মাঠে মারা গেল। এত ফসল চারধারে, আমার ঘর কিন্তু ধর্ম্মশালার মতই ফাঁকা।"

"আমার আনসা বেঁচে থাকলে সব জমিয়ে রাখতে পারত। তাহলে কি আর তোকে একদিকে আর তোর ছেলেকে আরেক দিকে পাক খেয়ে ঘুরে মরতে হত?"

"আমার কপালে ঘোরা থাকলে কে খণ্ডাবে বল? ঘুরতে হবে বৈ কি!"

"আমার সোয়ামীটাও যদি একটু ভাল হত তাহলে কি আমি তোদের এভাবে ঝড়ের মুখে ঠেলে ফেলে দিতুম?"

"ওসব বলে আর লাভ নেই কোনো। মনিবের খাবারে না আছে স্বাদ, না তাতে কোনো লাভ। ওখানে গোরু বলদেরও যা খাবার চাকরদেরও তাই, ঐ একই। এ

খাবারই আমাকে খেতে হচ্ছে। তরকারি আর ভাখরি চটকে কোনরকমে গলায় ঠেলে দিতে হচ্ছে আর কি! এদিকে আমার ছেলেটা পরের ঘরে বড় হচ্ছে— যেন বনবাসে দেওয়া হয়েছে। দিন রাত এত কষ্ট করে রোজগার করে কি লাভ?"

"তাহলে কি করবি ঠিক করেছিস বল?" মা এবারে সোজাসুজি জিজ্ঞেসই করে ফেললে।

"এভাবে ছেলেটাকে নিয়ে আমি বাঁচব কি করে? খাওয়া দাওয়ার একটা পাকাপাকি ভাল ব্যবস্থা করতে হয়।"

"আমি কি তোকে বারণ করেছি নাকি?"

দুজনেই আরেকবার বিয়ের কথাটা পাড়তে কিন্তু কিন্তু করছে।

"তা নয়, মনটা শক্ত করে কিছু একটা ঠিক করতে হবে।"

"তা ঠিক কর না, কি বলবি বলেই ফেল না।"

"আনসা মারা গেছে তা সাত আট মাস হয়ে গেল। একটা মাস কি আমি, কি আমার ছেলে, কারও দিকেই কুকুরেও মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে নি। আমার থেকেও আমার ছেলেটার এরকম অনাদর আমি আর সইতে পারছি না। আনসার ওপর আমার যতই ভালবাসা দয়ামায়া থাকুক না কেন, আনসা এখন স্বর্গে গেছে। আজ না হয় কাল বিয়ে আমাকে করতেই হবে।"

"কর না বিয়ে। আমি কি তোকে বারণ করেছি? দাদার সংসার ওখানে একরকম ভালভাবেই চলে যাচ্ছে। আমি যেমনই থাকি না কেন সংসার ঠিকই করে যাচ্ছি। তাই আমি কি আর এখন তোকে বলতে পারি যে তুই সারা গায়ে ছাই মেখে বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়া? তোর বংশ বাড়াতে হবে তো না কি? তোর সুখই তো আমার সুখ রে। তোরা বাপ ছেলে মিলে এভাবে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস এ কি আমার ভাল লাগে?" মার মনে একটা মোচড় খেয়েছে বলে মনে হল।

"আমি কি সে কথা বলছি না কি? আনসা গেছে সাত আট মাস হয়ে গেল। বছর যেতে এখনও চাব পাঁচমাস বাকি। বিয়ে করলে এ সময়ের ভেতরেই সেরে ফেলতে হবে। নয়ত সেই তিনটি বছর হাঁ করে বসে থাকতে হবে।"

"কর, কর। তুলসীর বিয়ে হলে চট্ করে বিয়েটা সেরে ফেল। তিন বছর কে বসে থাকবে? ততদিনে ঘরদোর ধুলোয় ভরে যাবে, কিছুই থাকবে না। সেজন্য আমি বলি কি সংক্রান্তির আগেই সেরে ফেল।"

"আমারও তাই মত। মন শক্ত করতে হবে। এখন তো বর্ষাকাল, কাজ কম। খোঁজ খবর নেবার এই হচ্ছে সময়, ভাল সম্বন্ধ পেলে পাকা করে ফেলতে হবে।"

পার্বণের খাওয়া খেয়ে মামা উঠে পড়লে। মার কথামত বালুকে চার পাঁচ দিনের জন্য আমাদের এখানে রেখে গেল, দিদার কাছে থাকতে পেয়ে বালু খুব খুশি। 'বেঁদুর' পরব বলে আমি কিছুক্ষণের জন্য সন্ধ্যায় গাঁয়ের বাড়িতে এলুম। বর্ষার দিন বলে এমনিতেও মাঠে তেমন কাজ নেই। আজ বলদদেরও ছুটি। শৌখিন লোকেরা আজকের দিনে বলদদের সুন্দর করে সাজিয়ে সারা গাঁয়ে ঘোরায়। আমি আর শিবা তাই গাঁয়ের দিকে তাড়াতাড়ি করে এসেছি। বাড়িতে বালুকে দেখতে পেয়ে আমরা দুজনেই বেজায়

খুশি। আমরা বালুকে নিয়ে গাঁয়ে সাজানো বলদ দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। মার মুখ কিছুটা গম্ভীব নজরে এসেছিল, কিন্তু সে দিকে অতটা মন দিই নি আমরা। মা বাইরের দিকের ঘরে বসে গায়ের কাঁথা সেলাই করছিল। এ সবুজ কাপড়টা আনসা পরত। সেটা টুকরো টুকরো করে মা একদিকে লম্বা করে লাগাচ্ছে। অল্প কালের জন্য হলেও আনসার কথা মনে পড়ে আমাব মনটা ওর স্মৃতিতে তলিয়ে গেল। ওর কথা আমার মনের গভীরে রেখে দিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লুম বালুকে নিয়ে। আসল কথা, বাড়ির কেউ মারা গেলে ওর কাপড় সবই গরীবদের ফসলের সময় দান করে দেয়াই রেওয়াজ। মরা মানুষের কাপড় দিয়ে গরীবের সংসাব ঢেকে দিলে তারা মৃত ব্যক্তিকে আশীর্বাদ করবে এই বিশ্বাসই চলে আসছে। আমাদের এই অভাবের দিনে মা এই রেওয়াজ মেনে আনসার কাপড় কিন্তু গরীবদের মধ্যে দান করে দেয় নি। একবার ভেবেছিল নিজের মেয়েদের পরতে দেবে সে কাপড়। একবাব বর্ষায় বীজ রোয়ার সময মেয়ে দুটো ভিজে জবজবে হয়ে যখন বাড়িতে এল তখন মা হীবা আর ধোণ্ডুকে পরতে দিয়েছিল সে শাড়ি। মা ভাবলে বড় মেয়ে মরল আর ছোট মেয়েরা ওর কাপড়ে সাজল, ওরা যেন অপেক্ষাই করছিল কখন বড় জন মরবে আর কখন ওরা ওর সে কাপড় পরবে। মা তাই পরেব দিনই আনসার কাপড পবিষ্কাব করে ধুয়ে পোটলায় করে বেঁধে তুলে রেখেছে। এর মধ্যে আবার ভেবেছে যারা পুবোনো কাপড়েব ব্যাবসা করে তাদের কাছে বেচে দেবে আনসার এ কাপড়টা, কিন্তু মবা মেয়ের কাপড় বেচে সে পয়সা সংসাবে ঢালার মতো কসাই তখনও হতে পারে নি মা। সেই কাপড় এখন কাঁথায় তাপ্পি দিয়ে মা যেন তার মেয়ে আনসাকে তার সংসারে বেঁধে রেখে দিলে চিরদিনের জন্যে। সেই সবুজ কাপড় কেটে তাপ্পি মারতে মাবতে আর তাতে ছুঁচ ফোটাতে ফোটাতে মার নিশ্চয়ই পুরোনো কত স্মৃতিই না মনে পড়ছে। মার মুখ দেখে তাই মনে হল। মুখে কোনো কথা নেই, চুপ করে সেলাই করেই যাচ্ছে।

দু ঘণ্টা ধরে উৎসব দেখলুম। চৌগুলে পাতিল, সাওলেকব এদের বলদগুলো যেন দৈত্যের মতন পালোয়ান হয়েছে, গা চকচকে, সাজ দেখলে চোখ আর ফেরানো যায় না, গাঁয়ের শোভাই যেন দেখান হচ্ছে এদের সাজসজ্জাব ভেতর। আর আমাদের বলদ? আমাদের বলদ যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকত। ওরা কখনও পেট ভরে খেতে পেত না। আমাদের ভাইবোনদের মতো ওদেরও কপালে কষ্ট আর অনাহার লেখা ছিল। আমি ভাবছিলুম আমাদের ঘরে সুন্দর বলদ কবে তৈরি হবে?

মনে মনে দুঃখটা চেপে বাড়িতে ফিরে বালুকে শিবার কাছে জিম্মা করে আমি গলির ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারতে বেরিয়ে এলুম। ফিরলুম যখন তখন রাত দশটা বেজে গেছে। পরবের দিন বলে বাবার খাওয়া দুপুরেই খেতে দিয়ে আসা হয়েছে তাই ওখানে আর যেতে হবে না।

বাড়ি ফিরে এসে দেখি বাছারা ততক্ষণে সব শুয়ে পড়েছে। মার বিছানায় বালু ও আপ্পা পাশাপাশি শুয়ে আছে। মা আর আমি খেতে বসলুম। মা আমাকে সবে তৈরি গরম গরম ডাল, দুটি রুটি আর একপাশে একটুখানি ভাত বেড়ে দিলে। ঢোকার সময়ই দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছিলুম মা মেঝেতে পায়ের ওপর পা তুলে ঘরের

ফিকে আলোয় চুপচাপ বসে আছে— হয়ত আমারই পথ চেয়ে বসেছিল। খেতে খেতে সকালে যা হয়েছে মা তাই আমাকে বললে। "জানিস, আমার মেয়ের ছেলে এখন অনাথ হয়ে যাবে।"

"কেন? মামা তো ভাল বৌও পেতে পারে, কে বলতে পারে?"

"পেলেই বা? পেটের ছেলে আর পরের ছেলে কখনও এক হয়?"

"আনসার সতীন এলেও আনসা তো ওর সাথে ঘরও করতে আসছে না আর নতুন বৌকে জ্বালাতেও আসছে না। তাহলে নতুন বৌই আনসার ছেলেকে জ্বালাতে যাবে কেন?"

"না রে বাবা, ওরকম নয়। তোর মামার আর নতুন বৌএর ছেলেপুলে হলে তাদের দুজনদের সংসারে বালু হয়ে যাবে পর। তার না হবে যত্ন-আত্তি, না হবে কিছু। যা দেবে খেতে তাই খেতে হবে। তাছাড়া নতুন বৌ ভাববে বালু তার সংসারে উটকো। শুধু ভাগ বসাতে এসেছে। তার পেটের ছেলের অংশে বালু ভাগীদার হবে। এসব ভেবে চিন্তে নতুন বৌ বালুকে হেনস্তা করবে, তাই না? এর পরেও ছেলেটা যদি বেঁচে থাকে তবে ঠাকুরের আশীর্বাদই মনে করব।"

"মামা বালুকে হেনস্তা করতে দেবেই না, বালুর ওপর ওর ভীষণ মায়া, আনসার ওপরও ওর ভীষণ মায়া ছিল। নতুন মা বালুর অনিষ্ট করলে মামা ওকেই আগে মারবে।"

"তুই এখন এসব ভাবছিস তাই। নতুন বৌ এলে দুজনে যে এক হয়ে যাবে না তা কি করে জানলি?

"ওরা এক হলে ভালই হবে, মামার সংসার চলবে ভাল। পরে মামার যা ছেলে-পুলে হবে ওরা যেমন মামার নিজের তেমনি বালুও তো ওরই সন্তান। তাছাড়া বালু হল গিয়ে মামার বড় ছেলে, ও যখন আরো বড় হবে তখন মামার কত কাজই না করে দেবে? একদিন তুমিই তো মা মামার নতুন সংসার পেতে সাজিয়ে গুছিয়ে দিয়ে এসেছিলে, মামাকে সংসারী করেছিলে। আজ তুমিই কি ওকে আবার বাঁজা নারকোল গাছের মতো এককোণে একা ফেলে রাখবে? মামার ভালমন্দ তো তোমাকেই দেখতে হবে।"

"জানি, জানি, আমার ভায়ের ভালমন্দ আমাকেই দেখতে হবে, তা না দেখে আমি কি পারব? একদিকে যেমন ওটা আমার ভায়ের সংসার, তেমনি আবার আমার মেয়েরও তো সংসার বটে, আমার মেয়েই তো ওর ঘরটা সচ্ছল সংসারে দাঁড় করালে, মোষ কিনলে, সোনার গয়না গড়ালে, ঘর বাড়ালে, ঘরের পেছনের আঙিনাটায় গোয়ালঘর করলে, বাসন-কোসন কিনলে, আবার পয়সাও একটু জমালে। এ সংসারে এখন যে আসবে সে তো তৈরি সংসার পাবে কি না। সেখানে বিনা কষ্টে বসবে মালকিন হয়ে আর যার গোছানো সংসারে ও এসে খালি ঢুকে গেল তার ছেলে ওর কাছে হয়ে দাঁড়াবে পরগাছা। আর দুদিন পর যদি ঐ মেয়েমানুষ আমার ভাইকে ভেড়া বানিয়ে না রাখে তো কি বলেছি! তখন তো আমার ভায়ের কাছে কাল অবধি যা ভাল ছিল, সেটা আজ নতুন সংসারে খারাপ ঠেকবে, সেটাই তো হয়, হবেও তাই। আমার

মনের ভেতর এ খচখচানিটা কিছুতেই দূর হচ্ছে না।"

"চার পাঁচ দিন পরে মামা তো বালুকে নিতে আসবেই, তখনই না হয় এসব কথা তুলো। মামাই বাতলাক এসবের মুস্কিল আসান কি করে হবে? তবে বিয়ে তো মামার দিতেই হবে। নতুন বৌকে যে মা হবার আগেই মা হতে হবে সেটা ভাল করে বোঝাতে হবে।"

তারপরেও এ নিয়ে মার সঙ্গে অনেক কথাই হল, মা আজ আমাকে অনেক কিছু বলে ফেললে। ভাই বোনের সম্পর্কের কথা এভাবে এই প্রথম আমার সঙ্গে এত খোলাখুলি আলোচনা করলে। এসব কথা মা কাউকে বলতে চাইছিল কিন্তু বলতে পারছিল না। হাতের কাছে আমাকে পেয়ে সব বলে টলে একটু হালকা হল। আমার কাছে মত চাইছে দেখে আমি নিমেষের ভেতর যেন বড়ই হয়ে গেলুম, বড়দের মতোই কথাও বললুম আবার কথার পিঠে কথার জবাবও দিলুম। আসলে মনে মনে আমারও ইচ্ছে মামা আরেকটা বিয়ে করুক। আনসা চলে যাবার পর আমিও যেন অনাথ হয়ে গেছি। গাঁয়ে নির্ভর করাব মতো বড়সড় একজন থাকুক এ আমি মনপ্রাণ দিয়ে চাইছিলুম আর নতুন মামীর ভেতর সেরকমই কাউকে পেতে পারি এ আশাই করছিলুম।

এরপব চার পাঁচ দিন কেটে গেছে। বাবার রাতের ভাখরি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে দেখি মামা বালুকে নিয়ে মার সঙ্গে কথা বলছে।

"কখন এলে?" আমি মামাকে জিজ্ঞেস করলুম।

"এই মাত্র।"

আমিও মামার কাছে গিয়ে বসলুম। মামা মাকে বললে ওর মনিবের কাছে দ্বিতীয় বিয়ের কথাটা ও তুলেছে, মনিব বলেছে এ গাঁয়ে বা গাঁয়ের বাইরে কনে দেখতে। মনিবেরও একই মত যে মামার শীগ্গিরই বিয়ে করা উচিত। তাহলে মামাকে আর তার ছেলেকে রান্না করে খাওয়াবাব একজন লোক আসবে, যার কাছে এটা সেটা ভালমন্দ আবদাব করে দুজনেই খেতে পারবে। মা সব শুনে যাচ্ছে, মুখেও হুঁ হুঁ করে যাচ্ছে, কিন্তু মনে মনে স্থির একটা কিছু করেইছে তা বোঝাই যাচ্ছে। মামার সব কথা শেষ হবাব পর মা বললে, "বেশ তো, তুই মেয়ে দেখ, এবারে আর আমি তোর মেয়ে দেখতে পারব না, তোর বৌ তুইই দেখেশুনে নে। হাজার হোক দ্বিতীয় পক্ষের বৌ তো। আরেকটা কথা, গরীব ঘরের মেয়ে দেখ, দোজবরের সাথে ঠিকমত যে চলবে। মেয়ে পছন্দ হলে ওসব বুঝিয়ে বল ওদের। ওরা এসবে রাজী থাকলে না হয় এগোন যাবে'খন। তা না হলে অন্য মেয়ে দেখতে হবে। মেয়ে যেন কুমারী হয়, কারো এঁটো মেয়ে নিস না। নষ্ট মেয়ে চাই না আমরা। দেখ, কোনো গরীব ঘরের মেয়ে পেয়েই যাবি। আগে থেকেই সব খোলাখুলি পরিষ্কার করে কথা বলে নিবি। আগে বলবি একরকম, পরে বলবি অন্য কিছু, দেখিস এসব যেন না হয়। ওতে শুধু শুধু গণ্ডগোলই হয় পরে।"

"না, না আগেই সব বলব, লুকোব কেন? বালুর জন্যে এসব তো করতেই হবে।" মামা ভেতরে ভেতরে খুশিই হয়েছে, একে তো মার অমত নেই, তাছাড়া খোলাখুলি কথা বলাতে মা কোনদিকে ভাবছে তারও আঁচ পাওয়া গেল। মামার দিদি

মামার পাশে এসে দাঁড়াক এ ব্যাপারে, মামা এটাই চায়। এ গাঁয়ে দিদি ছাড়া তো মামার আর কেউই নেই। অবশ্য ভাই ছাড়া মারই বা আর কে আছে?

প্রচণ্ড উৎসাহে মামা বেরুল কনের সন্ধানে। মাঝে মাঝে দিন পনের বাদে বাদে দু চার দিনের জন্যে বালু এসে থাকে আমাদের বাড়িতে। বিয়ের ব্যাপারে আমাদের বাড়িতে আবার মামার নিয়মিত ভাবে আসা যাওয়া শুরু হয়ে গেল।

তুলসীর বিয়ের পর একদিন সত্যি সত্যি মামার দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েটাও হয়ে গেল। বিয়েটা হল আমাদের বাড়িতেই। এটা মামার ইচ্ছে অনুযায়ীই হল। মামার প্রথম বিয়েটাও মামার দিদি তার বাড়িতেই দিয়েছে। দ্বিতীয়টাও দিদিই তার বাড়িতেই দিক, গাঁয়ের লোক এটাই জানুক, মামা তাই চাইছিল, যার যা ইচ্ছে। মামার এ ধরনের ইচ্ছেই ছিল। বাবা মার আপত্তির কোনো কারণই নেই— তারাও এ ব্যবস্থায় যথেষ্ট খাতির পাচ্ছে।

নতুন উৎসাহে নতুন করে সংসার পাতলে মামা। মামারও বিয়ে হল আর আমার গর্ভবতী মা ঐ বিয়ের প্রায় সাথে সাথেই একটা মেয়ের জন্ম দিলে। মার মনে হল হয়ত বা আনসাই তার কাছে ফিরে এসেছে, তার স্বামীর নতুন সংসার কাছে থেকে দেখতে পাবে।

শেঠজীর কারখানা থেকে রুগ্ন আনসা আমাদের এ বাড়িতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাকে বলেছিল, "মা আমি আর বাঁচব না। আমার মরদের তুমি আবার বিয়ে দাও। আমার বালুকে যত্ন-আত্তি করবে নিরীহ শান্ত গোছের একটা মেয়ে তুমি খুঁজে দিও।" জন্মের বার দিন পর নতুন কন্যার 'বারসা' অর্থাৎ নামকরণের দিন আনসার এ কথাগুলো মার মনে পড়ে গেলে মা কেঁদে ফেললে। কাঁদতে কাঁদতেই বললে, "আমার এ মেয়ের নামও তোমরা আনসাই রাখ।" এর আগে দশটি সন্তান হয়ে গেছে, এটি মার এগার নম্বর সন্তান। এখন থেকে একটা বাড়তি ভাখরি বাবা আর মার ভাখরি থেকে বার করতে হবে।

চার

পরের বছর বর্ষা যখন নামল তখন তা ভাল করেই নিয়মমাফিকই হতে লাগল। বীজ রোয়া হয়ে যাবার পর মাঠের কাজও কমে গেল। গোরু মোষদের জন্যে ডালপাতা কেটে রাখ আর তাদের গোবর গোবরের ঢিবিতে জমিয়ে রাখ এই যা। গোয়ালে ভীষণ কাদা, গোরু আর মোষ সারাদিন ঘরের ভেতরেই রয়েছে, ঘরে তাই গোবর আর চোনার গন্ধ ভরে থাকত। সে গন্ধকেই সঙ্গী করে আমি খেতুমও, বইও পড়তুম।

কাজ নেই, বাবা গাঁয়ে ফিরে গেছে। মাঠে আমি একা। বসে বসে হাঁপিয়ে গেছি। হাতের কাছে পড়ার বইটইও কিছু নেই। আমি গোরু মোষদের দেখছি, ওরাও দেখছে আমাকে। বাদলে আমরা সবাই ঘরে আটকা, মুখে কারও কথা নেই। সারাদিন অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে, ঘরে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। কিন্তু বাইরে যাবার জো নেই। ঠাণ্ডায় নড়তে চাইছে না কেউ, সবাই মুখ ঢেকে জবু থবু হয়ে বসে আছে। সন্ধের অন্ধকারে গোরুদের ঘাসের বাণ্ডিল চোখে দেখা যাবে না। ভাবলুম কচি ঘাসের দু তিন আঁটি এ বাদলায় বাজারে গিয়ে বেচে দিলে দুটো পয়সা আসে হাতে। কতদিন যে সিনেমা দেখি নি। এসব ভেবে চিন্তে সব ভীড়ভাট্টা কেটে গেলে আমি জলের কাছে গিয়ে সেখানে কিছু ঘাস কেটে আঁটি করে আখের খেতে রেখে এলুম। সন্ধে হতেই বাজারে যখন গেলুম তখন কদমাদের শির্প্যাত সেখানে গিয়ে হাজির। তার সাথেও আছে আখের ডালপাতা এসব। সেই যে ক্লাস টুতে স্কুল ছেড়েছে ও, তারপর তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ কমই হত, যদিও থাকত সে আমাদের গলিতেই। এগার বার বছর বয়স অবধি এর পর ও শুধু গোরুমোষই চরিয়েছে। পরে রোজগারের ধান্দায় ওর মার সঙ্গে একসাথে মজুরের কাজও করেছে। হাত-পাগুলো সরু কাঠির মতো, এদিকে লম্বা হয়েছে তাল গাছের সমান। পরেছে খাকি কাপড়ের ভেজা প্যান্ট, ছিঁড়ে কুটি কুটি হয়ে ঝুলছে। শির্প্যাদের পাশেই যে কাটকার পুলিস থাকত, সেই ওকে প্যান্টটা দিয়েছে, যখন ওটা পরে-টরে পুরোনো হয়ে গেছে। গায়ে প্যান্টের মতনই ছেঁড়া জামা। বৃষ্টিতে জামা প্যান্ট ভেজা, পায়ের বেশির ভাগটাই কাদা মাখানো। ঠাণ্ডায় ও কাঁপছে আর একটা ভেজা বস্তা মাথার ওপর দিয়ে বুকের কাছটা চেপে রেখেছে, যদি ওতে শরীরটা খানিকটা গরম হয়। প্যাঁচার মতো বড় বড় চোখ করে কালো মুখখানা হাঁ করে খোলা, এক দৃষ্টে দেখেই আমি শির্প্যাকে চিনতে পারলুম আর তখুনি বললুম, "কি রে শির্প্যা?"

"লাগা, লাগা, তোর বাণ্ডিলটাও দে লাগিয়ে সোজা করে।"

"হ্যাঁ রে শির্প্যা, তুই আমাকে চিনতে পারলি না?"

"তুইও তো আমাকে চিনতে পারিস নি।"

"তা, আমাকে তুই চিনতে পারলি না কেন?"

"চিনব কি করে বল? তোর ঐ চেহারাটা একবার জলে ঝুঁকে দেখ গে, তাহলেই

বুঝবি চিনতে পারলুম না কেন। গায়ের জামাটা লাল মাটিতে বেশ ভাল করেই রাঙিয়েছিস দেখছি। প্যান্টের পেছনটা বাঁদরের পাছার মতো লাল মাটির কাদায় লাল। পাগুলো কাদায় যেন পচে গেছে, ভারী ভারী হাত। তোর এ চেহারা এখন দেখে কেউ বলবে যে তুই ক্লাস সেভেন পাশ করা আমাদের সেই আন্দু? তোর চেহারাটা এখন কেমন দেখতে হয়েছে জানিস? ঠিক যেন লাঙল ধরা চাষা। আর গায়ের গন্ধ? বলদের চোনার মতো?"

. আমার মুখটা কালো হয়ে গেল, ধরা গলায় বললুম, "এখন স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে, লাঙল ধরা চাষা হব না তো কি ব্যারিস্টার হব?"

"তাহলে অতদূর পড়াশোনা করে তোতে আর আমাতে তফাৎটা কি রইল? তার চেয়ে বরং আমিই ভাল আছি।"

"কি করে?"

"দেখ, তুই স্কুল ছেড়েচিস ক্লাস সেভেন-এর পর, আমি ছেড়েছি ক্লাস টুতে। তাহলে আমি হাতে পেলুম ছ'টা বছর। সেই তখন থেকে কাজ করে আমি আমার পেট চালাচ্ছি। আর তুই? তুই তো সেই ছ'টি বছর বাপ মায়ের খেয়ে পরে সেই বোঝাই হয়ে রইলি। স্কুলে পড়লি কিন্তু সেই আবার কাস্তেই ধবলি। তাহলে তোর আর আমার ভেতর ফাবাকটা কোথায়? স্কুলে পড়ে চাকরি পেলে স্কুলে পড়ার একটা অর্থ হয়, নয়ত এমনি হাগলেও যা পেট ছাড়লেও তা।"

"তা কেন হবে? ক্লাস সেভেন অবধি পড়ে অনেক কিছু জানলুম, শিখলুম।"

"সেটা মাঠের কোন কাজে আসবে? তার চেয়ে স্কুলে না পড়ে গোড়া থেকেই খেতে কাজ করলে মাঠের হালচাল এখন যা জানিস তার চেয়ে ঢের বেশি জানতিস। এখন তোর না হল এদিক না ওদিক।"

কথা বলতে বলতেই খদ্দের এসে গেল। শির্প্যা ওকে বোঝাচ্ছে ওর আনা ডালপাতা কত সুন্দর কত কচি সবুজ, গোরু মোষ খোয়াক্ষীর মনে করে খাবে, আরো কত কী বলে খদ্দেরকে বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। খদ্দেরটি কিন্তু বুঝল না, এগিয়ে গেল। শির্প্যার মন খারাপ হয়ে গেল, সে লোকটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

আমি আমাদের কথাবার্তার বিষয় বদলাতে চাইলুম বলে এমনি জিজ্ঞেস করলুম,

"পাতা এনেছিস কার কাছ থেকে?"

"মকবুল পাঠানের একটা বাগান থেকে।"

"তার মানে নীচের দিকের জমি থেকে। ওরে বাপরে ওখানে নিশ্চয়ই ভয়ানক কাদা মাটি। মাঝের ঝোপটার ভেতরের রাস্তাটায় কাদায় হাঁটু ডুবে যায়।"

"কি করব বল? পেট তো চালাতে হবে। গরমের সময় কাজ করতে করতে ঘেমে নেয়ে গিয়ে হয়রান হয়ে যেতে হয় আর বাদলায় যখন হাতে কাজ থাকে না তখন কারো না কারো খেতের বাঁধের ধারে গিয়ে ভিক্ষে চাইতেই হয়। পাঠান লোক ভাল, তাছাড়া সারাটা গরম ওর কাজ করি আমি, তাই সে আমাকে ডালপাতা দিয়েছে। নইলে তুইই বল এ বাদলায় কেউ কাউকে দেবে ঢুকতে আখের খেতে?"

"আখের খেতে খুব কাদা, না রে?"

"হবে না? কাল মাটির জমি যে। হাঁটু অবধি কাদায় ডুবে যায়, বসলে পাছায় কাদা ঢুকে যায়। ল্যাঙ্গোট পরে কাজ করা যায় না, তাই তো এ প্যান্ট পরতে হয় এর তার কাছে চেয়ে।"

আমার হাসি পেয়ে গেল।

"হাসছিস যে? আরও বছর দুই যাক, আমার মতন তোরও বিয়ে হোক, তখন বুঝবি বর্ষাকালে পেটে কেমন পাগলের মতো ছুঁচোয় ডন মারে। এরকম দিনে পাছায় সবার ছিপি এঁটে রাখতে হয়।"

"কেন রে?" আমার আরো হাসি পেল।

"নতুন জলে আর এই ঠাণ্ডা হাওয়াতে হাগা পায়, সারাক্ষণ পায়খানায় ছুটতে হয়। ব্যস্, তারপর হেগে পেট যেই খালি হলো অমনি খালি খাই খাই। কিন্তু খাবটা কি? কোথাও কাজ না পেলে পেটে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে? তাই এ সময় পাছায় ছিপি এঁটে দিলে বেরও হবে না কিছু আর খিদেও পাবে না।"

"মন্দ ভাবিস নি, তুই লাগা তোর পাছায় ছিপি।"

"আমি তো লাগাবই, কিন্তু তোকেও আজ না হয় কাল ছিপি লাগাতে হয় কি না দেখ। ওরে হাঁদারাম! তুই এখন ইচ্ছেয়ই হোক বা জবরদস্তিতেই হোক, চাষেই তো এসেছিস, না কি?"

এরই মধ্যে ভাগবৎ নানাকে দেখছিলুম ডালপাতার স্তূপের দিকে এগোতে। শির্প্যার পাতাব বাণ্ডিল পাশ কাটিয়ে সোজা আমার কাছেই এল সে। শির্প্যা তাঁকে বললে, "কি আন্না, কথা না বলেই চলে যাচ্ছ যে? নাও না আমার পাতাগুলো। আমার আঁটিগুলো যেন খোয়াক্ষীরের মতো।"

"ওরে, এই কচি ঘাসের সময় পাতা নেবে কে? আমার মোষটা এখন দুধ দিচ্ছে ভাই।"

"তা পাতা খেলে কি দুধ হয় না, আন্না? কচি, সবে ফুটেছে মিষ্টি পাতা, আন্না।"

"তা হোক বাছা, আমার চাই না," আম্মা ওকে পাত্তা না দিয়ে ওর আঁটিগুলো টপকে আমার আঁটিগুলোর দিকে চলে এল। আমি দামটা বললুম, শির্প্যার মতো খদ্দেরের ঘাড় ভেঙে বেশি লাভ করার ইচ্ছে আমার ছিল না। তাও প্রতিবারের মতই একটু দরাদরি করলুম তারপর ঘাসের আঁটি বেচে দিলুম।

"শির্প্যা, যাই রে," বলে আন্নাকে ধরতে বলে আমি আমার বাণ্ডিল তুলে নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলুম। শির্প্যা উত্তর দিলে না, ওর মুখে কেউ যেন তালা লাগিয়ে দিয়েছে, ও-ও অস্থির হয়ে যাচ্ছে। এদিকে রাত বাড়ছে, খদ্দেররাও ক্রমে ক্রমে ঘাসের আঁটিগুলোর দিকেই ঝুঁকছে। কেউ কেউ শির্প্যার পাতার আঁটিগুলোও নিতে চাইছিল কিন্তু দাম যা দেবে বলছে তাতে শির্প্যার সারাদিনের কষ্টটা পোষায় না। ওর ঘরেও কয়েকটা মুখ নিশ্চয়ই বসে আছে হাঁ করে। শির্প্যার লম্বা মুখ আরো কালো, আরো লম্বা হচ্ছে, জলভরা বর্ষার কালো মেঘের মতোই থমথমে সে মুখ।

বর্ষায় ড্রেনের জল আটকে গিয়ে রাস্তায় নোংরা ছড়ানো। খালি পায়ে জখম নিয়ে সেই নোংরা মাড়িয়ে আন্নার পিছু পিছু আমি চলেছি, সরু সরু গলি পার হয়ে,

মাথায় রয়েছে ঘাসের বোঝা। তার থেকে জল ঝরছে, সে জল গায়ে দেয়া চটের বস্তা ছাপিয়ে পড়ছে হাতে পায়ে।

আন্না বাড়ির বড় সদর দরজাটা খটখট শব্দে খুলে দিলে আমি ঘাসের বোঝা নিয়ে ঢুকে পড়লুম। ভেতরের খোলা জায়গাটা পেরিয়ে দরজার সামনের উঠোনটায় মাথার ঘাসের বোঝাটা নামিয়ে রাখলুম। পেছনের উঠোনটায় যে মোষটা বাঁধা ছিল সে ঐ ঘাসের বোঝা দেখে ওখান থেকেই জোরে একটা ডাক দিলে। পর পর চারটে ঘর, শেষেরটা পেছনের উঠোনটার দিকে মুখ করে। দরজাও চারটে, মোষটা ঘাসের স্তূপ দেখতে পেয়েছে, আমিও এখান থেকে মোষটাকে দেখতে পাচ্ছি। থিয়েটারে যে ইলেকট্রিক বাতি জ্বলত সেগুলিই আন্না সবে কিনেছে ঘরের জন্যে। সামনের উঠোনে আন্নার বড় ছেলে মুকুন্দরাও হাইস্কুলের ছেলেদের ইংরেজির কোচিং দিচ্ছে, শহরে এই একটিই জায়গা আছে যেখানে হাই স্কুলের ছেলেরা ইংরেজির কোচিং পায়। আমি দরজার কাছে ঘাসের আঁটির বোঝা ফেলেছি যখন, তখন হয়তো ওর গায়ে দু এক ফোঁটা জল লেগে থাকবে। তাইতে ও বললে, "আন্না, ঘাস ভেজা আছে, ঘরের ভেতর দিয়ে নিও না, সারা বাড়ি জলে জলময় হবে, ওদিক দিয়ে গিয়ে পেছন দিককার উঠোনটায় নিয়ে যেও।"

"ঠিক আছে। খোকা বোঝাটা তোল, পেছনে নিয়ে আয়।" পেছন দিকে নিতে গেলে আরও গু মাড়াতে হবে। বামুনদের এ গলিতে দু দিক দিয়ে এক ফার্লং-এর মতো কেবল পায়খানা। বাড়িগুলো সব উঠেছে একটার গা ঘেঁষে আবেকটা। এই বামুনগলির বাড়ি ডিঙিয়ে যাওয়া মানে পায়খানার নোংরা মাড়িয়ে যাওয়া। বামুনরা সবাই ওদের পায়খানাগুলো বানিয়েছে বাড়ির পেছনদিকে। সব কটাই খাটা পায়খানা একখানা করে চুবড়ি রাখা আছে, তার ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে যাচ্ছে নর্দমাতে। নর্দমার সে জল বর্ষায় আটকে গিয়ে রাস্তার ওপর উপচে পড়েছে। অতটা রাস্তা মাড়িয়ে মানে অতটা গু ভর্তি রাস্তা মাড়িয়ে একবার আন্নার বাড়ির পিছনের উঠোনে যেতে হবে আবার সেই নোংরার ওপর দিয়ে হেঁটে ফিরতে হবে। আমি কিন্তু ভেতর দিয়ে হাত দশেক দূরেই আন্নার মোষটাকে দেখতে পাচ্ছি। এই দশ হাত হেঁটে ভেতরে চলে গেলেই কত সোজা হত আর নোংরাও মাড়াতে হত না। এমনিতেই বর্ষায় গোরুমোষের ঘাস পাতা কাটতে গিয়ে কাদা মাড়িয়ে শীত ধরে গেছে। আমি তাই আন্নাকে মিনতি করে বললুম, "আমি ঘাসের বোঝার জলটা এখানে ঝেড়ে ফেলি তারপর না হয় ভেতর দিয়ে সোজা পেছনে চলে যাই।"

কথা শুনেই মুকুন্দরাও চোখ বড় করে তাকালে, "বলিস কি রে, ঘরের ভেতর দিয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"না।"

"তুমি দেখই না, ঝেড়ে নিলে ঘাসে এক ফোঁটাও জল থাকবে না।"

"ওরে তোর পা যে ভীষণ নোংরা, এই নোংরা পায়ে তুই ঘরে ঢুকবি কি করে?" বাঁধানো উঠোনটায় গরম জলে পা ধুতে ধুতে আন্না বলে উঠল।

"তাতে কি হয়েছে? এক ঘটি জল দাও না পা ধুয়ে নি। আমাকে আবার ঐ পায়খানা মাড়াতে বলছি কেন?"

"শালা, তুই কে রে লাটসাহেব? বামুনের বাড়িতে ঢুকেছিস আবার অত কথা বলচিস? লজ্জা শরম নেই?" মুকুন্দরাও জায়গা থেকে এক চুল না নড়ে পিঠ সোজা করে বসে কথাটা বললে, "যদি তোর গরজ থাকে তো তোল ঐ বোঝা, আর যা পেছনদিক দিয়ে গিয়ে রেখে আয়, নইলে বাড়ি নিয়ে যা, ভাগ্।"

শুনে আমি খুবই দমে গেলুম, নরম সুরেই বললুম, "আচ্ছা, যাচ্ছি। পেছন দিকে দিয়ে গিয়েই রেখে আসছি।"

মাটির ঢেলা যেমন কবে জলে মিশে যায়, আমিও তেমনি লজ্জায় অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে গেলুম। বোঝাটা আবার মাথায় তুলে পেছনের উঠোনে গিয়ে সেটা ফেলে হাতে পয়সা নিয়ে আবার সেই উঠোন ছেড়ে নোংরা মাড়াতে মাড়াতে বেরিয়ে পড়লুম। আমি চাষীর ছেলে তা সত্ত্বেও মুকুন্দরাও আমাকে অচ্ছুৎ-এর মতো করলে। আমার হাতের ঘাস ওর মোষে খেলে ওর তাতে কিছু যায় না, দিব্যি চলে যায়। আমার মা সারা জীবন গোবরমাখা হাতে দুধ দুয়ে বামুনপাড়ায় দিয়ে এসেছে। তাতে কোনো দোষ নেই। ওর ছাত্রদের ভেতর হনবরদেব দুটি ছেলে আছে। তারাও তো চাষী, কিন্তু তাদের ছোঁয়াতে ওর কিছু যায় আসে না, ওদের টাকা আছে কিনা। আমাব এই দুর্দশা, নোংরা চেহারা দেখেই হয়তো সে বলল 'তুই শালা কে রে?' আমিই যদি ধোপদুরস্ত জামা কাপড় প'রে ওকে টাকা দিয়ে ওর কাছে ছাত্র হয়ে পড়তে বসতুম তাহলে কিন্তু ওর সরস্বতী অশুদ্ধও হতেন না, ওর ঘরও অশুদ্ধ হ'ত না।

ভাবছিলুম চাষীর জীবন বেছে নিলে আমার এভাবেই কাটবে, সারা গাঁয়ের গু মাড়াতে হবে পেটের জ্বালায়। বামুনরা ওদের কাজটা করিয়ে নিয়েই বলবে, "সরে দাঁড়া, ছুঁস না।" সারাটা জীবন এ নোংরার মধ্যেই গেঁথে থাকতে হবে। এত করেও আজ যদি বা পেট ভরে, কাল থাকতে হবে উপোস। সারা গাঁয়ে গরীব চাষী মজুরদের যা হচ্ছে, শির্প্যার যা হলো, আমারও তাই হবে। সেজন্যই স্কুলে পড়াশুনা চালিয়ে না গেলে কিছুতেই কিছু হবার নয়।

নিজের অজান্তেই পা দুটো আমাকে টেনে থিয়েটারের কাছে নিয়ে এল। থিয়েটারের সামনের দেয়ালে সিনেমার কিছু কিছু ছবি দেখে নিলুম, খানিকক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়েও রইলুম। ঘুরে ঘুরে টাঙানো ঐ ছবিগুলো ফের আরেকবার দেখলুম, তাও যেন মনে ধরল না। মনে হল বইটা দেখার মতো নয়, না দেখলেও চলে। শেষ পর্যন্ত বাড়ির দিকেই ফিরে চললুম।

গলি দিয়ে ফেরার পথে শির্প্যার ঘরের সামনে দেখি সেই তালপাতার বোঝাটি পড়ে রয়েছে, বুঝতে পারলুম ও সেটা বেচতে পারে নি। মাঝের ঘরের চৌকাঠে প্রদীপ জ্বলছে টিম টিম করে। শির্প্যা দেয়ালে পিঠ দিয়ে চুপ করে বসে আছে যেন মরা আগল্যাচ্ছে। সেই শির্প্যা যে নাকি স্কুলে কিছুটা গিয়েই পড়া বন্ধ করে দিয়েছে। ভাবছিলুম স্কুলে না গেলে আমারও শির্প্যার মতোই অবস্থা হবে। যেমন করেই হোক স্কুলে আমাকে ফিরে যেতেই হবে।

সে অন্ধকারে বরফের মতো ঠাণ্ডা পায়ে হেঁটেই চলেছি। আবাজীর নতুন ঘরে কাঁচের বাতির চোখধাঁধানো আলো দেখা যাচ্ছে। গলির সব ছেলেরাই সেখানে ভীড় করেছে, খুব আড্ডা জমেছে। একবার মনে হল ওখানে যাই কিন্তু ভাবলুম বাড়ি ফিরতে তাহলে দেরী হবে; তাছাড়া মাঠ হয়ে বাড়ি ফিরি নি কেন এতে বাবার সন্দেহ হবে, নানা কথা ভাবতে বসে যাবে। তাই শেষ পর্যন্ত বাড়িই ফিরলুম। শুনলুম বাবা সারাদিন গাঁয়ে ঘুরে এইমাত্র রাতের খাওয়া সেরে মাঠে ফিরে গেছে।

"হ্যাঁ রে, তোর সাথে দেখা হয়নি?"

"না, আমি মাঠ থেকে এসে গলিতে খানিকক্ষণ গল্প করছিলুম," দিলুম একটা মিথ্যে কথা বলে।

"ভাল করিস নি। মাঠেও ছিলি না, আবার বাড়িতেও নেই বাবা কী ভাববে বল তো?"

"আমি শঙ্কর আন্নাকে বলে দিচ্ছি, ও দেরী করে যায়। মাঠে যাবার পথে বাবাকে বলে যাবে।"

আমি চট করে শঙ্কর আন্নাকে বলে ফিরে এসে হাত পা ধুয়ে ধীরে সুস্থে খেতে বসলুম। মনে মনে আবাজীর আলোয় ঝলমলে ঐ ঘরটা আমাকে টানছে, ওখানে যা আড্ডা হচ্ছে তা আমাকে টানছে। খাওয়া-দাওয়া সেরে জামাকাপড় পাল্টে আমি ওদের ঘরে গেলুম। সনগরদের আবাজী এবার ক্লাস এইটে উঠেছে, ওর দাদা আরও দুটো ক্লাস এগিয়ে আছে। দুটো ছেলেই যখন ইংরেজি স্কুলে পড়তে লাগল তখন বিঠোবা আন্না দেওয়ানজী তাদের পড়াশুনার জন্যে একটা ভাল ঘর বানালেন। দরজার কাছে রাখা চটের থলেতে পা মুছে আমি ঘরে ঢুকে শ্যামরাওয়ের কাছে গিয়ে বসলুম। ও দেখি আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছে। ও আগে আমার সঙ্গে একই ক্লাসে পড়ত, আমি এখন পিছিয়ে পড়েছি। হাইস্কুলে যাবার পর থেকেই ও পরিপাটি জামা-কাপড় পরত, ওকে দেখাতও ভাল। বর্ষায় কাদামাখা রাস্তায় হাঁটার সময় ও প্যান্ট তুলে তুলে হাঁটে। এখনও ওব গায়ে ইস্ত্রী করা জামাপ্যান্ট, তাই হয়তো ও আমার কাছে বসাটা পছন্দ করছে না। ঠিকই তো, পছন্দ না-ই করতে পারে আর সেজন্য ধীরে ধীরে সরেও বসতে পারে। কিন্তু দুবছর আগে পর্যন্ত যার সঙ্গে একসাথে ক্লাস সেভেন অবধি পড়েছিলুম সেই হাসিখুশি শ্যামরাও আমার কাছে বসতে চাইছে না দেখে একটা ঘা খেলুম মনে। চুপ করে গুম হয়ে বসে ওদের কথা শুনছিলুম।

স্কুলের ছাত্রদের মাস্টারমশায়দের খেলাধুলোর মজার মজার সব গল্প হচ্ছিল। এ এর উরুতে চাপড় মেরে হাসাহাসি করছে, ওদের কথা শুনতে শুনতে আমারও হাসি পেল। আস্তে আস্তে মনের চাপা কষ্টটা কেটে যেতে আমিও দু একটা পুরোনো মজার গল্প বলতে লাগলুম। প্রথম ঘটনাটা শুনে কেউ হাসলে না, দ্বিতীয় ঘটনাটা বলতেও কারুরই হাসি পেল না, ওরা না শোনার ভান করে নিজেরা নিজেদের গল্পেতেই মজে গেল। সবাই আমাকে মন থেকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়েছে। আমি ওদের সাথে এখন আর স্কুলে যাই না, তাই আমার কথাও আর কেউ শোনে না। এরা সবাই স্কুলের ছাত্র, আমি একাই শুধু মাঠে খেটে খাওয়া চাষী। ভাবলুম আমারও

যদি পেটের চিন্তা না থাকত তাহলে কি মাঠে যেতুম? তাহলে তো স্কুলেই পড়তুম। ঘরে যে আমার বাচ্চাদের লাইন লেগে রয়েছে। লম্বা সে লাইন। তাদের জন্য খাবার জোগাড় করতে শুধু তাদের বাপ-মার খাটুনিটাই যথেষ্ট নয়। মা যতই চেঁচামিচি করুক না কেন, পেটে বাচ্চা তার আসবেই আর আমাকেও তাদের খাবার জোগাতে সবার সঙ্গে মাঠে খেটে মরে যেতে হবে। আমার কপালে কি আর এদের মতন স্কুলে পড়ে দিন কাটাবার জো আছে?

আমি আবাজীর কাছ থেকে একটা গল্পের বই নিয়ে বিষণ্ণ মনে উঠে পড়লুম। রাতে নিজের বিছানায় শুয়ে কত কথাই না মনে আসছে। না, এভাবে সাবা জীবন পচে মরতে পারব না। তার চেয়ে বিষ খেয়ে মরাও ভাল, কষ্টের হাত থেকে তো তাহলে বাঁচব। জেনে শুনে এ নরকে ঝাঁপ দেব কেন? যেমন করেই হোক আমাকে স্কুলে পড়তেই হবে আর এ অবস্থা থেকে মুক্তির পথও খুঁজতেই হবে।

গলায় ফাঁস লাগলে মানুষ যেমন ছটফট করে সারারাত তেমনি ছটফট করেই কাটল। ভোরের দিকে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতেই পারি নি। সকালে উঠে মাঠে চলে গেলুম। একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। জলও দিতে হবে না, লাঙলও চালাতে হবে না। বাবা তাই গাঁয়ের ঘরের দিকে রওনা দিলে। গোরুমোষদেব খাবার ডাল পাতা কেটে বাখলুম, যতটা জল খেতে চায় তাও খাওয়ান হল ওদের। শীরা ভাখরি নিয়ে এসেছে তা খেয়ে কিছুক্ষণ শুয়ে রইলুম। ঘুম ভাঙতেই ঘরে মন টিঁকছিল না, ঘরটা আমায় যেন খেতে আসছে। আবাজীর কাছ থেকে আনা বইটা পড়তে বসলুম, দু একটা গল্প পড়লুমও কিন্তু মন বসল না। ভাবলুম বইতে যা লেখা আছে আর আমার যে সত্যিকারের জীবন তার কোনো মিলই নেই। সব বানানো সবই মিথ্যে। জীবনে যে সব সমস্যা আসে তার কিসে সমাধান হয় বইয়েতে তা তো লেখা হয় না। আবার কাল রাতের চিন্তাটা মাথায় চাড়া দিয়ে উঠল। বেশ রাতে গাঁয়ের ঘরে ফিরে গেলুম। পুরোনো খাতা খুলে তার থেকে সাদা পাতা টেনে বার করে একটা নতুন খাতা সেলাই করে বানিয়ে ফেললুম। তারপরেই সনগরদের আবাজীকে দিয়ে ইংরেজির বর্ণমালার অক্ষরগুলো এ বি সি ডি বড় আর ছোট দুভাবেই লিখিয়ে নিলুম। চার দিনেই সেটাতে হাত বুলিয়ে অক্ষর রপ্ত করলুম আর আটদিনের মাথায় আমি ক্লাস এইটের ইংরেজি বই পড়তে লেগে গেলুম। মনে মনে ঠিক করে নিলুম ক্লাস এইটের পড়া স্কুলের বাইরে এই খেতেই বসে পড়ব আর তৈরী করব। তারপর মাস্টারমশাইকে বলে কয়ে বাইরের ছাত্র হিসেবে পরীক্ষা দেব। ক্লাস টেন অবধি হয়তো এভাবে টেনে নেয়া যেতে পারে। এবারে অত ভয় নেই, শিবা এখন বড় হয়েছে, হাতে হাতে কাজ শিখেছে, করছে। শিবাকে তো বাবা স্কুলে দেয়া তো দূরের কথা, স্কুলের গন্ধও শুঁকতে দেয় নি। স্কুলের শেষ পরীক্ষার সময় শিবা বাবাকে সাহায্য করবে, আমিও কাজ করব তবে তার সাথে সাথে স্কুলও করব। ইংরেজি আর অঙ্ক, মুস্কিল তো এ দুটো বিষয় নিয়েই, তা সেটা শেখা যাবে যদি আবাজী একটু সাহায্য করে। অঙ্কের মাস্টারমশায়ের সঙ্গে একটু পরিচয় করে নিতে হবে, যে অঙ্ক আবাজীও পারবে না সেটা রাতে মাস্টারমশায়ের কাছে গিয়ে শিখে আসতে হবে। বাদ বাকি বিষয়গুলো

মন দিয়ে পড়লে নিজেই পারা যায়, এমন কিছু আহা মরি শক্ত তো নয়।

যেই চিন্তা সেই কাজ। আমিও কাজ আরম্ভ করে দিলুম। আবাজীর সাহায্যও নিতে লাগলুম। আমার বুদ্ধির পরিচয় ও আগেই পেয়েছে, ও জানত আমি পড়তে আরম্ভ করলে সেটা এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতাও রাখি। ওর স্বভাবটাও ভারি মিশুকে ছিল, আমাকে কথা দিলে যখন যা দরকার তাতে ওর সাহায্য পাওয়া যাবে। আমি যে ক্লাস এইটের পড়া তৈরী করছি বাড়িতে কাউকে তা বলি নি। ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ খাতায় লিখে মাঠে সারা দিন কাজের ফাঁকে ফাঁকে তা রপ্ত করে যেতাম, মুখস্থ করতুম। প্রতিদিনকার পড়া একটা কাগজে লিখে আমার ছেঁড়া জামার পকেটে ফেলে রাখতুম। সকালে উঠে দাঁত মাজতে মাজতে, পায়খানায় যেতে যেতে, খাবার সময় উঠতে বসতে, একটা করে শব্দ আমার মুখে ফিরতই। আমি বুঝে গেছি মুখস্থ যে কোনো অবস্থাতেই করা যায়। কাজে হাত আটকা থাকলেও কোনো ক্ষতি নেই। লোকে যেমন মুখে খৈনী রেখে দেয় তেমনি শব্দও একটা একটা করে মুখের ভেতর রেখে তা বলে বলে, উচ্চারণ করে তার স্বাদ পাওয়া যায়, শব্দটা শেখা যায়। এভাবেই ইংরেজি শব্দের বানান মুখস্থ হল, সে শব্দের অর্থ জানা হল আর কতগুলো ইংরেজি শব্দের বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ এসব আমি ধীরে ধীরে রপ্ত করলুম। অঙ্কের উদাহরণ দেখে আর আবাজীর ক্লাসের অঙ্কের খাতা দেখে আমি অঙ্ক কষতে লাগলুম, অন্যান্য সব বিষয় তো নিজে পড়েই শেখা যায়।

এদিকে মামার বিয়ে হয়ে গেল, তার জন্যে বাড়িতে যে ঝগড়া হত তাও থেমেছে। আমি যতটা সময় হাতে পেতুম, নষ্ট করতুম না, পড়াশুনা করেই কাটাতুম।

মার্চ মাস। বার্ষিক পরীক্ষা তখন প্রায় এসে গেছে। একদিন সময় করে আমি হাই স্কুলের হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করে আমার পরিচয় দিলুম, বাড়ির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়, আমার বাবা গরীব চাষী, খেতে না খাটলে আমাদের খাবার অন্ন জোটে না, এই অভাবের জন্যই ক্লাস সেভেনের পরীক্ষায় সারা তালুকে ফার্স্ট হয়েও পড়া বন্ধ করে বাড়ির কাজে লাগতে হল, এসব সবই ওঁকে বললুম। মাঠে কাজ করতে করতে আমি ক্লাস এইটের পড়া তৈরী করেছি তাই আমাকে যেন উনি ক্লাস এইটের বার্ষিক পরীক্ষায় বসতে অনুমতি দেন আর পাশ করলে যেন ক্লাস নাইনে বসতে দেন। এভাবেই তাহলে একদিন আমি স্কুলের পড়া শেষ করতে পারব।

হেডমাস্টার মশাই আমার সব শুনে খুব খুশি হলেন আর এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টারমশায়কে ডেকে আমার কথা বলে আমার নামটা স্কুলের খাতায় লিখে নিতে বললেম। এভাবে অনুমতিই যে মিলল তা নয় তিনি আরও বললেন, "দশ বার দিন অন্তত স্কুলে এসে বোস, মাস্টারমশাইদের সঙ্গে পরিচয় হবে, ছেলেদের সাথেও একটু আধটু আলাপ পরিচয় হবে। এতে পরীক্ষায় বসতে তোমার সুবিধেই হবে।"

পরীক্ষার আর দুতিন সপ্তাহ বাকি, সবাই পরীক্ষার জন্য যা তৈরী করেছে তা আবার ঝালিয়ে নিচ্ছে। হেডমাস্টার মশাইকে "আচ্ছা" বলে আমি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে পড়লুম। হেডমাস্টার মশাইকে সবই বলেছি শুধু বলিনি যে আমার এ পড়া নিয়ে বাড়িতে কি ঝড় ওঠে, আমার বাবাই আমার পড়া চায় না। বলি নি, কারণ

বললে উনি সেটা বিশ্বাস করতেন না।

দুপুরে ভাখরি খাবার সময় দেখলুম যে কোনো কারণেই হোক বাবা খুব খোসমেজাজে আছে। বাবার কাছে কথাটা পাড়লুম। পরীক্ষার আগে দশ বার দিন স্কুলে যাই, মাস্টারমশায় তাহলে বছরের হাজিরাটা দিয়ে দেবেন। ক্লাস এইটের সব পড়াই আমার তৈরী হয়ে গেছে, পরীক্ষা পাশ করলে ক্লাস নাইনে উঠব, ক্লাস টেন তারপর ইলেভেন টোয়েলভ এভাবেই পড়ব ভাবছি। বাবা 'হ্যাঁ' 'না' করতে করতে শেষ পর্যন্ত রাজি হল।

দু আড়াই বছর তো মাঠেই খেটে গেলুম তাই স্কুলে পড়া নিয়ে বাড়িতে এর মধ্যে কোন ঝগড়াবিবাদ হয় নি। দিনরাত মাঠে গাধার মতো খাটতুম, অনেক কাজই সেরে রাখতুম, এভাবেই সকালে মাঠে জল ছেড়ে দিন দশ বার স্কুলে ক্লাসে হাজিরা দিয়ে ক্লাস এইটের পরীক্ষা পাশ করতে পারব এটা বাবার মাথায় ঢোকালুম। আমার হয়ে মাও ওকালতি করলে, "ছেলেটা এত খাটছে তার মাথা থেকে স্কুলের ভূত যাবার নয়। তাহলে গেলই না হয় দশ বারটা দিন স্কুলে। ক্ষতি কি?"

দুটো বছর ধরে বাবা মা দেখেছে সময় পেলেই আমি বই নিয়ে বসি। আমার মাথা থেকে স্কুলে পড়ার ইচ্ছেটা কিছুতেই যাচ্ছে না এটা ওরা দেখেছে। তাই পনেরদিন স্কুল করার অনুমতি মিলল।

এপ্রিল মাসে ক্লাস এইটের পরীক্ষা দিয়ে যে সেকসনে আমার নাম লেখান হয়েছিল সে সেকসনে আমিই ফার্স্ট হলুম। কি করে এত ভাল রেজাল্ট হ'ল আমি নিজেই বুঝতে পারিনি, খুব অবাক হয়ে গেছি। সাবা বছর স্কুলে পড়ে যারা পরীক্ষায় বসল তাদের ডিঙিয়ে আমি নিজে নিজেই পড়ে হলুম কিনা ফার্স্ট! হাইস্কুলে প্রথম ঢুকেই ভগবানের এত কৃপার পরিচয় পেয়ে আমি নিজেকে খুবই কৃতার্থ মনে করলুম আর নতুন উদ্যমে আবার বাজে লেগে গেলুম।

পাঁচ

ক্লাস নাইন-এর গ্রীষ্মকালটা আনন্দে কাটল। জমিতে লাঙল দেখা হয়ে গেছে, মাটিও সমান করা হয়েছে। সময়মত জলটা হওয়াতে জুলাই নাগাদ ঝটপট করে বীজ রোয়া হ'ল। ততদিনে আষাঢ় শেষ হয়ে শ্রাবণ শুরু হয়েছে, সব মাঠেই এখন বীজ রোয়ার ধুম পড়ে গেছে। মাঠে জল দেওয়া ছাড়াও অন্য কাজও শেষ। বলদগুলোকে এখন আর খাটানো হচ্ছে না। আষাঢ়ের বর্ষার ঠাণ্ডায় বলদগুলো তাদের গোয়াল ছেড়ে আমাদের ঘরের ভেতরে এসে ঠাঁই নিয়েছে, গরমের সুখটা খানিকটা পাবে এ আশায়। গোরু, মোষ, ছাগল খেতের সবুজ পাতা, বিচালি, আখের পাতা এসব খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঠে ঘাটে সব জায়গায় হাঁটু অবধি জল। মাটির বুক চিরে ধান গাছ উঁকি দিচ্ছে। মনে হ'ল মানুষে গাছে, দীন দুঃখী, সবাই যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ছে। মাঠে যেখানে যেখানে লাঙল পড়েছে সেখানে বীজ তরতর করে উঠেছে। বাবা চোখের সামনে ফসলের স্বপ্ন দেখছে, ভবিষ্যতের ছবি আঁকছে বড় বড় লম্বা চওড়া। চোখের সামনে সবুজ ধানের চারা দেখে এতে কত মন ধান হতে পারে এসব ভাবছে বসে বসে।

মাকে যদিও অনেক দিন আগেই জানিয়ে রেখেছি, এবার খেতে খেতে একদিন বাবাকে বলার পালা এল। নীচু গলায় বললুম, "ইংরেজি স্কুলের হেডমাস্টার মশাই বলেছেন, তুই পড়াশুনায় ভাল, ফার্স্ট হয়েছিস সময় পেলেই স্কুলে চলে আসবি। কাজ থাকলে মাঠে কাজ করবি, কাজ সেরেও আসতে পারিস। এস এস পি পাশ করতে পারলে ভাল চাকরি পাবি তুই, এতে তোদের পরিবারের সবাই একটুখানি সুখের মুখ দেখতে পাবে, তোদের সবার ভালই হবে। আমি মাস্টারমশাইকে বলেছি বীজ রোয়া হয়ে গেলে আসব, তা নইলে নয়। এখন মাঠে তো কাজ নেই, এখন তো যেতে পারি স্কুলে?"

বাবা বলল, "বর্ষা থামলে বীজ থেকে ধানের কচি চারাগুলো তুলে অন্য জমিতে লাগাতে হবে না?"

"সে সময় আমি তো মাঠেই থাকব। এই ঝিরঝিরি বৃষ্টিতে ঘরেব ভেতর থুতনিটা হাঁটুতে ঠেকিয়ে চুপচাপ কেবল বসেই আছি। তাহলে স্কুলে গিয়েই না হয় বসলুম। মাঠে কাজ আবার শুরু হলে খাটবার জন্য আমি তো আছিই।"

মা আমাকে বোঝালে, "আন্দু সারা গরমের কালটা তো খেটে মরলি এখন দুদণ্ড বিশ্রাম কর, একটু দম নিয়ে জিরিয়ে নে। কেন বোঁ বোঁ করে ঘুরে মরবি? স্কুলে যাবার দরকারটা কি?

"বোঁ বোঁ করে ঘুরছি কোথায়? স্কুলে গিয়েও তো সেই বসেই থাকব, বসে বসে শুনব। কানে শোনবার কাজ এই যা।"

আমার কথাগুলো বাবার মোটেই পছন্দ হল না, বললে, "ও তো কেবলি নিজের

সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছে।” বাবা চায় মা আমাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমার মতটা পাল্টাক। আমি বাবাকে আস্তে আস্তে বোঝালুম, “ঠিক তা নয়, এখানে না বসে থেকে ক্লাসেই বসি না কেন, তাই ভাবছিলুম।”

“তা গেল বছর ক্লাসে না বসে মাঠে বসে বসেই পড়া করলি আর তাতে তো শেষ পরীক্ষাটা পাশও করলি, তাই না?”

“করেছি ঠিক কথা। তবে ক্লাস নাইন-এর পড়া ক্লাস এইটের পড়ার চেয়ে অনেক শক্ত। ক্লাস এইটের মাস্টারমশাইরা আর ক্লাস নাইনের মাস্টরমশাইরা সব আলাদা। আগের মাস্টারমশাইদের একটু চিনতুম, যেখানে বুঝতে পারতুম না সেটা মাস্টারমশাইদের বাড়িতে নিয়ে গেলে ওঁরা বুঝিয়ে দিতেন।”

“ঠিক আছে যেতে চাইছে যেতে দাও। কারো কোনো ক্ষতি তো হচ্ছে না, তবে আর আটকাবে কেন? কাজের সময় বলছেই তো ঠিক হাজির থাকবে,” মা বললে আমার হয়ে।

“যা, যা করবার কর গে যা। কিন্তু বই কেনবার জন্য পয়সা পাবি না আগেই বলে দিচ্ছি, আর সকালের দিকে ঘণ্টা তিন চার মাঠে এসে কাজটা দেখবি, আখের ডালপাতা কেটে রাখবি।”

“ঠিক আছে।”

অবশ্য এত সব কথা হবার পরও বাবার যা বলার তা বলতে ছাড়লে না। যেমন এই স্কুলটাই বাবাকে গিলতে বসেছে, চাষের কাজে আমার মোটে মন নেই, তাই মা লক্ষ্মী আমাদের বাড়বাড়ন্ত দিচ্ছেন না। আমি আর মা চুপ করে খেয়ে যাচ্ছি। যাহোক বাবা রাজি হয়েছে তো, এই যথেষ্ট, এখন চুপ করে থাকাই ভাল।

শ্রাবণ মাসে আমি ক্লাস নাইন-এর পড়া আরম্ভ করে দিলুম। ততদিনে ক্লাসে পড়া অনেকটাই এগিয়ে গেছে। আবাজীর কাছে গিয়ে সব জানতে পারি। প্রথম দিন ভোরে উঠে খেতে গেলুম, দশটা অবধি আখের পাতা কাটলুম গোরুমোষদের খাবার ডালপাতার বন্দোবস্ত তো হল। বাবাকে গোবর তুলে জায়গাটা পরিষ্কার করতে বললুম, আখের খেতে বাবাকে আর ঢুকতেই দিলুম না। আমি জানি জমির ঐ কাদামাটিতে দাঁড়িয়ে পাতা কাটতে বাবা মোটেই পছন্দ করে না। বাবা যখন ঘরে এদিক ওদিক করছে ততক্ষণে আমি ডালপাতার একটা বস্ত বড় বাণ্ডিল গাড়িতে তুলে দিয়েছি। গাড়িতে বলদ আগেই জুতে দেয়া ছিল। এসব দেখে বাবা খুব খুশি হল, সারাদিনের ঝামেলা বাবার আর রইল না। ঘরে ডালপাতা, চারাগাছ যা জমান আছে তা বসে বসে বলদের মুখের সামনে ফেলে দেয়াটাই কাজ, এছাড়া করার মতো আর কিছু নেই।

আগের দিন সাবান দিয়ে যে জামাটা কাচা ছিল তাই পরে আমি এগারটার সময় স্কুলে গেলুম। ক্লাস নাইন যে ঘরটায় বসে তা আমাকে খুঁজে বার করতে হ'ল। দেয়ালের দিকে একটা খালি বেঞ্চে বসলুম গিয়ে। পাটিলের ছেলে আমাদের পাঠ্য কিছু বই আমাকে এমনি কোন দাম না নিয়েই দিয়েছে, সেগুলো বেঞ্চে রাখতে না রাখতেই প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে উঠল। সবার নজর এড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে এক জায়গায়

আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। স্টাফ রুম থেকে টিচাররা এলেন, পরিষ্কার ইস্ত্রী করা ফিটফাট জামাকাপড় সবার পরনে। তাঁদেরই ভেতর যাঁরা একটু কম বয়সী তাঁরা পরেছেন প্যান্ট, মাথায় টুপি পরেন নি, সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো, চালশে মুখে স্ফীত হাসি। প্রবীণ শিক্ষকদের মাথায় কালো টুপি, ধবধবে সাদা ধুতি পরে গায়ে ইস্ত্রী করা কোট চাপিয়ে এসেছেন সবাই। তাঁদের মসৃণ চিকণ চেহারা তাদের সচ্ছল অবস্থার সাক্ষ্যই দিচ্ছে। আমাদের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকদের বড় রোগা স্বাস্থ্যহীন চেহারা, বড়ই গোবেচারা দেখতে। জামাকাপড় ধোয়া ঠিকই, তবে তার রং গেছে চটে। গ্রামের রীতিনীতি আচার ব্যবহারের সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারে। ওদের আমাদেরই একজন বলে মনে হত। কিন্তু আজ এই স্টাফ রুমের টিচারদের সারি দেখে আমার মনের ভেতর কিসের যেন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হল। ছেলেরাও সারি বেঁধে দাড়িয়ে আছে কিন্তু নিজেদের ভেতর গল্পগুজব চলছে। সবাই কিসের অপেক্ষায় যে আছে তা যেন ধরতে পাচ্ছিলুম না। হঠাই সব কিছু শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেল। সবার পেছন দিক দিয়ে হেডমাস্টার মশাই হেঁটে এলেন— একা। মাথায় গোলাপি রঙের পাগড়ির ঝোলানো অংশের দিকটা পেছনের দিকে গুঁজে দেয়া। গায়ে ফিকে হলুদ কেতাদুরস্ত ইস্ত্রি করা কোট, পরনে ধবধবে সাদা ধুতি; চোখে মোটা কাঁচের চশমা। দেখলেই ভয় করবে এমন গম্ভীর মুখ। তিনি আসতেই অন্য টিচারবাও চুপ মেরে গেলেন। আমার বুকে অকারণে দপদপানি শুরু হয়ে গেল। মনে হল আমি যেন ভিন্ন পালে এসে মিশে যাওয়া একটা ভেঁড়া, নিজের বলতে কেউ কোথাও নেই। ঢোক গিলতে গিলতে ভাঙা গলায় প্রার্থনা করতে লাগলুম। তিন বছর ধরে যে বন্দেমাতরম বিদায় নিয়েছিল তা আবার আমার মুখে উচ্চারিত হল আর আমার ভেতর থেকে ক্রমশ একটা তীব্র বার্জনা বেজে উঠছে বলে আমার মনে হতে লাগল।

সেকেণ্ড বেল পড়তেই আকোলকার মাস্টারমশাই তাঁর কাছামারা ধুতি পরা পা দুটো দাপটে ফেলতে ফেলতে হাতে হাজিরা খাতা আর অন্যসব বইপত্তর সামলাতে সামলাতে ক্লাসে এসে ঢুকলেন। সবার সাথে সাথে আমিও উঠে দাঁড়ালুম। মাস্টারমশাই নিজে বসেই বললেন সিট ডাউন। আমি চমকে উঠলুম, গলার আওয়াজ কড়া এবং বেশ গম্ভীর। বড় বড় চোখ রাগে যেন লালচে হয়ে রয়েছে, কপালে বিরক্তির বলিরেখা। অনেকটা ত্রিশূলের মতো। মনে হল এখন ইংরেজিতেই সব কাজকর্ম চলবে আর আমারও এখানেই সব কিছুর ইতি হয়ে যাবে। আগে পদবী পরে নাম এভাবেই মাস্টারমশাই একে একে সবার নাম ডেকে চলেছেন, মনে হচ্ছিল যেন হুকুম জারি করছেন। মাঝপথে এল আমার নাম। নামটা ডেকেই তিনি চটপট পরের নামে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় সবার মতো আমিও প্রেজেন্ট স্যার বলে উঠলুম। বলতেই উনি চমকে উঠে ঘাড় তুলে দেখলেন। ওঁর গোলমুখ আরও গোল হল, গাল আরও ফোলা লাগলো, কপালের বলির ত্রিশূল আরো স্পষ্ট হল। আমাকে লক্ষ্য করে ইংরেজিতেই বললেন, "তুমিই যকাতে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"উঠে দাঁড়াও।"

আমি দাঁড়িয়েই রইলুম আর মাস্টারমশাইও ওদিকে নাম ডেকেই যাচ্ছেন। কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। দরজার কাছে সাত আটজন মেয়ে ছিল বসে, ওরা তাকালে আমার দিকে করুণার চোখে। আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, এ অবস্থা কেউ না দেখলেই বাঁচি। আমার মাথায় ছিল নস্যি রঙের ঘামের গন্ধে ভরা একটা টুপি, মাথা সবে কামান হয়েছিল তাই খুব আঁটো করে টুপিটা পরা, গায়ে জামরঙের ডোরাকাটা মোটা কাপড়ের সাদামাটা সার্ট, কনুইয়ের দুধারে জামাটা একটু করে ছেঁড়া। পরনের প্যান্টও ঘরে কাচা, কোন ইস্ত্রি নেই তাতে। জামাপ্যান্টে দুদিন আগে সাবান পড়েছে তবুও লাল মাটি আর গোবরের দাগ ওঠানো সম্ভব হয় নি, আবছা আবছা ছোপ দেখা যাচ্ছে এখানে সেখানে। আর দাগ উঠবেই বা কি করে? বছরের পর বছর জামাকাপড়ে সাবান পড়ে নি। এখন হঠাৎ একদিন একমন সাবান দিলেও কি দাগ উঠবে? দাগ যাতে কেউ না দেখতে পায় তার জন্যে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছি। রোল কল শেষ হতেই মাস্টারমশাই আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তা মশায়ের কোত্থেকে উদয় হল?" আমি কোন উত্তব না দিয়ে চুপ করে বইলুম, উত্তর দেবার কিই বা আছে? নিরীহভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে বইলুম।

"উত্তর দেবার মুখ নেই? আমি কি জিজ্ঞেস করলুম?" মাস্টার মশায়ের গলা একটু চড়ছে।

"স্যার, ক্লাস এইটের পরীক্ষাটা আমি বাইরে থেকে দিয়েছি।"

"আমি জিজ্ঞেস করছি তুই কোন শহরে থাকিস আর তুই আমায় ক্লাস এইটের পরীক্ষা পাশের কথা বলচিস।" সব ছেলেরা মাস্টারমশাইকে খুশি করার জন্য হেসে উঠল, উনি যেন খুব হাসিরই কোনো কথা বলেছেন।

"কাগলেই ছিলুম।"

"তাহলে এ দু'মাস কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছিস?" আমি এবারও চুপ করে রইলুম। পরিস্থিতি আমার অবস্থা বুঝিয়ে বলার মতো অনুকূল নয়। শুধু বললুম, "বাড়িতে একটু অসুবিধে ছিল।"

"এবার মনে রাখিস একটানা পনেব দিন না এলে নাম কাটিয়ে দেব স্কুল থেকে। আর তিন মাসের মাইনে কাল যদি আনিস তবেই ক্লাসে বসতে পারবি, বুঝলি? মনে থাকে যেন, সাড়ে তের টাকা হয়েচে। কি বুঝলি?" আমাকেই আবার প্রশ্নটা করলেন উনি। আমি নীচু গলায় বললুম, "সাড়ে তের টাকা।" "বোস" বলতেই আমিও ধপ করে বসে পড়লুম।

ঘাম ছুটে গেছে। এর পর উনি ইংরেজি কি পড়ালেন তার দিকে আমি মনই দিতে পারি নি। কান পেতে শুনলেও থেকে থেকেই আমি ও থেকে অনেক কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। এবারে এ বছর কেমন করে কাটবে এ চিন্তায় আমার হাত পা ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে এল, মরাব মতো ঘাড় ঝুলিয়ে বসে বইলুম।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফেরার সময় খালি ভাবছি এত টাকা কোথা থেকে জোগাড় করব আর ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। এ' টাকা পেতে হলে পনের যোল দিন আমায় কোথায়ও দিনমজুরি করতে হবে, হয়তো তার চেয়ে বেশি দিনও করতে হতে

পারে। বার আনা দিন মজুরি হিসেবে ষোল দিনে বারটাকা আরও দুদিনে দেড় টাকা। তাহলে মোট আঠার দিন খাটতে হচ্ছে। এ বর্ষায় আঠার দিন কে আমাকে কাজ দেবে?

ঘরে গিয়েও এ সবই ভাবছি। রাতে আবাজীর কাছে গেলুম, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল বলে কেউ আসে নি। সবে খেয়ে দেয়ে আবাজী বসেছে, আমাকে দেখে সে নিজে থেকেই স্কুলের কথা তুললে।

"সকালে আক্কোলকার মাস্টারমশায় তোকে শুধু শুধু হয়রানি করেছেন।"

"তা করুন গে। তিনি মাস্টারমশাই, তাঁর মুখে আমি ছিপি আঁটব কি করে?"

"আক্কোলকার মাস্টারমশাই ওরকমই। এক নম্বরের খিটখিটে, আর কড়াও। ইংরেজি আর ইতিহাস পড়ান কিন্তু খুব ভাল।"

"তাতে আমার কি লাভ? এগুলো তো আমি বাড়িতে পড়েই তৈরী করব।"

"স্কুলে যাবি না?" আবাজী আমার কথার ধরনে হতাশা লক্ষ্য করেছে, "স্কুল কিন্তু ছাড়িস না।"

"আমি না ছাড়লেও আক্কোলকার মাস্টারমশাই ছাড়াবেনই। উনি ক্লাস-টিচার, আর মাইনে না দিলে ক্লাসে বসতেই দেবেন না। বলেই তো দিলেন। এখন আমার কি করার আছে?"

"তুই হেডমাস্টার মশাই-এর সঙ্গে দেখা করে ওঁকে সব বুঝিয়ে বলল। তাহলে হয়তো মাইনেটা মাপ করে দেবেন। কত ছাত্রই তো ফুল-ফ্রী, হাফ-ফ্রী, কোয়ার্টার-ফ্রী স্টুডেন্টশিপ পায়। তোকে ফুল-ফ্রী করে দেয়া উচিত।"

আমি হেডমাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করব ঠিক করলুম। পরের দিন স্কুলে একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে ক্লাসে না গিয়ে হেডমাস্টার মশায়ের ঘরের বাইরে ওঁর অপেক্ষায় বসে রইলুম। তাঁকে কি বলব, কি ভাবেই বা বলব, কথাটা প্রথমে পাড়ব কি করে এসব ভাবছি আর বুক ধড়ফড়ানি হচ্ছে। ঘণ্টা পড়ার ঠিক পাঁচমিনিট আগে হেডমাস্টারমশাই এলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

"কি ব্যাপার?" ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন।

"একটু সময় চাই।"

"পনের মিনিটের ছুটির সময়টায় আসিস। এখন প্রার্থনার সময়।"

"স্যার, আক্কোলকার মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকতে দেবেন না তাই আমি আগেই দেখা করতে এসেছি।"

"কেন? কি আবার কাণ্ড বাঁধালি?"

"কাণ্ড না স্যার, মাইনে বাকি পড়েছে।"

"দিয়ে দে।"

"স্যার, একটু কথা আছে।"

"এখন প্রার্থনার সময় হয়ে গেছে, বলছি না? ক্লাস আরম্ভ হয়ে যাবে। মাঝখানে যে ছুটিটা হয় তখন দেখা করিস।"

"না স্যার। আক্কোলকার মাস্টারমশাই ক্লাসে ঢুকতেই দেবেন না বলছেন।"

"মাইনে কত বাকি পড়েছে? তোর নাম কি?"

বুঝলুম স্যার আমাকে মনে করতেই পারছেন না। অন্য সব ছাত্রদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন, ক্লাস এইটের সব কথা ভুলে গেছেন। অবশ্য ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। এর ভেতর চার-পাঁচমাস কেটে গেছে। হেডমাস্টার মশায়ের প্রশ্ন শুনে আমি একটু ভেবাচেকা খেয়ে গেলুম।

"স্যার আমার নাম আনন্দ যকাতে। আমার তিন মাসের মাইনে বাকি পড়েছে। ক্লাস এইটের এনুয়্যাল পরীক্ষাটা দিয়েছিলুম আপনার অনুমতি নিয়ে। আমার পয়সা দিয়ে পড়ার ক্ষমতা নেই তাই বাড়িতে বসে পড়া তৈরী করেছি।"

"ওহো তুই তো সেই যকাতে। ঠিক আছে একটা কাজ কর এখন তুই ক্লাসে গিয়ে বোস। আমি আক্কোলকার মাস্টারমশাইকে এখুনি বলে দিচ্ছি। তুই টিফিনের সময় দেখা করিস, তখন দেখব কি করা যায়।" এই বলে তিনি ওঁর ঘরের ভেতর চলে গেলেন। টিচার্স রুমটা ছিল ওঁর ঘরের লাগোয়া। উনি আক্কোলকর মাস্টারমশাইকে ডেকে পাঠালেন। ওখানে স্কুলের কেরাণী ঘাটগেও ছিলেন, কি একটা কাগজ সই করতে এসেছেন।

হেডমাস্টার মশাই আক্কোলকর স্যারকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ছেলেটির কি ব্যাপার বলুন তো?"

আক্কোলকার মাস্টার মশাই আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, "এমন কিছু নয়। ছেলেটি গতকালই প্রথম ক্লাসে হাজির হল, মাইনে বাকি পড়েছে তিন মাসের। ওকে তাই আমি বললুম, মাইনে দিয়ে হাজির হবি আর রোজ ক্লাসে আসা চাই। আমি আর কিছু বলেছি?" প্রশ্নটা উনি আমার দিকে এমনভাবে ছুঁড়ে দিলেন যেন মনে হবে আমি ওঁর নামে হেডমাস্টার মশায়ের কাছে নালিশ করেছি। আমি তাড়াতাড়ি সেজন্য প্রশ্নটা শুনে মাথা নেড়ে বোঝালুম যে না, উনি আর কিছুই বলেন নি।

হেডমাস্টারমশায় আক্কোলকার স্যারকে বললেন, "একটা কাজ করুন, আপাতত ওকে ক্লাসে বসতে দিন। তারপর কি করা যায় দেখছি। ছেলেটির বাড়ির অবস্থা ভাল নয়", তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "যা ক্লাসে গিয়ে বোস। আর শোন, কামাই করিস না।" আমি আবার মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলুম।

প্রার্থনার পর ক্লাসে গিয়ে বসলুম ঠিকই তবে সেদিন থেকে আক্কোলকর স্যার আমার সাথে আর ভাল করে কথা বলতেন না। তিনি আগের দিন ইংরেজি শব্দের মানে জিজ্ঞেস করতেন। যে ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত না, বা যে শব্দের মাঝে জিজ্ঞেস করতেন তা সঠিক বলতে পারত না, তার কপালে ছড়ির ঘা জুটত। মাস্টারমশায় আবার কখনো কখনো ছাত্রদের বেঞ্চের সারির ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ঘুরে ঘুরে প্রশ্ন করতে লেগে যেতেন। তখন উত্তর ঠিকমত দিতে না পারলে ছাত্রদের পিঠে পড়ত কিল আর ঘাড়ে পড়ত চড়চাপড়। অবশ্য ছাত্রদের ভেতরেও মাস্টারমশায়ের পেটোয়া কয়েকজন ছিল যেমন নাড়গোড়ে, দেশপাণ্ডে, যোশী, তালেসকর, কুলকার্নি আর মেয়ে ছাত্রীগুলো। ওরা মার খেত না। ওরা উত্তর দিতে ভুল করলে ওদের

না মেরে পুরো ক্লাসে সেটা বুঝিয়ে বলা হ'ত। মাস্টারমশায়ের মতে ওদের ভুল করা বা উত্তর দিতে না পারার অর্থ হচ্ছে সারা ক্লাসই ভুল করছে বা উত্তর দিতে অক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ এরা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী।

আমি কিল, ছড়ি, চড়চাপড় নিয়ম করেই যেন খেতে লাগলুম একদিনও বাদ পড়ত না। আক্কোলকর মাস্টারমশাই দু সারি বেঞ্চের মাঝখান দিয়ে আমার কাছে এগোলেই আমি মনে মনে মার খাবার জন্য তৈরী হয়ে যেতুম। ইংরেজি লিখতে যে পারতুম না তা নয় কিন্তু ইংরেজিতে কথা কয়ে উত্তর দেয়া আমার রপ্ত ছিল না, বেশ কঠিন লাগত। আমি তো কারো সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কখনও বলি নি, তাই একটা সঙ্কোচ আমার বাধা হয়ে দাঁড়াত। তাছাড়া কতগুলো ইংরেজি শব্দের উচ্চারণও আমার ঠিকমত জানা ছিল না। খাতায় লিখতুম ঠিকই, কিন্তু সে তো বানান আর শব্দের অর্থ মুখস্থ করে। তাতে তো আর উচ্চারণ ঠিক কি বেঠিক তা ধরা পড়ত না। আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে মনে মনে ইংরেজি শব্দগুলো সাজাতে হত। কিন্তু আক্কোলকর স্যার প্রশ্ন করেই আমার দিকে এমন করে একনজরে তাকিয়ে থাকতেন যে আমি সেই চাউনির সামনে সব ভুলে যেতুম কিছুই মনে করতে পারতুম না। আস্তে আস্তে আমি এই মাস্টরমশায়ের সাথে কথা বলার জন্য যে সাহস আর নিজের ওপর আস্থা দরকার তা যেন হারিয়ে ফেলতে লাগলুম। আমার মনে হয় না আক্কোলকর মাস্টারমশায়ের সাথে ঠিক করে কথা আমি কোনোকালে বলেছি বা উনিও কোনোকালে আমাকে বোঝার চেষ্টা করেছেন।

শুধু এই নয়। এ মাস্টারমশায়ের জন্যই আমার জীবনে আরেকটা মস্ত বড় ঘটনা ঘটে গেল, আমি মাথায় টুপি পরা বন্ধ করে দিলুম। সেটা কেন হল তাই বলছি। মাস্টারমশায় প্রত্যেক সপ্তাহে একটা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করতেন, ছাত্রদের দিয়ে তা লিখিয়ে নিতেন আবার ক্লাসে সেটা তিনি দেখেও দিতেন। যতক্ষণ উনি খাতা দেখতেন ততক্ষণ ওঁর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে হত, কোথায় কোথায় ভুলচুক হয়েছে তা দেখে নেবার জন্যে। আমার বেলায় উনি সব সময় ঘাড়ের ওপর কানের পাশে থাপড় মারতেন আর তখনই আমার নস্যি রঙের টুপি পড়ে যেত, সেটা তুলে আনতে হত। কখনো কখনো সে টুপি মেয়েদের বেঞ্চের তলায়ও গিয়ে পড়ত ওদের পায়ের কাছে, সেখান থেকে তুলে এনে মাথায় পরতে আমার ভীষণ অপমানবোধ হত। আমার বয়সও তো খুব কম নয়, ষোল সতের হবে তখন। কাঁদতে তো আর পারতুম না। শেষ পর্যন্ত টুপি পরাই বন্ধ করে দিলুম। গোড়ার দিকে একটু সঙ্কোচ হচ্ছিল কিন্তু দেখলুম অনেক বামুনের ছেলেও খালি মাথায়ই ক্লাসে আসছে।

ক্লাসে আমি বেশীর ভাগ সময়ই বসতুম একেবারে শেষ বেঞ্চে, আসতে দেরী হলে শেষের বেঞ্চগুলোও ভ'রে যেত। তখন বাধ্য হয়ে মেয়েদের সারির দিকে যেতে হতো। ওদের সারিতে দুটো বেঞ্চ খালি পড়ে থাকত তার একটা ছেড়ে দিয়ে পরের বেঞ্চটায় গিয়ে বসে পড়তুম। প্রায় সময় একাই বসতুম। সেটা ক্লাসের এক কোণে হওয়াতে এখানে বসতে আমার ভালই লাগত। তাছাড়া এ ক্লাসে কারো সাথে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছেও আমার ছিল না। আবাজীও সময়মত স্কুলে এসে ভীড়ের মধ্যে কোথাও

হারিয়ে যেত ওর টিকিরও নাগাল পাওয়া যেত না। আসল কথা আমার জামাকাপড় ময়লা থাকত। পরিষ্কার করব কি করে? সাবান তো আর কখনও জুটত না। সন্তুদের বাগানের রিঠা এনে ওতে কাপড় ডোবাতুম ঠিকই, কিন্তু তাতে জামার গোবর আর লালমাটির হলুদ দাগ উঠতে চাইত না, যেমনকার দাগ তেমনি থেকে যেত। সকাল থেকে তো মাঠেই কাজ করছি কিনা। গেঞ্জি পরতুম না বলে গায়ের ঘাম জামাতেই শুষে নিত ফলে সারা গায়ে আর জামাতে একটা ঘেমো বোটকা গন্ধ লেগেই থাকত। অন্য সব বামুনের ছেলেমেয়েদের গা থেকে বেরোত সুগন্ধি সাবানের গন্ধ, পরনের জামা থেকে ইস্ত্রির একটা বিশেষ কড়কড়ে ভাব আর ভাজা ভাজা গন্ধ। ওদের কাছাকাছি বসলে ওরা হয়তো আমাকে ঘেন্না করবে এ ভয়টা আমার সব সময় থাকত। কথা বলাব বিষয়ের ওদের অভাব হতো না আর বলতও শুদ্ধ ভাষায়। আমি তো আর অত শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে পারতুম না, তাই ওদের সাথে মিশতে বা কথা বলতে আমার সব সময়ই বাধো বাধো ঠেকত। আমার কথার ঢং-এ থাকত গেঁয়ে' ভাব। উচ্চারণও সব সময় শুদ্ধ হতো না। খুব সাবধানে কথা বলতে চেষ্টা করে শুদ্ধ বলতে বলতে এক ফাঁকে কখন যে গ্রাম্য টান কথা বেরিয়ে পড়ত তা কি ছাই আমিই জানতে পারতুম। খালি মনে হতো মারাঠী স্কুলে তো এসবের বালাই ছিল না সেখানে ক্লাস ফাইভ-এর পর যারা ক্লাসে পড়ত তাদের বেশির ভাগই বামুন নয়। ওরা হয় মারাঠা, মুচি, মেথর তাঁতি, বেনে, লিঙ্গায়ত বা ওরকমই কোন জাতের ছেলে। তাই স্কুলে বা ক্লাসে নিজেদের পাড়া পাড়া ভাবই যেন একটা থাকত। ক্লাস ফোরের পরীক্ষার পাশ করে যাবার পব বেশির ভাগ বামুনের ছেলেরা ইংলিশ ক্লাস ওয়ানের মধ্য হাই স্কুলে ভর্তি হয়ে যেত। মারাঠী স্কুলগুলোতে তাই সে অঞ্চলের গ্রাম্য ভাষা আর গ্রামদেশের চালচলন, দেশাচারেরই চল ছিল। মারাঠী স্কুলের ক্লাস সেভেনের পরীক্ষা পাশ করে এসব ছেলেরা বেশির ভাগ সময়ই চাকরি নিয়ে ফেলত নয়তো ব্যবসায় লেগে যেত। যারা ফেল করত তারা আমার মত খেতে খেটে খেত, কেউই হাই স্কুলের দিকে বড় একটা পা বাড়াত না। এরই ভেতব যে সব মারাঠী ছেলেরা হাই স্কুলে যেত তাদের বাপেরা হয় উচ্চ শিক্ষিত নয়তো সরকারী চাকুরে নয়তো বা ভাল ব্যবসাদার হত। ওদের ভাষাও তাই বামুনদের মতো শুদ্ধই হত। হাইস্কুলের ঝকঝকে ভাষার কথা আর সুন্দর পোষাকে ছেলেমেয়েদের দেখে, তাদের কথায় ইংরেজি শব্দের ছড়াছড়ি শুনে শুনে আমার মনে হ'ত এরা কেউই আমার আপনজন নয়। এসব কারণের জন্যই আমি একাই বসতুম কারো সঙ্গে কথা বড় একটা বলতুম না। ক্লাসের পরিবেশে আমি ঠিক মিশ খেতুম না, নিজেকে কেমন ছোট মনে হত, লজ্জায় কুঁকড়ে থাকতুম। তার ওপর আবার আক্কোলকর মাস্টারমশায়ের হাতে সবার সামনে অমন করে মার খেতে আরও লজ্জা, আরও অপমান আমাকে বিঁধত। তিনি যেন ইচ্ছে করেই আমাকে ছোট, হেয় করবার জন্যই বেশি করে তিরস্কার করতেন, মারতেন। এগুলো আমার মনে ভীষণ লাগত। মারাঠী স্কুলে মাস্টারমশাইরা ছিলেন ঠিক এর উল্টো। ক্লাস সিক্স বা সেভেনে কেউই গায়ে হাত তোলেন নি। তাছাড়া ওঁরা সবাই আমার বাড়ির অবস্থা বুঝতেন বলেই ওদের ভালবাসা আর সহানুভূতি

আমি সব সময়ই পেতুম।

দিন পনের কুড়ির পর যারা ফ্রী স্টুডেন্টশিপ পেয়েছে তাদের নামের লিস্ট বেরুল। আক্কোলকর স্যার তাদের নাম পড়তে গিয়ে ক্লাসের প্রায় আদ্ধেক ছেলের নামই পড়ে ফেললেন। কারো পুরো, কারো আদ্ধেক কারো বা সিকি মাইনে মকুব। আমার নাম কোনোটাতেই নেই। আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাবার উপক্রম। লিস্ট পড়া হয়ে গেলে বুকের ধুকধুকানি সত্ত্বেও একটু সাহস করে দাঁড়িয়েই পড়লুম, "স্যার, আমি কতটা ফ্রীশিপ পেলুম জানতে পারলুম না।"

"তোর নাম কি আমি পড়েছি?"

"না স্যার।"

"তাহলে তুই এটাও কি বুঝতে পারছিস না? আমি কি বলিনি যে যারা ফ্রীশিপ পেয়েছে তাদেরই নাম পড়ছি?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"তাহলে তোর নাম যদি পড়ে না থাকি তাহলে তার মানে কি দাঁড়ায়?"

তাঁর একথা শুনে আমার মন এক্কেবারে দমে গেল। মুখ কালো করে আমি বসে পড়লুম।

"উঠে দাঁড়াও," স্যার কড়া গলায় ইংরেজিতেই হুকুম করলেন। আমি তক্ষুনি উঠে পড়লুম। উনি ইংরেজিতে রাস্কেল বলে গালি দিয়ে বলে উঠলেন, "আমি যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দিয়েছিস?"

আমি শুধু মাথা নাড়লুম।

"তাহলে বসলি কেন বোকার মতন?"

"তার মানে দাঁড়ায় আমি ফ্রীশিপ পাইনি," খুব নীচু গলায় বললুম। ঢোঁক গিলতেও পাচ্ছি না। তখন উনি আমায় বসতে বললেন। ক্লাসে সবাই বুঝতে পেরেছে স্যার খামকা আমাকে অপমান করলেন। মাঝখানের ছুটিটায় একটি ব্রাহ্মণ ছাত্রের একটু সহানুভূতি বোধহয় হ'ল আমার ওপর, বললে, "মাস্টারমশায়ের সাথে তোমার কখনও ঝগড়া হয়েছিল?"

"না তো।"

"তাহলে উনি তোমার ওপর অত খাপ্পা কেন?

"কি করে জানব?" আমি চুপ করে গেলুম।

তখন থেকেই ভাবছি আর ভাবছি। কোন কূলকিনারা পাই না। একবার ভাবলুম দূর ছাই পড়া ছেড়েই দিই। হয়তো এত ঝকঝকে ক্লাসে মাস্টারমশায় আমাকে জঞ্জালই ভাবছেন।

আবাজী আমাকে ক্যানটিনে নিয়ে গেল।

পরের দিন মাঝের ছুটিতে আমি হেডমাস্টার মশায়ের কাছে গেলুম।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কেন এসেছিস?"

"স্যার আমার তো ফ্রীশিপ হয়নি, তাই আমার আর পড়া হ'ল না।"

"তুই এক পয়সার ফ্রীশিপও পাবি না। এক নম্বরের চ্যাংড়া, ডাহা মিথ্যে কথা

বলিস। ব্যাটা এখানে এসে আমায় ঠকাচ্ছিলি? আমি তোর সব খবর জেনে গেছি।”

আমি তো হতভম্ব! “কি স্যার?” কোনরকমে জিজ্ঞেস করলুম।

“একটা কথাও আর নয়, বেরিয়ে যা এখান থেকে।”

“স্যার কি হয়েছে, আমাকে বুঝিয়ে বলুন।”

“বুঝে কি করবি? তুই তোর নিজের অবস্থা বুঝলেই হল। তোর বাপ চাষা তো?”

“হ্যাঁ, স্যার।”

“আপ্পা সাহেব উপাধ্যায়ের আট একর জমি তোরা ভাগে চাষ করিস তো?”

“হ্যাঁ, স্যার।”

“রত্নাপ্পা যকাতেই তো তোর বাবা, ঠিক কিনা? তোর দাদুর এমনি ব্যবসাও ছিল আর তার ওপর সুদের কারবারও করত, ঠিক তো? তোর বাবাই তোর দাদুর একমাত্র ছেলে। এখনকার সরকারী আইন হয়ে যাওয়াতে সুদের কারবারটা বন্ধ, এই তো? তুই তো তার বড় ছেলে? তা মাসে মাসে স্কুলের ফিটা দিতে তোর বাপের কি হয়?”

“কিন্তু, স্যার......”

“আর একটি কথাও নয়। তোর পাড়ার ঘাটগে কেরাণীবাবু আমায় সব বলেছে। আর আমারও তো কাগলে কম দিন বাস হল না?”

“স্যার, আমার কিছু বলার আছে।”

“কিছু বলতে হবে না, আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। তোর বানানো কথা আমি আর শুনতে চাই না, আমার সময় নেই,” বলেই উনি উঠে পড়ে টিচার্স রুমের দিকে চা খেতে চলে গেলেন। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোকার মতন হাঁ করে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। যাবার সময় বলতে বলতে গেলেন, “মাইনে যা বাকি আছে তা আট দিনের ভেতর জমা দিয়ে দিস, আমার স্কুলে নিয়ম ভাঙলে চলবে না।”

আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এল, আস্তে আস্তে বাগানে গিয়ে বসলুম। সেকেণ্ড পিরিয়ড অবধি সেখানেই বসে রইলুম। ঘণ্টা পড়ার পর ধীরে ধীরে উঠে পড়লুম অনেকটা কোমর ভেঙ্গে যাবার পর কোমরে হাত দিয়ে যেমনটি ওঠে। কল থেকে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেয়ে ক্লাসে ঢুকে পড়লুম। এ পিরিয়ডটা মারাঠীর ক্লাস, আমারই প্রিয় বিষয়। কিন্তু তাহলে কি হবে, তখন কি পড়ার দিকে আমার মন আছে? ভাবলুম এখনই যদি একেবারে মরেই যাই তাহলে কি ভালই না হয়। দুটো পুরো দিন মনের ভেতর এ ব্যাপারটাই ঘুরে ফিরে গুমরে মরছে, কূল কিনারার কোনো হদিস নেই মনে হচ্ছে সব রাস্তাই যেন বন্ধ হয়ে গেছে। কার কাছে যাব, আসল ব্যাপারটা পরিষ্কারই বা করব কি করে বুঝে উঠতে পারছিলম না। ক্লাসে সবাই বেশ খুশি খুশী ফ্রীশিপের নামের লিস্ট বেরিয়ে গেছে। আমি তো স্পষ্টই বুঝলুম যাদের নাম বেরোল তারা মোটামুটি সবাই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে। হাইস্কুলের দুজন মাস্টারমশায়ের ছেলেদের পুরো মকুব। একজন মাস্টারমশয়ের ভাগনীরও মাইনে পুরো মকুব। একজন নামকরা উকিলের তিন ছেলেমেয়ের সিকি ভাগ মাইনে মকুব।

ঘাটগে কেরাণীর তিনজন আত্মীয়ের পুরো মাইনে মকুব। এগুলো কেন হল সেটা বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়। আমার হয়ে বলবে এমন তো কেউ ছিল না হাই স্কুলে। আমার মনে হল ঘাটগে খুব ভেবেচিন্তেই চালটা চেলেছেন। ভেবেছেন আমাকে ফ্রীশিপ দিলে অন্য কারো ভাগে কম পড়ে যাবে এ ভয়টা হয়ত ছিল। মিছিমিছি লোকটা একটা বাধা সৃষ্টি করে আমার ফ্রীশিপটা আটকে দিলে। ঘাটগে আমাদের পাশের গলিতেই থাকেন। সবাই তাকে ঘাটগে মাস্টার বলেই চিনত, যদিও তিনি কখনই টিচার ছিলেন না। বাবার বিষয়ে খবর যা উনি দিয়েছিলেন তা কিছুটা সত্যি এটা ঠিক। কিন্তু আমরা যে আধপেটা খেয়ে থাকি তার খবর রাখতেন না, রাখা সম্ভবও নয়। আমাদের গলির সঙ্গে ওঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। আমাদের গলি ছিল ছোট চাষীদের গলি সেখানে থাকত তাঁতিরা, সনগর বলেই যাদের সবাই জানত, আর থাকত দিন মজুররা। গাঁয়ের শেষ সীমানায় পায়খানা আর পায়খানায় যেতে হলে আমাদের গলি পেরিয়ে যেতে হত। আমাদের এই ময়লা গরীবদের গলিতে সাদা ধুতি আর জামা পরে হাতে ঝকঝকে পেতলের ঘটি নিয়ে ঘাটগে যখন পায়খানায় যেতেন তখন ওঁর ঐ পোশাক সবার চোখে পড়ত। যাবার সময় বা ফেরার সময় ঘাটগে না তাকাতেন কারো দিকে, না কথা বলতেন কারো সঙ্গে। আমাদের গলির কেউ ওকে আপনজন মনে করার মত দুঃসাহস রাখত না, উনিও এ গলির বাসিন্দেদের আবর্জনাই মনে করতেন। তাই এ গলির লোকেরা কি করছে, কেমন আছে, ওদের চলেই বা কিসে, কার কি রকম আর্থিক অবস্থা এ খবর ঘাটগে জানতেনও না, আর না জানাতে ওঁর কিছু এসেও যেত না। আমার বাবা যে চায় না আমি পড়াশুনা চালিয়ে যাই, আমি যে জোর করে বাপের এত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়তে চাচ্ছি আর পড়েও যাচ্ছি সেটা আমাদের গলির সবাই জানত, কারণ ওরা প্রায়ই আমার বাবার গালাগাল শুনতে পেত। কতবার ওরা আমাকে বাবার হাতের কিল চাপড়ের হাত থেকেই না বাঁচিয়েছে। সনগর মাস্টার মশাই তো আমাদের গলিতেই থাকতেন। উনি এ সবই জানতেন। আবাজীর বাবা বলতেন, "আমাদের গলিতে পড়ার জন্য যদি কেউ প্রণিপাত করছে তবে সে এই আনন্দ। একমাত্র ছেলে। অন্য সব হতভাগাগুলো সারা বছর পড়েও তো সেই ফেলই করে।" তিনি সবার কাছে আমার এ পবিচয়ই দিতেন।

ঘরে থেকে বাবা দোতলা তুলেছে আর ঐ বামুনের জমি ভাগে চাষের জন্য নিয়েছে. আর বাড়িতে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলেপুলের জন্ম হয়েছে তবে থেকেই আমাদের অবস্থা রাস্তার কুকুরের চাইতেও খারাপ হয়েছে। ক্লাস ফোরে থাকতেই সুদের কারবার আদ্ধেক গুটিয়ে গিয়েছিল, এখন তো একেবারে বন্ধ। সুদের কারবার কি আর এখন গাঁয়েতে হয়? কাউকে পঞ্চাশ, কাউকে পঁচিশ কাউকে বা একশ টাকা ধার দেয়া হয়েছে। ঘরের সব জমানো পয়সা তো এতেই গেছে। প্রতি বছর বামুনের চাষের জমির ফসলের ওর অংশ দিতে গিয়ে বাবা নাজেহাল হচ্ছে, লোকসান বেড়েই চলেছে, আমাদেরও দিনের পর দিন যেন ভিখিরি করে ছাড়ছে। এ খবর গলির কারোই অজানা নয়। কিন্তু ঘাটগে মাস্টার আমাদের মতো আবর্জনাদের সংসারের এ হালের খবর রাখেনও না, রাখা দরকারও মনে করেন না।

সকালবেলায়, যেমন রোজকার অভ্যেস, দেখলুম নীচের দিকে তাকাতে তাকাতে উনি পায়খানার দিকে গেলেন। ওঁকে দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ভাবলুম ফেরবার সময় ওকে ধরব আর পুরো ব্যাপারটা, আমাদের এখনকার অবস্থাটা বুঝিয়ে বলব। ফেরার পথে ওকে ধরে বললুম।

"মাস্টারমশাই আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, আপনার বাড়ীতে কখন যেতে পারি ?"

"কি ব্যাপারে ?"

"তেমন কিছু নয়, স্কুলের ফিস নিয়ে একটু কথা বলব আর সামান্য অন্য কথা।"

"তা আয়, কাল সকালেই আয় না।"

পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি ওঁর বাড়ী গেলুম। বাইরে থেকে খোঁজ করছি, উনিও বাইরে বেরিয়ে এলেন। খুব সংক্ষেপে বেশী সময় নষ্ট না করে ওঁকে সব বললুম। "আপনি হেডমাস্টার মশায়কে আমাদের সত্যিকারের আর্থিক অবস্থাটা একটু বুঝিয়ে বলুন। ওঁকে কে যেন আমাদের সম্বন্ধে ভুল খবর সব দিয়েছে।"

"ঠিক আছে। আমি ওঁকে বলব ঠিকই তবে, আমার কথা উনি কতটা শুনবেন সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"আপনি ওঁকে বলুন, তারপর আমি আবার স্যারের সাথে দেখা করে বোঝাবার চেষ্টা করব।"

"ঠিক আছে, আমি ওঁকে বলব'খন," বলে ঘাটগে মাস্টার আমাকে বাইরে থেকেই বিদেয় দিলেন।

চার-পাঁচ দিন পর সাহসে ভর করে হেডমাস্টার মশায়ের বাড়িই গিয়ে হাজির হলুম। মনে মনে ঠিক করলুম স্যার যতই গাল দিন, যতই রাগারাগি করুন চুপ করে শুনে যাব, কিন্তু আমার যা বলার তা বলেই আসব।

ঘাটগে কেরানীর মত হেডমাস্টারমশাইও দরজায় দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগলেন, আমাকে ভেতরে যেতে বললেন না।

তিনি গম্ভীর গলায় প্রথমেই বললেন, "যা বলার আমাকে স্কুলেই বলবে, বাড়িতে আমার অন্য কাজ থাকে।"

"স্যার, আমি ইচ্ছে করেই আপনার বাড়িতে এসেছি, স্কুলে সব কথা ঠিক বলতে পারি না, সঙ্কোচ হয়। আমাকে পাঁচ-দশ মিনিট সময় দিন, আমার অবস্থাটা আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে বলছি, তারপর আপনি যা ভাল মনে করেন তাই করবেন।"

"আয়, ভেতরে আয়। বল কি বলবি। কিন্তু ওতে কোনো লাভ হবে না।"

ভেতরে ঢুকে সতরঞ্চিতে বসলুম গিয়ে। সব কথা খুলে বলতে গিয়ে বুঝলুম ঘাটগে মাস্টার ওঁকে বলেন নি কিছুই। তাই ওঁকে আমি গোড়া থেকে সব কিছু আবার গড় গড় করে মুখস্থের মতো ব'লে গেলুম। গেল আট বছর ধরে আমাদের যে কিভাবে চলছে তা যে ঘাটকে মাস্টারের জানা নেই তাও বলে দিলুম, আগের পরের সব কথাই খুলে বললুম। আমাদের সুদের কারবারটা যে কেবল নামেই, আসলে একেবারে ফাঁপা, শুধু আশে পাশে গলির প্রতিবেশীদের একে ওকে কিছু ধার দেয়া ছাড়া আর

যে কোন কারবারই ছিল না, যেটুকু ছিল তাও আমি যখন ক্লাস ফোর, ফাইভে পড়ি তখনই তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সেসবও বুঝিয়ে বললুম।

হেডমাস্টারমশাই সব শুনলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুই বিশ্বাস করতে চাইলেন না। বললেন, "তোর বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন?"

"গোল তো সেখানেই, স্যার" আমি বললুম," বাবার যদি আমাকে পড়াবার ইচ্ছেই থাকবে তাহলে তো অনেক মুস্কিলেরই আসান হয়ে যেত। তাছাড়া অবস্থার চাপে বাবাও পেরে উঠছে না, বলছে তুই আর পড়িস না, চাষের কাজে আমাকে সাহায্য কর, ওতেই আমার কাজ হবে।"

"তা তুই সাহায্য করলেই পারিস? সকালে একবার করে মাঠে ঘুরে আসতে তো পারিস?"

আমি তখন মাস্টারমশায়কে বোঝালুম মাঠের কি কি কাজ করে আমি বাবাকে সাহায্য করি। সবশেষে আমি যে বানানো কিছুই বলছি না, সবই যে সত্যি তা বোঝাবার জন্য বললুম উনি যেন আমারই গলিতে থাকেন প্রাইমারি স্কুলের যে সব মাস্টারমশাইরা যেমন সনগর মাস্টার মশায়, নাইক মাস্টার মশায়, সৌন্দোলিকার মাস্টারমশায় তাঁদের জিজ্ঞেস করেন। ওঁরা আমাদের বাড়ীর অবস্থার সব কিছুই জানেন।

সব কিছু শোনার পর হয়ত ওঁর মনটা একটু নরম হ'লো। কিন্তু উনি এ-ও বললেন, "এসব কথা সত্যি হ'লেও আমি এক্ষুনি মাইনের ব্যাপারে কোন ছাড় দিতে পারব না। এসব ঠিক ঠাক হয়ে যায় অনেক কিছুর ওপর, যেমন ধর, গেল বছরের পরীক্ষার ফল, ক্লাসে ছাত্রটির পড়ার ধরন-ধারন, চাল-চলন, তার ওপর হাজিরাও আছে। এসব সবই ক্লাস-টিচার দেখেছেন, তিনিই এসব নিয়ে পরে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। এ বছরেব ফ্রীশিপের ব্যাপারটা তো ঠিকই হয়ে গেছে, আমি সইও করে দিয়েছি আর তো নড়চড় হবে না। দেখি, সামনের ছমাসের মাইনেতে যতটা পারি মকুব কববার চেষ্টা করব আমি। তার জন্যে তোকে এ ছমাস ভাল নম্বর পেতে হবে, হাজিরা দিতে হবে ঠিক মতন, আর স্কুলের অন্য সব ফাংসন, অনুষ্ঠানেও পার্ট নিতে হবে মাস্টারমশায় যেমন যেমনটি চাইবেন, বুঝলি?"

"কিন্তু আমি এখন এই প্রথম ছমাসের স্কুলের ফিস কোথা থেকে জোগাড় করব?"

"সেটা তুই দেখ, পড়তে গেলে খরচাপাতি একটু তো করতেই হবে। যেমন করেই হোক গোড়ার ছমাসের ফিস তোকে দিতেই হবে," এই বলে তিনি উঠে পড়লেন। আমাকেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়তে হল।

আবার মনটা দমে গেল। চিন্তায় চিন্তায় আবার আমাকে খেয়ে ফেলছে। পড়াটা মনে হচ্ছে কিছুতেই আর এগিয়ে নেয়া গেল না। যাক গে, অবস্থাটা মাস্টার মশায়কে বোঝান তো গেল, তারপর যা হবার হবে।

পড়ায় মন বসছে না, পড়তে ইচ্ছে করে না, ক্লাসে মন দিতে পারি না। মনে সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তা এসে হাজির হচ্ছে। দেশপাণ্ডে মাস্টারমশায় পড়াতেন সংস্কৃত। এককালে জমিদার ছিলেন, এখন অবস্থা পড়ে গেছে, আস্তে আস্তে আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু হাজার হলেও জমিদার তো, তাই জমিদারি চাল যায় না। ফর্সা

ছিপছিপে চেহারা, খুব পরিষ্কার জামা-কাপড় পরেন। চক রাখার জন্য একটা টিনের বাক্স রাখা থাকত, হাতের তিন আঙুলে চক ধরে লিখতেন খুব আস্তে আস্তে, চকের গুঁড়ো গায়ে যাতে না লাগে। লেখা হয়ে গেলে চক রেখে দিতেন সেই টিনের বাক্সে। খুব শৌখিন মানুষ ছিলেন, কুচকুচে কালো কোটে, টকটকে লাল গোলাপ দিয়ে আসতেন। হাত-পাগুলো বাচ্চা ছেলেদের মতো পবিত্র, পরিস্কার। টেবিলের যে দিকটা অন্য মাস্টারমশায়দের পড়াবার পর চকের গুঁড়ো পড়ে থাকত, তার ধারে-কাছে উনি যেতেন না, যে দিকটা পরিষ্কার থাকত সে দিকটায় বইগুলো রাখতেন। বাড়িতেও উনি কাঠের খড়ম ব্যবহার করতেন যাতে পা নোংরা না হয়। তাই নিয়ে উনি ঠাকুরঘরেও ঢুকে যেতেন। বসবার গদির পাশেই খড়ম জোড়া রেখে পা দুটো সোজা গদিতে তুলে দিতেন। তাঁর সব বইয়েতে মলাট দেয়া। মাঝে মাঝে সংস্কৃতের সাথে সাথেই ইংরেজির শুদ্ধ উচ্চারণও শেখাতেন। মাস্টারমশাইকে দেখে আমার মনে হত এঁর ছেলেরা ফিসের ছাড় নিয়ে করবেটা কি? উনি যদি ওঁর দুছেলের পুরো ফিসটা দিয়ে দেন, তাহলেই আমার স্কুলের ফিসের পুরো মজুত হয়ে যায়। আমার মতো গরীবের এতে কত লাভ হয়! একবার মনে হল এই খড়ম পরা পরিপাটি লোকটিকে তুমুল বর্ষার মধ্যে ঝোপঝাঁপের ভেতর দিয়ে, অলিগলির হাঁটু অবধি কাদায়, আর আমাদের কাদামাটির জমির পেছলের ওপর দিয়ে, ভেজা ঘাসে হাঁটু অবধি ডুবিয়ে, আমাদের জমিতে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলে কেমনটি হয়? জমির ঐ কাদামাটিতে খাটতে খাটতে জামা কতটা নোংরা হতে পারে, গোবর ঘেঁটে হাতে আর জামায় গোরুমোষের গন্ধ চিরদিনের মতো কেমন সেঁটে যেতে পারে তা দেখালে হয় একবার। দেখালে হয়তো উনি ওঁর ছেলেদের ফিসের যে ছাড় চেয়ে নিয়েছেন তা ছেড়ে দেবেন আর আমার ফি সব পুরো মকুবটা তা থেকে এসে যাবে। নারগোড়ে উকিলের দু ছেলে সদাসর্বদা নিজেদের জামাকাপড় ইস্ত্রি করে পরে। গঙ্গাধরদের গাঁয়ের দিকে উর্বর কালোমাটির দামি জমি সব। ওরা ফ্রীশিপ নিয়ে করবেটা কি? এই স্কুলের ফিসটা বাঁচিয়ে তা থেকে ওরা ইস্ত্রির খরচা তুলবে, নয়তো ক্যানটিনে খাবার খাবে। আমার চেয়ে মাত্র চার নম্বর বেশি পেয়ে ওরা এই সুবিধেটা হাসিল করে নিলে। আমি যদি ওদের মতো রোজ স্কুলে আসতে পারতুম তাহলে ওদের চেয়ে দ্বিগুণ নম্বর পেয়ে দেখিয়ে দিতে পারতুম।

সপ্তাহে একদিন এক ঘণ্টা থাকত ড্রিল-এর জন্যে আর এক ঘণ্টা শ্রমদানের জন্যে। আমার কেবলি মনে হত আমার আবার ঘটা করে নিয়মমত ব্যায়াম করার কি দরকার? চাষে সারাদিন যা খাটতে হয় আমাকে, তাতেই তো শরীরটা পিষে নেয়। তার চেয়ে এ সময়টুকু বিশ্রাম করলে আমার কাজে দেবে। বিশ্রামটুকু পেলে আমার যে রক্ত শুষে যাচ্ছে আর মাংস ঝরে যাচ্ছে তা অন্তত কিছুটা রক্ষে পাবে। তাছাড়া, সে সময়টা তো আমি পড়াশুনা করে কাজে লাগাতে পারি। আর শ্রমদানের মানে হচ্ছে স্কুলের জন্য ফোকটে খেটে যাও। স্কুল আমাকে একটা পয়সাও ছাড় দিলে না, আমিই বা তাহলে এর জন্য খাটব কেন? এই শ্রমটুকুই আমি আমার জমির চাষে দিলে আমার ক্ষুধার্ত ভাইবোনেরা হয়তো এক মুঠো বেশি খেতে পাবে। এখানে শ্রমদান না করে ক্লাসের এ ছেলেগুলো যদি আমার জমিতে খেটে দেয় তাহলে আমার জোয়ারের

ফসল আরেকটু ভাল হবে, জোয়ারের চারাগুলো ঠিক ঠিক মতন যদি রুয়ে দেয় তাহলে আমি তো স্কুলে আসতে একটু সময় পাব, আর অত কামাইও হবে না। আর বাবাও খুশি হবে, বলবে, "আন্দ্যা, তোর স্কুলের বন্ধুরা তো বেশ ভাল, বামুনদের বাড়ির, তোর টিচাবদের বাড়ির ঐসব ফুটফুটে একরত্তি ছেলেগুলো তোর চাষের কাজে কেমন হাত লাগাতে এগিয়ে এল!"

স্কুলে একবার ন. র. ফাটকের ভাষণ ছিল। উনি দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা, দেশের ইতিহাস কি করে বুঝতে হয় এসব নিয়ে বললেন। আমার মনে হলো আমাদের এত অভাব আর বাধার মধ্যেও কি করে পড়া চালিয়ে যাওয়া যায়, এ বিষয়ে উনি যদি কিছু বলতেন তাহলে আরো ভাল হত। তিনি বলতে তো পারতেন, দীনদরিদ্রের ছেলেপিলেরা পড়তে গিয়ে সাধারণত কি ধরনের অসুবিধেয় পড়ে আর তাদের এ সঙ্কট থেকে বাঁচাবার রাস্তাই বা কোন্‌টা? আমাদের যে এত অভাব আর পড়াশুনা চালাতে যে এত কষ্ট, তা বাইরের জগৎ আর জানল কোথায়?

স্কুলে মন টেঁকে না, ঘুরে ফিরে এসব চিন্তাই আসে কেবল। মারাঠী স্কুলে যে উৎসাহ নিয়ে পড়েছি এখানে সেটার বড়ই অভাব। স্কুলের কত কাজে, কত ফাংসনেই না আমি তখন পার্ট নিতুম, কবিতা পাঠ, বক্তৃতা, গান, কমিক, স্কাউট, সাজসজ্জায়, আরো কত প্রতিযোগিতায় আমি পার্ট নিতুম। মাস্টারমশাই নিজের আলমারির চাবি আমার হাতে দিয়ে আলমারি খুলে জিনিস যখন আনতে বলতেন তখন গর্বে আমাব বুক ফুলে উঠত। সনগর মাস্টারমশাই, সৌন্দলেকর মাস্টারমশায়রা আরো বেশি করেছেন, নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে আমার ফর্ম-এর টাকা জমা দিয়ে ড্রইং পরীক্ষায় বসার সুযোগ করে দিয়েছেন। মারাঠী স্কুলকে আমি তাই নিজের স্কুল বলে ভাবতুম আর সেখানে পড়তেও তাই এত ভাল লাগত।

হাইস্কুলের পরিবেশ সম্পূর্ণ অন্যরকম। একবার মারাঠীর মাস্টারমশায় ক্লাস-এ বিতর্কের বিষয় ঠিক করে দিলেন, আমি তাতে পার্টও নিলুম। ডিবেট যখন চলছে, তাকিয়ে দেখি ক্লাসের ছেলেরা আমার কথায় গাঁয়ের সুরে মুখ টিপে হাসছে। মেয়েরাও আমার মত করে কথা বলে নিজেদের ভেতর মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। পরের দিন থেকে আমি ক্লাসে ঢুকলেই আমাকে নকল করে যে কোন একটা কথা বলে বলত অমুক এসেছে। আমি জানতে পারলুম আমার ভাষা শিক্ষিতদের ভাষার চেয়ে আলাদা, উচ্চারণও আলাদা। এর আগে এ তফাৎটা আমাকে কেউ বলেও দেয়নি, তাই নিয়ে কেউ হাসাহাসিও করে নি। আমার মনে হল ক্লাসে আমাকে কেউই পছন্দ করে না। ধীরে ধীরে নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হতো, আমার কথা বলাও ক্রমশঃ বন্ধ হয়ে গেল। ইংরেজির সাবজেক্ট কোথাও আটকালে কাউকে তা নিয়ে জিজ্ঞেস করা তো আগেই ছেড়েছিলুম, এবারে অন্য সাবজেক্টেও কোথাও আটকে গেলে তা নিয়েও জিজ্ঞেস করা ছেড়ে দিলুম। অনেক সময়ই উত্তর জানা থাকলেও বলতুম না, চুপ করে থাকতুম। এই সময়ই আস্তে আস্তে আমার মন কবিতার দিকে আবার ঝুঁকল, কবিতার ভেতর দিয়েই আমি আমার মনের দুঃখ কষ্ট জানাতে লাগলুম। এভাবেই নিজের মনে মনে নিজের সাথে নিজেই কথা বলতুম। কবিতায় আমার দুঃখ যেন

আরও বেশি ফুটে উঠতে লাগল। নিজেকে বলতুম ভাল করে বাঁচতে না পারলে বেঁচে রয়েছিস কেন আনন্দ, বেঁচে তোর কোনো লাভ আছে? কোথাও গিয়ে মরলেই পারিস? নিজের ওপর ভীষণ রাগ হত।

এত যন্ত্রণার মাঝেও কিন্তু মরি নি। মনের কষ্ট যখন কমে যেত তখন গায়ে যেন হাতির বল পেতুম, সব বাধা-বিপত্তি অভাব-অনটনের ভেতর দিয়েই পথ কেটে বেরিয়ে যেতুম।

আগস্ট শেষ হয়ে গেল, সনগর মাস্টারমশাই-র ড্রইং ক্লাস দেরীতে শুরু হল। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার তালিম আমার দেয়াই আছে। আনসা চোখ বুজল, আমারও গেল বার শেষের দিনের পরীক্ষাটায় বসাই হল না। ভাবলুম এবারে পরীক্ষাটা দিয়ে দিই। আমাকে খরচ কিছুই করতে হবে না, সনগর মাস্টারমশাই দিয়ে দেবেন। চার পাঁচ বছর ধরেই তো উনি এ ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছেন। ওঁর ক্লাসের অন্য ছেলেদেরও ভালই সুনাম, বেশ নামডাক হয়েছে। হাইস্কুলের কয়েকটি ছেলেও ওঁর কাছে আঁকা শিখত, এতেই গোল বাধল। হাইস্কুলের ড্রইংমাস্টার পাটিলের হিংসে হল, ওঁর এতে অপমান হয়েছে বলে নিজেই ভেবে নিলেন। উনিও হাইস্কুলে ড্রইং পরীক্ষার ক্লাস চালু করে দিলেন, ক্লাসেও আমাদের জানিয়ে দিলেন হাইস্কুলের ছেলেদের হাইস্কুলের মাধ্যমে ড্রইং পরীক্ষা দিতে হবে। অন্য স্কুল থেকে ফর্ম জমা দেয়া চলবে না। সামনের সপ্তাহে স্কুল ছুটি হয়ে যাবে, তখন রোজ এক ঘণ্টা ড্রইং-এর ক্লাস চলবে। মাসের মাইনে, পরীক্ষার ফি, তারপর সঙ্গে কি কি নিতে হবে তার একটা লম্বা ফিরিস্তিও দিলেন। আমি মুস্কিলে পড়ে গেলুম। পাটিল মাস্টার মশায়ের সাথে আগে আমার পরিচয় ছিল না। ড্রইং-এর ক্লাসে আমি ওঁর টেব্‌লের কাছে উঠে গিয়ে বিনীতভাবে আমার সমস্যার কথা ওঁকে জানালুম। সনগর মাস্টারমশায় আমার কাছ থেকে এক পয়সাও নেন না, পরীক্ষার ফিও উনিই দিয়ে দেন, আমার তো পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই, সেজন্য উনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি তাঁর কাছেই যেতে পারি।

"ঠিক আছে, ওখানে যাবার দরকার নেই, তুই এখান থেকেই পরীক্ষা দিবি, তোকে মাইনেও দিতে হবে না, আর তোর পরীক্ষার ফি ও আমিই দিয়ে দেব", পাটিল মাস্টারমশায় যখন এ কথা বললেন, তখন রাজি না হয়ে তো আমার উপায় ছিল না। হাইস্কুলে পড়ার তাগিদে আমাকে এ ফাঁদে পড়তে হল, আর পাটিল মাস্টার মশায়ের কাঠখোট্টা ব্যবহার আমাকে হজমও করতে হল।

সনগর মাস্টার মশায়কে গিয়ে এসব কথা জানালে উনিও মেনে নিলেন, তাঁরও কিছু করার নেই, বললেন, "তা, বেশ তো, ফর্ম ওখান থেকেই জমা দে, ওখানকার ট্রেনিংই নিস। বরং সময় পেলে এখানেও আসিস, তাতে আঁকার হাত আরও পাকাই হবে, তোর ভালই হলো রে।" ড্রইং-এর পরীক্ষা দিয়ে পেলুম তো বি গ্রেড কিন্তু সার্টিফিকেট হাতে আসছে না। সেটা পাটিল মাস্টারমশাই ওঁর আলমারিতে আটকে রেখেছেন। বললেন, "ফর্ম-এর আড়াই টাকা দিয়ে সার্টিফিকেটটা নিয়ে যা।"

আমি ক্লাস নাইন, টেন আর ইলেভেনে সেটা নেবার জন্য চেষ্টা যে কম করেছি তা নয়, কিন্তু টাকা ছাড়া তো পাওয়া সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝেই পাটিল মাস্টারমশাই

আমাকে মনে করিয়ে দিতেন, "ওরে সার্টিফিকেটটা টাকা দিয়ে নিয়ে যাস, আমার কাছে পড়ে ধুলোর পাহাড় হয়ে গেল।"

"দেখছি স্যার, পয়সা পেলেই নিয়ে যাব," ব'লে আমি ওঁকে এড়িয়ে যেতুম।

এদিকে যত দিন যাচ্ছে, আক্কোলকর মাস্টারমশাই মাইনে নিয়ে তাগাদা মারেন। ক্লাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোজই ওঁর বকুনি খেতে হত। আমাদের গলির আবাজীও এ দৃশ্য হরদম দেখত। বেচারা, ওর একটা সহানুভূতি ছিল আমার ওপর, বোধহয় কিভাবে সাহায্যটা করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। আর, যখন একটা উপায় বার করে ফেললে তখন একদিন আমায় বললে, "দেখ ছ মাসের পরীক্ষা তো ঘাড়ে এসে পড়ল। ভাল নম্বর তুলে মাইনেটা মকুব করিয়ে নে। আমি তো অঙ্ক আর জ্যামিতিতে খুব কাঁচা। তুই রোজ রাতে কেন আমাকে এ দুটো সাবজেক্ট পড়াস না? তুই আমাকে কিছুক্ষণ পড়াবি, আর তারপর আমরা দুজনে একইসঙ্গে পড়ব, তোর জন্য আমারও পড়া হয়ে যাবে। তুই যে আমাকে অঙ্ক আর জ্যামিতি পড়াবি তার জন্য টাকা দেব, যাতে তুই মাসে মাসে স্কুলের ফিসটা মিটিয়ে দিতে পারিস, কেমন, রাজি?"

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম, মনে হলো হাতে স্বর্গ পেলুম, ভগবান এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন। আবাজী আর আমি একই ক্লাসে পড়তুম, ওকে অঙ্ক আর জ্যামিতি দুমাস শেখালুম।

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার ঠিক আগের দিন ক্লাস-টিচার আমাকে ডেকে বললেন, "মনে রাখিস, কাল মাইনে নিয়ে না এলে পাছায় লাথি মেরে ক্লাস থেকে দূর করে দেব, পরীক্ষায় বসতেই দেব না।" পরের দিন আবাজী দুমাসের টাকা একসাথে আমায় দিলে, আমিও সে টাকা মাস্টারমশায়ের হাতে দিয়ে বললুম, "দু মাসের টাকা এনেছি। দেয়ালীর ছুটিতে গতরে খেটে পয়সা জমিয়ে স্কুল খুললেই বাকি ফিস দিয়ে দেব।" উনি নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন, আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, যদিও তখনকার মতো।

স্কুলে কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেও, বাড়িতে ভাইবোনদের এক-একজনের এক-একরকম সমস্যা। হীরার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল সত্যি, কিন্তু ও বেচারা কোনরকমে বছর দেড়েক স্বামীর ঘর করেই ফিরে এল। আমাদেরও মুখ নেই ওকে ফিরে পাঠাবার। সেই যে ছেলেবেলা থেকে মাটি খাওয়া ধরলে, এখন পনের বছর বয়সেও ও মাটি খেয়েই যাচ্ছে, একটুও শোধরায়নি। যাতে মাটি না খায় তার জন্যে কত চেষ্টাই না করা হয়েছিল, কোনো ফলই হয় নি। ওর পিঠোপিঠি ভাই শিবাও মাটি খেত, তবে ও যখন বছর সাত-আটেকের হবে তখন ছেড়ে দিলে। ধোণ্ডু, সুন্দরা, চন্দ্রা এরা পাঁচ বছর বয়সেই ছেড়েছে। কেবল হীরাই পারে নি ছাড়তে। এখন একটু কাজ করলেই হাঁপিয়ে পড়ে, একটা একটা পা ফেলে হাঁটে। গায়ে কোনো রক্ত নেই, ওকে দেখলে মনে হবে হলুদ মাখানো হয়েছে সারা গায়ে। দুর্বলতার জন্যে সংসারের কোনো কাজেই বেচারা হাত লাগাতে পারত না। মুখটা সদাসর্বদা ফোলাফোলা থাকত বলেই বাবা মা ওকে জলের দিকে খুব একটা পাঠাত না, বলত জলের ঠাণ্ডাতে ওর গা হাত

পা আরও ফুলবে। ওকে তাই গোরু মোষ চরানোর কাজ দেয়া হল। সকালে গোবর বার করে গোয়ালঘর পরিষ্কার করত, তারপর মোষ আর জলখাবার নিয়ে মাঠে চলে যেত, বাড়ি ফিরত সেই সন্ধেবেলা। শিবারও মুখ চোখ ফোলা ফোলাই থাকত তাই ওকেও ভারী কাজ তেমন বড় একটা দেয়া হত না। তবুও অসুস্থ জেনেও মাঝে মাঝেই মাঠে জল দিতে ওকে লাগান হতো, বসে বসে গোবরও পরিষ্কার করতে হতো। যতই হোক ও হল ব্যাটাছেলে, বয়সও কম। বাবা আর আমি যখন মাঠে রাত কাটাতুম তখন শিবাই সকালে চা নিয়ে হাজির হত। ধোণ্ডু বাঈ মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করত, মায়ে ঝিয়ে চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে আনত আর হাটের দিন ধোণ্ডুই বসে বসে শাক-সবজি বেচতে মার সঙ্গে হাত লাগাত। সবজি যেদিন অনেক হ'ত সেদিন মা ওজন না করে এমনিই বেচে দিত, আবার যেদিন মাত্র এক ঝুড়ি সবজি হ'ত সেদিন ভাল করে কাপড় বিছিয়ে তাতে একটু একটু করে গুছিয়ে বেচত। তরকারী বেচতে গেলে ওজন ব্যবহার হত না বলে কত বেচা হল আর কতই বা রয়ে গেল তা বলা যেত না। 'এক ঝুড়ি তরকারি বেচে ক' পয়সা হল?' এভাবেই জিজ্ঞেস করা হত। মার সাথে থেকে থেকে ধোণ্ডু এসব কাজে হাত পাকিয়ে ওস্তাদ হয়েছে। সন্ধেবেলা ফেরার সময় মার কথামত নুন, মশলা, তেল, চা এটা সেটা দরকারি জিনিস মুদিখানা থেকে ওই কিনে আনত। সুন্দরার তখন সাত-আট বছর বয়েস। পাঁচ ছ বছরের লক্ষ্মী, আপ্পা আর সবচেয়ে যে ছোট, এই সেদিন যার জন্ম হল এদের আগলাত সুন্দরা। বাবা আর আমি মাঠের দিকটা সামলাতুম। দশটা সাড়ে দশটায় রান্না বান্না সারা হলে মা সেগুলো একটা ঝুড়িতে সাজিয়ে বাচ্চাদের পল্টনের সাথে মাঠে চলে আসত। মাঠের জোয়ার, চিনেবাদাম এসব তোলা, কাটা সব মা-ই করত দু তিনটি মজুরনি নিয়ে। তবে আজকাল ওদের কমই কাজে লাগান হত। মা প্রায়ই বলত পয়সাটা ওদের পেছনে খরচ না করে সে পয়সায় খাবার কিনে একটু সকাল সকাল উঠে কাজ করলেই তো হয়। তাই মাঠে বাবা মা আমি হীরা ধোণ্ডু সুন্দরা সব মিলে সাত-আটজন সারি দিয়ে গাছ তোলার কাজে নেমে পড়তুম। আপ্পা লক্ষ্মী, চন্দ্রা আর পাঁচ ছমাসের আনসা খেতে বসে খেলা করত। অবশ্য কাজের চাপটা বাড়ত বর্ষা শেষ হলে। গাছ টেনে বার করা, খন্তা দিয়ে মাটি খোঁচানো এসব কাজ তখন ডবল স্পীডে জোর কদমে চলত। গোরু মোষ চরানো, ওদের ঘাস কাটা, মাঠের অন্য আরো সব কাজ যেমন লঙ্কা তোলা, সবজি তোলা, সেগুলো দিয়ে আঁটি বানানো তারপর তা নিয়ে গিয়ে হাটে বেচা, এসব একটা না একটা লেগেই থাকত। সেজন্যেই তো বর্ষা শেষ হয়ে গেলে আর দেয়ালী এসে গেলে মা গোটা সংসারটাই মাঠে নিয়ে যেত, সবাই ওখানেই থাকলে ঝামেলাও কম। গাঁয়ে দু আড়াই ফার্লং এর লাইনে দাঁড়িয়ে সুযোগ পেলেই জল তুলতে হ'ত রোজ সাত-আট খেপ তো হ'তই। মেয়েরা তিন দিন পর পর চান সারত, ছেলেরা মাঠেই ও কাজটা সেরে নিত। গোরু মোষ রোজ একবার করে আনতে হত আর ফেরাতেও হত। বাবার কাছে ওরা দুধ দিত না, মাকেই দোয়াতে হতো। রোজ নিয়ম করে একটা দুটো মোষ দোয়ান। ওদের বাছুরদের দেখাশোনা করা, তাছাড়া ছাগল ছিল তাদেরও চরানো,

চায়ের দুধের দরকার হলে দুধ দোয়ান। রোজ এতগুলো গোরু মোষ ছাগল গাঁ থেকে একবার করে আন আর সন্ধেবেলা ফেরাও। এ কাজের ভার একজনের ওপর দেয়া হ'ত। মাকেই তো রোজ খাবার ঝুড়ি বইতে হত, পিছু পিছু ছেলেমেয়েদের একটা বড় পল্টন। ফেরার সময় বাড়তি যে কাজটা ঘাড়ে পড়ত সেটা হ'লো গোরু মোষ ছাগল এদের খাবারের জন্যে ডালপাতা জোগাড় করার সাথে সাথে জ্বালানির জন্যেও শুকনো ডালপাতা নিয়ে ফিরতে হত। এত সব ঝঞ্ঝাট থাকত বলেই বর্ষা শেষ হলেই মা খেতে এসে থাকত, তাতে আসা যাওয়ার সময়টা বেঁচে যেত, খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজে তাড়াতাড়ি হাত লাগানো যেত। কিন্তু তাতেও গাঁয়ের বাড়িতেও কিছু কাজ তো থেকেই যেত, বাবা তাই রাতে গাঁয়ে ফিরে যেত, আমি সবার সাথে মাঠেই থেকে যেতুম।

ক্লাস নাইন-এর হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা হয়ে গেল। এবারে আমাদের মাঠে সংসার ফেঁদে বসাটা যেন একটু তাড়াতাড়িই হ'ল বলে আমার মনে হ'ল। আমি স্কুলের ফিস যে বাকি পড়েছে বাড়িতে তা কাউকেই বলি নি, জানতে পারলে বর্ষার মধ্যেই বাবা আমার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিত। কিন্তু হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষাও হয়ে গেল, আদ্ধেক কাজও শেষ হয়ে গেল। আর মাসখানেক স্কুলে যাবার দরকার ছিল না।

একদিন বাবা গাঁয়ে ফিরে যাবার পর মার কাছে স্কুলের বাকি ফিসের কথাটা তুলে জানালুম যে তিন-চার মাসের মাইনে বাকি পড়েছে।

"সে ক'গণ্ডা টাকা?" মা জিজ্ঞেস করলে।

"দশ-পনের টাকা হবে আর কি", আমি বললুম।

"বাব্বা!.......দ-শ পনের?" মার যেন মাথা ঘুরে গেল, চোখ বড় বড় করে মুখ হাঁ করে রইল। আমি মাকে সব বুঝিয়ে বলায় মার আশাভঙ্গ হ'ল। মা বেচারা হয়তো ভেবে থাকবে হাইস্কুলে পড়তে পয়সা লাগে না, আমিও তো স্কুলে যাবার সময় মাকে সেরকমই বলেছিলুম কিনা। পনের টাকা মানে কুড়ি দিনের মজুরি। মা কোথায় পাবে এত টাকা? আমার তো এসব জানাই ছিল, তবু কথাটা তুললুম এইজন্যে যে মনে মনে একটা উপায় আমি ঠাউরে রেখেছিলুম, মাকে বললুম, "তোমাকে একটা পয়সাও দিতে হবে না। আমি মাসখানেকের ভেতরই পয়সাটা জমিয়ে ফেলব।"

"কি করে জমাবি এই মাঠের মধ্যে বসে?"

"ধারে পিঠে দেখ কত ঘাস উঠেছে, আরো অনেক উঠবে। রোজ একটা করে বাণ্ডিল হাটে নিয়ে বেচে দেব। দিনের বেলায় বাণ্ডিলটা কোথায়ও একটা লুকিয়ে রাখলেই হবে, সন্ধেবেলা কাজ সেরে যখন গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে যাব তখন যাবার পথে হাটে ঘাসের বাণ্ডিল বেচে দিয়ে যাব। ভোর হতে না হতেই গাঁ থেকে চলে আসব এখানে। তোমাকেও এ থেকে কিছু দেব।"

প্রস্তাবের শেষ অংশটুকুই মার বেশি পছন্দ হল। ওর ছেলেমেয়েরা একটু চিঁড়ে মুড়ি, ঝুরিভাজা মোয়া এসব খেতে পারবে। তারাও আমার এ কাজে হাত লাগাতে পারবে। সারাটা মাস আমি যখনই সুযোগ পেতুম ঘাস, জোয়ার গাছের ওপরের বাড়তি ডালপাতা চুপি চুপি কেটে বাণ্ডিল করে নিয়ে যেতুম আর হাটে বেচে দিতুম।

দেয়ালীর পর স্কুল আবার খুলল আর আমিও পরের দিন রেজাল্ট আনতে গেলুম। প্রাণের ভয় ডর না করে, মরিয়া হয়ে কাজ করে সতের আঠারো টাকা জমিয়ে আক্কোলকর মাস্টার মশায়ের হাতে তুলে দিয়ে রেজাল্ট নিয়ে এলুম। অন্যসব সাবজেক্টের নম্বর তো আমি সেইসব টিচারদেব কাছ থেকে আগে ভাগেই জেনে নিয়েছিলুম, ইংরেজির নম্বরটাই যা জানার বাকি ছিল। ওটার একেবারে টায়ে টায়ে পাশ করেছি, আক্কোলকর স্যার কিপটের মতো নম্বর সব দিয়েছেন। ওঁর কপাল যেমন ত্রিশূলের বলিতে গোটানো থাকত, ভেতরের মনটাও অন্তত আমাব ব্যাপারে একইরকম গোটানো ছিল বলেই আমার মনে হল।

পরের ছ'মাসের স্কুল ফিসটা হেডমাস্টারমশায়কে বার বার ধরে ক'য়ে আদ্ধেক মকুব করানো গেল। সেই আদ্ধেক ফিটাও আমার মাথায় খাড়ার মতো এখনও ঝুলছে। এই ছমাসে খেতের কাজে খুব কষে শুরু হয়েছে। আখ মাড়াই করা, চিনেবাদাম তোলা, জোয়ার ঝেড়ে ঘরে এনে তোলা। একটার পর একটা কাজ, আখের বীজ শুকিয়ে যেতে পারে সেজন্য আখের খেতটায় তাড়াহুড়ো করে লাঙল দেয়া। সারি সারি বীজ রোয়ার কাজ চালু হয়ে গেল। যত ভোবে উঠেই কাজে লেগে যাই না কেন কাজ আর শেষ হতেই চায় না। আমাব কান্না পেয়ে যেত। এত তাড়াহুড়ো কাজের ভীড়ে আটদিন চাষের কাজ কবতুম আর দুদিন যেতুম স্কুলে। এই করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ক্লাস নাইন-এব বার্ষিক পরীক্ষায় উৎরে গেলুম। পাশ করার আনন্দের চেয়েও আক্কোলকর মাস্টারমশায়ের হাত থেকে যে নিস্তার পেলুম তার আনন্দও কোনো অংশে কম ছিল না।

ছয়

পরীক্ষা শেষ হল, কোনোরকমে পাশও করে গেলুম আর নতুন বছর অর্থাৎ গুড়ি-পাড়ওয়ার সময় আমরা আবার গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে এলুম। এবার আর মা আরেকটা ঝামেলা আমার ঘাড়ে চাপাল।

পড়াশুনা চালাতে তো বই খাতাপত্তর দরকার, স্কুলে ফিসও দিতে হবে। তা এসবের টাকাপয়সা আসবে কোত্থেকে? যখন খুব ঠেকায় পড়ে যেতুম এসবের জন্যে, তখন তা থেকে উদ্ধার পেতে আমি এক উপায় বার করেছিলুম। সেটা হল আশেপাশে বাসিন্দেদের কোনো জিনিস, ফসলের খানিকটা, ঘাস, যাইহোক না কেন তা চুরি করে বেচে দিতুম আর তাতে যা পয়সা পেতুম তা দিয়ে দু একটা ইংরেজি, মারাঠী বই, কাগজ খাতা এসব কেনা যেত। হয়ত কেউ চিনেবাদাম খেত থেকে তুলে ঢিবি করে রেখেছে, আমি জ্যোৎস্না রাতে গিয়ে যে কটা দানা পড়ে থাকত তা তুলে নিয়ে এলুম। আবার কেউ হয়তো গোরুকে খেতে দেবে বলে খড় গুছিয়ে জড়ো করে রেখেছে, কেউ বা ঘাস রেখেছে রাশি রাশি, আমি রাতের অন্ধকারে সেই খড়ের গাদা আর ঘাসের স্তূপ থেকে কিছু সরিয়ে নিয়ে এলুম আর আখের গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকিয়ে রেখে দিলুম। ব্যস্, পরের দিন চোরাই মাল সোজা চলে যেত বাজারে আর সেখান থেকে খদ্দেরের গোয়ালে। বর্ষাকালে অঝোরে জল পড়ছে, যে সব খেতে পাহারা দেবার হয়তো কেউ নেই, সেসব ক্ষেতগুলোর বাঁধের ধারের ঘাস আর জোয়ারের খানিকটা উঠে আসত আমার থলেতে। মার কানে এসব কথা যে ওঠে নি তা নয়, তবে বাবা এর বিন্দুবিসর্গ জানত না এটা ঠিক।

জুলাই মাসের শেষের দিকে ক্লাস নাইনের পড়া আরম্ভ হয়, এটা সে সময়কার কথা। বইখাতা কেনার জন্য আমার কিছু পয়সার দরকার হ'ল। কাটবার মতো ঘাস ধারে কাছে কোথাও পাচ্ছি না, সবার জমিতেই তামাকের চারা পোঁতা হচ্ছে। সাধারণ জল পড়ছে, তাই মাঠে কোনো কাজ নেই। যারা দিনমজুরি করে খায় তারা কাজ পায় না, হাঁটুতে মুখ গুঁজে জলের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোটানো দায়। পিসির ছেলে বাবুর বাড়িতেও সেই একই অবস্থা, ঘরে তার আবার বৌ রয়েছে, দুজনেই উপোস করে রয়েছে। এক রাতে ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে একধারে ডেকে এনে, এদিক-ওদিক চেয়ে যখন কেউ নেই দেখলুম ঠিক তখনই কথাটা পাড়লুম, "বাবু, একটা জায়গা দেখে এসেছি, হাজার দু তিনের মতো তামাকের চারা উঠেছে। তুলে আনবি?"

"আনতে পারি, তা সে জায়গাটা কোথায়?"

"জায়গাটা একটু বেয়াড়া, বলছি পরে। আগে একটা খদ্দের ঠিক কর," এর বেশি কিছু তক্ষুনি ভাঙলুম না। আমি ওকে জায়গাটা বলি আর ও আগে ভাগে গিয়ে চারাগাছগুলো তুলে নিয়ে বেচে দিক আর কি!

পরের দিন বাবু একটা খদ্দের ঠিক ধরে আনলে। হাজারে ছ'টাকা দিতে রাজি। গাঁয়ে সব জায়গায় হাজারে আটটাকা পাওয়া যায়। চারাগাছের দাম আছে, তামাক আর লঙ্কাগাছ চড়াদামেই বিকি-কিনি হয়। ওদের পেছনে অনেক খাটুনি, অনেক মেহনত করতে হয় কিনা। এই যেমন, সারের গদিতে বসিয়ে জল দিয়ে যেতে হয়, খুব সরু আঙুলে ওদের আগাছাগুলো বের করে এনে ফেলে দিতে হয়। এত করেও গাছে পোকা ধরে যায়। এসব বিপদ থেকে খুব যত্ন করে গাছগুলোকে বাঁচিয়ে রেখে দু তিন মাস ধরে ওগুলোকে বাড়াতে হয়। সেজন্যই তামাকের চারার এত চাহিদা।

যার তামাকের চারা হাতসাফাই করতে যাচ্ছি তার নাম বন্যা, চলে খুব দাপটে। কচি চারাগাছগুলোর তিনটে ঝাড়ে ওর ছিল, আর দুটো ঝাড়ের মাঝখানটায় ওর কুঁড়েঘর। কেবলি মনে হচ্ছিল চারাগাছ চুরি তো নয়, এ যেন প্রাণ নিয়ে খেলা। সে রাতে বাবাকে বলে আমি খেতেই রয়ে গেলুম, বাবা গাঁয়ের বাড়িতে ফিরে গেল। রাত দশটায় বাবু এল। কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে, মাথা আর গায়ে বস্তা চাপিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম, হাতে নিলুম লম্বা বেতের লাঠি। ভেবেই রেখেছি টের পেয়ে লাঠি নিয়ে বন্যা যদি আমাদের তাড়া করে তখন এই বেতের লাঠিই আমাদের রক্ষা করবে। নীচের দিকে ল্যাঙ্গোট মাত্র পরেছি আর কিছু নয়। ভেবে দেখলুম রাতে সাদা কাপড়জামা দূর থেকে সহজেই চোখে পড়বে, তাছাড়া জামাকাপড় চালচলন দেখলেও কে বা কারা তার একটা আন্দাজ সহজেই করা যায়। কি দরকার ওসব ঝঞ্ঝাটে? সাবধান হতে গিয়েই এই আধান্যাংটো অবস্থায় বেরিয়ে পড়লুম।

"বাবু, বন্যা যদি সাড়া পেয়ে ছুটে আসে তখন কি করব?"

"ওসব চিন্তায় তোর কাজ নেই, তুই চারাগুলো তুলতে থাকবি আর সামনে নজর রাখবি। দূর থেকে ওকে দেখলেই জলের দিকে ছুটবি। তারপর আমি দেখে নেব। দেখ, একটা কথা মনে রাখবি, চোরকে ধরে মারতে গেলে খুব বড় বুকের পাটা লাগে, বুঝলি?" বলেই সে হাত দিয়ে নিজের বুকে জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে দুটো চাপড় মারলে, "চুরি করবার সময় চোর এমন বেপরোয়া হয়ে যায় যে সে সময় একটা হাতি ওর ওপর এসে পড়লেও ও ভয় পায় না। বন্যা যত বড় বাঘই হোক না কেন, ও হল গিয়ে একা আর আমরা হলুম দুজন। দেখিস ও এদিকে ছুটে আসবেই না, বড় জোর একটু চিৎকার চেঁচামেচি করবে। তেমন বুঝলে সেই ফাঁকে আমরা ফিরেই আসব।"

যাক গে ওসব কিছুই হয়নি, যদিও মনে মনে খুব ভয় ছিল। অবশ্য সেই সঙ্গে আরও একটা জিনিস ছিল সেটা হোল আমাদের উদ্যম। আর, তার ফলে চুরি করতে করতে একটা আস্ত ঝাড়ই টেনে নিয়ে এলুম।

সে রাতে আমি সাত টাকা আর বাবু আট আনা নিয়ে ফেরার সময় খদ্দেরের বড় ছেলেকে বাবু শাসিয়ে এল, "দেখিস, এ খবর যেন পাঁচ কান না হয়, খবরদার। তোদের গাছের দরকার ছিল তাই তোদের দিলুম। মনে রাখিস পরাণটা হাতে নিয়ে এ কাজ করতে হয়েছে আর তোদেরও দু'দুটো টাকা লাভ হয়েছে। ব্যস্, এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট।

"মাথা খারাপ? আমাদের অমনি অত বোকা ঠাউরেছিস নাকি? আমাদেরও তো এ গাঁয়ে সবার সঙ্গে মিলে মিশেই থাকতে হবে— ঠিক কিনা? আর পরাণটা হাতে নিয়ে তুই যা করলি তাতে আমাদের তো লাভই হল— ঠিক কিনা? এটুকু কি বুঝি না?"

"ব্যস্, ব্যস। ওটুকু মনে রাখলেই চলবে।"

আর কথা না বাড়িয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। হাতে পয়সা রেখে দিলে সিনেমা দেখতে খরচ হয়ে যেতে পারে মনে করে আমি দিন কয়েকের মধ্যেই বই খাতা কিনে পড়া শুরু করে দিলুম।

এদিকে যে লোকটা তামাকের চারাগুলো কিনেছিল তার খেতে ওগুলো বেঁচে উঠে সারি সারি সবুজ চার চারটে পাতা তুলে যখন তরতর করে বেড়ে উঠছে, তখন এর ছোট ভাই একদিন সকালে হুঁকো টানতে টানতে বাবার কাছে এসে গল্প ফেঁদে বসলে, "রতনুদা, তোর বোনপো বাবু ভীষণ বেয়াড়া হয়ে গেছে, সে না হয় হল। জন্মে অবধি দেখছি চুরিচামারিই করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তোর ছেলে? সে তো শুনি স্কুলে পড়ে। সঙ্গদোষে শেষে সে-ও কিনা চুরি ধরলে? ওকে শাসন করো, চোখে চোখে রাখো। নইলে ও কিন্তু তোমার হাতের বাইরে চলে যাবে।"

"বলিস কি রে?"

"মিথ্যে কথা বলে লাভ কি বল? এই তো আমার ঘরেই তো সেদিন ও আর বাবু আড়াই হাজার তামাকের চারা এনে দিলে। আমি নিজের হাতে গুণে গুণে কড়কড়ে পনেরটি টাকা দুজনের হাতে তুলে দিলুম।"

"আচ্ছা, আমি দেখছি ওকে। তা, চারাগাছগুলো কাদের?"

"তোমাদেরই পড়শি। বন্যা চাষীর গাছ ওগুলো।"

তামাক খেতে খেতে কথাগুলো বাবার কানে দিব্যি তুলে দিয়ে লোকটা কেটে পড়লে। ধারে কাছে হীরা ছিল, জোয়ার বাছছিল বসে বসে, সবই শুনতে পেলে আর যা যা কথাবার্তা হয়েছিল সবই ঠিক সময় আমায় বলে দিলে। আমি আগে থেকেই সাবধান হতে সময় পেলুম আর বাবার হাতে মার খাবার জন্য তৈরীও যেমন হতে থাকলুম তেমনি মারটা এড়াবার ফন্দিফিকিরও মনে মনে ঠিক করতে লাগলুম। প্রথম যেটা মাথায় এল সেটা হল বাবার সাথে দেখা হবার আগেই পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। আগের দিন রাতে ভীষণ জলঝড় হয়েছে দেখে বাবা আর আমি দুজনে ঘরেই শুয়েছি। সকালে বেরোবার সময় মাকে বললুম, "গোরু মোষগুলো গোয়ালঘরে সব না খেয়ে রয়েছে, আমি ওখানেই যাচ্ছি, পায়খানা চান সব ওখানেই সেরে আসব। কারো হাত দিয়ে চাটা পাঠিয়ে দিও। বাবা এলে বাবার সঙ্গেও দিয়ে দিতে পার।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বাবুর কাছে হাজির হয়ে ওকে সব জানালুম।

"বাবু, খদ্দেরটা কেমন ডোবালে দেখলি? বাবার কাছে চুকলি কেটেছে। তুই ওকে আচ্ছা করে দাবড়ে দিস তো। তা না হলে ও গিয়ে আবার বন্যাকেও বলে দেবে। ওকে গিয়ে বলবি এ খবর বন্যার কানে যদি ওঠে তাহলে ওর জমিতে যে চারাগাছগুলো

সবুজ হয়ে বেড়ে উঠেছে এ চারাগাছগুলো সব ক'টা টেনে উপড়ে ফেলে দিয়ে আসব জঞ্জালের ভেতর। আর ওর টাকা ফেরত দিয়ে দেব। বাবার মারের কথা মনে হলেই ভয়ে হাত-পা আমার সেঁধিয়ে যাচ্ছে। বাবা আজকে আর আস্ত রাখবে না। দেখ, বাবাকে আমি বলব আমি চুরি করি নি, বাবুই চুরি করেছে। আমি কেবল ওর সঙ্গে ছিলুম। যেতে বলল তাই গেছিলুম। আমি কিন্তু বাবাকে এটাই বলব বুঝলি? তোকে জিজ্ঞেস করলে তোর যা ইচ্ছে তাই বলিস। সবচেয়ে ভাল হয় তুই বাবার সামনেই যাস না। বাবা এলেই লুকিয়ে পড়বি। পিসি বলবে পিসি কিছুই জানে না। বাবা এলে বলবে তুই কাজে গেছিস। আমি চললুম, বাড়ি থেকে বেরোবার সময় বলে এসেছি মাঠে যাচ্ছি" বলেই এক দৌড়ে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলুম।

ঘণ্টাখানেক পর হীরাবাঈ এল চা নিয়ে আর খবর দিয়ে গেল বাবা আর মা চুরি নিয়ে কথা বলছিল। আর এক ঘণ্টার ভেতরই বাবা আসছে জলখাবার সেরে। মা বাবা দুজনেই বাবুকে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাচ্ছে।

যা শোনবার শোনা হ'ল। এবারে আখের গায়ের ঘাসগুলো কেটে হীরাবাঈকে দিলুম। বাবাও ততক্ষণে এসে গেছে, আমি মাঠে কাজ গোছাচ্ছি। বলদগুলোর জন্যে সাত-আট আঁটি ডালপাতা কেটে রেখেছি। ভেবেছি বাবার নজরে যদি পড়ে যে এখানে এসেই আমি কাজে লেগে গেছি বসে থাকি নি তাহলে হয়তো রাগটা একটু পড়বে।

"আন্দ্যা, এখানে আয়।"

যেন কিছুই হয় নি এরকম ভাব দেখিয়ে এগিয়ে এলুম।

"বন্যার তামাকের চারা তুলে তুই নাকি চাষীদের বেচে দিয়েছিস?"

"আমি? কই না তো। কে বললে?"

"কিশা চাষী বলছিল."

"ও! কিশা! তা সে তো আমি বেচি নি। পিসির ছেলে বাবু বেচেছে?" এটা যেন একটা খবর, বাবা জানত না, আমিই যেন এখন জানাচ্ছি— আমার ঐ একই ভঙ্গী।

"তুইও নাকি ছিলি সঙ্গে?"

"ছিলুম, তাতে কি হল? চারাগুলো তুলে এনে বাবু সোজা আমাদের জমির দিকে এল, আমাকে জিজ্ঞেস করলে, বাবা কোথায়? আমি ওকে বললুম বাবা বাড়ি গেছে। তখন আমাকে সে জিজ্ঞেস করলে ওর সাথে আমি গাঁয়ে যাব কিনা। কারা সব কি সব করেছে। আমি সঙ্গে গেলে আদ্ধেক পয়সা ও আমাকে দেবে। আমাকে কেবল সঙ্গে যেতে হবে এই যা। আমি ভাবলুম সেধে পয়সা দিচ্ছে, ফেরাই কেন? যাই-ই না। আমারও তো বই খাতার জন্য পয়সাকড়ির দরকার, তাই গেলুম। কিশা চাষী আবার এ সবের কি জানে?"

"হারামজাদা, ধরে ফেলে কেউ যদি তোকে ঠ্যাঙাত? আমার পিছু পিছু মাঠে এসে এসব কাণ্ডকারখানা করছিস্?" বলে বাবা আমাকে মারতে এগিয়ে আসার আগেই আমি নাগালের বাইরে সরে দাঁড়ালুম।

"পয়সা না থাকলে খাতা বই কিনব কি দিয়ে? ও সেধে দিচ্ছিল তাই তো গেলুম,"

আমার এ জবাব শুনে বাবার রাগ আদ্ধেক পড়ে গেল। বাবু অনেকদিন ধরেই ছোটখাটো চুরি করে আসছে, বাবা সেটা জানেও। তাই এই চুরির ব্যাপারে বাবা যে আবার বাবুর কাছে যাবে না সেটা আমি এরকম ধরেই নিয়েছিলুম তাই ভালমানুষের মতো এতগুলো কথা বানিয়ে বলে ফেললুম। বাবা খুব গাল দিলে কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াল না, ওখানেই শেষ হল।

এটা ঘটেছিল গেল বছর। তারই সঙ্গে বাবা একটা অন্য ব্যাপারও জুড়ে দিলে। দেয়ালীর পর প্রতিবারের মতো এবারেও আমাদের আখ মাড়াই করা হল, ও থেকে গুড় হল, সে গুড় গেল কোলহাপুরের হাটে। পনের দিন বাদে বাবা গুড়ের টাকা আনতে গেলে দালাল হিসেবের কাগজও বাবার হাতে গুঁজে দিলে আর সেই সঙ্গে সতেরটি টাকাও হাতে দিল।

বাবা তো অবাক, জিজ্ঞেস করলে, "এ সতের টাকা কিসের?"

"হিসেবের। গেল বছর গুড় বাবদ তুমি আগাম টাকা নিয়ে গেলে, সেই টাকা আর তার সুদ কেটে রেখে তোমার যা পাওনা হয় তাই দিলুম।"

"তা বলে মাত্র সতের টাকা?"

"হ্যাঁ তাই হয়, আমার হিসেব লেখা আছে," এই বলে দালাল পুরো হিসেবটা বাবাকে দেখালে। বাবার বিদ্যে কুড়ি গোনা পর্যন্ত। তাই হুঁ হুঁ করে সতেরটি টাকা মাত্র পকেটে নিয়ে বাড়ি ফিরল। ফলে হলো কি, সংসার খরচের কোনো টাকাই রইল না। তাই জোয়ার হবার আগেই চিনে বাদাম তুলে ফেলা হল, আট-দশদিন রোদে রেখে তা আবার শুকোনোও হল। এগুলো যখন হচ্ছিল তখন জোয়ারও কেটে বস্তায় ভরে মুখ বেঁধে ঘরে তোলা হল। শুকনো চিনেবাদাম বস্তায় ভরে দালালের কাছে দিয়ে আসতে হবে। এখন বেচলে তা থেকে সংসার খরচের টাকা আসবে। দালাল আগাম টাকা দিতে রাজী হয় নি কিনা। ঘরে মোট ছটা বস্তা, সেগুলোতে জোয়ার রাখাতে আটকে রয়েছে। সেগুলো আবার ঘরেতেই ঢেলে বস্তা খালি করা হলো। এবার তাতে বাদাম ভরে গাড়ি করে বাদামের বস্তা কোলহাপুরে বাবা দিয়ে এল। দালাল বললে, বাদাম বেচার টাকা দেড় দুমাস পরে দেবে।

এর ভেতর আবার আমার পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। সামনেই পাড়োয়া, কাজেই আমরা ফের আমাদের ঘরকন্না মাঠ থেকে তুলে গাঁয়ের বাড়িতে নিয়ে বসালুম। ঘরে নেই একটি পয়সা, ভাইবোনেদের গায়ে নেই একটাও নতুন জামা। মা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। দেয়ালীর চাইতেও পাড়োয়া বা সংক্রান্তিতে নতুন জামা কেনা ছিল অনেক সুবিধের। তখন গুড়ের টাকা হাতে থাকত। এবারে সে গুড়ে বালি। বাবা ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে গেল। চেনাশোনা যারা ছিল গাঁয়ে, তাদের কাছে টাকার জন্য বাবা খুব ঘোরাফেরা করলে কিন্তু কোনোই লাভ হল না, টাকা ধার দিলে না কেউই। বাবার আর আমার মন ভেঙে গেল, মনমরা হয়ে আমরা চলে এলুম খেতে রাত কাটাতে। বুঝলুম আরও খারাপ দিন আসছে। রাতে বাবা কি স্বপ্ন দেখলে বাবাই জানে, ভোরবেলায় ঘুম থেকেই উঠেই বলে উঠল, "আন্দ্যা, চিনেবাদাম বেচে দিয়ে দালাল টাকা হাতে আমার জন্য বসে অপেক্ষা করছে ওর গদিতে।"

"কি করে বুঝলে?"

"রাতে স্বপ্ন দেখলুম যে। আমি এখুনি কোলহাপুরে গিয়ে টাকাটা নিয়ে আসি গে।"

"ঠিক আছে," বলে আমি চুপ করে গেলুম। বাবা একবার স্বপ্নে কোনো কিছু দেখলে সেটা সত্য বলে মেনে নিত। কারো সন্দেহ করার উপায়ই ছিল না। ভীষণ অস্থির হয়ে পড়ত, স্বপ্ন মানেই বাবার কাছে সেটা ঠাকুরের নির্দেশ। বামুনের জমি ভাগে চাষের জন্যে নেবার পর থেকে যেমনি আমাদের অবস্থা ক্রমেই পড়তে লাগল তেমনি বাবাও ঘন ঘন স্বপ্ন দেখতে লাগল। রাতে স্বপ্ন দেখলে পরের দিন বাবা স্থির থাকতে পারত না। সারাদিন সে স্বপ্নের কি অর্থ হতে পারে তাই খুঁজে বেড়াত। একা বসে বসে নিজের মনেই বিড়বিড় করে কথা বলে যেত। স্বপ্ন বাবাকে পাগল করে দিত। বাবার সামনে সংসারের কতই না সমস্যা। চিনেবাদাম, গুড়, লঙ্কার বায়না হবে কি হবে না, বায়না হলে কত টাকা পাওয়া যাবে, জমির মালিক সেই যে বলেছিল কুয়ো খুঁড়ে দেবে তা সত্যি সত্যি দেবে কিনা, আখ কখন মাড়াই করলে ঠিক হবে, কখন দালালেব কাছে গুড় নিয়ে গেলে ফল ভাল হবে, দালাল আগাম টাকা দেবে কি দেবে না, কখন বীজ রোয়া হলে ফসল হবে ভাল, এসব হাজারো প্রশ্ন বাবার মাথায় কিলবিল করছে। এ সব প্রশ্নের জবাব বাবা খুঁজত স্বপ্ন থেকে। সারাদিন যে সব প্রশ্ন বাবার মনে তোলপাড় করত সেগুলো সযত্নে বুকে আগলে রেখে সব সমস্যার বোমা ঠাকুরের পায়ে দিয়ে একসময় বাবা ঘুমিয়ে পড়ত। রাত্তিরে স্বপ্নের ভেতর এ সব সঙ্কটের সমাধানের সূত্র খুঁজে বেডাত বাবা, আর যে কোনো স্বপ্নকেই বাবা স্বপ্নাদেশ বলে মেনে নিত। স্বপ্নে কোনো ধনগর মাথায় "ঘোঙরি" লাগিয়ে আসতে দেখলেই বাবা তাকে বিঠোবা মনে করত, কোন মাঙ্গ আসলে তাকে ধরে নিত খাণ্ডোবা, ল্যাঙ্গোট পরা ভিখিরি দেখলে ভেবে নিত দত্তাজী ঠাকুর আসছে আর কোনো বুড়োকে দেখলে বাবা তাকে হলসিদ্ধ আপ্পা বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিত। কমবয়সী ছোকরা বাবার কাছে জ্যোতিবা বলে খাতির পেত, এ সব ঠাকুরই আমাদের এলাকায় দেবতা— নিত্য পুজো পেয়ে আসছেন। ধনগর আর মাঙ্গদের বসতি তো আমাদের বাড়ির দুপাশেই। আমাদের খেতে আসতে যেতে হরদম ভিখিরির পাল দেখতুম। কত ছেলেছোকরা, বুড়ো অনবরত আসত যেত ও রাস্তায়, তারাই হয়তো চেহারা পাল্টে পাল্টে বাবাকে স্বপ্নে দেখা দিত, কে বলতে পারে? শুনেছি জন্মের সময় বাবার পা দুটো বেরিয়েছিল আগে। পাড়াগাঁয়ে লোকের বিশ্বাস এ সব বাচ্চারা খুব ধার্মিক হয়, তাদের ভেতর ভগবান বিচরণ করেন। তাছাড়া আমার ঠাকুর্দা ঠাকুরমা গাঁয়ে সবার কাছেই বলে বেড়িয়েছে যে তাদের যে ছেলে হয়েছে আর সে যে বেঁচে বর্তে বড়টি, ডাগরটি হতে পেরেছে সে তো একমাত্র হলসিদ্ধ আপ্পারই কৃপায়। ছেলেপিলের গুষ্টি বেড়েই চলল, জমির বামুন মালিক কুয়ো খুঁড়ে দেবে বলে দিলে না, ফলে ভাগের চাষ থেকে দুটো পয়সা আসা দূরের কথা মাথায় বোঝা হয়ে দাঁড়াল, সব মিলে বাবা দারুণ মুস্কিলে পড়েছে, তাই দেবদেবীর ওপর বাবার ভক্তিশ্রদ্ধা আর বিশ্বাস দিনদিন বেড়েই চলেছে! মাঝে মাঝে বাবা এই সব দেবদেবী

দর্শন করে আসত। ঠাকুরের ওপর ভার চাপিয়ে বাবা অনেক প্রশ্নের জবাবই পেত। স্বপ্নে যা দেখেছে তার একটা অর্থ ঠিক বার করবেই, সত্যি কথা বলতে কি বাবা স্বপ্ন কথাটাই বলত না, বলত 'আদেশ'। স্বপ্ন বাবার কাছে হেলাফেলার ব্যাপার ছিল না, স্বপ্ন বাবার কাছে ছিল একটা 'অসাধারণ' জিনিস, বাবা বলত ঠাকুর স্বপ্নে 'আদেশ' দিয়েছেন। স্বপ্নে যাকে দেখত তার চেহারা বর্ণনা করেই বলত ঠাকুর ঐ চেহারাতেই তাকে দর্শন দিয়েছেন। আমরা ছেলেমেয়েরা ঐ 'আদেশের' কথা শুনে আড়ালে মুখ টিপে হাসতুম, ঠাট্টা তামাসা করতুম। স্বপ্ন মানুষ কেন দেখে, স্বপ্নকে বিশ্বাস করে কোনো যে লাভ হয় না এসব বাবাকে একবার আমি পড়ে শুনিয়েছিলুম। বাবা আমাকে তেড়ে মারতে এল আর বললে আমার স্কুলটা কতগুলো নির্বোধ লোকে ভরা। এরপর থেকে আমি বাবার 'স্বপ্নাদেশ'কে পারলে এড়িয়েই চলি। যাক গে, সেবারে অনেক রাতে বাবা কোলহাপুর থেকে ফিরে এল, সঙ্গে চিনেবাদামের পয়সা। এবারে তাব 'স্বপ্নাদেশ' সত্যি সত্যি ফলে গেছে। প্রথমে দালাল টাকা দিতে রাজী হয় নি পরে বাবা তাকে শ্রী শ্রী দত্তাজী যে 'স্বপ্নাদেশ' দিয়েছেন সে কথা তুললে। দালালকে ওর দোকানে ঝোলানো দত্তাজীর ছবির দিব্যি কেটে চিনেবাদামের টাকা সত্যি পেয়েছে কিনা তাই জানাতে বললে। দালাল হেসে ফেলে বাবার 'স্বপ্নাদেশে'র খুব তারিফ নাকি করলে আর সেই সঙ্গে টাকাটাও দিয়ে দিলে। দালাল রোজ সকালে দত্তাজীর ছবিতে ধূপদীপ জ্বালিয়ে পুজো করে, সে কি করে দত্তাজীর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে মিথ্যে কথা বলবে? কিন্তু ফেরার সময় একটা মস্ত বড় ফাঁড়া গেছে।

চিনেবাদামের খালি বস্তাগুলো পাকিয়ে মাথায় তুলে পুরোনো কোটের পকেট সাবধানে সামলাতে সামলাতে বাবা দালালের দোকান থেকে মোটর স্ট্যান্ডে আসছিল। টাকা আনতে কোলহাপুরে বাবা যখনই যেত একটা পুরোনো মেঠো রঙের কোট পরত। সে কোট বানানো হয়েছে দশ পনের বছর তো হবেই। ভেতরের দিকে একটা পকেট আছে সেখানে টাকাকড়ি রেখে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বলে বাবা এ কোটটাই পরত। এ কোট পরে বাবাকে দেখাত ঠিক যেন কাকতাড়ুয়া। কনুই-এর দিকে ছেঁড়া এ কোট কিন্তু খুব মেজাজে পরেই বার হত। মাথায় খালি থলের বোঝা আর পরনে এ ধরনের কোট দেখে বুঝতে অসুবিধে হতো না যে বাবা একজন চাষী আর মাল বেচে টাকা নিয়ে ফিরছে। অন্তত একজন ঠগের এ অনুমান করতে যে অসুবিধে হয় নি তা এরপরে যা ঘটল তা থেকেই বোজা যাবে।

বাজারের সামনে দুদিক দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেছে বেগে। আখের গুড় তৈরী করার দিন এখন। ফসলেরও দিন। আর এ জন্যেই চাল, ডাল, গুড়, চিনেবাদামের এই আড়তে মাল ওঠানামা চলছে। অন্য জায়গা থেকে যে সব ব্যবসায়ীরা ট্রাকে এসেছে সে সব ট্রাকের লম্বা লাইন পড়েছে। এই হট্টগোলের ভেতর আবার গোবর কুড়োতে এসেছে কয়েকটি মেয়েছেলে। ওধারে বৌ ছেলেমেয়ের ভীড়। সেখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেখানে খোলা গুড় পড়ে আছে সেটা টিন দিয়ে একটু একটু করে চেঁছে নিচ্ছে, এমনি নয়ত চায়ের সঙ্গে খাবে। এদিক ওদিক চিনেবাদামের বস্তাতে দিচ্ছে আঙুল ঢুকিয়ে। ফুটো দিয়ে যা বাদাম বেরোল তা নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

এদের মধ্যে ভিখিরি, গোঁসাই এ ধরনেব লোকই বেশি। যে সব চাষীরা মালপত্তর নিয়ে এসেছে তাদের কাছ থেকে দুচার পয়সা মেগে নিয়ে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করে যাচ্ছে। আর মালপত্তর যা এসেছে সবই তো চাষীদের, ধনীদের তো নয়। গাড়িগুলোর আশেপাশে কুলীদের, মুটেদেরও খুব ভীড়। ফসলের সময় বলেই গোটা আড়তটাই লোকে লোকারণ্য, কেনাবেচার খুবই রমরমা।

চিনেবাদামের টাকা নিয়ে লোকের গুঁতোগুঁতি, ধাক্কা খেতে খেতে কোটের পকেটে টাকা সামলাতে সামলাতে শেষ পর্যন্ত মোটর স্ট্যান্ডে এসে পৌঁছল বাবা। বাজারের শেষদিকে মহাদেবের একটি ছোট্ট মন্দির, তার সামনে সারা গায়ে ভস্ম মাখা এক গোঁসাই। গোঁসাইকে দেখে বাবা মহাদেবকে নমস্কার করছে। এদিকে বাবাকে দেখে গোঁসাইও "জয় শঙ্কর জয় ভোলানাথ" হুঙ্কার দিয়েই বললে, "বাবাসাব তুই আজ এমনি এমনি চলে যাবি, শিউজিকে কিছু না দিয়েই? ভগবান আজ তোকে অনেক দিয়েছে, তাঁর নামে কিছু দান কর। দেবতার দেবতা হচ্ছেন মহাদেব, তাঁর কৃপা পড়েছে আজ তোর ওপর। তাঁকে মন দিয়ে প্রণাম কর বেটা।" বাবা একটু ধর্মভীরু মানুষ, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে গেল। বললে, "এই তো তোমার সামনেই প্রণাম করছি।" পায়ের চটি পাশে খুলে রেখে মাথার খালি থলেগুলো নামালে আর মন্দিরের চৌকাঠ ছুঁয়ে প্রণাম করলে। তারপর ভেতরের পকেট থেকে টাকাভর্তি থলেটা বাইরে এনে তা থেকে এক আনা পয়সা বার করে গোঁসাইর হাতে দিয়ে বললে, "এই নাও।" গোঁসাই বলে, "ওরে বেটা, আমি আমার জন্য মোটেই ভাবছি না, আমাকে তো ঠাকুর দিয়েছে দু'হাতে। আমার ভাবনা তো তোকে নিয়ে। দেবতার কাছে বোস না এক দণ্ড। সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়েছিস। বোস, তোর সাথে দুটো কথা বলি।"

ততক্ষণে বাবা গোঁসাইকে স্বয়ং দেবতাই ভাবতে লেগেছে। রাতে যে স্বপ্নাদেশ দেখেছে সেটা তার চোখে আবাব ভেসে উঠল, স্বপ্নের কথাগুলো মনে পড়তে লাগল। সে যেন এক গোঁসাইকেই দেখেছিল স্বপ্নে, সে যেন কিছু বলেওছিল। বাবা শেষ পর্যন্ত মন্দিরের দাওয়াতে বসেই পড়লে।

"পরমেশ্বর তোকে আজ অঢেল দেবে। যে লক্ষ্মী আজ তুই পেয়েছিস তা থেকে ঠাকুরকে দে।"

বাবা আবার সেই টাকার থলে থেকে চার আনা বার করে রাখলে দেবতার সামনে।

"এটা তুলে পকেটে ঢোকা। ঠাকুর তোর এক পয়সাও চায় না। আমাকে যে এক আনাটা দিয়েছিস সেটাও তুলে নে। আমাকে ঠাকুর দু'হাতে ঢেলে দেন। আমার ভাবনা তো তোকে নিয়ে। তোর আসল লক্ষ্মী কিন্তু তুই দেখাস নি আমাকে, নকলি লক্ষ্মী দেখিয়েছিস। আজ তুই অনেক পেয়েছিস ঠাকুরের কাছ থেকে, দেখিস ঠাকুর তোর এক টাকাকে দু'টাকা করে দেবেন।"

বাবা হতভম্ব! "তার মানে?" বাবা বেচারা মনে করেছে সে একটা কিছু অন্যায় করে ফেলেছে।

গোঁসাই একটু মিষ্টি হাসি হেসে বললে, "বেটা, আজ পরমেশ্বর তোকে ঢেলে লক্ষ্মী দিয়েছে কি দেয় নি?"

"হ্যাঁ, দিয়েছে।"

"ঠাকুরের ইচ্ছে তা তিনি দ্বিগুণ করবেন। তাঁকে দেখালেই তো হয়। তিনি কি ফের কেড়ে নেবেন তোর কাছ থেকে?"

"তা বটে।"

"ঠাকুরের সামনে টাকাটা রাখ। আমি ঠাকুরের প্রসাদ রাখছি তার ওপর, তাতে ভস্ম বেঁধে দেব। তারপর তোর লক্ষ্মী তুই ঘরে নিয়ে যা, দেখবি তিনদিনে সেটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আজ ঠাকুর তোকে জব্বর কৃপা করেছেন, তোর পাত্রটা উল্টে রাখিস না তাহলে তুইই ঠকাবি, ঠাকুরের কৃপা নিয়ে নে।"

"বলছেন ?" বাবা সাহস করে টাকার থলেটা বার করল এবার। তারপর ভক্তিভরে দশ টাকার সব ক'টা নোট—মোটমাট দুশ চল্লিশ টাকা বার করে ভক্তিভরে তা দেবতার চৌকাঠে রেখে দিলে।

"মিথ্যে বলব না, ঠাকুর আমাকে এই দিয়েছেন। এর ওপর তোমার ভস্ম লাগিয়ে দাও।"

"জয় শঙ্কর, জয় ভোলানাথ" বলে গোঁসাই বাবা তার নিজস্ব ভাষায় কি সব বিড়বিড় করে টাকার ওপর ভস্ম ছড়ালে। বাবার কপালেও ভস্ম মাখিয়ে দিলে।

"এই তোর লক্ষ্মী আর এই আমার ভস্ম, আমি মন্ত্র পড়ে দিলুম। এসব তোর ঘরে যে ঠাকুর আছে তার সামনে রাখবি, আর তারপর খরচ করিস। তিন দিনের ভেতর এ টাকা যদি দ্বিগুণ না হয়, তবে এ মন্দিরে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবি। আমি মহাদেবের সেবা করেছি সারা জীবন ধরে।"

বাবা টাকা পয়সা চৌকাঠের ওপর রেখে গোঁসাইজীর কথা শুনতে লাগল মন দিয়ে। পয়সা আছে চোখের সামনেই, তাই বাবার চিন্তা নেই তেমন। গোঁসাই তার ঝুলি থেকে একখানা সাদা কাগজ বার করে একটা পেনসিলও বার করলে। কাগজে একটা গোল মতো এঁকে তার বাইরে একটা চৌকো, চার পাশে কতকগুলো দাগ কাটলে। তারপর কাটাকুটি করলে বিস্তর আর বিড়বিড়ও করল অনেকক্ষণ। খানিক পরে কাগজটা বাবাকে দিয়ে মনে মনে ঠাকুরের নাম নিতে নিতে দু হাতে কাগজটা ধরতে বলে ওতে টাকাটা রাখতে বললে। একটা বিশেষভাবে ভাঁজ হবে কাগজটা আর তেমনি বিশেষভাবে টাকাটাও তাতে রাখতে হবে গোঁসাই বাবাকে বলে দিলে। এরপর মন্দিরের গহ্বরে গিয়ে একটি পাঁচরঙা সুতো দিয়ে শক্ত করে বাঁধল। মন্দিরের আবছা আলোতে টাকার সে বাণ্ডিল গোঁসাই বাবার চোখের সামনে নিমেষে মন্ত্র পড়ে মহাদেবের লিঙ্গের চারধারে ঘোরালে তারপর বাবার হাতে তুলে দিলে। মন্দিরের গহ্বরে যা হল তা বাইরে থেকে আবছা আলোয় যতটুকু দেখা যায় বাবা তাই দেখছে। বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে আছে এই ছোট্ট মন্দির থেকে টাকা নিয়ে আর যাইহোক পালাতে তো আর পারবে না গোঁসাই। তাই বাবা গোঁসাইর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে।

"এই নে, তোর লক্ষ্মী তুই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে নিয়ে যা। ঠাকুর তোকে দু'হাতে উপচে দেবেন।"

বাবা শ্রদ্ধাভক্তিতে ঘাড় নাড়লে। টাকা পকেটে রেখে বাবা দেবতাকে প্রণাম করে উঠে পড়ে বস্তাগুলো মাথায় নিয়ে হাঁটা দিলে।

"জয় শঙ্কর, জয় ভোলানাথ," পেছন থেকে গোঁসাই-এর জয়ধ্বনি কানে এল। বাবা পিছু ফিরে একবার গোঁসাইর দিকে তাকাল। গোঁসাইর মুখে আবার সেই মিষ্টি মধুর হাসি। বাবা এগিয়ে গেল। মোড়েই খাবার দোকান, হোটেল। সেখানে চা খেয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে যাবে মনে করে দোকানে ঢুকল। ভেতরে গিয়ে সুতোয় বাঁধা টাকার বাণ্ডিলটা বের করে আলতোভাবে হাত বোলানো। বাবার কেমন সন্দেহ হল, কাগজ সাদা হলেও একটু যেন ময়লা ময়লা, তাছাড়া ভেতরে টাকার ভাঁজটা, যেমন পুরু মনে হয়েছিল এখন তেমন পুরু তো আর লাগছে না। বাবার মনে কি হল, ওপরের কাগজ একটু ছিঁড়ে ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখে ভেতরে টাকা নেই। একটা ভীষণ ধাক্কা খেল মনে। বস্তাগুলো বগলে করে তড়াক করে উঠে পড়ে বেরিয়ে এসেই মন্দির পানে তাকালে। গোঁসাই ততক্ষণে উঠে হাঁটতে লেগে গেছে, দশ পনের পা মন্দির থেকে এগিয়েও গেছে। গোঁসাইকে দেখে বাবা চিৎকার জুড়ে দিলে "চোর, চোর ধর, গোঁসাইকে ধর, আমার সব টাকা চুরি করে নিয়েছে।" বাবা চিৎকার করছে আর গোঁসাইর পিছু পিছু ছুটছে।

গোঁসাই চাল ডালের আড়তের ভীড়ে মিশে যেতে চাইলে, বুঝেছে ছুটতে গেলে লোকে ধরে ফেলবে। বাবা কিন্তু ঠিক ওকে পাকড়াও করেছে।

লোকজন গোঁসাইকে ধরে বেদম মার লাগালে, ঝুলি থেকে টাকার বাণ্ডিলটা বার করে বাবাব হাতে দিল। সুতো কেটে ভেতরের টাকা বার করে চব্বিশটা নোট বার করে দেখা হল ঠিকঠাক আছে কিনা। গোঁসাইকে এরপর আড়তের পুলিশ চৌকিতে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হল। এত সব কাণ্ডকারখানার পর বাবা যখন কাগলে ফিরত তখন দিন গড়িয়ে গেছে। আমরা সবাই মাঠেই ছিলুম, বাবা সোজা সেখানেই এসে সারাদিন যা যা ঘটেছে সব বলে গেল। আমরা ছেলেমেয়েরা খুব হেসে উঠলুম। মা বাবাব এই বোকামির বহর দেখে রেগে লাল, "সারা বছর আমার ছেলেমেয়েদের হাড়ভাঙা খাটুনির পর যেটুকু পয়সা আসছিল তাও আজ তোমার বোকামিতে জলেই যেত। যেখানে যত গোঁসাই ভিখিরি আছে তুমি তো তাদের সবাইকে দত্তাঠাকুর মনে কুব কিনা। কোনদিন দেখব রাস্তার মানুষকে ঘরে ঢুকিয়ে সংসারটাকে রসাতলে দিয়েছ।"

"দুর্বুদ্ধিটা আমার পথে হাঁটতে হাঁটতে এল কিনা। মন্দিরের সামনে মাথা হেঁট করে প্রণাম করে আসছিলুম এমন সময় গোঁসাইকে দেখে তার খপ্পরে পড়ে গেলুম। তবে হোটেলে গিয়ে টাকার পুঁটলিটা খুলে দেখবার বুদ্ধিটাও ঠাকুর দিয়ে দিলেন তাই রক্ষে। গোঁসাই বাবাজীকেও মন্দিরের ভেতর কিছুক্ষণ রেখে তারপর আড়তের মধ্যে ঢুকে পড়ার দুর্বুদ্ধিটাও ঠাকুরই দিয়ে দিলেন কিনা আর সেজন্যই তো ওকে ধরতে পারা গেল। পুলিশের জিম্মায় পড়ে সে বোকা বনে গেল। এখন থাকুক সরকারি খাঁচায় কিছুদিন," বাবা বললে।

এরপর দুদিন ধরে বাবা শুধু এ ঘটনাটা নিয়েই ভাবতে বসে গেল। নানা কথা ভাবছে, গোঁসাইর সঙ্গে কাল্পনিক ঝগড়া করছে, আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে।

সবাই একসাথে খেতে বসলে বাবা আবার ঘটনাটির খুঁটিনাটি বর্ণনা দিত। "ভুলটা আমারই হয়েছে। ঠাকুরকে পেন্নাম করে বেশ এগিয়েই যাচ্ছিলুম, চলে গেলেই হতো। গোঁসাই যখন মন্দিরের গহ্বরে গেল তখন ওর হাতের দিকে আমার লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। তখুনি কাগজের ভাঁজটা খুলে দেখলেই ধরা পড়ে যেত। হারামজাদা। ঠাকুরের নামে কিনা গাঁয়ের লোকদের ঠকাচ্ছিস বলে তখুনি ওখানেই ওকে পেটানোর দরকার ছিল।" আরো কত কি যে বাবা বলত। তারপর এরকম ঘটনা আবার ঘটলে বাবা কি করবে তাও বলত। এ ক'দিন বাবা অন্য কোনো কিছু নিয়ে ভাবতেই পারছে না, খালি এটা নিয়েই ভেবে যাচ্ছিল।

এরপর সাত আট দিন কেটে গেল। বাবা মাঠে আছে। ভোরবেলায় বাবার চা নিয়ে আমি মাঠে গেলুম। বাবা চা খেতে খেতে বললে, "আন্দ্যা, আমি একটু গাঁয়ের দিকে যাচ্ছি, তুই শিবাকে নিয়ে মাঠে জল ছাড়। রাতে আমি "আদেশ" পেয়েছি। আপ্পা আমায় বললেন, 'তোর ঘরে চোর ঢুকেছে।' হ্যাঁরে, রাতে কোন বিপদ হয় নি তো?'

"কই না তো, হলে তো আমি বলতুমই।"

"ঘরের আলমারিতে চিনে বাদামের টাকাটা আছে। ওটা খোপের ভেতর আছে কিনা দেখে আসি তো," বলেই বাবা গাঁয়ের দিকে হাঁটা দিল। রাতের গোবর তেমনি পড়ে আছে, আমি তা গোছালুম, গোরুমোষদের খেতেও দিলুম। কাপড় কাচা পড়ে ছিল, শিবার জন্যে অপেক্ষা করে করে শেষে তাও কেচে ফেললুম।

একটু পরে শিবা সকালের খাবার নিয়ে মাঠে এল।

"দেরী করলি যে?" আমি জিজ্ঞেস করলুম।

"বস্তায় জোয়ার ভরছিলুম।"

"ভরা হল?"

"হ্যাঁ ভরেই তো এলুম।"

"বাবার টাকা খোপে আছে তো?"

"হ্যাঁ আছে।"

"এরই মধ্যে বস্তায় জোয়ার ভরতে হল কেন?"

"ঘরে জোয়ার ছড়ানো ছিল, তারপর চিনেবাদামের খালি বস্তাগুলো সবে ফিরেছে। বাবা বলল বস্তাগুলোতে জোয়ার ভরে রাখ। আমি আর ধোণ্ডু ভরে ফেললুম।"

"বাবা এল না কেন?"

"মার সঙ্গে ঝগড়া করছে। সেটা শেষ করতে হবে না? ঘণ্টাখানেক পর আসবে'খন। ততক্ষণ আমাদের মাঠে জল ছেড়ে যেতে বলে দিয়েছে।" শিবাকে জলের দিকে যেতে বলেছে তাই বাবার ওপর ও ভীষণ চটে আছে বোঝা গেল। আমি ওটা এড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "ঝগড়াটা শুরু হল কি নিয়ে?"

"জোয়ার নিয়ে। বস্তা ভরে বাবা মাকে বললে, 'জোয়ারের বস্তা একটা কম কেন? ছ'টা বস্তা এনে দিয়েছিলুম, অন্তত পাঁচটা বস্তা ভরে গেলে ঠিক হত।"

"তা, ক'টা বস্তা ভরল?"

"মোটে চারটে ভরল।"

"মা তো সারা মাস ওখান থেকেই জোয়ার নিয়ে ভাঙিয়েছে।"

"মা তাই বলল। তাও বাবা বললে, বেশ তো ধরে নিচ্ছি আধবস্তাই না হয় তোমরা খেলে, তাহলেও বাকি আধবস্তা তো কম হল। মা বলছে ছ'টা বস্তা ছিল না; বাবা বলছে বড় বস্তার সব ক'টায় জোয়ার ছিল। বস্তার মুখ সেলাই করলে পাঁচটা বস্তাই হত। এই নিয়ে বাবা মা দুজনে ঝগড়া শুরু করে দিলে।"

আমরা দুজনে খেতে জল দিচ্ছি এমন সময় বাবা আর মা দুজনে একই সঙ্গে চলে এল মাঠে। এসেই ওরা দুজনে আমায় ধরলে আমি নাকি জোয়ার সরিয়ে সরিয়ে লুকিয়ে বেচে দিয়েছি। আমি ভাবলুম আমি তো কোনদিন বাড়ির কোন জিনিস বেচি নি এভাবে। আমরা যখন গোটা বাড়িটাই মাঠে চলে এসেছিলুম তখন কখনো আমি কখনো বাবা গাঁয়ের বাড়িতে যেতুম রাতে শুতে। মা বাবা দুজনেই ভাবছে আমি জোয়ার লুকিয়ে বেচে দিয়েছি। মা তো খোলাখুলিভাবে বলেই ফেললে, "আন্দু, তুই তোর স্কুলের মাইনে জমা দিতে গিয়ে নিশ্চয়ই জোয়ার বেচে দিয়েছিস। তাই যদি না হবে তা হলে মাস্টার তোকে পরীক্ষায় বসতে দেয় কখনো? ওই হতভাগা বাবুর সঙ্গদোষে শেষ পর্যন্ত তুইও চোর হলি? সত্যি কথা বলতো, রাতে যখন শুতে যেতিস তখন বাবুকে কতটা জোয়ার বেচে দিয়েচিস?"

"তোমরা কি পাগল হলে? এই দেবীর দিব্যি নিয়ে বলছি জোয়ারের একটা দানাও আমি বেচে দিই নি।"

"তাহলে মাস্টারের দশ পনের টাকা তুই কোথা থেকে দিলি?"

"সনগরদের আবাজী আমায় মদত করেছে। রোজ রাতে গিয়ে আমি ওকে পড়াতুম, তাই থেকে আমার মাইনের টাকা উঠে আসত।"

"ওরে হতভাগা, ওর কাছে অত টাকা আছে যে সে তোকে দেবে? সত্যি করে বল কতটা জোয়ার বেচেছিস," ব'লে বাবা আমার বগল ধরে টেনে গালে মারলে এক চড়।

"আমি একটা দানাও বেচি নি। বিশ্বাস না হয় যাও না আবাজীকে জিজ্ঞেস কর না গিয়ে," গালে হাত বোলাতে বোলাতে আমি বললুম। কিন্তু বাবা কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করবে না। খালি ভাবছে আমি ওকে বানিয়ে বানিয়ে কেবল মিছে কথাই বলে যাচ্ছি। সেদিন বাবার হাতে খুব মার খেলুম। পায়ের চটি খুলে মাঠের কুঁড়েঘরটার সামনে বেদম পেটালে, নাকে লাথি মেরে রক্ত বার করে দিলে। যখন রক্ত গলগল করে পড়তে লাগল তখন বাবার রাগ একটু পড়ল, মারটা থামল। মা আমাকে নীচে থেকে টেনে বার করে বলল, "যা না হতচ্ছাড়া, পালিয়ে যা না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর কত মার খাবি?"

মাঠের শেষ কোণায় গিয়ে রক্তমাখা মুখটা জলে ধুলুম। তারপর সেখানেই বসে পড়লুম। বাবা তখনও রাগে গজরাচ্ছে ঘরেতে বসে, আর নোংরা সব গাল দিয়ে যাচ্ছে। মাকেও মাঝে সাঝে তার ভাগ দিচ্ছে, "তুই হারামজাদী, ছেলেকে সময় থাকতে শাসন করিস নি, চুরি করতে সায় ছিল তোর।" বাবার গালাগাল আর মার জবাব

শুনে আমি বুঝলুম যে দেয়ালীর ছুটির সময়কার সেই চুরির ব্যাপারটা মা বাবাকে বলেছে। সে চুরির টাকা স্কুলের ফিস আর সিনেমার পয়সা দিতে গিয়ে কুলোয় নি তাই ঘরের জোয়ার বেচে দিয়েছে। দুজনে এটাই ভেবে নিয়েছে। এঘটনাটায় বাবাকে আরও বেশি রাগিয়ে দিয়েছে। স্কুলের ফিস যে বাকি পড়েছে তাতো আমি বাড়িতে জানতেই দিই নি। যাক গে আমার মনে হল আশেপাশের খেত থেকে ঘাসটা, ধান গাছের আগাছাগুলো, এখানকার সেখানকার ডালপাতা কেটে যে বেচেছি তা মা জেনেও বাবাকে বলে নি। অবশ্য আবাজী যে আমাকে টাকা দিয়েছে মা সেটা জানে না। ওরা ভাবছে বাবার মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যই বানিয়ে বানিয়ে আমি এসব বলছি। তাই বাবা আরও খেপে গেছে, "কাল ছোঁড়া যদি ডাকাতি করে তাহলে আমার মানটা কোথায় থাকবে?" এই ব'লে বাবা মার দিকে ছুটে গিয়ে মার গালেও একটা চড় বসিয়ে দিলে। পরের একটা মাস এর জের চলল। থেকে থেকেই আমি গাল খাই, মাথা উঁচু করে কথা বলার সাহসই আমার ছিল না। সত্যি তো, আমি আশেপাশের অঞ্চল থেকে চার-পাঁচ বার চুরি করেছিই তো, সেটা তো আর মিথ্যে নয়। লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। আমি একেবারে কুঁচকে গেলুম। এর পরেও গালাগাল যাতে বেশি না খেতে হয় তার জন্য কষে কাজ করছি, খাটছি। যাতে বাবার কষ্ট খানিকটা কমে। বাবার সেই কথাটা "এর পর ডাকাতি করলে আমার মান থাকবে?" আমাকে যেন সেই মুহূর্তে সাপে ছোবল মারলে। কথাটা মনে গিয়ে এমন ধাক্কা মারলে। গল্পের সেই ডাকাতের কথাটা মনে পড়ে গেল, ফাঁসিতে ঝোলার আগে তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করতে গিয়ে মার কান কামড়ে বলেছিল সময়মত শাসন করলে আমার এরকমটি তো হত না। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, সত্যি তো আমার এ অভ্যেস বাড়তে থাকলে তো লেখাপড়া শিখেও কোনো লাভ হবে না, আমি সত্যিকারের ডাকাতই হয়ে যাব। গাঁয়ে এ কথা সবাই জানতে পারলে কোন্ মাস্টারমশায় আমায় ক্লাসে ঢুকতে দেবেন? সিনেমা না দেখে, হোটেলে না খেয়েও মানুষ বেঁচে থাকে। আর স্কুলের ফিস? ফিস আর বই কেনার পয়সা অন্যভাবে রোজগার করতে হবে। ঠাকুরের কাছে কেঁদে বললুম, আমায় মাপ করে দাও, চুরি করে আমি খুব ভুল করেছি আর কখখনো চুরি করব না। আমি যে চোর কেউ যেন তা জানতে না পারে, ঠাকুর। আমার একটা চোখ খুঁচিয়ে দাও, একটা চোখেই না হয় বেঁচে থাকব। গাছতলায় একা একা বসে খুব কাঁদলুম আর ঠাকুরের কাছে এই প্রার্থনা জানালুম। নিজের হাতেই নিজের মুখে দু তিনবার চড়-চাপড় লাগালুম, চোখে দুতিন ঘুঁসি মারলুম, অনেকটা সিনেমায় চোর ডাকাতরা যেমন মারে। নিজের চেহারা নিজেই দেখে সামনে যেন একটা ডাকাত দেখলুম মনে হল আর ভীষণ ভয়ও পেলুম।

সেদিন থেকে আর চুরি করিনি। বাবার স্বপ্নাদেশে আমার বিশ্বাস এসে গেল। ঘরে চোর ঢুকেছে বাবার এ স্বপ্ন তো তাহলে মিথ্যে নয়। তামাকের চারা চুরির খবরও বাবার কানে গেছে। আমাকে নিয়ে বাবাকে আরেকটা ভাল স্বপ্ন ঠাকুর যেন দেখান মনে মনে ঠাকুরের কাছে এ প্রার্থনাই জানালুম।

সাত

মাস দেড়েক পরের কথা। গাঁয়ে বিয়ের মরশুম। গলির বৌঝিরা যে যার মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন কতে লাগল। মাও যেত নেমন্তন্ন রক্ষা করতে, কাছাকাছি যারা ছিল তাদের আইবুড়ো ভাতও দিত। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগে মেয়েগুলো নতুন শাড়ি ব্লাউজ প'রে, পায়ে মল বেঁধে, আঙুলে চুটকি লাগিয়ে মাকে এসে একে একে পেন্নাম করে যেত আর মারও চিন্তায় মুখ শুকিয়ে যেত। ঘরে একটা নয়, দুটো নয় পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে, তিনটি তো মরেই গেছে। হীরার বিয়ে হয়েছে দু আড়াই বছর হবে, হীরা বাপের বাড়িতেই পড়ে আছে, শ্বশুরবাড়ি যায়নি, স্বামীর মন পায় নি। এখন থেকে বাকী জীবনটা হীরাকে এভাবেই রাখতে হবে এখানে। ঝগড়াঝাটি হোক, তাতে দোষ নেই সব বাড়িতেই হয়, কিন্তু কোলে দুটো একটা বাচ্ছা এলেও তো হত। মেয়ের জন্ম সার্থক হত। যেমন করেই হোক স্বামীর ঘর হীরাকে করতেই হবে, আপনিই তখন ছেলেপুলে হবে। আজ নয় কাল, ছেলে পেটে ধরার মতো সেয়ানা সে হবেই, তখন ওর রূপই খুলে যাবে, কলাগাছের মতো কেমন তরতর বেড়ে যাবে তখন। তখন স্বামীর মন পেতে দেরী হবে না। বুঝিয়ে সুঝিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে হীরাকে স্বামীর ঘরে পাঠাতেই হবে, এসবই মা ভাবছে। এখনও চার-চারটি মেয়ের বিয়ে বাকি। এরপর আরও কত মেয়ে জন্মাবে কে জানে, চিন্তায় চিন্তায় মার মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে।

রাতে বাবা আর আমি খেতে বসেছি। মা ভাখরি সেঁকছে তাওয়াতে আর বেড়ে দিচ্ছে আমাদের। কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বলল, "দেড়বছরের ওপর হয়ে গেল হীরার শ্বশুর বাড়ীর কেউ এদিক মাড়ায় নি। গোড়াব দিকে বছরখানেক তাও যাওয়া-আসা ছিল, তারপর তো তাও বন্ধ হয়ে গেল, কোন সাড়াশব্দই নেই। ওপক্ষও চুপ, এপক্ষও চুপ।"

"তা, কি করতে বলিস?"

"ওকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা তো একটা করতে হবে, না কি?"

"ছেলেটিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে না? তার ওপর ঐ হারামজাদী বাপ মারা যাবার পর ওর সংসারে ঢুকেছে এসে, তারও হাতে-পায়ে ধরতে হবে।" 'হারামজাদী' হল গিয়ে হীরার বড় ননদ সমা। ওর বিয়ে কাছে পিঠেই কোথাও হয়েছিল। এই দিদি তার পুরো সংসার নিয়ে ভায়ের সংসারে এসে ভর করেছে। দিদি হয়ে লাভ হয়েছে এই, আস্তে আস্তে সুবিধে করে ও এ সংসারটার কর্ত্রী হয়ে গেছে। পাড়ায় তাকে সবাই মুখরা বলেই জানে। ভায়ের সংসারে আসার ছ'মাসের ভেতরেই হীরাকে সে বাপের বাড়ী চালান করে দিয়েছে। সমা মা-বোনেদের পুরুষদের মতন করেই গালমন্দ করত। শঙ্করের বাপ-মা চোখ বোজার পর এই দিদি আর ওর মরদ শঙ্করের দেখাশোনার ভার নিয়েছে। দিদি ঘরে এসেই কিভাবে ওকে শাসন করত হীরা মাঝে

মাঝেই এসে তা বলত। গাঁয়ের পশ্চিম দিকে একটা নালা ছিল, বর্ষায় সে নালায় ভীষণ স্রোত হত আর জল বয়ে যেত সর্বক্ষণ। ঐ নালার দিকে যেতে গেলে দু আড়াই ফার্লং কাল মাটির জমি পেরিয়ে যেতে হবে, সেখানে যেমন ঝোপ ঝাড় তেমনি কাদা থাকত হাঁটু অবধি আর পেছলও তেমনি। ছেলেছোকরা বা জোয়ান পুরুষেরাই এ পিছল কাদায় হাঁটতে গেলে তাল সামলাতে পারত না, পড়ে যেত। এই ঝোপঝাড় কাটিয়ে আর ঐ নালা ডিঙিয়ে তবে শঙ্করের চাষের জমিতে আসা যেত। শঙ্কর দেওয়ানের কাছে জমি নিয়েছে, ভাগে ভাষ করে। বর্ষায় এখানে পুরুষ মানুষ ছাড়া কেউ আসতেই পারত না। আর সমা এইরকম বর্ষাতেই হীরাকে এখানে শঙ্করের খাবার দিয়ে পাঠাত, “যা তোর মরদের জলখাবার তুই-ই বয়ে নিয়ে যা।” হীরা চুপ করে মেনে নিত, মুখে মুখে জবাবও দিতে পারত না। কাঁদতে কাঁদতে একে ওকে ধরে কোনমতে ভাখরি পৌঁছে দিত। কখনো কখনো ঐ কাদায় পা হড়কে পড়ে যে যায়নি তা নয়, তখন শুকনো ভেজা যা খাবার ওর সঙ্গে থাকত, ওর সাথে সাথে সেগুলোও পড়ে যেত। শঙ্কর কেবল রাগই করত, কিন্তু এ ননদ তার পিঠে ঘা কতক লাগিয়েও দিত। এমনিতেই ভীষণ রোগাটে আর কমজোরি, তার ওপর বর্ষার এ জলকাদায় হেঁটে হেঁটে ওর শরীর আরও ফুলে ফুলে উঠল। এখানেই শেষ নয়। ভোর হতে না হতেই ওর ননদ ওকে যাঁতায় জোয়ার পিষতে বসিয়ে দিত, “তোর আর তোর মরদের জন্যে এগুলো পিষগে যা।” ওটা যেই শেষ হল অমনি মোষ দুটোর গোবর ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার কববার হুকুম হত। গোয়ালঘর পরিষ্কার হলে সমা ঢুকবে গোয়ালে দুধ দোয়াতে। দুধ দোয়ান হয়ে গেলে সে দুধ বেচতে চলে যেত, এখানে সেখানে গল্প করে ফিরত সেই তিনচাব ঘণ্টা পরে। তখন খাবার সময়। এসেই তাড়া মারত, “হয়েছে, ভাখরি হয়েছে?” গোবর ঘেঁটে জোয়ার পিষে হীরার দুর্বল শরীরে তখন আর কিছু নেই, যতটা তাকত থাকত তাতে আস্তে আস্তে ভাখরি করে যেত, আর তাই দেখে ঐ ননদ ওকে পেটাত। হীরাব মরদ মাঠে খেটে মরত আর সমার মরদ ছিল গোরুর মতো শান্ত নিরীহ। যেখানে কাজ পেত সেখানেই চলে যেত। শঙ্করের ঘরে খাবার লোক মাত্র দুটি, কাজেই সমার সোয়ামী এখন একটু সুখের মুখ দেখতে লেগেছে, বৌয়ের খাতিরে ঘরে বসে বসে খাচ্ছে আর দিন দিন কুঁড়ে হয়ে যাচ্ছে। বসে বসে খাওয়াচ্ছে দেখে ও আর বৌকে কিছু বলত না, ওর মোড়লি মেনে নিয়ে সয়ে যেত, ওর ওপর কথা বলত না। তাছাড়া সমা ছিল ভীষণ বদরাগী ও যেন সবসময় হাতে একটা বঁটি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সমার মরদ তাই ভেজা বেড়ালের মতোই নরম হয়ে থাকত। তবে বৌ বেরিয়ে গেলে ও হীরার কাজে সাহায্য করত, বলত, “তুই ভাখরি করতে থাক আমি গোয়ালঘরে গোবরটা পরিষ্কার করে দিই।” সমা দুপুরে হীরাকে দিয়ে ছুঁচোর গর্তগুলো বন্ধ করতে দেখে ও আগে-ভাগে তাও করে রাখত। হীরাকে মারধোর করতে করতে যখন সমা বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলত তখন সেই হীরাকে ঐ ডাইনীর হাত থেকে বাঁচাত। এ সংসারে সমার-ঐ মরদাটাই হীরার যা একটু আশাভরসা, মাকে এসে হীরা এসব বলত। মা হীরাকে এসব কথা শঙ্করকে জানাতে পরামর্শ দিত। “ওতে কোনো লাভ নেই,” হীরা বলত,

"ওতো দিদিকে কিছু বলে না। দিদি ওকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। ওকে বলে, ঐ রুগ্ন পচাটাকে বিয়ে করেছিস কেন? যেখান থেকে এনেছিস সেখানেই ফেলে রেখে আয়। তোর আবার মেয়ের অভাব? পঞ্চাশটা মেয়ে তোর দোরগোড়ায় এনে বেঁধে দিচ্ছি, তুই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখ। একজনের থেকে আরেকজন বেশি সুন্দর এমন মেয়ে। এই মাগীকে পাঠিয়ে দে ওর বাপের কাছে— সমা তো খালি এ সব কথাই বলে।" মা হীরাকে জিজ্ঞেস করে, "শঙ্কর এসব কথায় আপত্তি করে না?" হীরা জানায় শঙ্কর কোনো কথাই বলে না, সমার সামনে মুখই খোলে না। কেবল গুম হয়ে বসে থাকে। হীরার সঙ্গেও একটা কথা বলেনি এ পর্যন্ত। মা হীরাকে সান্ত্বনা দেয়, "তুই কিছু ভাবিস না, আস্তে আস্তে শঙ্কর ঠিকই বুঝবে ঐ ডাইনী ওর সব খেয়ে নিচ্ছে।"

হীরা শঙ্করকে চিনে ফেলেছে তাই ঐ সান্ত্বনা ওর কোনো কাজে লাগে না। সে বলে, "ও কিছুই বুঝবে না, দিদি অন্তপ্রাণ। বাবা নয়তো তুমি যদি ডাইনীটাকে টেনে বার করে দিতে পারতে তবে ঐ সংসারটা বেঁচে যেত। তা নইলে নয়।"

"দেখি, একটা বছর যাক। কষ্ট করে একটা বছর ওর নাচন-কোদন সয়ে যা। ছেলের বাপ সবে মরেছে। এখনই বোনের সঙ্গে ঝগড়া করলে পাড়ার লোক সেটা ভাল চোখে দেখবে না," মা ধীর স্থিরভাবে হীরাকে বুদ্ধি দেয়।

দেয়ালীর সময় হীরার শরীর ভীষণ ফুলে গেল, ভাল করে নিশ্বাসও নিতে পারছিল না, উঠতে বসতেই হাঁপিয়ে যেত। একটু হাঁটার পরই থপ করে বসে পড়ত। তবুও এরই মধ্যে সমা ওকে খাটিয়ে মারছিল। গলিটা ভেজা, বর্ষায় মাটি ঠাণ্ডা, মেঝেটা সেঁতসেঁতে। এরকম জায়গায় একটা বস্তা পেতে আর গায়ে একটা কাঁথা জড়িয়ে দিন কাটাতে হ'ত। দেয়ালীর যখন আর মাত্র আট দিন বাকি, তখন হীরা মাথায় একটা পুঁটলি বেঁধে আমাদের বাড়িতে ফিরে এল। মা জিজ্ঞেস করলে, "কি হল?" হীরা বললে, "ওর ননদ আর মরদ বলেছে, 'দেয়ালী এসে গেছে, বাপের বাড়ি যা, আর এবারে পুরোপুরি সেরে তবেই আসবি। না হয় আমরাই যাব তোকে নিয়ে আসতে'।"

হীরাকে আর কেউ নিতে আসে নি। মা যখন খোঁজখবর নিতে যায় তখন মার সঙ্গে ঠিকমত কেউ কথা বলে না। আমরা সবাই বুঝে গেলুম শ্বশুরবাড়িতে ওকে নিয়ে যাবার ওদের মোটেই ইচ্ছে নেই। ওরা ওকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলতে চায়। তাই তো ওরা ওকে অসুস্থ করে একেবারে মরণাপন্ন অবস্থায় আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এতদিন অবধি মন শক্ত করে মা নিজের সংসারে হীরাকে রেখেছিল। এখন হীরার শরীর খানিকটা সেরে উঠেছে দেখে মা ভাবছে হীরা আবার ঘর সংসার করুক। তাই হীরার কথাটা আস্তে আস্তে বাবার কাছে মা পাড়লে।

"ওর ব্যাপার তুই নিজেই ভাবগে যা," বাবা রেগেছে, "তুই হারামজাদী, আমার কথা না শুনে ঐ মালীদের গলিতে গিয়ে মেয়েটাকে ও-বাড়িতে বিয়ে দিলি। মরলেও তুই হারামজাদী বাপের বাড়ির মায়া ছাড়তে পারিবি না। এবার ঠেলা সামলা। বিয়েটা মানা করেছিলুম, তাইতে মুখ গোমড়া করে সনগাঁরদের বাড়িতে গিয়ে বসে রইলি।" মাকে গাল দিতে দিতে কোনরকম খাওয়া শেষ করে বাবা মুখ ধুতে উঠে পড়ল।

মা বেচারার কথা বলার মুখ নেই আর।

সন্ধেবেলা ছোটমামা এল মার সঙ্গে দেখা করতে। ওকে মা বললে, "লিঙ্গাপ্পা, হীরা তো এবারে একটু সেরেছে। আর মাস ছয় কি বছরখানেক পর ও সেয়ানা হয়ে যাবে। এখন তো ওকে ওর শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবার একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হয়। তোর পাড়ায়ই তো ওর বাড়ি। তোর মালিকের নতুন জমিটার কাছেই তো ওদেরও চাষের জমি। ওর একটা গতি করে দে না ভাইটি আমার। যেতে আসতে ধর একবার শঙ্করকে।" ভেতরে একটা রাগ চাপা ছিল মামার, এবার সেটা ফেটে বেরোল, বললে, "এই রুগ্ন হীরু যে নাকি রোজ বস্তা বস্তা মাটি খেত ওর ভালমন্দের চিন্তা এতদিনে তোমার হল? তোমার বড় মেয়ে তো সোনার প্রতিমা ছিল তার ভালমন্দের চিন্তাও তো তোমার হয় নি, ওকে তো জলেই ফেলে দিয়ে, ওর সর্বনাশ করে ছাড়লে। আমার সংসারটাও ছারখার করে দিলে, আমার জীবনটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সে ছাই গায়ে মাখতে বলে আজ আবার আমায় বলছ এই ঝগড়ুটে, ভাঙা গলার হীরুর সংসার জোড়া লাগিয়ে দিয়ে আসতে?" এর পেছনে একটু ইতিহাস আছে। মামার নতুন বৌটি শ্যামলা, কন্নড় সীমান্তের, দেখতেও সুশ্রী ছিল না, মোট কথা সে মামার মনের মতো হয় নি। মেয়েটির বিয়েই হচ্ছিল না, পাত্র জুটছিল না, তাই মামার মতো দোজবরের সাথে বিয়ে হোল। পরের বিয়েটা মনের মতো হয়নি বলে আগের বৌয়ের কথা মামার মনে প্রায়ই ভেসে উঠত, আর সুযোগ পেলেই তা বেরিয়ে আসতে চাইত।

"তোমার মেয়েকে আমি কেন দেখব?"

"দেখবি না? মনে কর না কেন তোর বোনের মরদ মরেছে সে বিধবা হয়ে গেছে। তাহলে কি ব্যাটাছেলে হয়ে তুই সাহায্য করতে এগিয়ে আসবি না? আমার মেয়ে আর তোর মেয়ে কি আলাদা? হীরা কি তোরও মেয়ে না?"

"সে বললে হয় না। তুমি যেমন আমার বোন, শঙ্করও তো আমার মামার ছেলে, বলতে গেলে আমারই ভাই। তুমিই বা এ ছেলেটির গলায় পচা কুমড়োর মতো হীরাকে কেন ঝুলিয়েছ? এভাবে ওর আর সেই সঙ্গে হীরার জীবনটাও নষ্ট করবে ভেবেছ নাকি? শঙ্কর শুনছি আবার বিয়ে করবে। তাহলে আর এই আপদকে কেন ওর ঘরে ঠেলতে চাইছ?"

শঙ্কর আবার বিয়ে করছে শুনে মার ভাবনা হল, দিন দুই কোথায় যেন ঘুরেও এল। কিছু একটা মতলব আঁটছে, একটা রাস্তা বার করেছে মনে হল।

একদিন রাত্রে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে সে সময় মা বললে, "আন্দ্যা, লিঙ্গা যা বলছে তা কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না, আমার মনে হচ্ছে ও একটা প্যাঁচ কষছে। তাছাড়া হয়ত লিঙ্গা সমার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। লিঙ্গার ধারণা ওর বৌয়ের সর্বনাশ আমিই করেছি, তাই ও এখন আমার এ মেয়েটার সর্বনাশ করে তার শোধ নেবে ভেবেছে। ও হয়তো সমাকে বলেছে হীরা যাতে শঙ্করকে ছেড়ে দেয় তার ব্যবস্থা করে দেব, শঙ্করকে মুক্তি পাইয়ে দেব, তার জন্যে এত টাকা লাগবে। লিঙ্গা হয়তো এসব ফিকিরেই আছে, কিছুই বলা যায় না, বুঝলি?"

"এসব কি বলছ, তুমি? মামা কখনো এসব করতে পারে? এ তুমি ভাবলে কি করে?"

"তুই জানিস না, ও ভীষণ শয়তান, সব পারে। তুই ছেলেমানুষ আছিস, এখনও ওকে বুঝতে পারিস নি। এর কথা ওকে আর ওর কথা একে করতে ছেলেটা ভারি ওস্তাদ, আমি ওকে খুব ভাল করেই চিনি কিনা," বুঝলুম মা সন্দেহের চোটে এসব বলছে। বয়সকালে মামা কিছু নটঘট করেছিল ঠিকই, তাই বলে হীরার ব্যাপারে শঙ্করকে ছাড়পত্র পাইয়ে দেবে আর তার জন্য ওদের কাছ থেকে টাকা নেবে এমন কথা আমার কখনও মনে হয় নি। আমি তাই মাকে আবার বোঝাতে চেষ্টা করলুম।

"নিজের বোনের সন্তানের ক্ষতি কি মামা করতে পারে?"

"তুই যাই বলিস। ওর মনে এসব না থাকলেই ভাল, বুঝব ঠাকুরের অশেষ কৃপা। তোর সামনেই তো বলল হীরাকে এখানেই রেখে দাও।"

"তা বটে, সেটা বলেছে।"

"তবেই দেখ, তাহলে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াল। ওর ইচ্ছে নয় হীরা শ্বশুরবাড়িতে ঘর করুক। মেয়ের বাপ তো আগেই হাত পা ছেড়ে বসে আছে। ছেলেমেয়ের জন্ম দিতে পারে গাদা গাদা করে। কিন্তু ওদের নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না। তুই তো বাবা আন্দ্যা এখন আর ছোটটি নোস্, শঙ্করও তো তোরই বয়সী। পাড়ায় তোর বয়সী ছেলেদের বিয়ে হয়ে তারা সংসারী হয়েছে। তুই এখন দেখ বোনকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাবার কি ব্যবস্থা করতে পারিস।"

"আমার কথা ওখানে শুনবে কে?"

"কেন শুনবে না? লেখাপড়া শিখেছিস, শঙ্করকে ধমকে দিবি। ঐ মাগীকে আমি দেখে নেব। মেয়েকে দু তিন বছরও ওরা ঘর করতে দিলে না? অসুখ কি কেবল আমার মেয়েরই, আর কারো অসুখ করে না? অসুখের সময় ওর যে মরদ, ওষুধপত্র তো ওরই দেয়া উচিত, দেখাশোনা তো ওরই করা উচিত। তা না করে হতচ্ছাড়া বউকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাপের বাড়ি। তাও আমি চুপ করেই থাকতুম, কিছু বলতুম না, হাজার হোক ও তো আমারই মেয়ে। আমি কি আর ওকে ফেলতে পারি? এখন মেয়ে একটু সেরেছে, তা এখন তো ওকে ফিরিয়ে নিবি? বিয়ের পর পাঁচ ছ'বছর লেগে যায় মেয়েদের সেয়ানা হতে। সেয়ানা হলে বনিবনা না হলে তবে না ছাড়াছাড়ির কথা উঠতে পারে। আমার মেয়ে তো আর মরদকে দুষছে না, শ্বশুরের ঘর করতেও আপত্তি করছে না। কিন্তু ঐ আবাগীর বেটী আমার মেয়ের সর্বনাশ না করে ছাড়বে না। মতলব করেছে পথে বসাবে। আচ্ছা, দেখব কেমন পথে বসায়। ছেলেটা তো তেমন খারাপ মনে হয় নি, তা তুই এতটা পড়াশুনা করছিস কিসের জন্যে, যদি ওকে বুঝিয়ে পড়িয়ে না-ই নিতে পারিস? ওকে বল এখন দুটো বিয়ে বেআইনী। লুকিয়ে চুরিয়ে বিয়ে করলে হাতকড়া পড়বে আর জেলের চাক্কি পিষতে হবে। এখন আর সেই আগের জমানা নেই। এটা তো বলতে পারিস?"

বোঝা গেল মা এবারে খুব কোমর বেঁধেই যুদ্ধে নেমেছে। আমি শঙ্করকে একদিন মাঠে ধরলুম। ও কিন্তু তেমন রুখে দাঁড়ালে না। আমি তাকে বন্ধুর মতো বোঝালুম,

দুবার বিয়ে করতে বাধা কোথায় তাও বললুম। আইনের দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখালুম। হীরার শরীর এখন অনেকটাই সেরেছে তাও জানালুম। শেষ পর্যন্ত শঙ্কর বলেই ফেললে, "আমার তো কোনো আপত্তি নেই, যা বলার দিদিকে বল।"

আমি আর মা একদিন ওর দিদি সমার সাথে দেখা করলুম। ও মাকে বললে, "তুই তোর অসুস্থ মেয়ে আমার ভাইকে গছিয়ে ওর সর্বনাশ করেছিস। আমার বাপ যখন অসুস্থ, মরো মরো, তখন ওকে ধরে মিষ্টি কথা বলে দিব্যি কথা আদায় করে নিলি। তাই বাপ রাজি হল আর বিয়েটা হয়ে গেল আমাদের বাড়ির দোরে। তুই আমার বাপকে ঠকিয়েছিস, আমি তোর মেয়েকে কিছুতেই শ্বশুরের ভিটেতে ঢুকতে দেব না।"

মা ওকে যাচ্ছেতাই গাল দিলে, পাড়ার লোকও জমা করালে। পাড়ার লোকদের ডেকে মা ওর মেয়ের ওপর কিভাবে অত্যাচার হত, দুধ বেচার নাম করে কিভাবে সমা ঘরের কাজে ফাঁকি দিয়ে ওর মেয়ের ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিত তা সবই চেঁচিয়ে বলে কয়ে সারা পাড়ায় একটা সোরগোল তুলে দিলে। মা বললে, সমার আর ওর সোয়ামি আর বাচ্চাকাচ্চার খাবার কোথায়ও জুটছে না তাই ছোট ভাইটাকে একা পেয়ে লুটেপুটে খেতে ওর বাড়ীতে ঢুকেছে। মা ওদের বললে, এ বাড়ির মালকিন তো ওরই মেয়ে, সেই তো এ বাড়ির বৌ। এটা সমা মানতে চায় না, বাড়ির বৌকে সইতে পারছে না। তাই তো বৌকে উপোস রেখে জন্তুজানোয়ারের মতো খাটিয়ে নেয়, ঠাণ্ডায় জলে-জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। বর্ষায় ভেজা মাটিতে শুতে বলে আর তারপর অসুখ যখন করে তখন বলে আমি নাকি অসুস্থ মেয়ে ওর ভাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছি। "মাগী! তুই তো আমার মেয়েটার অসুখ বাধালি, এখন ভাইয়ের ঘরে ঢুকেছিস ওর সংসারটা গিলতে।"

মার এতসব চেঁচামেচিতে সারা পাড়া একটু নড়েচড়ে বসল। এদিকে সমা কিছুক্ষণ ধরে কথা বলছে না, চুপ করে রয়েছে। পাড়ার বৌঝিরা সমাকে একটু বোঝালে, "মেয়েটাকে ঘরে ফিরিয়ে আন। ভায়ের সংসারে আগুন লাগিয়ে পাপের ভাগী হোস নে। ভাই নিজের ঘর নিজেই সামলাক, যেমন ভাবে পারে।"

গোপাতাত্যা এ মুলুকের নেতা। ঝগড়া বিবাদে কোর্ট কাচারি করতে মাসের আদ্ধেকই বাইরে থাকে। মা তাকে সঙ্গে নিয়েই এসেছে। ওর সামনেই মা সমা আর ওর মরদকে বকুনি লাগালে। সমার বাসন-কোসন ঘর থেকে বার করে রাস্তায় ফেলে দেবে বলে হুমকিও দিলে গোপাতাত্যা। তাতে ফল হল এই যে হীরা এক মাসের ভেতরেই শ্বশুরবাড়িতে ফিরে গেল আর শঙ্করের সংসারের ঘানিও আবার টানতে লেগে গেল।

আট

হীরা আবার শ্বশুরবাড়ি ফিরে যেতে গোরু মোষ চরাবার ভার পড়ল সুন্দরার ওপর। অবলা জীবগুলোর সামলাবার কাজটা ওই হাতে নিলে। ছোট্ট আনসা এখন লক্ষ্মীর কোলে বসে, আনসা বছর খানেকের হল। আপ্পার বয়স চার পাঁচ হবে, ও এখন দরজায় বসে খেলে, ওর বয়সী ছেলেদের সঙ্গে গলিতে ধুলো উড়োয়। শিবা তোর চৌদ্দতে পড়েছে, শরীরটাও খানিকটা সেরেছে। এখন ও আর মাটি খায় না। মাঠে, নালায় জল টেনে দিতে পারে সুন্দর করে। শিবা আর আমিই খেতে জল দেবার কাজটা করি, দুভায়ে মিলে খেত আগলাই। শিবা রয়েছে বলেই বাবা খানিকটা বিশ্রাম পায়, ও অনেকটাই সামলায় কিনা। মাঠে তেমন কাজ না থাকলে আমি মাঝে মাঝেই অন্য জায়গায় রোজগাবের ধান্দায় চলে যাই। সকালে মাঠে জল দেয়া অবধি আমি ওখানেই থেকে যেতুম, তারপরেই এখানে সেখানে বেরিয়ে পড়তুম। কারো বা লাঙল ধরতে, কারো খেতে বেড়া দিতে, কোথায়ও কুয়ো পরিষ্কাব কবতে, কোথায়ও বা ঘাস টেনে তুলতে।

এভাবে অন্য জায়গায় কাজে একটা আনন্দ ছিল। অন্য লোকের সঙ্গে একসাথে হেসে খেলে কাজ করতে পরিশ্রম গায়েই লাগত না। আমাদেব ওখানে বাবা সবসময় খিচির-মিচির করছে, ভালও লাগত না, কাজ কবতে মন চাইতই না। এভাবে বাইরে কাজ করে যে পয়সাটা পেতুম তাতে দু'সের চাল কেনা যেত। আমি রোজগার করে বাবা-মাকে পয়সা এনে দিচ্ছি, সে পয়সা দিয়ে চাল কেনা হল, তার ফলে আমার ছোট ভাইবোনেরা এক মুঠো ভাত বেশি খেতে পাচ্ছে এতে আমার বুক ফুলে উঠত। চার পাঁচ দিন কাজে গেলে চার আনা পয়সা হাতে পেতুম, মা ওটা দিত আমাকে। আমার এভাবে বাইরে কাজ করার ব্যাপারে বাবার খুব একটা সায় নেই। আমাকে ছেড়ে দিলে মাঠের সব কাজে শিবার সঙ্গে বাবাকেও হাত লাগাতে হবে, তাহলে তো আর যখন তখন শহরে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে না তাই বাবা এরকম নিমরাজি ছিল। যাক গে, সারাবছর তো আর আমি এই মোট মজুরির কাজ পেতুম না, যা পেতুম গরমের সময়।

গরমের পর বর্ষার শুরুতে স্কুল আবার খুলে গেল। এবারে স্কুলের পড়া এত সোজা নয়। ক্লাস টেনে রেজাল্ট-এর ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি ছিল। যে ছেলে দুটো সাবজেক্টে ফেল করবে তাকে ক্লাস ইলেভেনে উঠানো হত না। অবশ্য তাকে পড়াবার জন্য সময় দেখা হত, আবার পরীক্ষায় বসতে পেত সে, আর পাশ করে গেলে ইলেভেনে উঠত। ক্লাস টেন-এর পরীক্ষা বোর্ড-এর পরীক্ষা, সেখানে ফল ভাল হওয়া চাই। নইলে স্কুলের গ্র্যান্ট আটকে যেতে পারে, স্কুলের বদনামও হতে পারে, স্কুলের কর্তাব্যক্তিদের এ দুর্ভাবনা কখনও যেত না। সেজন্যই ক্লাস টেন আর ইলেভেনে বাছাই করা ছাত্র নেয়া হোত।

যখনই আমি ক্লাস নাইন-এর পরীক্ষা পাশ করেছি জানতে পেরেছিলুম, তখনই ক্লাস টেনের মারঠীর বই পড়ে রেখেছিলুম। অঙ্ক, জ্যামিতি, বিজ্ঞান এই বিষয়গুলো বই পড়ে বুঝে নিজে নিজেই বাড়িতে খাতায় কষতে চেষ্টা করতুম। কেবলি মনে হ'ত আর বোধহয় শেষ রক্ষা করতে পারলুম না, সব যেন আমার হাতের, আমার সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। হাজার চেষ্টা করেও মাথায় কিছুতেই ঢোকাতে পারছি না, খুব একটা বুঝতেও পারছি না, বিশেষ করে এলজেব্রার ফর্মূলাগুলো যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারতুম না। বাড়িতে বসে বসে পড়তে পারব বলে মনে হল না। নীচের ক্লাসগুলোতে নিজের ক্ষমতার ওপর যে বিশ্বাস আমার ছিল তা যেন হারিয়ে ফেলছি। বুঝে ফেললুম, গোড়া থেকে স্কুলে অন্তত এই ক'টি বিষয়ের ক্লাস করা খুবই দরকার। আর এ তিনটি সাবজেক্টের বইও নিজের কাছেই থাকা দরকার, ধার করে এর তার কাছে চেয়ে চিন্তে পড়লে চলবে না।

বর্ষা এবার একটু আগেভাগেই নেমে যাওয়ায় জুন মাসেই বীজ রোয়ার কাজও শুরু হয়ে গেল। আর তাড়াতাড়ি শেষও হয়ে গেল। ফলে আমি অন্য জায়গায়ও বীজ রোয়ার কাজে যেতে লেগে গেলুম। দিন শেষ হতে না হতেই মাঠে না গিয়ে আমি অন্য জায়গায় রোজগারের নাম করে সোজা গাঁয়ে গিয়ে এখানে সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতুম, বসে বসে আড্ডা মারতুম। আমাদের গলিতে পাটিল নামে এক নতুন প্রাইমারি টিচার এসেছিলেন। কম বয়স, বিয়ে থা করেন নি। একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন আর স্টোভে নিজে রান্না করে খেতেন। রাতে আমরা ছেলেছোকরারা ওর ঘরে আড্ডা মারতে যেতুম, বর্ষাকালে দরজা ভেজিয়ে গল্প করতে বেশ লাগত। কে যেন মাস্টারের কানে তুলে দিলে আমি গান গাইতে পারি, সিনেমার সংলাপ মুখস্থ বলে যেতে পারি, কমিক করতে পারি আরো কি সব। ব্যস্, মাঝেসাঝেই তিনি আমায় এসব করতে বলতেন। কখনো কখনো নতুন নতুন আইডিয়াও দিতেন। আইডিয়াটা দিয়ে সেটা করলে কেমন দেখায় দেখবার জন্যে সেটা করে দেখাতে বলতেন। নিজেও অনেকসময় সেগুলো করে দেখাতেন। একদিন আমি প্রায় একটি ঘণ্টা কেবল কমিকই করে গেলুম। বাইরে আমাদের গলির অনেক ছেলেই ভীড় জমিয়ে ফেলেছে। তার পরের দিন চলল গানের সাথে সাথে সিনেমার সংলাপ— তাও ঘণ্টাখানেক হবে। তারও পরের দিন দিবাকরের ছোট ছোট নাটকের কিছু অংশ করে দেখালুম, আমার সেগুলো মুখস্থই ছিল। গতবছর প্রাইমারি স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিল। সেজন্য সিনেমা হলও একটা ভাড়া করা হল। কাগলের সব হোমরা-চোমরাদের কাছে নেমন্তন্ন গেল। সেখানে আমার অভিনয় গাঁয়ের লোকেদের খুব মনে ধরেছে, ওরা বেজায় খুশি। এর ফল হোল এই যে, হাই স্কুলের বার্ষিক সম্মেলনে আমার অভিনয়ের জন্যে একটি ঘণ্টা বরাদ্দ হল। যখন ক্লাস নাইনে পড়তুম তখনই আমি আক্কোলকর মাস্টারমশাইকে অনেক ট্রিকস করে দেখিয়েছিলুম। কমিক করতে তখন থেকেই আমার ইচ্ছে বেড়ে গেল। মনে আছে সে বছরই একজন ভদ্রলোক হাইস্কুলে এসে কমিক করে গেলেন। স্কুলের মাস্টারমশায় ও ছাত্ররা সবাই মিলে ওকে অনেক পয়সা তুলে দিলে। সেখান থেকেই কিছু কমিক আমিও শিখে ফেললুম, আর

তার থেকেই কিছু কিছু পাটিল মাস্টারমশায়ের ঘরে কমিক করে দেখালুম। এসব যখন করছি তখন হঠাৎই একদিন আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। বুদ্ধিটা হল এই— আমি ভেবে দেখলুম মাঠে বীজ রোয়ার কাজ শেষ, বর্ষায় এখন অন্য কোন কাজও নেই, রোজগারের রাস্তাও নেই। এদিকে স্কুল খুলে গেছে, বইপত্তর বিশেষ করে, অঙ্ক, জ্যামিতি, বিজ্ঞানের বই তো কিনতে হবে। তা, কোলহাপুর নিপানি, কাগল এ অঞ্চলের প্রাইমারি স্কুলগুলোতে কমিক দেখিয়ে এসময়টায় কিছু পয়সা কামিয়ে নিলে কেমন হয়? তাহলে বই খাতা পেন্সিল কেনার পয়সাটা উঠে আসতে পারে। আমি ভেবে দেখলুম মাস্টারমশায়রা যখন আমার ওপর খুশি আছেন আর আমিও বুদ্ধিমান, খাটতে পেছপা নই। তখন এ কাজ করা তো আমার পক্ষে সাধ্যের বাইরে নয়— তাহলে কেন করব না? সবাই তো আমাকে ভালই বাসে, একটা মায়া পড়ে গেছে আমার ওপর। আশেপাশে গাঁয়ের স্কুলগুলোতে ক্লাস ফোর অবধি আছে। সেসব স্কুলের মাস্টারমশাইদের আমাদের গাঁয়ে আসা-যাওয়া আছে, ওঁরা আমার মাস্টারমশাইদেরও চেনেন। এখন আমি যদি আমার মাস্টারমশাইদেব কাছ থেকে চিঠি নিয়ে ঐ সব গাঁয়ে যাই আর সেখানে গাঁয়ে গাঁয়ে গান আর অভিনয় করি, তাহলে দু পয়সা স্বচ্ছন্দে কামিয়ে নিতে পারি। এমনিতেও তো মাঠে কাজ করে যে ক'টা পয়সা বাড়তি পেয়েছিলুম তা নিজের কাছে রাখতেও পারি নি, নিজের কাজেও লাগাতে পারি নি। সবটাই বাবা মার হাতে তুলে দিতে হয়েছে।

আস্তে আস্তে গোড়ায় যেটা একটা হঠাৎ মনে আসা আইডিয়া মাত্র ছিল সেটা বেশ মনে গেড়ে গেল আর তাকে রূপ দিতে চাইলুম। তাই আমি আমার এই আইডিয়াটার কথা নাইক আর সনগর মাস্টারমশায়দের কাছে গিয়ে ভাঙলুম। ওঁরা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে চিঠি দিয়ে দিলেন। প্রথমে আমি যে প্রাইমারি স্কুলটায় পড়তুম সেখানেই ব্যবস্থা হল। ছেলেদের সবার কাছে থেকে এক পয়সা করে তোলা হল আর এভাবে গোড়াপত্তনটা শুভই হল বলতে হবে। পরের অনুষ্ঠানটি হল মেয়েদের স্কুলে। অল্পস্বল্প কিছু টাকা হাতে এল। চুরি করার চেয়ে এভাবে রোজগার করাটা অনেক ভাল মনে হল। আমার উৎসাহ তখন দেখে কে! আশেপাশের গাঁগুলো হেঁটেই মেরে দিলুম। এভাবে যা পয়সা পেলুম তাতে একটা ভাল ছাতা আর একটি রঙিন থলে কেনা গেল। কাগলের আশেপাশে যেখানে যেখানে স্কুল ছিল, সে জায়গাগুলোতে পাঁচ সাতটা অনুষ্ঠান করা গেল। নিপানির হাই স্কুলেও একটা অনুষ্ঠান করা হল। এভাবে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে অভিজ্ঞতাটা আমার ভালই হল। হাফ টাইমের একটু আগেই আমি স্কুলের কর্তাব্যক্তিদের কাছে গিয়ে নিজের সব কথা খুলে বলতুম। তারপর প্রত্যেক ক্লাসে আমার চটকদারি অনুষ্ঠানের নোটিস ঘোরান হয়ে যেত। ওদের আমি বলতুম ওরা যেন হাফ টাইমের সময় বাড়ি গিয়ে একটা করে পয়সা নিয়ে আসে। অবশ্য এতে যে খুব একটা লাভ হত তা বলতে পারি না, তবে আড়াই টাকা থেকে আরম্ভ করে সাতটাকা অবধি উঠেছে। যে স্কুলেই গেছি সেখানকার মাস্টার-মশাইরা আমাকে গরীব ও উদ্যমী সাহসী ছেলে বলে প্রশংসা করে সব ছাত্রদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতেন আর আমার পিঠ চাপড়ে আমাকে বলতেন, "পড়াশুনা চালিয়ে যাও, স্কুল

ছেড়ো না।” এতে আমার উৎসাহ, সাহস দুইই বেড়ে যেত, আমার গায়েও মনে হত একটু মাংস লেগেছে।

গাঁয়ের মাস্টাররা ছিলেন সরলপ্রকৃতির ওঁরা কখনই আমাকে সন্দেহের চোখে দেখেন নি, আমার অবস্থা বুঝে আমায় সাহায্য করবার জন্যই এগিয়ে এসেছিলেন। এর ঠিক উল্টোটি হল কোলহাপুর শহরে।

কাগল নিপানি আর আশেপাশের গাঁগুলোতে সাত-আটটি ফাংসন করে আমি ভাবলুম এবার কোলহাপুর যাওয়া যাক। নিপানি ছাড়া আর সব জায়গাগুলোতে হেঁটেই গেছি, সবই পাঁচ-সাত মাইলের ভেতরেই ছিল। কোলহাপুর বার মাইল দূর। আগে আগে অনেক সময় হেঁটেই গেছি। যেতে ঘণ্টা তিনেক লাগত। সকালে সাতটায় কিছু জলখাবার খেয়ে রওনা হলুম। পথে কত কি যে ভাবলুম তার ঠিক নেই। কোলহাপুরে চার পাঁচটা হাই স্কুল আছে। জায়গাটা শহর, সব বড়লোকের বসতি। প্রত্যেকটি ছেলে নিদেনপক্ষে এক আনা করে তো নিশ্চয়ই দিতে পারবে। ছেলেও নেহাৎ কম হবে না। যদি তিনটি স্কুলেও ফাংসন করতে পারি তাহলেই আমার স্কুলের সারা বছরের ফিসের টাকা উঠে আসবে। এর ওপরেও কিছু টাকা বেঁচে গেলে কয়েকটা বই কেনা যাবে। পরনে ভাল কাপড়ও নেই, চাই কি তাও কেনা যেতে পারে। ভাবলুম শহরের টিচাররা আমাকে আরো উৎসাহ দেবেন, আরো প্রশংসা পাব। ওঁদের আয় ভাল, কিছু টাকা-পয়সাও আছে। ভগবানকে বললুম, ঠাকুর এই কোলহাপুরে আমি যেন খুব সাহায্য পাই। ক্লাস টেন-এর এ বছরটা আমার যেন ভালভাবে উৎরে যায়।

চওড়া পিচের রাস্তা, কোনো কাদা মাটির নামগন্ধ পর্যন্ত নেই। বড় বড় রঙ চঙে বাড়ি। সুন্দর জামাকাপড় পরা, সুন্দর সুন্দর লোকগুলো গাড়ি করে, টাঙায় চেপে বা সাইকেলে চড়ে ছুটছে। জিনিসপত্রে ঠাসা সব দোকান। সিনেমা, থিয়েটার, কাবখানা, অফিস, কাচারী। সর্বত্র পয়সার ছড়াছড়ি। এক আনা ক'রে দিতে কারুরই অসুবিধে হবে বলে মনে হোল না।

প্রথমেই গেলুম একটা মিশনারিদের স্কুলে। দারোয়ান তো আমাকে ঢুকতেই দেয় না, বলে, “কি কাজ?”

“হেড মাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা করব।”

“সময় হবে না,” সঙ্গে সঙ্গে ও বলে উঠলে। ভেতর থেকে হেডমাস্টারমশায় হয়ত সব শুনে থাকবেন, বলে উঠলেন, “কে ওখানে?”

“কালকেরই একজন মনে হচ্ছে।”

“মানে?”

“ছোটখাটো কাজের খোঁজে কয়েকটি ছেলে কাল এসেছিল না?'

“বলে দে, তিরিশ তারিখে দেখা করতে।”

“আমি কিছু কাজ চাইতে আসি নি, আমি একজন ছাত্র।”

“ছাত্র?” অবাক হয়ে সে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। ওর নিজের জামাকাপড় আমার চেয়ে পরিপাটি, ইস্ত্রি করা। কোলহাপুরের ছাত্রদের দেখেই ওর অভ্যেস, এরই পাশাপাশি আমাকে দেখে কাজের খোঁজে এসেছি মনে

করাই তো স্বাভাবিক।

তবুও হাল ছাড়লুম না, বললুম, "আমি পাড়া গাঁ থেকে এসেছি। কোন একটা ব্যাপারে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই।" শেষ পর্যন্ত ও আমাকে ভেতরে যেতে দিলে। আমার কাছে যে চিঠিগুলো ছিল ওঁকে সেগুলো দিলুম, আমার বাড়ির অবস্থার কথা সবিস্তারে বললুম, কিন্তু তাতেও উনি আমার ফাংসনটা করাতে রাজি হলেন না। স্কুলে এসব করতে দিলে ছেলেদের পড়ার সময় নষ্ট হবে, স্কুলের সময়ের ভেতর স্কুলই হবে অন্য কিছু নয়, মনোরঞ্জন বা এ ধরনের অনুষ্ঠান স্কুলের পর হওয়া উচিত এই তাঁর মত। তাছাড়া, ওঁর স্কুল তো আর বাইরের ছাত্রদের সাহায্য করতে পারে না। এই স্কুলে যে সব গরীব ছাত্র পড়ে, এ স্কুল কেবল তাদেরই সাহায্য করে। এখন কাজের সময়, এখন তুমি যাও, এখানে কোনো সাহায্যই পাবে না।" অগত্যা বেরিয়ে পড়লুম। এবারে অম্বাবাঈর (মা দুর্গারই আরেক রূপ) মন্দিরের সামনের একটা স্কুলে। সেখানে আমাকে পত্রপাঠ বিদায় জানালে। "স্কুল কর্তৃপক্ষ এ ধরনের ফালতু অনুষ্ঠানের অনুমতি দেয় না।" আমার তখন একটু জেদ চেপে গেল। তখন আমাকে বলা হল নিয়ম হচ্ছে আগে স্কুলের বড় কর্তাদের চিঠি দিতে হবে। সেটা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির কাছে পাঠানো হবে। ওঁরা অনুমতি দিলে আমাকে জানানো হবে। এই বলে উনি ক্লাসে চলে গেলেন।

খাসবাগে একটা নামকরা স্কুলের হেডমাস্টারমশাই আমাকে বাজিয়ে নিতে চাইলেন। আমার ঘাম ছুটে যাবার উপক্রম। তিনি আমাকে ভাল করে এটাই বোঝাতে চাইলেন যে, স্কুল চলাকালীন যে ছাত্র এভাবে ঘোরে, সে ফাঁকিবাজ, বসে বসে খাবার মতলব। এই বলে উনি আমায় রাস্তা দেখিয়ে দিলেন।

কাছেই একটা প্রাইমারি স্কুল দেখতে পেয়ে আবার সেখানে গেলুম। আমার চেহারা দেখে ওদের তো বিশ্বাসই হতে চায় না যে আমি ভাল কমিক করতে পারি।

আর নয়, এবারে আমি সত্যি সত্যি বেরিয়ে পড়লুম। হেঁটে হেঁটে আমার চেহারা শুকিয়ে আদ্ধেক, গাল তো ভাঙাই ছিল, মাথার চুল বেড়ে আরো লম্বা হয়েছে, হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গলার স্বর আর বেরুতে চায় না। যা অভিজ্ঞতা হলো তাতে মুখটা নিরাশায় কালো হয়ে গেছে। পরনের জামা যেমন তেমন করে সাধারণভাবে কাচা, চেহারায় নেই কোনো জৌলুস। মাস্টারমশায়দের আর কি দোষ? ওঁরা এভাবে আমাকে দেখে কি করেই বা বিশ্বাস করবেন যে আমি অভিনয় করতে পারি? মনে মনে একটু লজ্জা পেয়ে গেলুম।

হেঁটে হেঁটে খুব খিদে পেয়েছিল। একটা হোটেলে ঢুকে পাউরুটি আর ঘুগনি খেলুম। তার ওপর ঢক ঢক করে জল খেয়ে এক কাপ চাও খেয়ে নিলুম। এবারে বেশ কিছুটা চাঙা মনে হল নিজেকে, মনে মনে খুবই তরতাজা হয়ে উঠলুম। বাইরে বেরিয়েই মনে হল মুখটা ধুয়ে ফেলা যাক। চৌমাথার কলে মুখটা ধুয়ে এগিয়ে গেলুম। সেদিন এভাবেই কাটল, রাতে আবাজীর মুদিখানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

পরের দিনটাও কোলহাপুরেই কাটল। যে ক'টা হাই স্কুল ছিল সব আমার ঘোরা হয়ে গেল। কেউই আমার কথা মন দিয়ে শোনে নি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের

কাজেই ব্যস্ত। অন্য কারো কথাশোনার তাদের সময়ও নেই, মেজাজও নেই। তাদের মন কি এক অজানা চাপে চিরকালের মতো পাথর চাপা হয়ে আছে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে তাদের চিন্তাধারার বাইরে কোনো প্রসঙ্গ এলেই রীতিমত খেঁকিয়ে উঠত। আর পোকামাকড় যেমন গা থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় তেমনি ঐ প্রসঙ্গ আলোচনা থেকেই ঝেড়ে ফেলে বাদ দিতে চাইত। এ শহরে প্রায়ই কেউ না কেউ আসতেই সাহায্য চাইতে। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশ আর উত্তরপ্রদেশের অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েরা বাজনা বাজিয়ে রোজই প্রায় এ শহরে এসে হাজির হত। কাগলে ওরা খুব একটা যেত না। ওদেরই দেখাদেখি আমিও টাকা করবার এ সোজা পথ বেছে নিয়েছি ভেবে একজন টিচার তো আমায় পুলিশের হাতেই তুলে দিচ্ছিলেন আর একটু হলে। উনি ঠিক বাঘের মতো আমার দিকে তেড়ে এলেন, অন্য টিচাররা ওঁকে আটকালেন। বাপরে! আর কোন কথা নয়, মুহূর্তের মধ্যে ওখান থেকে আমি হাওয়া হয়ে গেলুম।

রাজারামপুরের দিকে মেয়েদের খুব নামকরা একটি হাইস্কুল ছিল। সে-স্কুলের হেডমাস্টারেরও খুব নামডাক ছিল, তাঁকে সবাই প্রিন্সিপাল বলেই জানত আর উনি নিজেও শুনেছি শিক্ষার ব্যাপারে অনেক কিছুই জানতেন, পড়াশুনা করেছেন। স্কুলের ডিসিপ্লিন, নিয়ম খুব কড়াকড়ি করে মানা হত এটা বোঝা গেল। প্রিন্সিপাল সাহেবের অফিস খুব সাজানো গোছানো, দামী ফার্নিচার, দরজার সামনে পর্দা ঝুলছে আর ওঁর নিজের পরনের জামাকাপড়ও ছিল ঠিক সাহেবদেরই মতো। এ ধরনের লোকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে এমনিতেই আমার সব কিছু গুলিয়ে যেত, এদের পোশাক, চশমা আঁটা গম্ভীর মুখ দেখে আমার মন খুবই দমে যেত। ওদের দেখে মনে হত যেন এক অন্য জগতের লোক, ওরা যে আমার কথা শুনবে এ আমার বিশ্বাসই হত না। যাক গে ভয়ে ভয়ে ওঁর দিকে এগিয়ে ওঁর হাতে চিঠি দিয়ে নিজের অভাবের কথা সবই ওঁকে খুলে বললুম।

"হাই স্কুলে পড়ার জন্য আবার সাহায্য কেন? কত টাকা লাগে স্কুলের ফিস দিতে আর বইখাতা কিনতে? সেটুকুও কি তোর বাবা দিতে পারে না?"

"না স্যার।"

"তুই নিশ্চয়ই মিছে কথা বলছিস। আমার এ বিশ্বাস হয় না।"

"না, স্যার, সত্যি কথাই বলছি। আমার বাপ মা চায় না আমি পড়ি।" এ কথা ওঁর কাছে আরও অবিশ্বাস্য মনে হল। বাপ মা নিজের ছেলে পড়ুক চায় না এ অসম্ভব। আমি বুঝিয়ে বললুম ওরা মনে করে জমির চাষে খেটে তাদের আর আমার ছোট ভাই বোনদের পেট চালানোই হচ্ছে আমার উচিত কাজ।

"তা সেতো ঠিকই বলে ওরা। তোর তো তাই করা উচিত। তুই নিশ্চয়ই তা করিস না, চাষেব কাজে ওদের সঙ্গে হাত লাগাস না।"

"না স্যার, আমি খুবই খাটি। কিন্তু আমার সাত আটটা ভাই বোন, সেখানে আমার একলা খেটে কতটা হয়?"

"তা এতগুলো বাচ্চা-কাচ্ছা জন্মাতে কে বলেছিল? ওদের দায় দায়িত্ব কি এখন আমাদের নিতে হবে নাকি? সাত-আটটা ভাইবোনের কথা বলতে তোর লজ্জা করছে

না? এখন আর কি করবি? ওদের খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তোকে কষ্ট স্বীকার করতেই হবে, এ ছাড়া কোন রাস্তা দেখছি না", বলে সাহেব হঠাৎই রেগে গেলেন, "আর ছোঁড়া তুই কিনা নিজে হাই স্কুলে পড়বি বলে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছিস? বেরো, চ্যাংড়া কোথাকার?"

আমি তাও নড়িনি, বললুম, "না, স্যার ঠিক তা নয়।"

"না স্যার, না স্যার, তবে হ্যাঁ স্যারটা কি? তোকে যখন সামান্য হাইস্কুলের পড়ার ব্যবস্থা করতেই এত হিমসিম খেতে হচ্ছে তখন তো বেশ বোঝাই যাচ্ছে তোর ভাগ্যে এর চেয়ে বেশি কিছু হবারই নয়। তুই তার চেয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাপ-মাকে চাষে সাহায্য কর গে। আমরা মেধাবী ছেলেদেরই সাহায্য করি, কেবল গরীব হলেই হয় না, বুঝলি? যা আর সময় নষ্ট করিস না, বেরো।"

"স্যার, আমিও পড়াশুনায় বড় একটা খারাপ নই, কিন্তু... তখনও হাল ছাড়িনি আমি, সাহেবের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই চলেছি।

"ওরে গাধা, লেখাপড়ায় যদি তুই ভালই হবি তাহলে তোর নিজের স্কুলে কি আর তোর ফ্রিশিপ হয় না? তুই যা তা বানিয়ে বলে যাবি আর আমি তা বিশ্বাস করে নেব? পড়তে না পারলে ট্রেনের তলায় মরগে যা। এভাবে ভিখিরি হয়ে বেঁচে থাকার কোন অর্থই নেই। তোর নিজের কোনো আত্মসম্মান নেই? সাতকর্, ওকে বার কর আগে! হতভাগা কোথাকার! আমার সময় নষ্ট করছিস!" ভদ্রলোক হঠাৎই কেন এত খেপে গেলেন ভেবে আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। বাস্তব জগতের সাথে ওঁর কি কোনোই সম্পর্ক নেই, উনি কি শুধু কল্পনার রাজ্যে বাস করেন?

সেখান থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটা ধরেছি। এতসব বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আমার হাতে পায়ের শক্তি চলে গেছে। মানুষে মানুষ গাদাগাদি এই শহরে আমার দামটা কি তা যেন কিছুটা বুঝতে পারছি এতক্ষণে। অন্য স্কুলে ঢুকতে এখন আমরা কেমন যেন ভয় হতে লাগল। কেউ কিছু উল্টোপাল্টা বললে হয়তো আমি সেখানেই পড়ে মরে থাকব। আমার মনের সব রঙিন তাজা দিনটাকে কে বা কারা যেন পাথর মেরে থেঁতলে চৌচির করে দিয়েছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে বোকার মতো হেঁটেই যাচ্ছি, সব বোধশক্তি, চিন্তা করার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে। যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ছি, আবার চলা শুরু করেছি। পাগলের মতো একটা কিছু দেখতে হয়তো দাঁড়িয়ে পড়লুম, সবটাই উদ্দেশ্যহীন। খাণ্ডেকার আর ফডকের উপন্যাস পড়ে সভ্য শিক্ষিত লোকদের সম্বন্ধে আমি মিছিমিছি ভুল করেই

একটা ভাল ধারণা করে বসেছিলুম, ভেবেছিলুম শহরের লেখাপড়া-জানা শিক্ষিত মানুষগুলো আমার অবস্থাটা ঠিক বুঝতে পারবে, আমার সাহস আর ধৈর্যের তারিফ করবে, আর বেশি না হোক অল্প স্বল্প সাহায্যে এগিয়ে আসবে। আমার এ ধারণাটা ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে গেল। এরই ভেতর থেকে ক্রমে ক্রমে আরেকটি ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমার আরেক রূপ, সত্যিকারের চেহারা। দেখতে পেলুম রোগা-পটকা গরীব হতভাগ্য একটা ছেলেকে, রাস্তার আবর্জনায় ফেলে দিলে বা ট্রেনের তলায়

পড়ে সে মরে গেলে কোনটাতেই কারো কিছু এসে যাবে না।

আবার হেঁটেই চলেছি, সামনে মহারানীর মূর্তি দেখতে পেলুম। সেই পাথরের মূর্তিতে বাৎসল্য উথলে পড়ছে। ইচ্ছে হচ্ছিল সে মাতৃমূর্তির বুকেতে মাথা রেখে কেঁদে একটু হালকা হয়ে নিই। কিছুক্ষণ বোকার মতো ঐ মূর্তিটির দিকে হাঁ করে তাকিয়েই রইলুম। কাছাকাছি তিন-চারটি সিনেমাহল ছিল। ধীরে ধীরে সে দিকেই এগোলুম। রঙিন পোস্টারে সিনেমার কোনো কোনো দৃশ্যের কিছু কিছ অংশ আঁটা আছে। দেখতে দেখতে আমার মন মজে গেল। দুপুরের শোতে গিয়ে বসে পড়লুম। সিনেমা দেখতে দেখতে যেন একটা নতুন জগতে চলে গেলুম। দু' আড়াই ঘণ্টা অন্ধকারে বসে বেশ ভালই লাগল। শো'র শেষে ঘরের অন্ধকার থেকে বাইরের আলোয় যখন এলুম তখন নিজেকে আমি অনেকটাই সামলে নিয়েছি। মোটর স্ট্যান্ডে গিয়ে সোজা কাগলের বাস ধরে ফেললুম। কোলহাপুর থেকে কাগলে ফিরতে ফিরতে একটা কথা নিশ্চিত বুঝতে পারলুম যে অভিনয় করে আর এভাবে ভিক্ষে চাওয়া যাবে না, অভিনয় করে পয়সা কুড়োনোও যা, ভিক্ষে চাওয়াও তাই। একই জিনিস। ভেবে ঠিক করে ফেললুম খেটে কাজ করে রোজগার করব, সে পয়সায় স্কুলের ফি আর খাতার দাম দেব। মা আর বাবাকে সোজাসুজি বলে দেব যে আমার রোজগারের সবটাই আমি ওদের হাতে তুলে দেব না। আমার স্কুলের ফিস আর বইখাতার জন্যে যা লাগে তা আলাদা করে রেখে দেব। কিছুটা তোমরা নাও। কিছুটা আমার লেখাপড়ার জন্যে যাক। এতে ওরা যদি রাজি না হয় তাহলে মরা ছাড়া আর আমার অন্য কোন রাস্তা থাকবে না। যেখানে হোক আত্মহত্যা করব। এভাবে গাধার মতো খেটে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভাল, এ জ্বালা থেকে অন্তত মুক্তি পাব। এবার থেকে গান আর অভিনয় একেবারে বন্ধ। দুদিনে আড়াই টাকা জমিয়েছিলুম। বিরক্ত করছিলুম বলে একটি স্কুলের হেডমাস্টার আমাকে একটা আধুলি দিয়েছিলেন। আর একটি নাইট স্কুলের হেডমাস্টার সাদা কাগজে একটা সই করে কি যেন একটা জায়গা থেকে দুটো টাকা দিয়েছিলেন।

জুলাই মাসের শেষ পনের দিন, অঝোরে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। মাঠে কোনো কাজ নেই। আমি রোজ স্কুলে যাচ্ছি, কামাই করছি না। মনে মনে ফিসের চিন্তা সবসময়ই উঁকি দিচ্ছে। ক্লাসে যে বেঞ্চে বসতুম ঠিক জানালার কাছে সেখান থেকে বাগানের লাগোয়া জমিটা চোখের সামনেই দেখতে পেতুম। খোলা পলিমাটির জমি তার ওপর অবিশ্রাম বৃষ্টির জল পড়ে বিরামহীন স্নান করিয়ে দিচ্ছে। গাঁয়ে উর্বর জমি হাতের চেটোর সমান জায়গাও খালি নেই। এ জমিটা ফসলের পক্ষে খুব লোভনীয় মনে হল। কিন্তু জমিটা এমনিই পড়ে আছে, কোনো কাজেই লাগানো হচ্ছে না। কিছু চাষ করলে গরীবের দুমাসের খাবার সংস্থান হয়ে যেতে পারে। ভাবতে বসে গেলুম ও-জমিতে কিছু করা যায় কিনা। মনে মনে একটা মতলব এসে গেল। দুদিন কেবল জমিটার চারধারে ঘুরলুমই শুধু। তারপর মতলবটা ঠিক করে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করে বললুম, "স্যার, ও জমিটায় মেথি আর টমেটোর চাষ আমি করতে পারি আর তাতে আমার একটু উপকারও হবে।"

"কোন জমি?"

"বাগানের ওপাশটায়, জমিটা এমনি এমনি পড়ে আছে।"

হেডমাস্টারমশায় আপত্তি করলেন না। দুদিনের ভেতরেই আমি সে জমির মাটি কুপিয়ে মেথির বীজ ফেলে দিলুম। গোপাতাত্যার জমিতে টমেটোর চারাগাছ ছিল, তাও এনে লাগিয়ে দিলুম। মাস দেড়েকের ভেতরেই সুন্দর তরতাজা সবুজ মেথির গাছ গজিয়ে গেল। টমেটোর গাছও খুবই সতেজ হল। স্কুলের দরোয়ান আবদুলকে আমি দলে ভিড়িয়েছিলুম, ওকে বললুম, "হেড স্যারকে বলে এ জমিটাকে মেথি আর টমেটো লাগালুম, তুই বাবা একটু পাহারা দিস, তোকেও ভাগ দেব।"

মেথি গাছ কাটার মতো হ'লে আমার খুব আনন্দ হল। আমি গোপাতাত্যার বাগান থেকে কলাগাছ কেটে তা থেকে পঞ্চাশটা দড়ি পাকালুম। সে দধি দিয়ে মেথিশাকের পঞ্চাশটা আঁটি হল। প্রত্যেক মাস্টারমশায়কে তিনটি করে আঁটি দিয়ে বললুম, "স্যার, আমার বই খাতার জন্যে আমি মেথি শাক লাগিয়েছিলুম, এর জন্যে যা হোক পয়সা আপনারা দিলেই হল। আমি কাল পনের মিনিটের ছুটির সময়টার এসে পয়সা নিয়ে যাব।"

"কোথায় গুরুকে শাক ভেট দিবি, তা নয়। তাঁর কাছে পয়সা চাইতে এসেছিস? কি ধরনের চাষা রে তুই?" বলে যোশী মাস্টার মশায় জোবে জোরে হাসতে লেগে গেলেন স্টাফ রুমে। আমিও একটু হেসে কথা আর না বাড়িয়ে বেরিয়ে এলুম।

পরের দিন চায়ের বিরতিতে স্টাফরুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তখন আর আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছেন না, তাকাচ্ছেনও না। যার কাছে পারলুম হাত পাতলুম পয়সার জন্য। মাত্র তিনজন দু আনা করে পয়সা ঠেকালেন, বাকিরা আজ হবে কাল হবে করে এড়িয়ে গেলেন। সে 'কাল' অবশ্য এ জীবনে আর এল না। বই খাতা কেনার পয়সা তো দূরের কথা, মেথির বীজের পয়সাও আমার উঠল না।

মেথি শাক হয়েছিল চারকোণা একটা জায়গায়, আবদুল তা ভালকরেই দেখাশোনা করেছে। কেউ যদি অল্পস্বল্পও তুলত তাও ধরা পড়ত। পরে সে জায়গায় যে টমেটো এল তা কিন্তু আর রইল না। গরীবের ঘরকন্না আবদুলেরও, টমেটো যেমন যেমন ফলত, তেমন তেমন তুলেও নিত সে, আর তা খাওয়াও হয়ে যেত। রোজ এভাবে কত টমেটো যে আবদুল পাচার করত তার কূল পাওয়া যেত না। আমিও শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিলুম। ভাবতুম এমনিতেও মাস্টার মশায়দের ভোগেই যাব সেগুলো, পয়সা তো আর পাওয়া যাবে না, তাহলে গরীব আবদুলই না হয় খেল সে টমেটো।

সে বছর স্কুলে দুজন নতুন টিচার এলেন। রণদিভে মাস্টার মশায় আর দত্তাকাত্রি মাস্টারমশায়। রণদিভে স্যার ছিলেন জৈন, আর কাত্রি মাস্টারমশায় ছিলেন সমাজে পেছিয়ে পড়া শ্রেণীর একজন। কাত্রি স্যার মারাঠী শেখাতেন প্রাণ দিয়ে, আমাদের একনিমেষে জাগিয়ে তুলতেন। হোমওয়ার্কে একটা রচনা লেখা নিয়ে ওঁর সাথে পরিচয়ের সৌভাগ্য হোল, ক্রমে সে পরিচয় গাঢ় হয়ে নিবিড় সম্পর্কে দাঁড়াল। সে সময়ে আমি যেসব কবিতা লিখেছিলুম তা তিনি পড়তেন। পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতেন, "লিখে যা, কবিতা লেখার হাত ভাল তোর, পড়াশুনা করে যা, পড়া ছাড়িস না কখনো।" আমি যেন একটা অবলম্বন পেলুম, যে আমাকে সাহস জোগাবে, ভেঙে পড়তে দেবে

না। আমাকে বুঝতে পেরেছে স্কুল এমন অন্তত একজনও আছে তা ভেবে একটা প্রশান্তি এল মনে। রণদিভে মাস্টার মশায় মারাঠী শেখাতেন না ঠিকই, তবে গান লিখতেন আর নিজে গাইতেনও। তাঁর সঙ্গেও আমার খুব বন্ধুত্ব হল। তিনিও আমাকে অনেক সাহস জোগালেন, চার-পাঁচটা খাতা দিলেন, সামনের ছ'মাসে কাজে লাগবে। এ দুজন টিচারকে আমি আমার ফিসটা মকুব করে দেবার সুপারিশ করতে অনেক করে বললুম। কিন্তু ওঁরা আমায় কোনো সাহায্যই করতে পারলেন না, স্পষ্টভাবে বলেই দিলেন আমি যোশী বা দেশপাণ্ডে হলে বেতনটা মকুব নিশ্চয়ই হয়ে যেত। অন্তত এদের কারো ভাগনে নয়তো ভাইপো হয়ে জন্মান উচিত ছিল আমার। আমি চুপ করে গেলুম।

এই টানাপোড়েনের ভেতরেই হাফইয়ারলি পরীক্ষা হয়ে গেল, পাশও করে গেলুম। কিছু মাইনে বাকি পড়েছিল। দেনার বোঝা মাথায় নিয়েই দেয়ালীর ছুটি কাটালুম মাঠে বসে বসে, অঙ্ক আর ইংরেজির পড়াটা ফের ঝালিয়ে নিতে নিতে। পড়তে পড়তে মাঝে মাঝেই মনে পড়ে যেত যে স্কুলের ফিস বাকি আছে, মনটা তক্ষুনি দমে যেত। দেশপাণ্ডে মাস্টার মশায়কে কথা দিয়েছিলুম ছুটির পরই মাইনেটা শোধ করে দেব, তা পারলুম না। অবশ্য দেশপাণ্ডে মাস্টারমশায় খুব সরল আর সজ্জন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। মাইনের কথা নিয়মমত একবার করে জিজ্ঞেস করতেন, আবার তক্ষুনি চুপ করে যেতেন, বলতেন, "বেশি মাইনে বাকি ফেলিস না বুঝেছিস, পরে তা দিতে কষ্টটা তোরই বেশি হবে। তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দে।" আমি "এই দেব, স্যার" বলে বসে পড়তুম। তবে বসে পড়লে আর কি হবে, দেনার বোঝা তো ক্রমে বেড়েই চলেছে না।

দেয়ালীর পর স্কুল খুলে গেল। ঠিক করলুম প্রথম দিন থেকেই স্কুলে যাব, একে তো এবার বার্ষিক পরীক্ষা আর দ্বিতীয়ত খাতাও কড়াকড়ি করে দেখা হবে। তাছাড়া ক্লাস না করলে অঙ্ক আর বিজ্ঞান কিছুই তো বুঝতে পারব না। প্রথম সপ্তাহে প্রথম তিন দিন স্কুলে না গিয়ে তারপর স্কুলে গেলুম। মাইনের কথা জিজ্ঞেস করতেই "এ মাসেই দিয়ে দেব" বলে বসে পড়তুম। স্কুল থেকে ফেরার পথে সনগরদের আবাজী আমায় বললে, "আন্দ্যা, স্কুলে রোজ ঠিক ঠিক আসিস কিন্তু। অঙ্ক তো বেশ শক্ত, তাছাড়া ভূগোলের অঙ্কই কি কম শক্ত? আমি তো বুঝতেই পারি না। তুই ঠিকমত স্কুলে এলে তোরও পড়া হবে, আমারও হবে। গেল বছরকার মতো এবারেও আমরা দুজনে না হয় একই সঙ্গে পড়াশোনা করব। মনে করে নে না তুই আমার ওখানে টুইশনি করছিস, তোর যা মাইনে বাকি পড়েছে আমিই এ মাস থেকে তা দিয়ে দেব।"

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। দ্বিগুণ তোড় জোড় করে পড়ায় লেগে যাব ঠিক করে ফেললুম। ভোরে উঠে অন্তত দুঘণ্টা একটানা পড়ে যাব আমাদের মধ্যে এই ঠিক হল।

এদিকে মাঠের ফসলে পাক ধরেছে, তোলার সময় হয়ে আসছে। আখের চাষ আরম্ভ হয়েছে দেরীতে, কাজেই গুড় হতে হতে সংক্রান্তি অথবা মহাশিবরাত্রি হয়ে

যাবে। ততদিন পর্যন্ত গাছে জল ছেড়ে যেতেই হবে। দেয়ালীর দিন আষ্টেক পরে সব কাজ হঠাৎ যেন হুড়বড়িয়ে আরম্ভ হয়ে গেল। বর্ষার জলে কুয়ো হয়ে আছে টইটম্বুর। গোটা বর্ষাকাল গোরুমোষগুলো বসে বসে সবুজ সবুজ ঘাস চারা খেয়েছে, তাদের গায়ে খানিকটা মাংস লেগেছে বলে মনে হল। এবার তাদের ভোরে উঠে কুয়ো থেকে জল টানতে হবে আর আমাকে তাদের দড়ি টানতে হবে। ভোর থেকেই কাজের ধূম পড়ে যাবে। কত রকমের কাজই যে এসে যায়। এই যেমন, তামাক গাছের চারধারটা খুঁড়ে মাটিটা আলগা করা, কোথাও বা মাটির ঢেলা ভেঙে সমান করা, ওদিকে লঙ্কার গাছ পাহারা দেয়া। চিনেবাদাম তোলারও সময় হয়ে গেছে, সেখানেও রাতে পাহারা না দিলেই নয়। জলের ধারের ঘাসও কাটবার মতো বড় হয়েছে। চোখে চোখে রাখা দরকার। সেই ভোব থেকে শুরু হয়ে মাঝরাত অবধি কাজই চলেছে। খাটতে খাটতে কোমর বেঁকে গেছে। এসব কাজ যখন চলছে তখন বাবাকে আমি হয়তো জিজ্ঞেস করলুম, "বাবা, আজ তাহলে স্কুলে যাই?"

"আজ থাক। দেখছিস তো কত কাজ পড়ে আছে। কাজটা গুছিয়ে দিয়ে পরে যাস।"

ব্যস্ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে আমি স্কুলের পড়ায় পিছিয়ে পড়তে লাগলুম। স্কুলে এখনই তো আমার রোজ যাওয়া দরকার। এবারে ক্লাস টেন-এব পড়া বলে কথা। পরীক্ষার পড়া স্কুলে না গিয়ে কিছু কি বুঝব? বাবাকে বললেই বলে, "কাজটা কে করবে শুনি? তোর বাপ? বসতে দিলেই শুতে চায়। আগে আমাকে কি বলেছিলি?"

"কি বলেছিলুম।"

"কাজ করতে করতে বাড়িতে বসেই পড়ব বলেছিলি। সারাটা বর্ষা গেলি তো স্কুলে। আমি কি তখন তোকে বারণ করেছি না আটকে রেখেছি? এখন স্কুলে গিয়ে চাষের কাজটায় বারটা না বাজালে আর চলছে না, তাই না? আমার সর্বনাশ করার ইচ্ছে জেগেছে?"

"তা হোক, মাঝে মধ্যে আমাকে যেতেই হবে। বছর দেড়েকের ভেতরেই আমার ম্যাট্রিক হয়ে যাবে। এতদিনই যখন পড়লুম তখন ম্যাট্রিক না দিয়ে লাভ নেই," মরিয়া হয়ে আমি বলেই ফেলতুম, মনে যা আসত তাই বলতুম, রেখে ঢেকে নয়। ভাল করেই বোঝাতুম যে আমি পড়া চালিয়ে গেলে আমাদের সংসারে লাভ বই লোকসান নেই।

"এই কাজগুলো শেষ করে যা, আমাকে আর বড় বড় বুলি শোনাস না," বাবাও মরিয়া হয়ে গেছে।

আমাদের দুজনকার মধ্যে একটা চাপা, রাগারাগি চলছে। বাবার হাবভাব বুঝে কখনো কখনো হয়তো মাঠেই থেকে গেলুম, আবার কখনো ভোরে উঠে একটানা এগারটা অবধি মাঠের কাজ করে বাবাকে কিছু না বলেই স্কুলে চলে যেতুম। সন্ধেবেলায় ফিরে এসে আবার শুরু হয়ে যেত গোরুমোষদের খাবার ঘাস, ডালপাতা গোছানো, বাঁধের ধারে ধারে ঘাস, আগাছা তুলে এনে জমানো, আরো টুকিটাকি এরকমই নানা কাজ পড়ে থাকত। বাবা আর শিবা দুজনে মিলে করতে পারবে এমন কাজ করার

থাকলে ওদের জন্য সেটা ফেলে রেখে কাউকে না জানিয়েই আমি স্কুলে রওনা দিতুম। তবে ওরা দুজনে মিলেও করা মুস্কিল আছে এমন কাজ পড়ে থাকলে আমাকে অগত্যা থেকে যেতেই হত, স্কুলে আর যেতে পারতুম না। স্কুল আমাকে যেমনি টানত, চাষের কাজে এভাবে আটকে থাকলে তেমনি মন খারাপ হয়ে যেত। জোয়ারের মাঠে জোয়ারে আস্তে আস্তে পাক ধরছে। অভাবী ডোম, মেথর, দীন দরিদ্ররা রাতে চুপি চুপি জোয়ারের শীষ কেটে নিয়ে যায়, কেউ বা চিনেবাদামই টেনে নিয়ে গেল, আবার কেউ কেউ জলের দিককার ঘাসই কেটে নিয়ে চলে গেল। দিনকাল এত খারাপ, চারিদিকে এত অভাব-অনটন যে গরীবের চুরি ছাড়া অন্য কোনো রাস্তাই খোলা নেই। রাতে তাই দু একবার সারা মাঠটায় টহল দিয়ে বেড়ানোটা জরুরি হয়ে পড়ল।

এদিকে কাজের চাপ যতই এভাবে বাড়ছে পড়ার চাপও একইরকম বাড়তেই থাকল। আবাজীকে পড়াচ্ছি, রোজ রাতে ওর সঙ্গে বসতেই হত, রাতে না পারলে সকালে।

আমি চাইতুম ওকে পড়াবার কাজটা রাতেই সেরে ফেলতে। তাহলে পরের দিন ভোরে যে যার মতো পড়া তৈরি করতে পারি। রাতে খাবার জন্য ঘরে ফিরতে হত। ভোর হতে না হতেই আবার ছুট লাগাও মাঠের দিকে। সেকেণ্ড হাফ ইয়ারলিটায় আমি মাঠের দিকটায় কমই থাকতুম, একরকম থাকতুমই না বলতে গেলে। শিবা রুগ্ন, ওর মাঠে শোয়া ঠিক নয় তাই ঘরেই থাকে। জমিতে পাহরা দিতে হলে হয় বাবা নয়তো আমায় যেতে হবে। চিনে বাদাম আর জোয়ার কাটার মতো হল যখন, বাবা বললে, "চল, মাঠে থাকবি গিয়ে সেখানেই পড়বি।"

"তা কি করে হবে? আমার কাছে কোনো বই আছে নাকি? আমাকে তো আবাজীব বই নিয়ে পড়তে হয়, ওর সঙ্গে থেকেই পড়তে হবে। আমি বাড়িতেই থাকব।"

"কি আছে, আবাজীর থেকে বই চেয়ে নিয়ে খেতে রাতে পড়বি, পরের দিন ওকে সেটা ফিরিয়ে দিস। তাহলেই তো হল।"

"দুজনে একসাথে পড়ছি, আমি বুঝতে না পারলে ওকে জিজ্ঞেস করি, ও না পারলে আমাকে জিজ্ঞেস করে।"

"পরের দিন স্কুলে গিয়ে না হয় জিজ্ঞেস করিস, আর নয়তো রাতে যখন খেতে যাস বাড়িতে তখন জিজ্ঞেস করে নিবি।"

"অনেক অসুবিধে আছে। আমি মাঠে থাকতে পারব না গিয়ে। সারাদিন খেটে খেটে গায়ে ব্যথায় মরি, তাও হচ্ছে না। রাতে আবার কোমর অবধি ঘাসে হাঁটতে হবে। কেন? আমি কি মানুষ নই?"

"হারামজাদা, আমি কি ওখানে পালং-এ শুয়ে থাকি না বসি? রাতে আমাকে হাঁটতে হয় না? তুই থাকলে তুই এক খেপ, আমি এক খেপ, এতে দুজনেই পালা করে করে পাহারা দিতে পারি।"

"আমাকে না নিয়ে শিবাকে নিতে পারছ না?"

"হ্যাঁ, শিবাকে নিয়ে মরি আর কি! একে তো ও চিরকালের রুগী, তার ওপর মাঠের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে এক মাসের ভেতরেই পচা কুমড়োর মতো করে ছাড়ি

আর কি! আর তারপর ওকে সারাতে গিয়ে সব টাকা ডাক্তার বদ্যিতে ঢেলে ফতুর হই, নয়তো ওকে মাটিতে পুঁতে মাটি চাপা দিই, কি বলিস?" এইসব কথাকাটাকাটি হরদম চলত, মতলব হল মাঠে পাহারাটা আমি যাতে দিই। কখনো এমনও হয়েছে আমার বাবা আমাকে আগে আগে হাঁটতে দিয়ে জোব-জবরদস্তি করে ওর সঙ্গেই মাঠে নিয়ে গেছে। বাবা ভাবত পড়া তৈরি করাটা একটা বাহানা মাত্র, ঐ বাহানায় আমি বাড়িতে থেকে যাই আর রাতে সিনেমা দেখি গিয়ে। বাবা মানবেই না যে রাতে আমি আবাজীকে পড়াই। অবশ্য দোষটা আমারই। আমিই বাবাকে আগে ভাগে বুঝিয়ে রেখেছি যে এবারে আমাকে পুরো ফিসটাই মকুব করে দিয়েছে, চুরি চামারি করার প্রশ্নই উঠছে না। তাই রোজ রাতে আবাজীকে এভাবে না পড়িয়ে আমার উপায়ই ছিল না। আবাজীও তার বাপকে না জানিয়েই আমাকে টাকা দেয়। ওর বাবা মনে করে ছেলে বুঝি আন্দ্যার সাথে মিলেমিশে পড়াশুনা করে, ওর ছেলে কোথায়ও আটকে গেলে বা বুঝতে না পারলে আমি বুঝিয়ে দিই, বেশ তো এক সঙ্গে পড়ুক না। স্কুলেও যে আমার ফ্রীশিপ হয় নি আর আবাজীও যে ওকে পড়াই বলে আমায় টাকা দেয় এ দুটো ব্যাপার তাই গোপনই রয়ে গেল। অনেক সময় "আমি একটু পড়াশুনা করেই আসছি, তুমি ততক্ষণে এগোও" এই বলে বাবাকে আগেভাগে পাঠিয়ে দিতুম মাঠে। কখনও বা এবপব সত্যি সত্যিই যেতুম মাঠে, কখনো একদম যেতুমই না, ডুব মেরে দিতুম। বাবা তাই আমার এসব কথায় একদমই বিশ্বাস করে না। অনেক সময় আমি রাতে এসে আটটা নটার সময় আবাজীকে পড়িয়ে খেয়ে দেয়ে ফিরে যেতুম মাঠে। তাছাড়া বাবার দিকটাও দেখতে হবে, বাবার কথাটাও ঠিক। সত্যি তো আমি না থাকলে বেচারার অসুবিধে হত বৈকি। মাঠে দুজন থাকলে অনেক সুবিধে। চুরি-চামারি ডাকাতি হলে দুজন থাকলে দৌড়ে যাওয়া যায়, একজন অন্যজনকে সাহস জোগায়। পাল্টাপাল্টি করে বিশ্রামও করা যায়। কিন্তু মন এসব যুক্তি সব সময় মানতে চাইত না। আমার মনে হত মাঠে পাহারাটা বাবারই দেয়া উচিত আর আমাকে ঠিকমত পড়তে দেয়া উচিত। সাত-আটটি সন্তান বাবা-মার, কিন্তু ওদের ভেতব একজনও মাঠে কাজ করবার উপযুক্ত হয়ে উঠল না, ফলে বাবার আর আমার ওপর সব বোঝাটা পড়ল এসে। প্রায়ই আমার মনে আক্রোশ ফেটে পড়ত, যদি খেতেই দিতে না পারবে তবে এরা এতগুলো বাচ্চার বাপ-মা হতেই বা গেল কেন? তার জন্য আমি কেন আমার পড়া বন্ধ করব? কেন আমি এরজন্য আমার পড়ার ক্ষতি করব? চারিদিক দিয়ে আমি যেন কোণঠাসা হয়ে গেছি। এ যন্ত্রণা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে।

স্কুলে যেতে প্রায়ই দেরী হচ্ছিল। ভোর হতে না হতেই আমি বাসি ভাখরি দই আর লঙ্কার চাটনি দিয়ে খেয়ে মাঠে দৌড় লাগতুম, সেখানে কোমর বেঁধে কাজে নেমে একটানা এগারটা অবধি চলত, ততক্ষণে মা এসে যেত খাবারের ঝুড়ি নিয়ে। মার আসতে যত দেরী হত আমার ততই মজা হত, অবশ্য দশটা সাড়ে দশটার ভেতর মা ঠিক এসেই পড়ত। মা আসতেই বাবা বলত, "নে, কাজ বন্ধ কর।" আধঘণ্টা কাজে বিরতি, এখন জলখাবার সময়। তারপর মাঠে জল ছাড়ার পালা,

সেটা চলবে প্রায় বারটা অবধি, ততক্ষণে স্কুলে ওদিকে ফার্স্ট পিরিয়ড হয়ে গেছে, সেটা আমার করা হল না। ইংরেজির ক্লাস করতে না পারলে মন ছটফট করত। আমি বাবাকে বলতুম জল দিয়ে যাই, বন্ধ করে দরকার নেই। একটানা চলুক। মাঝখানে আধঘণ্টা বন্ধ করে কোনো লাভ হয় না, বরং শেষের দিকে না হয় আধ ঘণ্টা আগে জল দেয়া থামিয়ে দিলেই হবে। মাঝে আধ ঘণ্টা বন্ধ করে আবার জল চালু করতে অযথা অনেক সময় বেরিয়ে যায়, তাছাড়া তাতে লাভটা কি? সব সময়ই যে· বাবা বুঝত না, তা নয়। কখনো সখনো বুঝত আর এ ব্যবস্থা মেনেও নিত। কখনো আবার আমার চালাকিটা ধরে ফেলে বকে বসত, "আমাকে উপোসী রেখে তুই পড়বি ভাবছিস?" আর তারপর দিত গাছে জল দেয়া বন্ধ করে। এসময়টায় আমি বাবার সঙ্গে জলখাবারটা সেরে নিতুম। অন্য সময় শিবাকে বলতুম, "একটু জলের দিকে যা, বাবা জলখাবারটা খেয়ে নিক, আমি কুয়োটা দেখছি। এভাবেই জল ছেড়ে আমি আধঘণ্টা আগেই জলের কাজটা সেরে ফেলতুম আর খাবার যা আনা হত ভাখরি, সবজি একটুকরো কাপড় বেঁধে স্কুলের থলেতে ফেলে দিয়েই স্কুলে ছুট মারতুম। দুপুরে পনের মিনিটের ছুটির ফাঁকে বাগানে কোনো একটা গাছতলায় বসে খেয়ে নিলেই হত। কাছে পিঠের গাঁ থেকে তিনটি ছেলে আসত, ওরা যেখানে বসে খেত আমিও সেখানে খাওয়াটা সেরে ফেলতুম।

আমার অবস্থা দেখে মা বেচারার কষ্ট হয় বুঝতে পারি। মা ভাবে সকাল থেকে খেটেও শেষ পর্যন্ত সেই শুকনো ভাখরি আর শুকনো তরকারিই আমার কপালে জোটে। এ নিয়ে মার ভারি কষ্ট হয় মনে। আমি এক হাতা ভাত, ডাল, দই, ঘোলও খেতে পাই না, দিন দিন রোগা হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি। আমার গাল বুড়োদের মতো ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। এদিকে বয়স তো মাত্র সতের পেরিয়ে আঠার। দেখতে ঠিক যেন তালপাতার সেপাই, মাথায় বেড়েই চলেছি। আগে তবু রোজগারের টাকা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে কিছু কাপড় জামা কিনতুম, এখন সে টাকা স্কুলের ফিস দিতেই চলে যাচ্ছে। পরনে ছেঁড়া জামা-কাপড় ছাড়া কিছু জোটে না। অবশ্য ওগুলো নিয়ে আমি খুব একটা ভাবতুম না, ঐ পরেই স্কুলে চলে যেতুম।

চিন্তায় অস্থির হয়ে মা মাঝে মাঝে বলত, "আন্দ্যা, আর কত কষ্ট করবি? এত খেটেও পেটে তো একটা দানাও পড়ে না তোর। খালি পেটে স্কুলে যাস। স্কুলের জন্যে এভাবে মরে কি লাভ? ঐ পোড়া স্কুলটা আগুন দিয়ে দে জ্বালিয়ে, শেষ করে দে, তাহলে যদি তোর পরাণটা বাঁচে। গায়ের মাংস সব যেন কাকে কুকুরে খাবলে খেয়েছে, শরীরে মাংস বলতে তো কিছু নেই। তোর শরীর কবে যে সারবে," কান্নাকাটি করে মা বলত। এর জবাবে আমি বলতুম, "এ কথাটা তোমার কর্তাকে বল না গিয়ে। এত খেটেও তো ওর মন পাই না, ওর দয়া হয় না। বাবা ভাবছে আমি আরও বেশি করে খাটি না কেন, তাহলে তো নিজে বেশ বসে বসেই পেটের অন্ন জোগাড় হয়ে যায়।" আমার কষ্টটা যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যেত, তখন এক-একসময় মা আর থাকতে পারত না, বাবার সাথে এ নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে বলত, "মাঠে জল আরও সকাল সকাল ছাড় না কেন? বছর দেড়েক খেতে যা হোক করে কাজ

তুলে দেয়া যাবে, তার জন্যে ছেলেটার সারাটা জীবন এভাবে নষ্ট করো না। এভাবে শুকিয়ে গেলে বাছা আমার আর বাঁচবে না। স্কুল থেকে ফেরার পথেই হয়তো বা কোথাও পড়ে মরে থাকবে।"

"হারামজাদী! আমাকে বুদ্ধি দিচ্ছিস? ঐ হারামজাদার স্কুল বন্ধ করে ওকে খাটিয়ে আমি খাচ্ছি একথা তুই হারামজাদী কোন্ মুখে বলিস? তুই মাগী ওর স্কুলের জন্যে দায়ী। তুই ওকে কানে ফুসমন্তর দিয়ে ওর মাথায় স্কুলের ভূত ঢুকিয়েছিস। এখন ও যদি মরতে মরতেও স্কুল করে তাতে আমার কি করার আছে? মরুক শালা। আমিও দেখে নেব ওর জেদ কতদূর যায়," বাবা রেগে গেলে খিস্তি করে এখনও, তবে আগেব মতো গায়ে হাত তোলে না। আমি এখন মাথায় বাবার মতোই লম্বা হয়েছি, কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে। বাবা মারতে এলে আমি এখন আর ছুটে পালাই না, সামনেই সোজা দাঁড়িযে থাকি। মাবলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাই, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকি। চোখ দিয়ে এখন আর এক ফোঁটা জলও পড়ে না। বাবা এসবই দেখত, জানত। এখন ভেতবে ভেতরে উল্টে ও আমাকেই ভয় পায়, খুব রেগে না গেলে এখন আর আমার গায়ে হাত তোলে না। হাত দিয়ে মারা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে বলা যায়। এখন ধরেছে চাবুক আর নয়তো গোরুমোষদের পিঠে যে লাঠি দিয়ে মারত সেটা। সেগুলোই তোলে। হাজার চেষ্টা কবেও একদিনও আমি সময়মত স্কুলে যেতে পারতুম না, দেরী হয়েই যেত। মানে মাস্টার ছিলেন স্কুলে বেজায় কড়া— স্কুলের দরজায় এক হাত লম্বা ছড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যারাই দেরী করে আসত নিজে থেকেই হাতটা ওঁর দিকে বাড়িয়ে দিত আর মার খেত, ছড়ির মার সয়ে মার খাওয়া হাত নাড়তে নাড়তে কোনোরকমে ক্লাসে গিয়ে বসে পড়ত। আমাব কপালে এ অভ্যর্থনা নিত্যকাব ব্যাপার ছিল।

"স্যার, আমি চাষের কাজ সেরে দুমাইল হেঁটে আসি। দৌড় এলেও দেরী হবেই, স্যার্", এসব বলতুম বটে, কিন্তু ওতে চিঁড়ে ভিজত না। উনি বলতেন, "নিয়ম নিয়মই। ও সব আমি জানি না। একটু তাড়াতাড়ি আসবার চেষ্টা করিস, এখন চট্‌পট হাতটা বাড়াও তো বাপধন।" আমি আর কী করি নিরুপায় হাত যথারীতি এগিয়ে যেত আর ওঁর ছড়ির দাগ নিয়ে ক্লাসে ঢুকত। মাঝে মাঝে এক-আধদিন আমিও একটু চালাকি করতুম। স্কুলের পেছন দিকটায় দুটো ফাঁকা প্যাসেজ ছিল, তবে এ প্যাসেজ দিয়ে ঢুকতে হলে আধ ফার্লং আগেই স্কুলের সদর রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বনের ভেতর ঢুকতে হত আর স্কুল দালানটা একবার চক্কর মেরে তবেই স্কুলে ঢোকা যেত। খুব দেরী হয়ে গেলে মার এড়াবার জন্যে এভাবে স্কুলে ঢুকেছি কখনো সখনো। এভাবে ছড়ির মার থেকে যদি বা রক্ষে পেয়ে গেছি, আক্কোলকর মাস্টারমশায়ের ইংরেজির ক্লাস কিন্তু ঠিক কামাই আমার হতই। ততদিনে বছরটাও আদ্ধেক কেটে গেছে।

আমার যথাবীতি যেদিনই স্কুলে যাই, দেরী হয়ে যায়। আক্কোলকার মাস্টারমশায়ের ক্লাস আবার সব সময় গোড়ার দিকে পড়ত। উনি পড়াতে পড়াতে মজে থাকতেন, দরজা ভেজান থাকত, তার ওপর আমি গিয়ে টক টক টোকা মারতুম। পড়াতে পড়াতে বাধা আসত। যেমন মন ঢেলে পড়াতেন তেমনি বদরাগী ছিলেন এই মাস্টারমশায়।

যে দেরী করে আসত সে টোকা মেরে ভেতরে আসবার অনুমতি চাইত। যারাই এভাবে দেরীতে আসত, উনি ওদের ওপর খচে ব্যোম হয়ে যেতেন। আমার ওপর এমনিতেই ওঁর একটা রাগ ছিল, দু একবার আমাকে আচ্ছা করে বকুনিও দিয়েছিলেন। আমাকে সবই সইতেই হবে, আমি চুপচাপ সয়ে গিয়ে কোনো কথাটি না বলে মেয়েদের পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসতুম। একবার তিনি আমায় ভেতরে ঢোকালেন বটে কিন্তু পড়তে দিতে নয়। গালে এক থাপ্পড় লাগিয়ে ইংরেজিতে গাল দিয়ে যা বললেন তার অর্থ হচ্ছে 'হতভাগা, নচ্ছার, বেরিয়ে যা এখান থেকে' বলেই মুখের ওপর দরজা লাগিয়ে দিলেন। ক্লাসে ছেলেরা ভয়ে সাদা ফ্যাকাসে মুখে পাথরের থামের মতো স্থির হয়ে বসে রইল। সেদিন থেকে দেরী হয়ে গেলে আমি আর ওঁর ক্লাসে ঢুকতুমই না, ক্লাসের বাইরে জানালাটার ধারেই ছিল প্যাসেজ, সেখানে ইংরেজি বইটা খুলে ভেতরে যা পড়া হচ্ছিল তা মন দিয়ে শুনে যেতুম। উনি যা পড়াতেন বাইরে থেকে তা শোনাই যেত। বরং আমি আরো বেশী মন দিয়ে পড়াটা ধরতে পারতুম। মাস্টারমশায়কে দেখা যেত না, শুধু ওঁর গলার আওয়াজ আসত বাইরে। মাস্টারমশায় আমাকে একটা প্রশ্নও করতে পারছেন না, ছাত্ররাও আমার অপমান দেখতে পাচ্ছে না। কেবল আমি আর আমার বই। আমার অবস্থা অনেকটা একলব্যর মতো, মাস্টারমশাই জানতেনই না যে ওঁর পড়ানোটা আমি ওঁর অজান্তেই শুনে শিখে নিচ্ছি। পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে বই বন্ধ করে আমি চুপ করে আড়ালে গা ঢাকা দিতুম, উনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলে ক্লাসে ঢুকে ভালমানুষের মতো বসে অন্য পিরিয়ডগুলো মন দিয়ে ক্লাস করে যেতুম। আমার এই চুরি বিদ্যে দেখে ক্লাসের অন্য ছেলেরা বেশ মজা পেত, হাসাহাসি করত। যারা বেশি জোরে হাসত অর্থাৎ টিটকিরিটা বেশি হয়ে যেত তাদের আমি আলাদা করে আমার নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলতুম। এমনিতেই ধীরে ধীরে ওরা আমার অসহায় অবস্থার অনেকটাই এর মধ্যে জেনেই গেছে, তাই আস্তে আস্তে আমাকে নিয়ে ওদের হাসাহাসি টিটকিরিটা বন্ধ হয়ে এল, সবাই চুপ হয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া লেখাপড়াতেও আমি যে খুব একটা খারাপ নই সেটাও সবারই এতদিনে জানা হয়ে গেছে। এরপর ক্লাসে আমার দেরী করে আসাটা সবার সয়ে গেল।

মুস্কিল দেখা দিল অন্যভাবে। আকোলকর মাস্টারমশায় শুধু যে ইংরেজি পড়াতেন তা নয়, ইতিহাসও পড়াতেন। ইতিহাসের ক্লাসে আমাকে পড়া জিজ্ঞাসা করতে গিয়েই উনি জিজ্ঞেস করতেন, "কি রে ইংরেজির ক্লাসে আসিস নি কেন?"

"আসতে দেরী হয়ে গেল, তাই আসা হয় নি।"

"সে তো তোর রোজকার ব্যাপার। তা এরকম হ'লে ইংরেজিটা শিখবি কি করে?"

"ইংরেজিটা আমি বাড়িতেই পড়ে নিচ্ছি।"

আমার এ জবাব শুনে অবশ্য ওঁর আর বলার কিছু থাকত না। তবে উনি লক্ষ্য করে দেখেছেন আজকাল রোজই আমি ওঁর ইংরেজির ক্লাসটা কামাই করছি অথচ ইংরেজি পড়াটা ঠিকই করে যাচ্ছি। এতে মনে মনে ওঁর খুব অপমান হচ্ছে। ইতিহাসের ক্লাসে ঠিকই হাজির আছি। ইংরেজি ক্লাসে কামাই করাতে ওঁর যে রাগটা হত, ইতিহাসের

ক্লাসে উনি সে রাগটা আমার ওপর ঝালিয়ে নিতে পারতেন না। তখন তিনি অন্য রাস্তা ধরলেন। এমনিতেই ক্লাসে 'এই চ্যাংড়া' এসব বলে ডাকতেন আমাকে। হয়তো বললেন, "এই চ্যাংড়া, বল তো অমুক ঘটনা কবে কোথায় ঘটেছিল?" বোঝা যেত ভেতরে ভেতরে রেগে রয়েছেন, বাইরে কিছু করতে পারছিলেন না। তাছাড়া এবার তিনি ক্লাস-টিচারও নন যে স্কুলের ফিস বাকি পড়েছে ব'লে রোজই পেছনে লাগবেন। এরকম যখন চলছে তখন একদিন পনেব মিনিটের ছুটি শেষ হবার ঠিক আগে হেডমাস্টার মশায় চাপরাসী দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি ক্লাসে বসে বসে আপন-মনে পড়ছিলুম, ডাক এসেছে শুনে ভয়ে হাত পা হিম হয়ে গেল, বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠল। মাস্টারমশায়রা আমার সাথে রেগে কথা বললে আমি কোনোদিনই ঠিকমতো জবাব দিতে পারতুম না। ঘটনাটা হঠাৎ হত বলে আমি থতমত খেয়ে যেতুম আর কেবলি না স্যার, না স্যার বলে যেতুম। এইসব টিচারদের কাছে মনের কথা খুলে বলব এমন ভরসাও পেতুম না।

হেডমাস্টারমশায়ের ঘরে গিয়ে দেখি আক্কোলকার মাস্টারমশায় পাশে বসে আছেন। আমার তখনই অবস্থা কাহিল হয়ে এসেছে।

"কি রে যাকাতে?"

"কি, স্যার?"

"কি স্যার, আবার কি? সোজা হয়ে দাঁড়া। ভাল অভ্যেস কিছুই হয় নি দেখছি?"

আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না, আমি তো আমার অভ্যেসমতো সোজাই দাঁড়িয়েছিলুম। ডান পায়ে ভর দিয়ে হাত পিঠের দিকে ভাঁজ করে দাঁড়িয়েছিলুম। মাস্টাবমশাই ওরকম করে বলাতে সঙ্গে সঙ্গে দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালুম। "হাত পেছনে রেখেছিস কেন? ছাড়। বড়দের সামনে কি করে দাঁড়াতে হয় তাও জানিস না? ঘরে ঢুকে বড়দের নমস্কার করতে হয় কি হয় না? রাস্তার চ্যাংড়া ছেলেদের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেই হল?"

বুঝলুম কথাটা হেডমাস্টারমশায়ের নয় একটা আক্কোলকার স্যার-এব কথা। তিনি হেড স্যার-এর মুখে কথাটা গুঁজে দিয়েছেন। আমি আর কি করব, দুহাত দিয়ে দুজনকে নমস্কার করে হাত দুটো ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। নিশ্চয়ই খুব অদ্ভুত আর আড়ষ্ট লাগছিল আমাকে।

"তুই মেয়েদের নিয়ে ইয়ার্কি করিস?"

"না, স্যার।"

"না, স্যার আবার কি? আমাব কাছে তোর নামে নালিশ এসেছে।"

আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি, কি বলব বুঝতেই পারছি না। তাও জবাবে বললুম, "কোনো মেয়ের নালিশ থাকলে তাকে আমার সমানে ডাকুন না হয়।"

"সামনে আবার কেন ডাকব? আবদার দেখ না, বলে কিনা সামনে ডাক। কেন, তুই তো রোজই ওদের পেছনেই বলিস ওদের কথাবার্তা, ওদের চলাফেরা মন দিয়ে শুনিস আর দেখিস। তোর কি ক্লাসে যে পড়া হচ্ছে তাতে মন থাকে নাকি?"

"না, স্যার।"

"না আবার কি? এই তো মাস্টারমশাই এখানেই তো বসে আছেন।" হেডমাস্টার মশায় আক্কোলকার স্যারকে দেখালেন। আমি আর কিছু বলতে পারলুম না, একেবারে চুপ মেরে গেলুম কেউ যেন আমার মুখ চেপে ধরে আছে।

"চ্যাংড়াদের মতো লম্বা লম্বা চুল রেখেছিস, জামাকাপড় ময়লা। ক্লাসে ভদ্রভাবে থাকবি, পড়ার দিকে মন দিবি। ভাল কথা, ইংরেজির ক্লাসে আসিস না কেন?"

"মাঠে চাষবাসের কাজ করতে করতে দেরী হয়ে যায়, স্যার" চোখ দিয়ে তখন জল পড়ছে। এ অন্যায় অপবাদে আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, কথা বলতে গিয়ে তা গড়িয়ে পড়ল।

সেটা দেখে স্যারের মনে হয়তো দাগ কাটল, মুখে বললেন, "যা, ন্যাকামি করে আর কাঁদতে হবে না, স্কুলে সময়মত আসবি।"

ঘরের বাইরে এসে আর চোখের জল আটকে রাখা গেল না, আমি খুব কাঁদতে লাগলুম। সংস্কৃতের ক্লাস ছিল, এ অবস্থায় তো আর ক্লাসে যাওয়া যায় না। যাওয়া মানেই হচ্ছে ছেলেদের সামনে বোকা বনে যাওয়া। ক্লাসে না গিয়ে তাই বাগানে গিয়ে বসলুম, চারিদিক নিঝুম, চুপচাপ এখানে। আমি কেঁদে কেঁদে বসেই রইলুম সেখানে বোকার মতো। আমার লম্বা হাতার সার্টটার কনুইয়ের দিকটা ছেঁড়া। আমি ছেঁড়া জায়গাটা ঢাকবার জন্যে হাত গুটিয়ে হাফ সার্ট-এর মতো করে পরি। আমাদের যা অবস্থা তাতে জামাকাপড়ে রোজ রোজ সাবান তো দেয়া যায় না, লাল মেঠো রঙের মাটির দাগ জামাতে তাই লেগেই থাকত। আবার মাঠের কাজেই হোক আর স্কুলে যাবার জন্যেই হোক, জামা তো সবে মাত্র ঐ একটিই। মাঠে কাজ করে করে জল ঘেঁটে ঘেঁটে হাত-পাগুলো যেন এক্কেবারে খরখরে। একটুখানি তেল দিতে হয়। আমার চুল বাড়াবার ইচ্ছে ছিল, যদিও জানতুম হেডস্যার ছেলেদের লম্বা লম্বা চুল মোটে পছন্দ করেন না। উনি নিজে চুলের ছোট ছাঁটই ভালবাসেন। একবার মনে আছে প্রার্থনার সময় একটি ভাল ছাত্রকে ওর উড়ু উড়ু চুলের জন্য ভীষণ বকুনি দিয়ে বলেছিলেন পরের দিন স্কুলে চুল ছোট করে না এলে বাগানের মালীর কাঁচি দিয়ে উনি নিজেই ছেলেটির চুল ছেঁটে দেবেন। এ গল্প আমি জানতুম আর সেজন্যই আমার নিজের চুলের জন্য ভয় ছিল সবসময়। তখনই মনে হয়েছিল কে জানে এই লম্বা চুলের জন্যই হয়তো আমি ফ্রীশিপ পাচ্ছি না। তবে একটা ভুল আমি করে ফেলেছিলুম সেটা এখন বুঝতে পারছি। গেল বছর স্কুলের অনুষ্ঠানে দু তিনটি ছেলের পাল্লায় পড়ে ক্যারিকেচার করেছিলুম। ছেলেমানুষ ছিলুম, হেড স্যার সমেত সব টিচাররাই আছেন দেখে ওদের সামনে আমার বাহাদুরিটা একটু দেখাবার লোভ সামলাতে পারি নি। ভেবেছিলুম এভাবে যদি ওঁদের একটু খুশি করা যায়, একটু ভালবাসা পাওয়া যায়। পাঁচ সাতটা ক্যারিকেচার করেছিলুম মনে আছে, তাদের ভেতর একটি মেয়েদের নিয়েও ছিল। ওরা কি ক'রে টিপ পরে, চুল আঁচড়ায়, সাজগোজ করে এসব করে দেখিয়েছিলুম। এর আগে এই স্কুলেই এ ধরনের কমিক কেউ একজন করে গেছে, এ বিদ্যে, তা আমার ওকে দেখেই শেখা, নইলে কোনো মেয়েকে কি আমি সামনে থেকে কাজল কুমকুম দিতে দেখেছি, না স্নো পাউডার মাখতে দেখেছি? আমার সেবারকার

ঐ ক্যারিকেচার ছেলেদের কিন্তু খুব পছন্দ হয়েছিল। আক্কোলকার স্যার সামনের দিকে বসেছিলেন। চোখ বড় বড় করে দেখেছেন আর হয়তো ভেবেছেন আমি বোধহয় ক্লাসে মেয়েদের পেছনের বেঞ্চে বসে এসবই দেখি আর তাই থেকেই এ কমিক শেখা। সব কিছুই উল্টো বুঝিলি রাম হয়ে গেছে দেখে ভাবলুম চুপ করে থাকা ছাড়া এখন আর অন্য রাস্তা নেই, অবস্থা বিপাকে পড়ে পড়ে মার খেতেই হবে মুখ বুজে।

দম বন্ধ হয়ে আসছিল কিন্তু আমার সত্যিকারের অবস্থাটা কাউকে কি বোঝাতে পারছিলুম? সেই সময়েই মনে হল ইস্। আমি যদি কোন বামুনের ঘরে জন্মাতুম সে গরীবই হোক না কেন বামুন হলেই হল, তাহলে ঘরে বসে পড়তেও পেতুম, গায়ে ধোয়া জামাকাপড়ও চড়ত, সময়মতো স্কুলেও যেতে পেতুম। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে গিয়ে আমায় এত বেগ পেতে হত না। বাবা মাও আমার স্কুলে পড়ায় এত ওজর আপত্তি তুলত না, এত বাধাসৃষ্টি করত না। তাছাড়া সবচেয়ে বড় কথা ফুল ফ্রীশিপটাও নিশ্চয়ই জুটে যেত কপালে। তখন মনের সুখে পড়াশুনাটাও চালিয়ে যাওয়া যেত আর সেই সঙ্গে ছাত্র ভাল ছিলুম বলে নাম যশও ছড়াত বৈকি চারিদিকে!

যাকগে, এ হাজারো ঝামেলা ঝঞ্ঝাট বাধা বিপত্তির মাঝেও আমি ক্লাস টেন এর পরীক্ষা ঠিকই দিলুম আর পরীক্ষা শেষে খোলা বাতাসে দাঁড়িয়ে বুক ভরে একটা নিশ্চিন্ত আরামের নিঃশ্বাস নিয়ে মনটাও হালকা করলুম।

নয়

ক্লাস টেনের পরীক্ষার পর একটু হালকা হয়েছি, পড়ার চাপ নেই। মাঠে আমি আর বাবা দুজনে মিলে লাঙল চালাই। এদিকে বোশেখের রোদ ক্রমেই চড়ছে, রোদের ঝাঁজ গায়ে লাগছে বেশ। তৈরি আখের গাছের ছোট ছোট কচি পাতা আর গাছগুলোর মধ্যিখানের আগাছাগুলো টেনে তুলে মা আমাদের দুধেল মোষদের যত্ন করে খাওয়ায়, আর বদলে ওদের থেকে পোয়াটাক বা আধসের খানেক দুধ বেশি আদায় করে নেয়। গরমের সময়, দুধের দাম সাড়ে ছ'আনা থেকে সাড়ে সাত আনায় উঠেছে। তাই মা আর অন্য ভাইবোনেরা সবাই মিলে এ কষ্টটুকু করছে। মার চার-চারটে ছেলেপিলে মিলেমিশে চার-চারটে করে ডালপাতা তুলে আনলেও তো আমাদের গোরু মোষের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

এইসব ছেলেপিলের দলে ধোণ্ডুবাঈ কখনও থাকে, আবার কখনো থাকেও না। তখন সে হেঁসেল সামলায় পুরোপুরি। বেলা গড়িয়ে চারটে বাজতে না বাজতেই মা ধোণ্ডুবাঈকে একা একা বাড়ির দিকে পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গে দিয়ে দেয় জ্বালানি কাঠের গোছা, নয়তো কোনো কোনোদিন তরকারির ঝুড়ি। মা ওকে রাতের খাবার রান্না করতে লাগিয়ে দিত। সকালে রান্না হয়ে গেলে ধোণ্ডু বারটার সময় মার সঙ্গে মাঠে চলে আসত, সঙ্গে আনত ছোট্ট আনসাকে। রান্নার কাজ ছায়াতে ছায়াতে হত বলে ধোণ্ডুর গায়ের রঙ রোদের তাতে পুড়ে তামাটে হয়ে যায় নি। ঘরেই সব সময় থাকত বলে ওকে গলা তুলে চেঁচিয়ে কখনো কথা বলতে হয় নি। ধোণ্ডুবাঈ তাই খুব আস্তে আস্ত যেটুকুনি দরকার ততটুকু কথাই বলত, বেশি কথা বলত না। ওর এখন এগাব সাড়ে এগার বছর বয়স হয়েছে অর্থাৎ বিয়ের যুগ্যি হয়েই গেছে। গলিতে ওর বয়সী অনেক মেয়েদেরই বিয়ে হচ্ছিল এ তো ধোণ্ডুবাঈ কাছে থেকেই দেখেছে।

আমি যখন বাড়িতে থাকতুম তখন আমি আব ধোণ্ডুতে মিলে গাঁয়ের একটা চৌবাচ্চা থেকে জল তুলে আনতুম। চৌবাচ্চাটা বেশ দূরে ছিল, প্রায় দেড় দু ফার্লং হবে। সেখানে চার-পাঁচটা পাড়ার লোকও একই সঙ্গে জল নিতে আসত। এতগুলো লোকের মাঝে যেমন যেমন লাইন এগোবে তেমন তেমন জল তুলবে, ততক্ষণ এর ওর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দাও আর সময় কেটে যাক। জলের ভীড় লেগে যেত সেই ভোর পাঁচটা থেকে। মার পেটে আবার বাচ্চা এসেছে, পাঁচ মাস হবে। আগের মতো যাওয়া আসা করতে পারে না এ শরীর নিয়ে। বয়সও তো কম হোল না, চল্লিশের ওপর হবে। ভোরে মা ঘরের কাজে হাত দেয় আর আমাকে আর ধোণ্ডুকে পাঠায় জলের ধারে।

ধোণ্ডুবাঈর বয়সী মেয়েরা অনেকেই আসে জল তুলতে। এদেরই ভেতর কয়েকজনের আবার গেল বছর সবে বিয়ে হয়েছে, ওরা বেশ সেজেগুজে নতুন কাপড় পরে পরিপাটি হয়ে চলে আসত। ওদের বাপ মা বিয়ের দু চারমাস আগে থেকেই বাড়িতে একটু

ছায়ার মধ্যে রাখত ওদের। এতে এটুকুই হত যে রোদে গায়ের পুড়ে যাওয়া চামড়া একটু পরিষ্কার, একটু ঝলমল করত। বিয়ের পর একটি মাস ওদের কেউ কাজে পাঠাত না, তাই গায়ে একটু মাংসও লাগত, চেহারা ভাল হত। গলায় মঙ্গলসূত্র, গায়ে নতুন শাড়ি ব্লাউজ, হাতে পায়ে গয়না চাপিয়ে ওরা যখন আসত, দেখতে ওদের তখন লাগত বেশ। ফুলের মতনই সুন্দর। ধোণ্ডুবাঈ ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। ওর মনের ভেতর তখন একটা নতুন অদেখা অজানা স্বপ্নের আভাস উঁকিঝুঁকি মারত। এই দলের নতুন বৌদের কারো কাছে গিয়ে ওদের নতুন গাঢ় রঙের শাড়ির আঁচল হাত ধরে জিজ্ঞেস করত, "বিয়ের শাড়ি?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি।"

"আঁচলটা ভারি সুন্দর তো," ধোণ্ডুবাঈ বলত আর সেই সঙ্গে পারলে একটা অলংকারও হাত দিয়ে ধরে দেখত। জলের লাইন এগিয়ে ওর সময়টা আসতে দেরী থাকলে ধোণ্ডুবাঈ কারো পায়ে পরা মল বা হাতে পরা সোনার চুড়ি খুলে নিজে পরে দেখত এগুলো কেমন দেখাচ্ছে, কেমন মানাচ্ছে ওর হাতে পায়ে। মনের ভেতরকার অস্পষ্ট স্বপ্নটা এবার যেন আরও পরিষ্কার হয়ে আসছে। গলির কোনো মেয়ের বিয়ে হলে ধোণ্ডু নির্ঘাত যাবে ওর গায়ে হলুদ লাগাতে, হলুদের জল দিতে, গান গাইতে। ঘরের সব কাজকর্ম তখন চুলোয় যাক, ও তখন এ কাজে মশগুল হয়ে থাকত।

ঘরে ধোণ্ডুকে খুবই খাটতে হত। মার বুকে আর সেরকম দুধ আসে না, রোদে রোদে ঘুরে, কাজ করে বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে। বাচ্চাদের তাই অন্য দুধ দিতে হয়। কুড়িয়ে পাওয়া সমুদ্রের ঝিনুক দিয়ে ধোণ্ডু আনসাকে দুধ খাওয়াত, তাতেও আনসার কান্না থামতে চায় না। একটু একটু করে জল মেশানো দুধে আনসার খিদে মেটে না, তখন ধোণ্ডুকেই চেষ্টা করে কোনোরকমে ওকে চুপ করাতে হয়। হেঁসেলের সব কাজ করে তারপর বাইরের কাজ করেও ও যখন সবার শেষে খেতে বসে, অনেক সময়ই ভাত বা তরকারির ভাগ ওর ভাগ্যে জোটে না। আধপেটা খেয়েই মেয়েটা উঠে পড়ে। এই সময় মার ওপর ভীষণ রাগ হত ওর, বলত, "তোর ছেলেমেয়ের জন্য আমি আর কত করব? এত করেও আমার পেট ভরে না। জন্মাবার পরই মাটিতে গর্ত করে আমায় পুতে দিলি না কেন?" ঐটুকুনি বয়সেও ধোণ্ডুর এত পাকা পাকা কথা মুখে এসে যেত। হয়তো আশেপাশে কারো মুখে শুনে থাকবে এ ধরনের কথা, আর তা শুনে শুনেই ও-ও তাই শিখেছে। মা কিন্তু এসব শুনে বেজায় দমে যেত, তবে ধোণ্ডুর মনের আসল ইচ্ছেটার একটা আঁচও সেই সঙ্গে পেয়েছিল বলেই ঠিক করে ফেললে এ বছরেই ধোণ্ডুর বিয়েটা দিয়ে দেবে।

দুতিনটে করে সম্বন্ধ আসছে, আবার ওরা সবাই একটু-আধটু নগদ টাকা চায় বলে ছেড়েও দিতে হচ্ছে। বাবার ছোট বোন আকসি থাকত সিদ্ধনেলীতে। সেও ওরই জানাশোনা একটা সম্বন্ধ এনে দিয়েছে। সাধারণ পরিবার, দিন মজুরি করে। তিনটি ভাই, দেড় একর জমি আছে। তিনজন আলাদা হয়ে গেল প্রত্যেকের ভাগে আধ একর মত জমি পড়বে। যে যার মতো আলাদা আলাদা কাজ করে ভাইরা। কাছে পিঠের আখের খেত থেকে ডালপাতা চেয়ে চিন্তে এনে ফেলে দেয় বাড়ির

গাই মোষগুলোর সামনে। তারপর যে যার কাজে চলে যায়। বৌরা গোরু মোষ চরায়, গোবর কুড়োয়, ঘুঁটে দেয়। দিনে দুবার মোষ দুইয়ে রাতে দই পেতে পরের দিন সকালে তিনচার মাইল দূরে কাগলে এসে 'দই চাই দই চাই' হেঁকে হেঁকে বেচে ফিরে যায় নিজেদের গাঁয়ে। বেচতে না পারলে, খদ্দের না পেলে আর কী করবে, বৌরা ওতে জল দিয়ে, ঘোল বানিয়ে ফেলত, আর তা থেকে মাখন তুলে যত্ন করে রেখে দিত। তারপর মাখন তোলা সেই ঘোলে চালের খুদ মিশিয়ে ছেলেপুলেকে খাইয়ে দিত। ওদের গাঁয়ে ধানের ফলন ভালই ছিল, চাল হত প্রচুর। মা তাই ভাবলে ধোণ্ডু আর কিছু না হোক ভাল করে ভাত আর ঘোল খেতে তো পারবে পেট পুরে। এসব ভেবে চিন্তেই এখানেই মেয়ের বিয়ে দেবে ঠিক করে ফেললে। ছেলেও মার মনে ধবেছে, নাক টিকোলো, গোরুর মতো বড় বড় শান্ত চোখ, শরীর খুব তাগড়াই। মা ভাবলে গোরুর মতোই নিরীহ হবে জামাই তার। ধোণ্ডু মাঠে কখনও খাটে নি, ঘরেই ছিল। মা ভাবলে ধোণ্ডুর স্বামী ধোণ্ডুকে গতরে খেটে খাওয়াবে। আমার কিন্তু ছেলেটিকে তেমন পছন্দ হয় নি। তাহোক, আমি কিছু আর বললুম না, মার মতে মত দিয়ে সায় দিয়ে গেলুম। যতই হোক বিয়ে বলে কথা। কুটুম বাড়ির মান রেখে চলতে হবে, বেশি কথা বললে চলবে না।

এ সম্বন্ধটা মা-ই প্রথম দেখে এল। বড় মেয়ের আর হীরার বিয়েও মা-ই আগ বাড়িয়ে পাকা করিয়েছিল। বাবা এসবে নাক গলাত না, দূরে দূরে থাকত। খুব একটা যে বুঝত এসব ব্যাপার, তাও নয়। কেনাকাটার ফর্দ করতে বললেই বা সে ফর্দ দেখলেই মাথায় রক্ত উঠে যেত, আর সে রাগ ফলাতে গিয়ে প্রায় সবই ভণ্ডুল করে দিত। তবুও নিজের বৌ যা করছে তা করতে দিত, কারণ এভাবেই নিজে অনেক ঝঞ্ঝাট আর ঝামেলার হাত থেকে বেঁচে যেত। দেয়ালের ভেতরের এ গর্তে সে গর্তে মা যা একটু আধটু সোনার গয়না বা টাকাকড়ি সংসার খরচ থেকে বাঁচিয়ে সরিয়ে রাখতে পারত তাই দিয়ে পুরো কাজটা মোটামুটি হয়ে যেত, বাবার নগদ টাকায় হাত পড়ত না, বাবা এতেই খুশি। তাছাড়া, কিছু গড়বড় হলেই বৌকে গালাগাল দিয়ে সবদোষ বৌয়েব ঘাড়ে ফেলতে পারে। বাবা তাই নিজে থেকে কখনই মেয়েদের বিয়ের কথা তুলতই না। মাও কম একরোখা নয়, যা করবে বলে ভেবে রাখত তা করেই দেখাত। নিজের ছেলেপিলেদের হাতে হাতে কাজটা ভাগ করে দিত, অন্য কোনো গুরুজনদের, যেমন বাবা বা মামা, কাউকে আর এ কাজে নাক গলাতে দিতই না। জ্ঞাতিরা লোক মোটেই সুবিধের নয় মা জানে, তাই এসবের খবর ওদের জানতেই দেয় না। মার মনে ভয় ছিল এসব জ্ঞাতিরা আমাদের বাড়ির ভেতরকার সব খবর পাত্রপক্ষের কানে তুলবে নয়তো এবং তার ঘরেও বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে বলে বসবে, চাই কি কোন্ মেয়ে দেখিয়ে এ সম্বন্ধ ভেঙেও দিতে পারে। এ ভয় খুব যে অমূলক তা নয়, মা পোড়খাওয়া লোক, অনেক দেখেছে, ভুগেছে। তবে অনেক সময়ই প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সাবধান হত আর সন্দেহ করত।

একদিন আমার হাতে একখানা কাগজ গুঁজে দিয়ে মা বললে, "আন্দা, তুই তো কিছু লেখাপড়া শিখেছিস, আর সিদ্ধনেলীতে তোর কিছু বন্ধুবান্ধবও আছে। যা তো

বাবা, এ জমির কাগজটা নিয়ে আর দেখে আয় তো সত্যি সত্যি ওদের নামে কতটা জমি আছে। তাছাড়া এ জমি বন্ধক দিয়ে এখান থেকে সেখান থেকে টাকা ধার করেছে কিনা সে খোঁজও নিয়ে আসবি। দেখিস, তোর পিসির কানে যেন এসব না যায়, ও যেন জানতে পা পারে তুই এসব খোঁজখবর নিচ্ছিস, বুঝলি? যা তো বাবা, এবারে একটু কাজ কর, বড় ভাই হয়ে বোনের বিয়েটা দাঁড়িয়ে থেকে দে তো।"

মা এসব বলায় আমাব উৎসাহ প্রচণ্ড বেড়ে গেল, আমি খুব জোর দিয়ে দাদার কর্তব্য পালন করতে লেগে গেলুম, বড় সাজার এ সুযোগ আমি ছাড়ি কখনও? আমি সেখানে গিয়ে সব খবরাখবর নিয়ে ফিরলুম আর তারপরেই বিয়েটা পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে গেল। পাত্রপক্ষকে আমি আগে ভাগেই বললুম, "দেখ, পণ আমরা দিতে পারছি না, তোমাদের বাড়ি তো দেখছি খুবই গরীবের বাড়ি। সারাজীবন আমাদের মেয়েকে অনেকবারই বাপের বাড়িতে আসতে হবে মনে হচ্ছে।"

ঠিক হল তিরিশটা পুঁতির মালা কবা হবে, পায়ের বিছে, চুটকি এসবও থাকবে। কানের জন্যে সোনার ফুল। আসলে বড মেয়ে মাবা যাবার পর ওর বিয়ের গয়না মা চেয়ে নিয়েছিল সে ক'টা গয়নাই ধোণ্ডুবাঈকে পরানো হবে। এখানকার রেওয়াজমত বর আর কনের জামাকাপড় শ্বশুর বাড়ির তরফেই কেনা হবে, বিয়ের খরচও ওরাই দেবে। দুটো গোরুর গাড়ি ভর্তি লোক সিদ্ধিনেলীতে যাওয়া হল। যথাসময়ে ধোণ্ডুবাঈর বিয়েটাও হয়ে গেল। ওর শ্বশুরদের কিছুটা জমি ছিল ঠিকই কিন্তু সংসারটায় কষ্ট আর দাবিদ্র্যও ছিল। ঘরদোর গোবর আর গরুর চোনার গন্ধে ভরে রয়েছে। আমাদের সবাইকে গোরুর খাটালেই বিয়ের খাওযা খাওয়ানো হল। খেতে খেতে যেই না ঝড় উঠল, ব্যস, সবার পাত রাস্তার ধুলোতে গেল ভরে। আমার তো খাবার গলা দিয়ে নাবতেই চাইছিল না। কিন্তু কথাটি না বলে চুপ করে খেয়ে নিলুম। কেতকী রঙের কনে ধোণ্ডুর পাশে ঐ কালো কালো খবখরে ঠোঁটের আর বড় বড় চোখওয়ালা ধোণ্ডুর ববটিকে মোটেই মানাচ্ছিল না, আমার ভালও লাগছিল না ছেলেটিকে। তাও যা হবার তো হলই, বিয়েটা তো হয়েই গেল। ভাল ভাল সম্বন্ধ আসে নি যে তাতো নয়, কিন্তু সবাই পণ চায় আর আমাদেব যা অবস্থা, কাজেই...। বাবা মাঝে মাঝেই রাগ চাপতে না পেরে মাকে গাল দিয়ে ওঠে, "হারামজাদী মাগী, লাইন করে খালি মেয়েছেলে বিইয়ে গেছে, এখন সামলা!" ধোণ্ডুবাঈর বিয়ের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, সে কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুরবাড়িতে রয়ে গেল আর আমাদের দুগাড়ি লোক মনমরা হয়ে মাথা নীচু কবে ক্ষুণ্ণ মনে কাগলে ফিবে এল।

ধোণ্ডুবাঈর বিয়েতে হীরা এল বাপের বাড়ি, কিন্তু ফিরে গেল না বা ফিরতে পারলে না, যেভাবেই বলি না কেন। গা হাত পা ফুলে গিয়ে হীরা খুবই অসুস্থ। স্বামীর ঘব করতে গেলেই দেখা গেছে ছ'মাস বা বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওর শরীরের ঐ হাল হয়। মা এবার মন শক্ত করে ঠিকই করে ফেলেছে ওকে আর শ্বশুরবাড়িতে পাঠানো নয়, ও এখানেই থাকুক। হীরা আবার আগের মতো গোরুমোষ চরায়, ওরই কাজ ছিল ওটা, ওর অবর্তমানে সুন্দরাকে দেয়া হয়েছিল সেটাই হীরা ফিরিয়ে নিলে।

সুন্দরা এখন ঘরেই থাকে, মাকে রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করে। একজন যেমন গেল বাড়ির বাইরে, আরেকজন তেমনি ঢুকল বাড়িতে। স্ত্রীজাতি বড়ই নিরীহ, বাপের বাড়িই হোক বা শ্বশুরবাড়ি দু জায়গাতেই তাদের কপালে কেবল কষ্ট আর কষ্ট। নীরবে নিরীহ গোরুর মতনই চুপ করে সয়ে যাওয়া।

যবে থেকে আমরা বামুনের জমি ভাগে চাষ করতে লেগেছি সেই সাত-আট বছর ধরেই আমাদের সংসারে দারিদ্র্য, অভাব-অনটন আর কষ্ট হু হু করে দাবানলের মতো বেড়েই যেতে দেখলুম। ধোণ্ডুবাঈর বিয়ের খরচের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে আমাদের একটা দুধেল মোষ বেচে দিতে হল। জমির মালিককে খাজনা বাবদ যা দেবার দিতে পারি না, দালালের কাছে ধার দেনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বাস্তুভিটেটার ওপর ব্যাঙ্ক থেকে নেয়া দেনার অঙ্কও বেড়ে চলেছে, আসলের ওপর না দিতে পারা সুদটা চাপছে কিনা। ফি বছরই জমি থেকে কেবল লোকসানই হচ্ছে আর দেনার বোঝাও বেড়েই চলেছে। কুয়োর জল এত কমে গেছে যে দুগাড়ির বেশি গুড়ই হয় না সারা বছর। তাছাড়া, গরমের সময় এত জলকষ্ট হয় যে শাকসব্জি তেমন ফলানোই যায় না। আমাদের ভাগের জমিতে ঘাস নেই, তাই বর্ষার অন্যের জমির এক টুকরো ভাড়া নিতে হয় গোরুমোষ চরাবার জন্যে। খাবার লোকও বাড়ছে, তাই খাবার তাগিদও বেড়েই চলেছে। জমিতে ভাল করে লাঙল দেবার উপায় নেই কারণ পয়সার অভাব, জমিতে সার পড়ে না ঐ একই কারণে। ফলে ফসল যেমন কমছে, আগাছা তেমনি বেড়েই চলেছে। মাঠে গাছগুলোর অবস্থা বড়ই করুণ, কোনোরকমে যেন টিঁকে রয়েছে। যেখানে মানুষের পায়ের মতন মোটা মোটা জোয়ারের গাছ উঠত, সেখানে হাতের বুড়ো আঙুলের মতো সরু সরু গাছ উঠেছে। প্রথম বছরের তুলনায় এখন ফসলের পরিমাণ ঠিক আদ্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাবার কাছে এসব কিছুই অজানা নয় বলেই ভেতরে ভেতরে খুবই দমে যাচ্ছিল। সংসারটা খুবই তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ছে দেখে বাবা মাথা ঠিক রাখতে পারত না। এত হাড়ভাঙা খাটুনির পরও বছরের শেষে মহাজন "এই যা দাঁড়িয়েছে" বলে কাগজে ওর পাওনা টাকার অঙ্কটা যখন লিখে দিত তখন মনে হত আমাদের সারা বছরের রক্ত জল করা পরিশ্রমের ফল ঐ মুদিখানায় যেন এক মুহূর্তেই শুষে নিলে।

দুরবস্থার চূড়ান্ত হল যখন এরই মধ্যে বাবা আবার কোর্ট কাচারী করতে আরম্ভ করলে। বাবার বক্তব্য, জমির মালিক এক বছরের মধ্যে কুয়ো খুঁড়ে দেবে বলে দেয় নি। কুয়ো খুঁড়ে দিলে জল পাবে এই ভরসায়, বাবা অত চড়া খাজনায় জমিটা নিয়েছিল। এসব অভিযোগ নিয়েই বাবা আদালতে গেছে। অবশ্য কিছুটা ফল হল। আদালতের রায় বাবার পক্ষেই গেল। এরই জন্যে সামনের বছর থেকে জমির খাজনা কমে যাবে, বাবা একটু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। এ রায় পাবার পর বাবার খালি খালি আফশোষ, "পেছনের ক'টা বছর আমি মিছিমিছি অত টাকা বাড়তি খাজনা দিয়ে লোকসান কুড়িয়েছি ঐ হতচ্ছাড়া জমি চাষ করে। পাঁচ ছ'বছর তো হবেই জমির মালিক বাড়তি খাজনা নিয়ে আমায় ঠকিয়েছে, অকারণে মাথার ওপর দেনার বোঝা চেপেছে।" যাকগে, বাবার বক্তব্য আদালত যে মেনে নিয়েছে, রায়ে যে বাবার ওপর অন্যায় জুলুম হয়েছে

তা স্বীকার করা হয়েছে এতেই বাবা খুশি, আর তাতেই কাজে বাবার উৎসাহ আরোই বেড়ে গেল।

এদিকে আরেকটা ঘটনা ঘটে গেল যার ফল হল সুদূরপ্রসারী। সরকার ভাগচাষীদের কল্যাণকারী এবং তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে অনেক আইন পাশ করলে। যারা লেখাপড়া জানে, শিক্ষিত বা পয়সাওয়ালা আর কোর্ট কাচারীতে যাতায়াত আছে তারা এরকম আইন পাশ হচ্ছে আভাসে ইঙ্গিতে আগে-ভাগেই জানতে পেরে গিয়েছিল। এইসব জমির ধূর্ত মালিকেরা এরই মধ্যে যাদের জমি ভাগচাষে দিয়েছিল তাদের থেকে জমির মেয়াদ ফুরোবার আগেই বার করে ফিরিয়ে নিলে আর নিজেরা লোক রেখে সে জমি চাষ করতে লেগে গেল। যাদের জমির মেয়াদ আর এক বছর গেলেই শেষ হবে তাদের সে এক বছরের খাজনা রেহাই দিয়ে এসব মালিকরা ভাগচাষীদের দিয়ে লিখিয়ে নিলে যে এ জমিটা চাষ করা ওদের আর পোষাচ্ছে না, সেজন্যেই ওরা স্বেচ্ছায় এ জমির চাষ ছেড়ে দিচ্ছে আর এ জমিতে ওদের আর কোনো দাবী বা অধিকার রইল না। এই সব গরীব ভাগচাষীদের কোর্ট কাচারী করবার সামর্থ্য কোথায়? ওরা নেহাৎই সাদাসিধে ভালমানুষ গোবেচারা গোছের, মালিকদের সাথে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের কথা মনে রেখে এসব কাগজে সরলমনে সই করে দিয়ে জমির ওপর ওদের সব দাবী বা অধিকার ছেড়ে দেয়। সেই একই জমিতে এর পরে ঐ চাষীরাই মজুর হিসেবে খাটত, এখন আর কোনো জমির মালিকই জমি ভাগে চাষ করতে দিতে রাজি নয়। এখন এ সব চাষীরা তাদের গোরু, মোষ, ছাগল নিয়ে যায়ই বা কোথায়? যেখানেই যাক ওদের সেই গতরেই খেটে খেতে হবে, এ ছাড়া উপায় কি? এতদিন যখন জমি খাজনা দিয়ে ভাগে চাষ করেছে তখনও ওরা জমির মালিকানা পায় নি, তখনও তারা সেই গতরেই খেটেছে। এখনও সে একই জমিতে দিন মজুরি খাটতে আপত্তি কি, আগে যেমন একটা সময় পর্যন্ত সে জমিতে ওদের একটা দাবী থাকত, না হয় সে দাবী এখন নাই রইল? ছটফট করে হবেটা কি? মালিক যা চাইছে তা লিখে দিলেই হয়। মালিক কি আর ওর ক্ষতি করবে, এত বছর ওরা এদের চেনে। ওরা কি গরীব চাষীদের ঠকাবে? মালিকদের নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণেই এ রকম করে লিখিয়ে নিতে হচ্ছে কাগজে, এ ছাড়া আর কি হতে পারে?

গোপাতাত্যা কিন্তু ওর চাষের জমি নিজের হাতেই রেখে দিলে। আদালতে সে দরখাস্ত করে আর্জি জানালে যাতে আদালত তাকে জমির নায্য খাজনা ঠিক করে দিয়ে তাকে চাষ করতে অনুমতি দেয়। ওর জমিটা আমাদের জমির লাগোয়াই ছিল। আসা-যাওয়ার পথে বাবা ওর কাছে তামাক খেতে খেতে গল্প জুড়ে দিত। ওর কথাতেই বাবাও জমির মালিকের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা সে মামলা বাবা জিতেও গেছে। এ সময় গোপাতাত্যাই বাবাকে বুদ্ধি জুগিয়েছে। গোপাই বাবাকে বুঝিয়েছে যে এবার আদালতে মামলা না চালালে মালিক জমির লীজ শেষ হতে না হতেই আর ফের লীজ দেবে না তখন সে এমনিতেই জমিহারা হবে। তাছাড়া এরপর অন্য জমির মালিকও যে আমাদের ভাগ চাষে জমি ছেড়ে দেবে তাও মনে হয় না। আর চাষ করতে জমি না পেলে সারাবছর খাব কি? কিসের ভরসায় বাঁচব?

অই বাবা আদালতে জমির মালিকের বিরুদ্ধে আরেকটা মামলা দায়ের করে দিলে। মালিক বাবার ওপর পাঁচ ছ'বছর অন্যায় জুলুম করেছে, কাজেই বাবার স্বেচ্ছায় জমির চাষ ছেড়ে দেবার বা সেই জমিতে সে মাইনে করা মজুর হিসেবে খাটবে এমন কথা লিখে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। বাবার মতলব ছিল মালিককে একটু শিক্ষা দেওয়া। এবারে সেই সুযোগটাই এসে গেল।

ক্লাস টেন-এর পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবার দিন খুব আগ্রহ নিয়ে স্কুলে গেলুম। ভেবেছিলুম দেশপাণ্ডে মাস্টারমশায় অতি সজ্জন লোক, উনি কি আর আমার রেজাল্ট আটকাবেন? কিন্তু উনি তো নিরুপায়। নিয়ম ভাঙবেন কি করে? আমাকে রেজাল্ট জানাবার তাঁর কোনো উপায়ই নেই। তিন মাসের বেশি যাদের মাইনে বাকি, তাদের রেজাল্ট জানানো হবে না। এদিকে আমি ক্লাসে বসে আছি, কোন সাবজেক্টে কত নম্বর পেলুম নোট করে নেব, কোনো লাভ হল না। উনি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারবেন না, ওঁর হাত-পা বাঁধা, উনি বলেই দিলেন। তবে হেডমাস্টার মশায়ের সঙ্গে দেখা করতেও বললেন। রেজাল্টের কাগজটাও সেই সঙ্গে অফিসে গিয়ে ঘাটগে কেরাণীর কাছে জমা দিয়ে এলেন। আমি আব কী কবি? ঘণ্টাখানেক বাগানে বসে কাটিয়ে সবাই যখন চলে গেছে দেখলুম সেই ফাঁকে ঘাটগে কেরাণীব কাছে গিয়ে হাজির। উনি বলবেন না, স্পষ্টই বলে দিলেন। সেখান থেকে সোজা হেডমাস্টাব মশায়েব বাড়ি। তিনি আমাব অবস্থা খুব ভাল কবেই জানতেন। তাঁকে আমি বললুম, "স্যাব, আমি ছুটিব মধ্যে দিন মজুরি করে টাকা রোজগার করি। মাইনের টাকা জমলেই আমি দিয়ে দেব। আমার পবীক্ষার ফলটা জানতে চাইছি আপনি যদি একটা কাগজে লিখে দেন।"

"তুই পাশ কবেছিস, ব্যস্ এই বলে দিলুম। আব কিছু জানার আছে?"

"স্যার, কি বকম নম্বব পেয়েছি জানতে ইচ্ছে কবছে।"

"স্কুলেব বাকি ফিস চুকিয়ে না দিলে তা পাওয়া যাবে না। এ নিয়ম আমি ভাঙ্গতেও পাবব না। একজনকে সুবিধে কবে দিলে অন্যদেরও দিতে হবে। তাছাড়া ফিস আদায় করবার সময়ই এটা। এখন ফিস আদায় করতে না পারলে সারা বছর আর পাব না। আমি নিরুপায়, যা, মাইনেটা জোগাড় কবে নিয়ে আয়, তোর রেজাল্ট মার্কস সবই সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবি।" আমার আর কিছু করার ছিল না। তবে মাস্টার-মশাই যখন বলেছেন যে আমি পাশ করে গেছি তখন মার্কস না জানতে পারি পাশ করার খবরটায় একটা ভরসা হল, নিশ্চিন্তেও হওয়া গেল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভাবছিলুম পরীক্ষায় বসেছি অথচ পাশ করি নি এটা তো হয় নি কখনও, পাশ একটা করবই। সেজন্য কেবলমাত্র পাশের খবরে তেমন কোনো আনন্দ হচ্ছিল না। যাক গে, পরের ক্লাসে উঠে গেছি জেনে ভয়টা দূর হল। বাড়ি ফিরে নিশ্চিন্ত মনে চাষের কাজে মাঠে নেমে পড়লুম, কাজে উৎসাহও বেড়ে গেছে। এস এস সিতে ভর্তি হয়ে গেলুম কোনরকমে। এবারে শেষ যুদ্ধ। রক্তারক্তি হলেও যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, লড়ে যেতে হবে আর সে লড়াইতে জয়ীও হতে হবে। এবারের চেষ্টাটাও ডবল করতে হবে। কোর্ট কাচারীর কাজে বাবা থাকে আটকে, তবে শিবা এখন কাজের ভার নিতে পারে।

অসুস্থ রুগ্ন হীরাবাঈ সংসারের কাজ কোনরকমে ঠেকা দিয়ে যাচ্ছে। বাবার জন্য খুব একটা ভরসা না করে আমি তাই শিবাকে নিয়ে জমিতে লাঙল দিয়ে চাষের মতো করে জমি তৈরি করে ফেললুম। নিজেদের চাষবাসের কাজেই শুধু পড়ে থাকলে তো চলবে না, ওটা সেরে অন্য জায়গায় রোজগারের ধান্দায় যেতে হবে না? বাড়তি আয়টুকু না হ'লে সংসারই চলবে না। আমাদেব লাঙল দেয়া জমিতে ভোরে জল ছাড়া হত, কুয়ো থেকে যতটুকু জল পাওয়া যেত সবটাই তোলা হত। তারপর দুপুরে ঘুরে ঘুরে জমি সমান করা বীজ রোয়া যায়। তারপর সকলে মিলে মাটিতে গেঁড়ে থাকা আগেরবারেব গাছের গুঁড়িগুলো উপড়ে ফেলে ঘরে যা সার ছিল জমানো তা এনে ঢাললুম জমিতে। মাঠ থেকে গাঁয়ের বাড়িতে গাড়ি যেত ঘুঁটে ভর্তি হয়ে, আর বাড়ি থেকে মাঠে ফিবত সার নিয়ে। বর্ষার আগেই ঘুঁটে তোলা চাই ঘরে, নইলে আমাদের জ্বালানিই হবে না। মাঠের কাজ সব যখন এভাবে সারা হল, হাত-পা ঝাড়া হলুম তখন দিনমজুরির জন্য রেডি হয়ে গেছি। গোড়ার দিকে কুয়ো থেকে জল তুলতে শিবা বেশ ভয় পেত, বিশেষ করে বালা বলদটাকে তো যমের মতো ভয় পায়, সে ব্যাটা ভীষণই মারকুটে বলদ কিনা। বাবা নয়তো আমি যখন ওকে ধবতুম তখন বোগা পটকা শিবা যাহোক করে কুয়ো থেকে জল তুলে মাঠে ছাড়বার সাহস পেত। আমি আব বাবা দুজনেই মাঠে না থাকলে তো বিপদ, তাহলে তো পুরো চাষের কাজই যাবে আটকে। তাই বলদকে ধরার কায়দাটা শিবাকে শেখানো হোল। বলদ যেখানে থাকত সেখানে সব ক'টা বলদের দুপাশ দিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকত। এভাবে দুদিকে হয় মা আর হীরা, নয়তো মা আর শিবা বসে থাকে তখন শিবা আস্তে আস্তে বলদটার গায়ে হাত বোলাত, ও ভাবেই ওর মেজাজ ভাল করে দিতে হবে কিনা। তারপর বলদটার গায়ের পোকা বেব করতে করতে ওর গলাব কাছটাতে বসে থাকত শিবা। এভাবে এক হাতে যখন পোকা তুলে দিচ্ছে অন্য হাতে গলার তলায় হাত বুলিয়ে আদর করছে, এরই ফাঁকে একসময় হঠাৎই ওব অজান্তেই নাকে দড়ি লাগিয়ে দিতে হবে আর সেটা শক্ত করে ধরেও থাকতে হবে। তারপর দুদিকেব বাঁধা দড়ি ছেড়ে দিয়ে দুজনে দুদিকে ধরে ওকে সাবধানে জলের দিকে নিয়ে যাওয়া হত। এভাবেই গোড়ার দিকে শিবাকে বলদ ধরা শেখানো হল। আস্তে আস্তে শিবা কায়দাটা রপ্ত করে নিলে আর দু তিন মাসেই শিবা এই মারকুটে বালা বলদটিকে নির্ভয়ে সামলাতে শিখে গেল। এখন শিবা মাঠে দিব্যি জল ছাড়তে শিখেছে দেখে আমি রোজগারের ধান্দায় বেরোতে লাগলুম। পিসির ছেলে বাবু কুয়োর ময়লা জঞ্জাল তোলার বায়না নিত। আমিও তার সাথে কাজ করে অনেকের কুয়োব ময়লা সাফ করে দিলুম, অন্যের জমিতে বাঁধ তৈরী করে দিলুম, জমিতে আল কাটলুম, চাষীদের গাড়িতে সারের স্তূপ ভরে দিলুম। এতে যে মজুরি পেলুম তা কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করে সংসারে বুঝিয়ে দিতে হত। অবশ্য যা পেতুম তা থেকে আটদশ আনা মার কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি আদায় করতুম, কখনও বা সপ্তাহে একবার, কখনও দু সপ্তাহে একবার এভাবে আমার হাতে পয়সা আসত। কিন্তু হায়! ও থেকে বাঁচত না এক পয়সাও। কখনও সিনেমা দেখে, কখনও পাউরুটি ঘুগনি খেয়ে সে পয়সা

কখন উড়ে যেত। ভাবলুম, না এবার আমার রোজগার আরো বাড়াতে হবে আর তা থেকে বেশ কিছুটা জমাতেও হবে। কারণ, শুধু যে ক্লাস টেনের ফিসের বাকি টাকাটাই দিতে হবে তা তো নয়, ক্লাস ইলেভেনের জন্যও ব্যবস্থা করে রাখতে হবে আগে ভাগেই। বই খাতা যা লাগবে তাও তো বাধ্য হয়ে আমাকেই কিনতে হবে। আর সবশেষে বছর শেষে ফর্ম ভরবার সময়ও টাকা লাগবে। এবারে রোজগারের অন্য রাস্তা ধরতে হবে মনে হচ্ছে।

গেল দু'বছর ধরে মাঙ্গদের শির্প্যাকে দরকার পড়লেই আমাদের এখানে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই যেমন, গুড় যখন তৈরী হবে তার আগে আখ মাড়াই করার যন্ত্রপাতি আনবার সময়, বা যখন ধান বা জোয়ার তোলা হবে তখন বড় ধরনের কাজ থাকলে ওকে আমরা ডাকি। অন্য সময়ে শির্প্যা রাতে আমাদের কাছে এসে আড্ডা মারে, তা কাজ থাকুক আর নাই থাকুত। মাঙ্গ পাড়াটা আমাদের ঘরের লাগোয়াই কিনা, তাই ওর সাথে আমাদের এত ভাব। অনেকবার ও আর আমি বাদলার সময় এখান থেকে ওখান থেকে ঘাস কেটে এনে বেচে দিয়েছি আর যা পেয়েছি ভাগ করে নিয়েছি। ক্লাস ফোর কি ফাইভ পর্যন্ত ওর পড়াশুনার দৌড় হলে হবে কি, সিনেমার গান গাইতে বল, যা চমৎকার গাইবে। কখনো কখনো বর্ষার সময় ওর হয়তো সময় কাটছে না, আমাদের খেতে চলে আসত আর আমার কাজেও সাহায্য করত, দুজনে গল্প করতে করতে বেশ কাজ করে যেতুম। আমি ওকে বলে রেখেছি কোনো কনট্রাক্ট-এর কাজ পাওয়া যায় কিনা খোঁজে থাকতে, ওর কাছে এসবের খবর আসে। ও তো বারমাসই এভাবে আয় করে কিনা। অবশ্য আমার বেলায় তা হবে না, শুধু গরমের সময়টাতেই আমি বাড়তি কাজ কবে যা দুপয়সা কামিয়ে নিতে পারব।

শেষ পর্যন্ত শির্প্যা ঠিক একটা কনট্রাক্ট-এর কাজ ধরে আনলে। কোনো এক বামুনের এক একর জমিতে সিমের গাছ আছে, সেগুলো উপড়ে ফেলে এক জায়গায় জড়ো করে রেখে দিতে হবে— এই হল চুক্তি। একদিন ওখানে গিয়ে সব গাছগুলো গুনে ফেললুম, একটা গাছ তুলতে কত সময় লাগতে পারে দেখে নিলুম তারপর সে হিসেবে একদিনে ক'টা গাছ তোলা যাবে তারও হিসেব হয়ে গেল। তারপর কাজে লেগে পড়লুম। তিনজনে কাজ হচ্ছিল, শির্প্যা, আমি আর একটা লোক। তাকে দিন মজুর হিসেবে আমরা রাখলুম, ওকে ওর পাওনা মিটিয়ে দিয়ে যা থাকবে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব। এসব বন্দোবস্ত করে প্রথমেই জমিটা ভালো করে খুঁড়ে ফেললুম। আমাদের উৎসাহ দেখে কে! কাস্তে, কুড়ুল, মাটি খোঁড়ার খন্তা আরো কতই না যন্ত্রপাতি নিয়ে যে কাজ আরম্ভ হল কি বলব। মাথায় মে মাসের রোদ, গা আদুল, পরনের ল্যাঙ্গোট জলে কাদায় ভিজে জবজবে। সাত আট দিনের ভেতরেই আমার চেহারাটা হয়ে গেল ঠিক যেন পোড়া কাঠের মতো। মাঠে মাটি কেটে, তারপর সে মাটি তুলে বাঁধ তৈরী করে হাত দুটো খুলে যাবার উপক্রম। প্রথম চারদিন সকালে উঠে মনে আছে হাত পা নাড়ালে মনে হত হয়তো বা ভেঙেই যাবে, এত ব্যথা। পায়ের গাঁটগুলো যেন মট করে ভেঙে যাবে আর শিরদাঁড়া? ওটাতো একেবারে

যেন নড়বড়ে হয়ে গেছে। সাতদিন যখন হয়ে গেল, তখন মনে হল ধেৎ তেরি আর দরকার নেই এ কাজে। তবে এখন মাঝপথে পালাবার তো আর রাস্তা নেই, গোড়াতে ঠিক ভাবতে পারি নি এতদিন লেগে যাবে আর ভোগাবে, ভেবেছিলুম আট দশ দিনেই মেরে দেব। সে জায়গায় ষোল দিন লেগে গেল, রোদে খেটে রক্ত জল হয়ে গেল। রোজগারের পয়সা নিয়ে বাড়ি ফিরলুম, দেখলুম বাড়তি আমদানি কিছুই হল না। ভেবেছিলুম দিনে বার আনা মজুরি হিসেবে যা হয় বাড়িতে খরচের জন্য দিয়ে দেব, বাকিটা দিয়ে স্কুলের ফিস দেব, বই কিনব। তা হল না, বাড়তি কিছু ছিল না। পরে মনে হল এ কাজটা না ধরে কুয়োর ময়লা সাফের কাজ ধরলে কাজে দিত, তাহলে এক টাকা রোজে কাজ করতে পেতুম আর ঘণ্টা দেড়েক মাঝখানে বিশ্রামও মিলত। সে সময়টা গাঁয়ে গিয়ে বই পড়তে পারতুম আর মাকে বার আনা হিসেবে হাতে ধরে দিয়ে চার আনা থাকত আমার কাছে। সারা মাস এভাবে কাজ ধরতে পারলে হাতে পাঁচ ছ টাকা জমে যেত। সেসব আর কোথায় হল? আমি ভাবনা-চিন্তায় ছটফট করে মরছি।

এদিকে তখনও বর্ষার নামগন্ধও নেই। অল্প স্বল্প ছিটেফোঁটা বৃষ্টি হয়েছে দু একবার, এ ছাড়া জল হয় নি। এ জন্যই গাঁয়ে কুয়ো পরিষ্কার হচ্ছে জায়গায় জায়গায়। যাদের কুয়ো, তারা পরিষ্কার করাবার সাথে সাথে আরো বেশি করে খুঁড়িয়ে নিচ্ছে।

চ্যবনদের কুয়ো খোঁড়া হয়নি তা চারপাঁচ বছর তো হবেই। জল টইটম্বুর হয়ে থাকত এ কুয়োয়, তাই এর একেবারে তলাটা কোনদিনই চোখে পড়েনি। এ কুয়ো থেকে দুবেলা মাঠে জোর কদমে জল ছাড়া হয়। ওদের জমি চার পাঁচ একর মতন। আদ্ধেকটাতে আখের চাষ আর বাকি আদ্ধেকটাতে করে শাকসবজির চাষ। বারমাস হাটে ওরা শাকসবজি বেচে। এবারে হল কি, ওদের কুয়োও গেল শুকিয়ে আর তার ময়লা সাফ করবার কাজটা আমাদের গলিরই একজন পেলে। যাবার সময় আমায় ডাকলে, "কি রে, যাবি নাকি?" আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলুম।

চ্যবনদের কুয়োর চারধারে বেত, ডুমুর আর কালোজামের গাছ। গাছের পাতা, ডাল, ফল সারাবছর কুয়োর জলেই পড়ে ক্রমশঃ তলায় পচে গেছে। চারপাঁচ বছর ধরে এ কাণ্ড। কি দুর্গন্ধ! সারাদিন ল্যাঙ্গোট পরে মাথায় করে এ পচা তলানি নিয়ে যাও আর আস। সারা গায়ে মাথা থেকে পা পর্যন্ত এই পচা গন্ধ। সারা দিনে এ তলানিতে পুরো চান করাই হয়ে যেত, এক একসময় মনে হত এ গন্ধ আর সহ্য হচ্ছে না, ঘরে ফিরেও গন্ধের হাত থেকে নিস্তার নেই— গা থেকে গন্ধ যেতেই চাইত না। তারপর সন্ধে হলে ভেজা গায়ে যেই হাওয়া লাগত অমনি শীত লেগে যেত। যাকগে, গেল চার-পাঁচ দিন এভাবেই কেটে গেল। তারপর একদিন রাতে তেড়ে জ্বর এল, নাক বন্ধ, বুকে সর্দি বসেছে সেইসঙ্গে শুরু হল কাসি। পরের দিন আরো জ্বর, গা পুড়ে যাচ্ছে। আটদিন ভুগে সেরে উঠলুম। সেরেও নিস্তার নেই, বাবা আর মা দুজনেই গাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিল। আটদিন বিছানায় পড়ে থাকা, না নিজেদের মাঠের কাজে যাওয়া না অন্য রোজগারের ধান্দায় ছোটা, কোনোটাই তো হয় নি। এত নবাবি আমাদের মতো গরীবের ঘরে পোষায় কখনো? ততদিনে

গরমের ছুটিও শেষ আর হাইস্কুলে ক্লাসও শুরু। এদিকে হাতে একটা আধলাও নেই, আমার অবস্থা তখন এক কথায় খুবই খারাপ।

সারা দিনে এত খাটুনি, মনেও ঠিক শান্তি বলতে যা বোঝায় তাও নেই, তবুও কোথায় যেন একটা আনন্দ আছে। প্রাইমারি স্কুলের সৌন্দলেকর মাস্টার মশায়ের বাড়িতে রাতে গিয়ে ওঁর বই এর আলমারি থেকে কবিতার বই নিয়ে পড়তুম— তাদের ভেতর আবার অনেকগুলোই দিনের বেলা আওড়াতুম বসে বসে। গিরীশ, যশোবন্ত, চন্দ্রশেখর এঁদের কবিতা পড়ে মনে হত এঁরা গাঁয়ের লোকেদের জীবনযাত্রার কথা জানেনই না। কতগুলো অদ্ভুত মনগড়া ধারণা নিয়ে গাঁয়ের লোকদের জীবন নিয়ে যখন এঁরা লেখেন, তখন আমার মনে হোত গাঁয়ের লোকেদের মনের ছবিটি আমিই এঁকে দেখাতে পারব। গরমে এ সময়টায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম নিয়ে অনেক কবিতাই আমি লিখে গেলুম। তাছাড়া "সবুজ জগৎ" নাম দিয়ে কবিতার একটা খাতাও বানিয়ে ফেললুম। হাইস্কুলে মনের কথা মন খুলে বলা যায় আর তা দরদ দিয়ে বুঝবে, শুনবে এমন টিচার আমার চোখে পড়ে নি, তাই হাইস্কুলে এ কবিতাব খাতা কাউকে দেখাবার কথা আমার মনেই আসেনি। কট্রি আর রণদিভে মাস্টার মশায়বা ওক বছর হতে না হতেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে চলে গেলেন; এর পর আমি যে কবিতা লিখি তা আর কারো জানার উপায় রইল না। দু একজন হয়তো জানে, তবে ওরা এ নিয়ে মাথাই ঘামায় না। আমার কবিতাগুলো তাই ডানা মেলে উড়তে পারে নি, জবুথবু হয়ে খাতার ভেতরেই বদ্ধ হয়ে আটকে রইল।

আমাদের গলিতে আবাজীর বড় ভাই বিষ্ণুর একটা আলাদা ঘর ছিল। বিষ্ণোবা স্বাধীনতা সংগ্রাম জেল খেটেছেন, বই পড়তে খুব ভালবাসতেন। ওঁর কাছে কোলহাপুরের "পুঢারী" (নেতা) আর পুণের "সকাল" নিয়মিত আসত, রোববারে আসত "লোকসত্তা", আর আসত "সাপ্তাহিক নবযুগ" প্রতি সপ্তাহে। মাঝে মাঝে বিনোবা ভাবের "ভূদান"-ও আসত। রোজ রাতে আমি আমার পড়ার আগ্রহটা এ ঘরে এসেই এ সব পড়ে মেটাতুম, অন্যদেব সাথে উনি যা কথাবার্তা বলতেন, আলাপ আলোচনা করতেন সব শুনতুম। এ ঘবেই নেহরু, নাথ পাই, জয়প্রকাশ বিনোবা, প্রফেসার কে আত্রে, কাকাসাহেব গ্যাডগিল, এস এম যোশী, এন জি গোরে এঁদের মতবাদ, কাজ আদর্শ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে সবরকম আলোচনা চর্চাই হত আর এসব চর্চা যখন চলত আমি এঁদের যেন চোখের সামনে দেখতে পেতুম, মনে মনে এঁদের আমার প্রণাম ভক্তি জানাতুম। আমার জীবনের এ সময়টায় এ ঘরের সাংস্কৃতিক পরিবেশটা মনে গভীরে ছাপ রেখে গেল। বিনোবার উদার চিন্তাধারা আমার মনে এমন একটা শক্তি, এমন উৎসাহ জোগালে যে আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করে ফেললুম যে করে হোক আমাকে আরো পড়ে যেতে হবে, বিনোবার মতো হতে হবে। এঁদের কথা যত শুনছি এই চর্চা, তর্কাতর্কি, আলোচনার মধ্যে, ততই যেন আমার জেদ আরো বেড়ে চলছে, এঁরা আমাকে ওঁদের অজান্তেই হাতির বল জুগিয়ে গেলেন।

এদিকে বর্ষা ততদিনে বেশ জোরে নেমে গেছে, মাঠে বীজ রোয়ার কাজ জোরকদমে চলছে। আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। বর্ষা না নামলে বাবাকে স্কুলে যাবার কথা

বলতেই পারছিলুম না। এ বছর আবার হাই স্কুলের শেষ বছর, গোড়া থেকেই স্কুলে ঠিকঠাক হাজির হওয়া দরকার।

স্কুল খুলবার আগের দিন আমি গেল বছরের বাকি ফিস সব মিটিয়ে দিয়ে নম্বর জেনে এলুম। ইংরেজি আর অঙ্কে খুব কম নম্বর উঠেছে, আমাকে এ সাব্জেক্ট দুটোতে আরো বেশি করে খাটতে হবে বুঝতে পারলুম। এস এস সি পাশ করা ছেলেদের বাড়িতে গিয়ে ওদের বাবা-মাদের ধরে কয়ে বইগুলো বিনি পয়সায় বা আদ্ধেক দামে কখনও বা সিকি দামে চেয়ে চিন্তে নিয়ে আসতুম, পুরোনো খাতাগুলোর সাদা পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে তৈরী হত নতুন খাতা।

আমার এ ছটফটানি দেখে একদিন খাবার পর যখন ঘরে বসে আছি তখন বাবা বলে উঠল, "আন্দা, এ বছর স্কুল যাক, স্কুল তোকে পাতে ভাত এনে দেবে না। এবারকার মতো আমার মামলার রায় বেরিয়ে যাক, তারপর তুই মন প্রাণ দিয়ে পড়িস। তখন না হয় শিবা আর আমি দুজনে মিলে চাষের দিনটা সামলাব। এখন আমাকে এ মামলাটা চালিয়ে যাবার জন্যে কোর্ট কাচারিতে একটুখানি যেতে দে, আমাকে তোরা ছেড়ে দে।"

এ কাকুতি-মিনতি শোনার পর আমার হাতের বই হঠাৎই যেন আরো ভারী হয়ে দাঁড়াল, মুখে কথা আসছে না, ঢোঁক গিলতে পারছি না। চুপ করেই রইলুম। পুরোনো যে বইগুলো চারিদিকে ছড়ানো ছিল, তা গুছিয়ে নিয়ে তাকে তুলে রেখে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়লুম আর রাতের অন্ধকারে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কি ফেসাদেই না পড়লুম। আগে আগে বাবা জেদ করে স্কুলে যেতে বাধা দিত, ঝগড়া পাকাতো, এখন ঠিক উল্টো। এখন অবস্থা বুঝে অসহায় হয়ে আমার সাহায্য চাইছে, এমন করে আগে কোনদিনও বলে নি। এভাবে বললে আমার তো আর 'না' বলার উপায় থাকে না। এ বছর নানা দিকে বাবা হেনস্থা হয়েছে। গেল বছর থেকেই বাবার কোর্ট কাচারিতে যাওয়া-আসা শুরু হল পুরোদমে। বাবার আর্জি, 'জমি চাই ভাগ চাষের জন্যে'। ওদিকে জমির মালিকও তেমনি জমি না ছাড়ার যুক্তি দেখিয়ে আর্জি করেছে। দুদিকেই মামলা শুরু হয়েছে। বাবা উকিল ঠিক করে ফেললে, উকিল তার ফি আগেই চেয়ে নিলে। দালালের কাছ থেকে সে টাকা বাবা ধার করে নিয়ে এল, সামনের বছরের গুড়ের ভরসায়। এরই ফাঁকে ফাঁকে উকিল এটার জন্যে সেটার জন্যে টাকা চেয়ে নিচ্ছে। সে টাকা মা ধোণ্ডুবাঈর গলার হার আর হাতের গয়না বাঁধা রেখে এনে দিলে। এগুলো ছিল ধোণ্ডুবাঈর নিজের গয়না, যদিও বিয়ের সময় আমরাই সেগুলো ওকে দিয়েছি। পুজো পার্বণের সময় ওর শ্বশুর বাড়ির লোকরা যদি গয়নাগুলো চেয়ে বসে তখন কি উপায় হবে? কি বলব তাদের? মা আগে ভাগেই এর জবাব তৈরী করে রেখেছে। মা বলবে আমার মেয়ে দু'বছর অন্তত শ্বশুরবাড়ি থাকুক তারপর গয়না পাবে, তার আগে নয়। পুজোপার্বণে বড়জোর এখানে এসে গয়না পরতে পারে।

মামলার ঝামেলায় বাবার পাগলা হয়ে যাবার উপক্রম। কোর্টে তারিখের দিনের

একা একা কাজ করতে করতে নিজের মনেই বিড়বিড় করে যেত, কোর্টে জমির মালিককে যেন জেরা করছে আর তার উত্তরও নিজেই বলে যাচ্ছে, নিজেই একটা প্রশ্ন তুলছে আর বিপক্ষকে জেরা করে নাজেহাল করে ছাড়ছে। নিজের মনেই এসব জেরা আর তার জবাবে বিপক্ষকে কোণঠাসা করে জেতার আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠত।

বাবা আব আমি যখন মাঠে কাজে নামতুম বা রাতে দুজনে যখন মাঠে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছি তখন বাবা আমার সঙ্গে কথা বলত, সেও অনেকটা নিজের সাথে নিজে কথা বলারই মতন। জমিব মালিক কি জিজ্ঞেস করবে, আমাদের উকিল ওকে কি জেরা করবে, বিপক্ষের উকিলই বা কি ধরনের জেরা করবে এসবই বিড়বিড় করে যেত বাবা। আমার হুঁ হ্যাঁ বলে সায় দিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। আমিও মেসিনের মত 'হ্যাঁ' 'হুঁ' করে যেতুম যদিও মনটা পড়ে থাকত অন্য জায়গায়। আমি তখন ভেবে মরছি কতগুলো ইংরেজি শব্দ আর তাদের অর্থ, সংস্কৃত শব্দের বিভক্তি, ইতিহাসের কোন ঘটনার সন তারিখ বা বই থেকে কোনো কবিতার লাইন। হয়তো কবিতার কোনো একটা লাইন আওড়ে যাচ্ছি, রাস্তায় যেতে আসতে এভাবে কবিতা আওড়ান বা মুখস্থ বলে যাবার অভ্যেস ততদিনে আমার বেশ ভালভাবেই দাঁড়িয়ে গেছে। পড়ার বই-এর প্রশ্নগুলো মনে মনে বসেই ঠিক করে নিতুম। অনেক সময় আবার মনে মনে কবিতা লাইনের পর লাইন বানিয়ে যেতুম। হঠাৎ বাবার খেয়াল হত ওর কথায় আমার মোটেই মন নেই, মন রয়েছে অন্যত্র। তখন রেগে গিয়ে গাল দিয়ে উঠত, "হারামজাদা, সেই তখন থেকে দেখে আসছি তুই কেবল হ্যাঁ হুঁ করে যাচ্ছিস?"

"তা, কি বলব?"

"কিছু তো বলবি? এখন তো আর ছোটটি নোস। বড় হয়েছিস, দামড়া হয়েছিস। তোকেও তো একদিন কোর্টে যেতে হতে পারে তখন কি করবি? সেজন্যে বুঝতে হবে না ওসব এখন?"

অবশ্য আসলে যে তা নয় সেটা বুঝতে আমার অসুবিধে হত না, আসল কথা এভাবেই বাবা নিজের মনে এসব বক বক করে নিজে তালিম দিত, আমিও বুঝতে পেরে হ্যাঁ হুঁ করতুম। অবশ্য কখনো কখনো বাবার সঙ্গে আমাকেও কোর্টে যেতে হয়েছে। সেখানকার হাবভাব দেখে আমার বেশ ভয়ই হত। কোর্ট যখন বসে গেছে, চলছে, তখন ইংরেজিতে যে সব সওয়াল জবাব হত জমির মালিক, উকিল এঁদের ভেতর, তা শুনে বাবা আমায় জিজ্ঞেস করে জানতে চাইত ওরা কি বলছে। আমি তো কিছুই বুঝতে পারতুম না, কিন্তু তা কি বাবাকে বলার জো আছে? একবার দু'বার বলতেই বাবা রেগে লাল হয়ে যেত, "হারামজাদা কোথাকার, এতদিন ইংরেজি পড়ে শেষ পর্যন্ত এই হোল, এসব বুঝতে পারছিস না? তোর স্কুলে আগুন ধরিয়ে দে গে যা, কাজ নেই তোর আর ইংরেজি পড়ে।"

আমি কথা ঘোরাতুম, আমতা আমতা করে বলতুম, "একটু একটু বুঝতে পারি, সব তো এখনো আমাদের পড়ানো হয় নি বাবা। আস্তে আস্তে সবই বুঝে যাব'খন।"

অনেক সময় মামলার তারিখের দিন ফেরার পথে বাবা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসত, "ঐ কালো মিনসে উকিলটা কি বলছিল রে?" বাবা ও-পক্ষের উকিলের ওপর চটে রয়েছে বুঝতে পেরে আমি কোনোমতে গোঁজামিল দিয়ে বলতুম, "হাকিম বলছিল জমি তুমি পাবে না।" এভাবে সত্যি মিথ্যে কোনোরকমে একটা জবাব বানিয়ে তখনকার মত পার পেয়ে যেতেই হত আমাকে, নইলে কে জানে ইংরেজি শিখতে পারি নি বলে বাবা হয়তো আমার স্কুলে যাওয়াই দিলে বন্ধ করে। এ ভয়টা সব সময়ই ছিল। গোপাতাত্যা আর বাবা যেতে আসতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পই করে যেত। কোর্টে সারাদিন ধরে যা হল তা নিয়ে দুজনের মধ্যে জোর আলোচনা বসত। আমি বাবাকে যা বুঝিয়ে দিতুম তাই মেনে নিয়ে বাবা আস্ফালন করে যেত, "তুই দেখে নিস গোপা, আমি জমির মালিককে কেমন টাইট দিই এ বছর। তুই শুধু দেখে যা।" বৃষ্টির সময় আশেপাশেব ঘাস চুরি করতে আসত সন্তু। উসখুশ করছে. সে বেচারা এদিক-ওদিক যাবে ঘাসের সন্ধানে। বাবার বকবকানির মোদ্দা কথা হল সবশেষে এ মামলায় বাবারই জিৎ হবে, তা সেটা জেনে সন্তুর কি হবে?

যাক গে, মামলা জেতার নেশায় বাবা কোর্টে ঘনঘন যেতে লাগল। সে সময়টা চাষীদের হরেকরকম মামলাই চলছিল, আর বাবাও সারাদিন কোর্টে বসে এসবই শুনে যেত। অন্য চাষীরা বা অন্য জমির মালিকেরা কি বলাবলি করত বাবা তাও শুনতে মন দিয়ে, আর তা থেকেই ওর নিজের মামলায় কি ধরনের সওয়াল উঠতে পারে তার একটা আঁচ করবার চেষ্টা করত। শুধু তাই নয়, আমায়ও এই সব বুঝিয়ে বলে কয়ে ঝালিয়ে নিত। আগে দুপুরের খাওয়া হয়ে গেলে বাবা দড়ির চারপাইতে সোজা সটান হয়ে শুয়ে পড়ে নাক ডাকিয়ে তোফা ঘুম লাগাত, এখন তা নয়। এখন বাবা চোখ বড় বড় করে কড়িকাঠের দিকে মুখ করে পড়ে থাকে। আগে ঘণ্টাখানেক গড়িয়ে নিযে উনুনের আঁচের কাছে যেত তামাক সাজাবে ব'লে। একা একা স্থির হয়ে বসে থাকত, মনে হবে কেউ যেন বাবাকে তুকতাক করেছে। কুয়োর কাছটায় গিয়ে গোরুমোষদের ডেকে ডেকে উঁচু গলায় গান জুড়ে দিত। এখন মাথায় উঠেছে ওসব। এখন শুধু নিজের মনে বিড়বিড় করে কি সব আওড়ায়।

এদিকে ঠাকুর দেবতার ওপর বাবার চিরদিনই ভক্তি শ্রদ্ধাটা একটু বেশি, ইদানীং তা আরও বেড়ে গেল। এখন বলা যেতে পারে সেটা উপচে পড়ছে। হলসিদ্ধ আপ্পার ওখানে এখন আমাকে দেবতার সামনে নারকেল ফাটাতে যেতে হয় প্রত্যেক অমাবস্যায়, এতে কোনো ভুল বা গাফিলতি হয় না। এতখানি পথ হেঁটে যেতে আসতে বাবার আর মন চায় না। পথ তো আর কম নয়, কাগল থেকে কিছু না হোক ন-দশ মাইল দূরে এই থান। আমার কিন্তু এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে আসতে ভালই লাগত, আমি একটু একান্তে আপন মনে থাকতে পারলেই বেঁচে যেতুম। কিছু না হোক আঠার কি কুড়ি মাইল হাঁটতে হবে। তবু তো চাষের ঐ নিত্যকার একঘেঁয়ে কাজ, আমাদের ঘর সংসার, বাবার রোজকার গালাগাল এগুলোর হাত থেকে রেহাই মিলবে। এসব থেকে দূরে থাকার এ সুযোগ এভাবেই এসে যেত আর আমিও খোলা আকাশের নীচে ঘুরে বেড়াবার এক নতুন আনন্দ পেতুম। নরসোবার থানে অবশ্য বাবাই বোধ

হয় মানত করে গিয়েছিল। পূর্ণিমার দিন এখানকার থানে বাবার আসা চাই-ই। এভাবে পাঁচ-পাঁচটা পূর্ণিমায় বাবা এখানে এসেছে। তার জন্যে খরচও নিশ্চয়ই অনেকই হয়েছে। কিন্তু যেমন করেই হোক ট্যাঁকে পয়সা কড়ি বেঁধে বাবা ঠিকই পূর্ণিমায় এসে যেত এ থানে।

তাছাড়া কেবল থানেতে আসাই নয়, স্বপ্নও দেখত বারবার। সারাদিন ধরে যেসব জিনিস নিয়ে বাবা চিন্তা-ভাবনা করত, রাতে সেগুলোই স্বপ্ন হয়ে বাবার সামনে এসে হাজির হত। স্বপ্নগুলোর ভেতর যেগুলো ভাল স্বপ্ন, বাবা ভাবত ওগুলোই ওর ফলে যাবে। কখনো হয়ত স্বপ্নে দেখল যে ও পক্ষ কিছু গড়বড় করছে, বা ওর উকিলকে ওদের দলে টেনে নিচ্ছে, বা হয়তো দেখল ওরা টাকা খাইয়ে সুবিধে করে নিচ্ছে। ব্যস্, আর কথা নেই। সোজা চলে যাবে গাঁয়ে, গিয়ে ওখানে নিজের পক্ষের উকিলের খোঁজ-খবর নেবে। উকিল বাবার এ ছেলেমানুষি দেখে হেসে ফেলতেন। কখনো বা এরকম হলে উনি বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে গাঁয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন, কখনও ধমকে চুপ করিয়ে দিতেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবার সঙ্গে দেখা হতে না হতেই বাবা আমাকে ওর স্বপ্নের কথা আমাকে বলে ফেলত। ভাল স্বপ্ন হলে বাবা খুশি। অনেক সময় এ সব স্বপ্নে সাক্ষীকে কি প্রশ্ন করা হবে আর জবাবে সেই বা কি বলবে বাবা জেনে যেত। যে সব স্বপ্নে হাকিমের রায় বাবার পক্ষে, সেগুলো বাবা মন প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করত, আর হাকিমের রায় যদি ও-পক্ষের অনুকূলে যেত, তবে তো আর রক্ষে নেই। বাবা ভাবনা-চিন্তায় ডুবে থাকত, জমির মালিককে আমার সামনে বসে বসে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিত। আমার মনে আছে এ সময়টায় বাবা সারা দিন "স্বপ্নাদেশ" নিয়েই ভাবত-চিন্তা করত। বাবাকে দেখে মনে হত ভেতরে ভেতরে মামলার ফল বা রায় নিয়ে একটা ভয় ঢুকেছে। আদালতে দাঁড়িয়ে বাবা ভীষণ ভেবাচেকা খেয়ে যেত, প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বাবার পা কেঁপে কেঁপে উঠত, ঢোঁক গিলতে থাকত, গায়ে ঘাম ছুটে যেত। আমাদের উকিলকে ওপক্ষের কারো সাথে কথা বলতে দেখলেই বাবার মাথায় সন্দেহের ভূত চাপত। জমির মালিক সেজেগুজে পরিপাটি হয়ে হাসিমুখে সিগারেট টানতে টানতে বেরিয়ে আসতে দেখলেই বাবার দারুণ সন্দেহ হত, ভেবেই নিত নিশ্চয়ই ব্যাটা গেল সপ্তাহে আদালতে এসে আমাদের পক্ষের উকিলকে টাকা খাইয়ে আগে ভাগেই কাজ হাঁসিল করে নিয়েছে, আর হাজির হবার তারিখের দিনে শুধু শুধু ন্যাকামি করতে এসেছে কোর্টে। কোর্ট গেলে দেখতুম চাষাভুষোরা গাছের নীচে, কোন বাড়ির আনাচে-কানাচে, সিঁড়ির ধাপে বা কলের ধারে বসে আছে। এ ছাড়া বসবার বা অপেক্ষা করবার অন্য কোনো জায়গা যেন ওদের নেই। আর ওদিকে জমির মালিকেরা উকিলদের ঘরে চেয়ারের গদিতে আরাম করে বসে আড্ডা মেরে যাচ্ছে। দেখে মনে হবে চাষীরাই যেন অপরাধী, সব দোষ ওদেরই। দেখলুম এখানে চাষীদের আপনজন বলতে কেউ নেই, ওদের হয়ে বলার কেউ নেই। শিক্ষিত লোকেদের এ এলাকায় আমাদের মতো চাষাভুষোর স্থান কোথায়, আমরা কোন কাজে আসব? এ রকম পরিবেশে বাবা চুপসে যেত, মুখ চুন হয়ে যেত,

আর তা দেখে আমার খুবই কষ্ট হত। বাবার শরীরেও সে বল আর কোথায়? মাঝে মাঝেই তো পেট ব্যথা করে, পিত্তি বড় হচ্ছে, পেট ফেঁপে থাকে। রাত দিন জোরে জোরে ঢেকুর তুলে যাচ্ছে। পেট জ্বালা করে, বেশ বমিও হয়। যা খায় তা আর হজম হতে চায় না। সেই আগেব দিনের পালোয়ান বাবা আর নেই, গায়ের অনেকটা মেদই ঝরে গেছে। গায়ের রঙও নেই আগের মতন। কোর্টে যাবার সময় বাবাকে পনের কুড়ি টাকা নিয়ে হাজির হতে হত— কোনো কারণে দরকার হলে যাতে চাইবামাত্র দিতে পারে। যদিও শুনেছি চাষীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই আইন পাশ হয়েছে, তবুও চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি অনেক উল্টো-পাল্টা রায়ও বেরোচ্ছে। চাষীরা অনেকেই আপীলও করছে। আবার অনেক সময় আদালতের বায় চাষীদের পক্ষে গেলে মালিকপক্ষ ওপরের আদালতে মামলা তুলে নিয়ে চালিয়ে যেত, আর সেখানে মামলা চালাবার মতো কোমরের জোর না থাকলেও বাধ্য হয়ে টেনে হিঁচড়ে যেতেই হত চাষীকে। বাবার চোখের সামনে নিত্য এসব ঘটনা ঘটছে, বাবা যত দেখছে তত মনে মনে ভেঙে পড়ছে, বাবা বুঝেছে শেষ পর্যন্ত বাবারও হয়তো ঐ অবস্থাই হবে। আমিও যে এসব বুঝতে পারছিলুম না তা নয়, কিন্তু কি করব? আমারও তো স্কুলে পড়ার এটাই শেষ বছর, যেমন করেই হোক পাশ তো আমাকে করতেই হবে। একবার স্কুল ছেড়ে দিলে কি আবার সহজে ঢুকতে পারব সেখানে?

বেশ বাদলা নেমেছে। বাবা কি কারণে গেছে আদালতে, আমি আর শিবা মাঠে কাজ করছি। বলদগুলোর খাবার জোগাড় করে আনলুম মাথায় চটের বস্তা চাপিয়ে, পরনে ভেজা ল্যাঙ্গোট। ছাউনিতে ফিরে এসে গায়ের ভেজা জামা নিংড়োতে নিংড়োতে বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে আছি আর স্কুলের কথা ভাবছি। এমন সময় হীরা ভাখরি নিয়ে এল। সবাই একসাথে বসে খেলুম। আমি শিবাকে বোঝালুম যে আজকের মতো কাজ খতম, আর কোনো কাজ নেই, তাই আমি এখন স্কুলে যাচ্ছি, পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ফিরে আসব। এই বলে গায়ে চটের বস্তাটি চাপিয়ে আমি তো বেরিয়ে পড়লুম।

রাতে খাবার সময় বাবার সাথে আবার দেখা। সকালে সেই যে বেরিয়েছিলুম, আর বাড়ি ফিরিনি, শিবাকে বলে দিয়েছি আমার খাবার রাতে বাবার সঙ্গে একই সাথে নিয়ে আসতে। বাবা ফিরেছে রাত নটায়। কথা হয়ে যাবার পর বাবা আমায় বললে, "তোকে না স্কুলে যেতে বারণ করেছিলুম, তবে স্কুলে গেলি যে বড়? আমার সর্বনাশ হয়ে যাক তোরা সবাই মিলে কি এই চাস?"

আমি বললুম, "মাঠের কাজ, চাষ এসব তুমি একেবারে ভেব না, বাবা। ও দিকটা শিবা আর আমি সামলাব। এখন বর্ষা, মাঠে তেমন কাজকম্ম নেই, তাই স্কুলে গেলুম। কাজ থাকলে আমি ঠিক সামলে নেব। বর্ষার শেষে মাঠে যখন আবার কাজ করতে হবে, তখন আমি আবার স্কুল যাওয়া বন্ধ করে দেব, আবার কোমর বেঁধে কাজে নেমে পড়ব। এ বর্ষায় এখানে অমনি অমনি বসে সময় নষ্ট না করে স্কুলে কি পড়ানো হচ্ছে দেখলে আমার কাজে দেবে। তোমার চাষবাস নিয়ে ভাবার কোনো দরকার নেই। এ বছরটা চাষও দেখব, স্কুলও করব আর এভাবে পড়তে না পারলে

পরের কথা পরে দেখা যাবে," এই ব'লে এ প্রসঙ্গটা এখানেই বন্ধ করে বাবাকে সান্ত্বনা দিলুম। বাবা অবশ্য এতেও রেগেই রইল, মুখে বললে, "যা খুশি তাই কর।" এতদিন পর বাবা এটা বুঝেছে আমায় মার ধোর করে বেশি সুবিধে হবে না, আমার যেটা করবার ইচ্ছে হবে, সেটা আমি করবই।

স্কুল শুরু হয়ে গেছে, পড়াশুনা পুরোদমে চলছে। ক্লাস ইলেভেনে সংস্কৃত পড়াতেন ধর্মাধিকারী মাস্টারমশায়, কথা খুব কমই বলতেন। সংস্কৃত আমার ফেভারিট সাবজেক্ট, এ ভাষায় শব্দের ভাণ্ডার, যাকে বলে ভোক্যাবুলারি, বাড়াবার আমার খুব আগ্রহ। সংস্কৃতের প্রতি আমার এটান আমাকে ধর্মাধিকারী মাস্টার মশায়ের খুব কাছে নিয়ে এল, ফলে হল কি সারা বছর ধরে স্কুলের ফিস বাকি পড়ে গেলেও উনি তা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করতেন না, পেছনে লাগতেন না। মাঝে মাঝে বড় জোর জিজ্ঞেস করতেন, "স্কুলের ফিসের কি ব্যবস্থা করছিস?" জবাবে আমি বলতুম, "স্যার টাকা জমাচ্ছি, দিয়ে দেব।" আমার বাড়ির অবস্থার কথাও উনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন, আমার পক্ষে এটাই যথেষ্ট, আমি কৃতার্থ হয়েছি। এদিকে এস. এস. সি. পরীক্ষা বলে আবাজী এ বছর মাস্টারমশায়দের বাড়িতে গিয়ে পড়ছে, ওকে পড়িয়ে যে পয়সাটা পেতুম সেটা গেল বন্ধ হয়ে। কোনরকমে দিন কেটে যাচ্ছে, ঘরে খুবই অভাব। বাবাও ঘন ঘন গাঁয়ে যাচ্ছে, কোলহাপুর যাচ্ছে এর-তার সঙ্গে দেখা করছে, কোথাও টাকা পয়সা ধার পাওয়া যায় কিনা। টাকা ধারের জন্য ব্যাঙ্কেও যাচ্ছে। চাষীদের মামলার শুনানি উঠলে বাবা ওদেব সঙ্গে দেখা করে খোঁজ খবর নেয়। এদিকে মার পেটে আবার বাচ্চা এসেছে, ঐ অবস্থাতেই মা মাঠে বীজ রোয়ার কাজে যায়, চাষের অন্য কাজেও হাত লাগায়। আমার হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার কাছাকাছিই প্রায় দিন পড়েছে মার বাচ্চা হবার। এজন্যে আমার বেশ মুস্কিল হয়েছে, রোজ রাতে জল ভরে রাখতে হয়। এর আগে আমার সাথে জল ভরেছে ধোণ্ডুবাঈ, ও অনেক ধকল সইতে পারত, কিন্তু ও তো শ্বশুরবাড়ি গেছে। অগত্যা হীরা হাঁপাতে হাঁপাতে এক পা এক পা করে এক একবার একটা কলসী আনে। বেশির ভাগ জল আমাকেই ভরতে হয়, খেটে খেটে জান কয়লা হবার উপক্রম, এক ফোঁটা বিশ্রাম নেই। ছোট সুন্দরা, ন দশ বছরেরটি হল, সে ভাখরি করে দেয় আমাদের। খাটে বসে বসে ওকে মা দেখিয়ে দেয় কতটা নুন, মশলা, জল ওতে লাগবে। এবারে মার শরীরও একেবারে ভেঙে গেছে, এবারে পেটে বাচ্চা এসে মাকে একেবারে নির্জীব করে দিয়েছে। বার দিন কোনরকমে খাটে বসে কাটালে তারপর সন্তানের "বারস" বা নামকরণ হয়ে যাবার পর পুরোনো কাপড়ের পট্টি কোমরে মোটা করে কষে বেঁধে আবার আগের মতনই ঘরের সব কাজই মা কবে যেতে লাগল। ঠাণ্ডা জলেও কাজ করতে হত, ফলে শীগগিরই মার শরীর ফুলে গেল। আমরা মানে ছেলেমেয়েদের ঐ দেশ ভাবনা হতে লাগল, মনে বেশ ভয় ধরে গেল। কিন্তু ঐ ভয় ধরা পর্যন্তই, এর বেশি কিছু করার কারো উপায় ছিল না, তার কারণ প্রত্যেকেই তো কোনো না কোনো কাজে লেগে আছে। তবে আমাদের এবার একটি ভাই হয়েছে, চার নম্বর ভাই বলাই ভাল, এটাতেই আমরা সবাই খুব খুশি। মাঠে এ দিকে আগাছায় গেছে ভরে, বর্ষা থাকতে থাকতেই

শিবা, হীরা, আর আমি তিনজন মিলে সব টেনে উপড়ে ফেলে পরিষ্কার করে ফেললুম কিন্তু অতটা জমি আমরা ভাইবোনেরাই কেবল পারি কখনো? বাবা, মা ধোণ্ডু ওদের তো পাওয়া গেল না, তাই কাজ সেভাবে করা যায় নি। ফসলও সেজন্য তেমন হল না। কোনটা যে আগাছা আর কোনটা সত্যিকারের ফলনের গাছ তা বোঝার জো নেই, আগাছা এমন বেড়েছিল। আর দিনমজুর রেখে আগাছাগুলো যে পরিষ্কার করিয়ে নেব সে ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমিও অঙ্ক, জ্যামিতি এসবের পিরিয়ডগুলো করেই আসছি বলে চলে আসতুম কিন্তু আর ফিরতুম না। অবশ্য একেবারে যে ফিরতুম না তা নয়, মাঝে মাঝে ফিরে এসে কাজে হাতও লাগাতুম তবে এই হতচ্ছাড়া জমিতে কাজ করতে মন চাইত না। এভাবেই স্কুলের হাফ ইয়ারলি পরীক্ষা দিলুম, তারপরেই দেয়ালীর ছুটি পড়ে গেল আর আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। পড়ার বই সব মাঠের ঘরটায় এনে জড়ো করলুম, সময় পেলেই যাতে পড়তে পারি। ছুটি শেষ হয়ে আসতেই একটা ব্যাপার ঠিকই করে ফেললুম, এবারে আমাকে এই শেষ পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে। আছেও তো মাত্র তিন চার মাস, বলতে গেলে আড়াই মাস। ফর্ম পাবার পরীক্ষা জানুয়ারিতে। ফর্ম জমা দিলেই প্রায় সব শেষ হয়ে যাবে, তারপর বাড়িতে থাকলেও চলে। কোনো কিছু না বুঝতে পারলে সেটা লিখে রেখে বাতে বাড়ি ফিরে আবাজীকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হবে। সেও যদি বোঝাতে না পারে তবে সেটা মাস্টাবমশায়দেব বাড়ি গিয়ে জেনে আসব। তারপব পরীক্ষা দেবার জন্যে চার পাঁচ দিন যেতে হবে। আসলে ফর্ম এর পরীক্ষা না হওয়া অবধি ধৈর্য ধরে লেগে থাকতে হবে।

ছুটি শেষ হতেই স্কুলে যাবার জন্য আমার তোড়জোড় আরম্ভ হয়ে গেল। এদিকে বর্ষাও শেষ হল আর চাষের কাজও পাহাড় প্রমাণ জমল। এত কাজের ফাঁকে স্কুলে যাবার ফুরসৎ পাওয়াই মুস্কিল। কিন্তু কী করব মন শক্ত কবে সব কাজ ফেলে রেখেই আমি স্কুলে ছুটলুম। মাঝপথে বাবা ঠিক পথ আটকালে, "তোকে না বর্ষার শুরুতেই বললুম এবছর স্কুলটা বন্ধ থাক। তুই বললি বর্ষায় যাচ্ছিস কেননা বর্ষায় মাঠে তেমন কাজ নেই। এখন বর্ষা শেষ হয়ে গেল, তা অতখানি কাজের পাহাড় ফেলে রেখে কোথায় চললি।"

আমি বললুম, "এবারে তো সব শেষের পরীক্ষা। দু আড়াই মাসে আমার ফর্ম-এর পরীক্ষা হয়ে যাবে, একবার ফর্ম জমা পড়ে গেলে ঘরে বসেই পড়তে পারব। এই অল্পসময়টুকু যা হোক করে চালিয়ে নাও, তারপর তো আমি আছিই।"

"তা এ সময়টা কি হবে? চাষের কাজ কে করবে? বাদামের ফালি কে তুলবে? আখের গুড় কে করবে? এদিকে আমি যদি কোর্ট কাচারী ছেড়ে দিই তাহলে পুরো সংসারটাই তো পথে বসবে, সে খেয়াল আছে? তোর স্কুলে আমাদের গিলে খাচ্ছে। যা, স্কুলে যেতে হবে না, ফিরে যা।"

"আমি স্কুলে যাবই। তোমার দরকার হ'লে দু আড়াই মাস খেতে কাজ করবার লোক রাখগে যাও। আমার পরীক্ষাটা হয়ে গেলে সারাটা গরমের সময়টা আমি মাঠে খেটে দেব আর উপাধি আয়ত্ত না হয় খেটে করে দেব। তোমার দিন-মজুরকে যা

দিতে হবে সেটা আমি তখন গতরে খেটে তুলে এনে তোমার হাতে দেব। কিন্তু এখন আমি স্কুলে যাবই।"

"কি আমার বড়লাট সাহেব এসেছে রে, আমাকে টাকা এনে দেবে রোজগার করে। যা, ভাগ, মুখ বুজে চলে যা। বলদগুলোর ঘাস কেটে দু ঝুড়ি দিগে যা।"

"না, ফিরে যাব না, আমি স্কুলে যাবই", বলে যেই না বাবাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে যাচ্ছি তক্ষুনি বাবা আমার ঘাড় ধরে ফেললে, আমাদেব ভেতর ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে গেল। বাবা পায়ের জুতো দিয়ে আমার গায়ে মাথায় মুখে মারতে লাগল। এই হুটোপুটিতে আমার গায়ের জামা পিঠের দিকটায় ছিঁড়ে গেল। ছুটে পালাতে চেষ্টা করতেই বাবা কোমরে এক লাথি মারলে আর আমিও মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম। ততক্ষণে বাবা আরও খেপে গেছে। আমি পড়ে গেছি দেখে জুতো দিয়ে আমার মাথায় মারতে লাগল, "যা স্কুলে যাবি, শালা, যা দেখি তোর কত হিম্মৎ। অনেক সয়েছি আর নয়। এবাবে আমাকে সব জায়গায় কেবলি খেটে মরতে হচ্ছে।" এর মধ্যে খাবার নিয়ে মা এসে হাজিব।

"কোন মুখে ওকে এখন মারধোর করছ তুমি? সকাল থেকে ছেলেটা না খেয়ে মাঠে জল ছেড়েই যাচ্ছে, পেটে একটা দানাও পড়ে নি। তোমাব জন্যে ও আর কত খেটে মরবে বল তো?"

ব্যস, যেই না বলা, বাবাব সব রাগ পড়ল গিয়ে মার ওপব। মার মুখে এক থাপ্পড় মেরে বললে, "তোর জন্যই তো মাগী ও স্কুল ধবেছে।"

"ছেলেপুলে নিয়ে তোমাব সংসাবে এত কষ্ট করেও মারই খেয়ে যাচ্ছি। আর কত মাব খাব? সংসার সামলাবার মুরোদ না থাকলে ঘরে আগুন লাগিয়ে দাও।"

মা রেগে কাঁই হয়ে রয়েছে, মাথা ঠিক রাখা দায়। এব আগেব দিনই বাবার সঙ্গে মাব এক চোট হয়ে গেছে। আড়াই তিন মাসের ছেলে কোলে করে মা মাঠে কাজ কবতে আসে। বাবা এতেও নিস্তার দেবে না, ছুতো পেলেই ঝগড়া বাধিয়ে বসবে। কাজ এড়াবাব জন্যে হাজিবার তারিখ না থাকলেও বাবা কোর্টে গিয়ে বসে থাকত, এসব দেখে আমাদের রাগ তো হবেই। বাবার মাঠে যা কাজ সেও তো আমাদেরই করতে হচ্ছে, দুধের শিশু কোলে নিয়ে মাকে ঘর মাঠ দুদিকই সামলাতে হচ্ছে। মার তাই আজ এত রাগ।

সেদিন আর আমার স্কুলে যাওয়াই হল না। তারপরও আট-দশ দিন স্কুলে যেতেই পারি নি। আমার মুস্কিল হল, কি জামা পরব তাই নিয়ে। জামা তো মোটে একটা তাও ছিঁড়ে গেছে তিন জায়গায়। দরজি বললে, সেলাই করে লাভ হবে না, এবড়ো-খেবড়ো হয়ে যাবে। সেজন্যে আমি বাড়িতেই ছুঁচ দিয়ে কোনোরকমে কাজ চালিয়ে নিয়েছি। মা আমাব এ অবস্থা দেখে সাত আট দিন পর নতুন জামাই কিনে এনে দিয়েছে। এ আট দশ দিন বাবাতে আর আমাতে রোজ খিটিমিটি লেগেই থাকত। আমি স্কুলে যাবার জন্য জেদাজেদি করতুম। সাবাদিন মাঠে কাজ করে রাতে আর আমি মাঠে থাকতে চাইতুম না, বলতুম, "আমি আবাজীর সঙ্গে পড়ব, আমার বই নেই।" বাবাও চতুর্দিক থেকে সমস্যার চাপে মাথার ঘায়ে কুকুর পাগলের মতো অবস্থা, বলত, "আগে

মাঠে চল, তোর স্কুলের মুখে আগুন। চল মাঠে চল।"

"আমি পারব না," বলেই চট করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতুম। কখনো কখনো বাবা আমাব সামনে হাঁটতে বলে তাড়িয়ে খেতে নিয়ে যেত। আমি তখন সনগরদের গলিব মোড়ে এসেই ঢুকে পড়ে পালিয়ে যেতুম। দিনের শেষে গোরুমোষদের খাবার নিয়ে খেত ফেরতা ঘরে ফিরে তাড়াহুড়ো কবে কোনোরকমে রাতের খাবার খেয়ে আবার ফিবে আসতুম অনেক রাতে, বাবা ততক্ষণে খাওয়া দাওয়া সেরে মাঠে চলে গেছে পাহারা দিতে। শিবা নয়ত সুন্দরার কাছে বলেই রাখতুম বাবা চলে যাবার পর সনগর মাস্টারমশায়দেব ঘোঙরি, রাখাব যে ঘরটা আছে সেখানে গিয়ে আমাকে খবর দিতে। ভাইবোনেরা সব আমারই দলে। মাও আমার দলে। মা বলে ছেলের চাকরি হলে মাঠে একটা কেন দু দুটোলোক খাটাতে পারবে আমার ছেলে, এমন মাইনে সে পাবে। আমি ভাবি কোনোবকমে তালেগোলে এ বছরটা কাটাতে পারলে হয়। আমাব ভাইবোনেরাও তো বড় হচ্ছে, ওবাও বাবাব কাজে কুঁড়েমি লক্ষ্য করেছে। ছেলেমেয়েদেব দিয়ে কাজ করানো, কিন্তু ওদের গালাগালের বেলায় বিশ আনা, দেখে দেখে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। কিন্তু ওদের ওপব মার টানটা ওবা ঠিকই বোঝে। হাটের দিন মা আমাদের জন্য মুড়ি, তেলেভাজা, পেযাবা নয়তো অন্য কিছু উল্টে পাল্টে ঠিক এনে দেবেই। মা আমাদের সঙ্গে খ্যাচ খ্যাচ করে না, মিষ্টি কথা বলে কাজ কবিয়ে নেয়। জামাকাপড় যখন যেটুকু পারত কিনে আমাদেব পরাত, সাজিয়ে দিত। পুজো পার্বণের দিনে এত অভাব-অনটনের ভেতবেও কিছু একটা জুটিয়ে আমাদের মুখে তুলে দিত। আমবা ছেলেমেযেবা সেটা জানতুম বলেই মার মুখ চেয়ে আশায় আশায় বসে থাকতুম। বাবা মাবতে এলে ভাইবোনেবা মার পেছনে মাকে আড়াল করে লুকিয়ে থাকত।

আমার মুস্কিল হল বাবা এবারে আমার স্কুলের ওপর খেপে রয়েছে, আমার স্কুলে যাওযা যে কবেই হোক বন্ধ করবেই করবে। বাবা ভাবছে মিথ্যে কথা বলে বাবাকে আমি ঠকিয়েছি। যেমন বর্ষাকালে কোনো কাজ নেই স্কুলে গেছি বর্ষা শেষ হলে কাজ এসে গেলে কাজ তুলে দেব বলেছি কিন্তু বর্ষা শেষ হয়ে গেলে গাদা খানেক কাজ পড়ে রয়েছে তা সত্ত্বেও সে সব ফেলে রেখে আমি স্কুলে ঠিকই গেছি দেখে বাবা মনে মনে ভাবছে এতে ওব অপমান হয়েছে, হার হয়েছে। বাবা ভাবছে আমি বোধহয় ওব ভাল মানুষির সুযোগ নিচ্ছি। কোর্ট কাচাবিতে যাচ্ছে, হাতে পয়সা থাকছে না, ধারও কেউ দিচ্ছে না, এ পর্যন্ত ধাবধোব যা করেছে তাই বা শোধ করবে কি করে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছে না। এ সব কিছু ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছে। এরই মধ্যে আমি কোথায় চাষের কাজে হাত লাগাব, তা নয় যাচ্ছি স্কুলে। দেখে বাবার মাথা ঠিক থাকবার কথা নয়।

আর আমিও রোজ রোজ স্কুলে যাবার রাস্তায় কোথাও দাঁড়িয়ে পড়ে পথ আটকে দাঁড়াবার বাবার এ অভ্যেসে কম বিরক্ত হচ্ছি না। বাবার মারধোর আজকাল আর তেমন গায়ে মাখি না, মুখ বুজে সয়েও যাই না, অন্যায় হলে রুখে দাঁড়াচ্ছি। যতই বাধা আসুক এ বছর এস. এস. সি. পরীক্ষা পাশ আমাকে করতেই হবে এই হচ্ছে

আমার পণ।

রোজকারমতো সেদিনও মাঠে দাঁড়িয়ে একচোট কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। বাবা বললে, স্কুল চারদিন কামাই কর আর চিনেবাদামের ফালি তোল। ওতে আমি রাজি নই, ঠিক করেছি ভোরে উঠে এগারটা অবধি মাঠে কাজ করে স্কুলে চলে যাব। আমরা তখন খেতে বসেছি, বাবা বললে, "সারাটা দিন মাঠের কাজ তাহলে কে দেখবে, তোর বাপ?"

"তুমি দেখ না, ক্ষতি কি? এখন তো চারদিন আদালতে তারিখ পড়বেই না।"

"না পড়ুক, কোর্টে আমার অন্য কাজ আছে।"

"সেগুলো না হয় চারদিন পরেই করো।"

"মেলা জ্ঞান দিস নি আমাকে, শালা ভাষণ দিচ্ছে," খাবার জলের ঘটিটা হাতে তুলে আমায় শাসালে, "এই ঘটি দেখছিস?"

"দেখেছি?" বলে হাত ধুতে চলে গেলুম। বাবার এত রাগ হোল জলের ঘটিটা শব্দ করে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিয়ে খেতে খেতে বলল, "দেখ তোকে কি করি, খাওয়াটা হয়ে যাক।"

"আচ্ছা, দেখব", বলে আমি রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লুম। সনগরদের গলিতে রাতে ছেলেছোকরাদের আড্ডা বসত, আমি সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে কেউ নেই দেখে আবাজীর ঘরে গিয়ে বসলুম। ঘরে আবাজীর বাবা পড়ছিলেন। আবাজীকে দরকারি কথা আছে বলে বাইরে ডেকে নিয়ে সব বললুম, সারাদিন যা যা ঘটেছে। ওব সাথে কথা বলছি ঠিকই তবে মন আমার পড়ে রয়েছে অন্য দিকে। আমি মনে মনে ভাবছি শেষ পর্যন্ত খেয়ে-দেয়ে বাবা নিশ্চয়ই মাঠে যাবে পাহারা দিতে, তারপর আমি মনের সুখে পড়তে পারব।

তা আর হোল না। আধঘণ্টা মতন হয়েছে, বাবা এসে হাজির। হাতে লণ্ঠন আর লাঠি।

"আন্দ্যা?"

"কি?"

"মাঠে চল," বাবার গলায় স্পষ্টই চাপা রাগ। আবাজী তা ধরতে পেরে গলা নামিয়ে বললে, "আন্দা তুই যা।"

"আচ্ছা" বলে উঠে পড়লুম। আমি আগে আগে বাবা আমার পিছু পিছু। আমি ঠিকই করে ফেলেছি মাঠে আর যাচ্ছি না, বাবার হাবভাব দেখে আমার ভয় ধরে গেল। কিন্তু গলিতে সবার সামনে আমি ঝগড়াঝাঁটিও চাইছিলুম না, আর সবার সামনে মারধোরটাও এড়াতে চাইছিলুম। তাই বাবার আগে আগেই হেঁটে চলেছি।

একটা মোড় এল, সেখান থেকে দুদিকে দুটো রাস্তা একটা যায় মাঠের দিকে অন্যটা বাড়ির দিকে। আমি বাড়ির রাস্তা ধরলুম।

বাবা চেঁচালে, "মাঠে যাবার রাস্তা তো এদিকে।" আমি তাও না শুনে বাড়ি যাবার রাস্তাটা ধরেই এগোচ্ছি। "আজ আমার হাতে তোর মরণ আছে কপালে," বলে বাবা আমার পিছু পিছু বাড়িতে এল। আমি ঘরে ঢুকে বইয়ের তাকের দিকে

এগিয়ে গেলুম। বাবা মেঝেতে লণ্ঠনটা রেখে হাতের লাঠিটা মাটিতে একবার ঠুকে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালে, তারপর বললে, "কিরে এবারে মাঠে যাবি তো?"

"আমি যেতে পারব না। সামনে ফর্ম-এর পরীক্ষা। আমাকে এখন বাড়িতে বসে পড়তে হবে।"

"তোকে না বলেছি তোর ঐ স্কুলটায় আগুন লাগিয়ে দিতে?"

"আমি স্কুলও ছাড়ব না আর মাঠে পাহারাও দিতে পারব না।" খুব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলুম।

"তোর খুব বিপদ ঘনিয়ে আসছে।"

"আমায় মেরে ফেললেও আমি যাব না।"

"হারামজাদা, খাইয়ে খাইয়ে এতটা দামড়া করেছি, এখন মুখে লম্বা চওড়া কথা।"

"গোটা সংসারের লোকই ওদের ছেলেপুলেদের খাওয়ায়, তুমি কি সংসারের বাইরে নাকি?"

বাবা তক্ষুনি হাতের লাঠিটা রেখে দিয়ে আমার কানের পাশে দুটো চড় লাগালে কষে।

আমারও রাগ হল, "বাঁচালে কেন? জন্মাবার সাথে সাথে গলা টিপে মেরে ফেললেই পারতে। খাওয়াবার যখন মুরোদ নেই তখন অতগুলো ছেলেপুলে বিয়োন কেন? যাও রাস্তায় ভিক্ষে চাও গে যাও, বল গিয়ে ছেলেপুলেদের খাওয়াব। যাও,আমার পথ চেয়ে আর বসে থেকো না। তোমার কাজ তুমিই সামলাও, আমার ভরসায় থেকো না, আমায় পড়তে দাও" রাগের মাথায় আমার মুখেও যা আসে তাই বলে গেলুম।

বাবা হঠাৎ আবার লাঠিটা হাতে নিলে। তা দেখে আমি আরও রেগে গিয়ে বললুম, "মার, মাথায় মার না, মাথাটা ফাটিয়ে দাও লাঠি দিয়ে।"

"আমার মুখের ওপর কথা বলে এ ছেলেটা, এত সাহস," বলেই আমার হাঁটুর ওপর মারলে এক বাড়ি। "মাগো" বলে আমি যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলুম।

"তুই আমার ছেলেই নোস, তোর মরাই ভাল" বলে বাবা আর একটা ঘা মাথায় মারবে তাক করে লাঠিটা তুললে। আমি হাত তুলে মারটা আটকাতে গেলুম। লাঠি পড়ল হাতের ওপর। হাতের কবজি বেলুনের মত ফুলে উঠল। আমি আবার মাগো বলে চিৎকার করে উঠলুম। মা ছুটে এসে বাবার হাতের লাঠিটা ধরে ফেললে, "পেটের ছেলেটাকে মেরে ফেলবে নাকি?" বাবা তখন মাকে ধাক্কা দিয়ে দেওয়ালে ফেলে দিয়েছে, দুম করে আর পালোয়ানের মুষ্টি নিয়ে মার বুকে এক কিল বসিয়ে দিয়েছে। "আমার ছেলেটা মরে গেল রে", বলে মা চিৎকার জুড়ে দিলে। গলির আর রাস্তার লোক জমা হয়ে গেল। একজন মাঠে পাহারা দিতে যাচ্ছিল আমাদের বাড়ির রাস্তা দিয়েই, সে এসে বাবার হাত থেকে লাঠিটা টেনে কেড়ে নিলে। এদিকে বাবার হাতেও লাঠি নেই দেখে পা দিয়েই জোরে একটা লাথি মারলে আমার পাঁজরায়, আমার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। আমি তাও চেঁচিয়েই যাচ্ছি, "মার, মার একেবারে জানে মেরে শেষ করে দাও।"

মা আমায় ঘিরে দাঁড়িয়ে কেঁদে কেটে বললে, "আচ্ছা আমি তোর পায়ে পড়ি, তুই আজ মাঠে চলে যা পাহারা দিতে। যাবি বল?"

আমি মার কথা কানেই তুলছি না, "না, না আমি আজ এখানেই মরব, আমাকে এখানেই মরতে দাও।"

একজন এসে বাবাকে জাপটে ধরে রাখলে, বাবা ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে ছটফট করছে আর বলছে, "আমায় ছেড়ে দাও, এরকম ছেলে বাঁচিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই, ওকে আজ মেরেই ফেলব," আরও কয়েকটা লাথি মারবে বলে এগোবার চেষ্টা করছে আর দুজনে ওকে জাপটে ধরে রেখেছে। বাবা কেবলই চেষ্টা করছে ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে।

শঙ্কর আম্মা আমাকে ভারী গলায় ডাকলে, "আন্দা, বেরিয়ে আয়।" বাবা এদিকে তখনও তড়পাচ্ছে, "ওকে বার করে নিয়ে যাচ্ছ কেন? ওর সব বার হবে আজ। এমন কুকুর জন্মেছে আমার বংশে?" শঙ্কর আম্মা উল্টে বাবাকে ধমকালে, "মারব টেনে এক চড়, বুড়ো হচ্ছিস তবু বুদ্ধিশুদ্ধি হচ্ছে না। সোনার টুকরো ছেলে তোর, শরীরের রক্ত জল করে পড়াশুনা করছে আর তুই কিনা ওর পেছনে লাগছিস? তুই নিজে খেটে তোর ছেলেপুলেদের খাওয়া না, ওকে কেন টানছিস এর ভেতর? চল, আন্দা চল, আমার বাড়িতে থাকবি, আমিই তোকে পড়াব।"

এদিকে চারদিকে ভীড় জমে গেছে। আশেপাশে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ততক্ষণে আমার কান্না থেমেছে। আমি বললুম, "আম্মা, আমি তোমার বাড়ি যাব না। আমার বাপ আমাকে স্কুলে পড়তে দিচ্ছে না, আমি নিজে যেখানে দুচোখ যায় চলে যাব। আমার নিজের পড়া আমি নিজেই চালাব। ওকে বলে দিও।"

"উঃ! ভারি দেমাক দেখান হচ্ছে, আগে বেরো তো। উনি আমার কত ভাল করবেন জানা আছে, সাহস কত", বলছে আর ছাড়িয়ে নেবার জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে যাচ্ছে বাবা। মা এদিকে আরো জোরে কান্না জুড়ে দিয়েছে। আমি আমাব বই-এর আলমাবির চাবি খুঁজতে লাগলুম। এত হট্টগোলে চাবি কোথায় গেছে হারিয়ে, খুঁজে আর পাই না। শেষে তালাটা মোচড় দিয়ে চাবি ছাড়াই খুলে ফেললুম। ভেতর থেকে নাটকের খাতা, কবিতার খাতা, গানের খাতা, সিনেমার সংলাপের খাতা সব টেনে বার করলুম, এগুলোই তো আমার প্রাণ। সবগুলো হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। মা তখনও কেঁদেই যাচ্ছে, ছোট ভাইবোনগুলোও চিৎকার, কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে।

আমি ভীড় ঠেলে বেরিয়ে পড়লুম। ধনগরদের গলির ভেতর দিয়ে দে ছুট। পিসির ছেলে বাবু আমার পিছু নিলে আর গাঁয়ের বাইরে এসে আমাকে ধরেই ফেললে। আমি শুনবই না তাও একরকম জোরজবরদস্তি করেই ওর বাড়িতে আমাকে ও নিয়ে তুলল। এভাবে দুদিন কেটে গেল। তিনদিনের দিন রাতে বাবা পিসির বাড়িতে হঠাৎ এসে হাজির। আমি রান্নাঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলুম, এরকমটা হতে পারে আমি একটা আঁচ করেছিলুম। বাবা বাইরে থেকেই হাঁকলে, "কম্বলা, আন্দ্যা কোথায় রে?"

"আমি কি করে জানব?" ততক্ষণে আমি ঘুঁটে রাখার জায়গায় গিয়ে লুকিয়েছি,

আর বাবু আমাকে বস্তা দিয়ে ঢেকে দিয়ে দু'চারটে ঘুঁটে পিসির সামনে এনে ফেললে। পিসি ভাখরি করছিল। বাবা পিসিকে শাসাচ্ছে, "তোর বাড়িতেই ও দুদিন ধরে আছে। খবরদার ওকে জায়গা দিবি না। এবারে ও কোথায় যায় আর স্কুলই বা করে কেমন করে দেখে নেব।"

"আমি কেন ওকে জায়গা দিতে যাব? গাঁয়ে ওর বন্ধুর অভাব আছে নাকি? দেখ গে কার বাড়িতে রয়েছে সে?" এই বলে পিসি কাটিয়ে দিতে চাইলে, যেন কিছুই তেমন হয়নি এমন হাবভাব।

"তোর কাছে যদি দেখি, তাহলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি," আরেকবার শাসানি দিয়ে বাবা চলে গেল। তাছাড়া, পিসি আর বাবার মধ্যে আমাকে নিয়ে একটা ঝগড়া বা মনকষাকষি হোক এ আমি চাই নি। বাবাব অমতে আমাকে রাখাটা পিসির ঠিক হবে না। মামাও বাবাকে লুকিয়ে আমাকে ঠাঁই দিতে পারবে না। আর এভাবে লুকিয়ে লুকিয়ে কাগলে কদিনই বা থাকতে পারব আমি? এভাবে থেকে লাভই বা কি? তার চাইতে এখান থেকে চলে যাওয়াই তো ভাল।

"পিসি, আমি একটু ঘুরে আসছি।"

"তোর বাপ বলে যে পরিচয় দেয় সে তো একটু আগেই এখান থেকে গেল। এখনই তোর না গেলেই নয়?" পিসি বলে। আমি বললুম, "বাবা এখন বাড়ির দিকে গেছে। আমি একটু সনগর গলিতে আবাজীর বাড়ি হয়ে আসছি।"

"এখন তোর না গেলে চলছিল না?"

"না, একটু হয়ে আসি। স্কুলে কতদূর কি পড়া হচ্ছে একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি।"

"যা, সাবধানে অন্য দিক দিয়ে যাস।"

আমি পা টিপে টিপে আবাজীর বাড়ি গিয়ে ওকে বাইরে মোড়ে ডেকে নিয়ে এসে ওখানে দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগলুম।

আবাজী বললে, "আন্দা, তোর বাপ পরশু রাতে আমাদের বাড়িতে এসে তোর খোঁজ করে গেল। রেগে রেগে আমাকে বলে কিনা, 'আন্দ্যা কোথায়?' আমরা বললুম, 'জানি না।' তখন বললে, 'তোমরা আবার জান না?' আমরা এরপর আর কোনো কথা বলিনি।"

আমি জিজ্ঞেস করলুম, "আমি যে পিসির বাড়ি আছি কেউ সেকথা বাবাকে বলেছে?"

"ওসব কেউ বলে নি, বললুম না, সবাই চুপ করেই ছিল। কিন্তু তুই আর এখন কাগলে থাকিস না।"

"কেন?"

"তোর বাবা তোর ওপর ভীষণ খেপে আছে। কাল দুপুর বারটার সময় আমাদের স্কুলে এসে হাজির।"

"বলিস কিবে, স্কুলে?"

"হ্যাঁ, তা না হলে আর বলছি কি। সোজা ক্লাসে ঢুকে পড়েছে। ওকে নিশ্চয়ই কেউ ইলেভেন ক্লাস দেখিয়ে দিয়েছে, ব্যস্ সোজা ক্লাসে এসে হাজির। ক্লাসে তখন

সায়েন্স টিচার কাড়কর স্যার পড়াচ্ছেন। তোর বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার ছেলে এসেছে?' স্যার বললেন, 'কে, আন্দা যকাতে? সে তো আজ দিন পনের হলো স্কুলেই আসছে না। এ বছর ওর এস এস সির পরীক্ষার বছর। তুমি ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছ তাহলে ছেলে তোমার গেল কোথায়?' তোর বাবা বললে, 'ছেলে পালিয়েছে।' স্যার শুনে ভয় পেয়ে বললেন, 'পালিয়ে গেছে, ওরে বাবারে।' সবাই জানে তুই পালিয়ে গেছিস। তোর বাবা দরজায় দাঁড়িয়ে একনজরে পুরো ঘরটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে চলে গেল। তোকে ধরতে পারলে খুব পেটাবে মনে হল।"

আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলুম। বাবা স্কুল অবধি ধাওয়া করবে ভাবতে পারি নি। তার মানে বাবার রাগ পড়ে নি এখনও। আমারও রাগ হয়ে গেল। ওর কাছে এও জানতে পারলুম অনেক ছেলেই আবাজীর কাছে আমার খবর নিয়ে গেছে। আবাজী আমাকে ভালবাসত, ওর সহানুভূতি ছিল আমার ওপর, ও তাই ওদের সব বলে দিয়েছে, বাবা আমাকে কেমন মেরেছে, আরও কত সব। আমার মনে হল এগুলো আবার আবাজী বলতে গেল কেন? আমার মনটা খুবই দমে গেল, ভাবলুম দূর ছাই! কাগলে থেকে আর কী করব? চার দিন পর কাউকে কিছু না বলে আমি কাগল ছেড়ে কোলহাপুরে চলে গেলুম। বইটই পড়ে মনে হয়েছিল সংসারে দয়ামায়া মানুষের ভেতর একেবারে শুকিয়ে যায়নি। এখনও কিছু কিছু আছে। যে কেউ থাকতে দেবে তার কাছেই গিয়ে থাকব, কাজ করব আর সেখান থেকেই পড়াশুনা চালিয়ে যাব। পড়াটা শেষ করতেই হবে। বার মাইল হেঁটে বেলা এগারটা নাগাদ কোলহাপুরে এসে পৌঁছোনো তো গেল। হেঁটে হেঁটে পায়ের তলাগুলো যেন খসে পড়তে চাইছে। এদিকে মাথায় দুশ্চিন্তার ঝড়। কোথায় যাব, কী করব, কোনো কিছুরই ঠিক নেই। তবে একটা ব্যাপার একেবারে পাকাপাকি ঠিক করে নিয়েছি, যেখানেই যাই না কেন বাড়ি আর ফিরছি না। ভাবতে ভাবতে প্রায় আধপাগলা হয়ে গেছি। দিন চারঘণ্টা এমনি এমনি গাছতলায় বসে বসেই হয়ত কাটিয়ে দিলুম। দিন রাত, শীত, গ্রীষ্ম কোনো কিছুর বোধই আর নেই। টাউন হলের বাগানটায় গেটটা ডিঙিয়ে রাতের বেলায় সেখানে আশ্রয় নিয়ে ঘুম লাগাই, রাতে ঘুমোতে খুব একটা পারি না। ঠাণ্ডা পড়েছে, গায়ে তো কেবল একটা সার্ট আর একটা প্যান্ট। ঠাণ্ডা ছাড়াও, মশামাছির উপদ্রব আছে। রাতে কামড়ায়। মুখের ওপর একটা খবরের কাগজ চেপে মুখটা কামড়ের হাত থেকে বাঁচালেও, হাত পা তো খোলা থাকে ওখানে কামড়ে কামড়ে ফুলিয়ে দিয়েছে, চুলকে চুলকে একশা। ঘুম যতটুকু হয় তাতে আবার অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। মাথার ওপর গাছের ডালে পেঁচা ডাকে, চামচিকে ফড়ফড় করে উড়তে থাকে। আমি একা নির্জনে ভূতের মতো গাছের তলায় শুয়ে রয়েছি। ভোর হবার আগেই উঠে পড়তে হয় বাগানের দরোয়ান আসার আগেই। তারপর রাস্তার কলে গিয়ে হাতমুখ ধোয়া। চান তো মাথায় উঠেছে। যেদিন এলুম তার পরের দিন গোটা কোলহাপুর শহরটা আস্ত চষে বেড়ালুম, অনেক বড় বড় লোকের বাড়িতে ঢুঁ মেরেছি। ব্যবসাদারদের অফিসে গেছি। কেউ আমাকে কাজও দিতে চায় নি, রাখতেও রাজি নয়। না, মাত্র কয়েকদিনের জন্য কাজও কেউ দেবে না। যে কোনো কাজ করতে আমি রাজি আছি;

কাজের কোনো বাছবিচার নেই তাও বললুম সবাইকে, কিন্তু তাতেও মনে হল কারুরই আমাকে দরকার নেই। আমাকে কেউ বিশ্বাস করতে পারছে না। দেখতে তো লাগছে চ্যাংড়ার মতো। সাত আটদিন চানই হয় নি, চুল রুক্ষ, জামাকাপড় ময়লা, রোদে ঘুরে ঘুরে শুকিয়েও গেছি। খিদেয় গলায় আওয়াজ বেরোচ্ছে না। লাঠির বাড়ি খেয়ে হাঁটু জখম, তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে। এরকম যার চেহারা আর চলাফেরার ধরন তাকে কে আর বিশ্বাস করে থাকতে দেবে? ভেবেছিলুম সারাদিন কাজ করব আর রাতে স্কুলে পড়ব, এ স্বপ্ন ধূলিসাৎ হতে চলেছে। দুদিন স্রেফ না খেয়ে কাটল। পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে, জল খেয়ে খেয়ে কোনোরকমে ঠাণ্ডা করছি, কিন্তু এ করে দেখলুম হাতে পায়ে জোরই পাচ্ছি না। তখন আর কি করি, যে দিকটায় কাগলের বালমহারাজ থাকতেন সেইখানে গেলুম। ওঁর বাংলোটা শহরের বাইরের দিকে ছিল। আমার ইচ্ছে ছিল ওঁকে গিয়ে বলব আমি কাগলেরই লোক, যদি কোনো কাজকর্ম পাইয়ে দেন। শহরের বাইরে আসতেই আখের খেত নজরে পড়ল, ছোলার গাছে দেখলুম ছোলা ধরেছে। তারের বেড়া ফাঁক করে মাঠে ঢুকে পেট ভরে আখ খেলুম, ছোলা তুলে খেলুম, তারপর আরেকদফা আখ খাওয়া হল। এসব খেয়ে টেয়ে মহারাজের বাগানবাড়িতে যখন পৌঁছুনো গেল, তখন আমার চেহারা দেখে কেউ ঢুকতেই দিতে চায় না। ঘণ্টা দুই এখানে থেকেও কোনো লাভ হল না, কেউ ঢুকতেও দিলে না, মহারাজের সাথে দেখাও হোল না। তারপর এক সময় কোনো এক ছুতো করে আমাকে বাগান থেকে বার করে দিলে। আমার মনে তখন সাংঘাতিক অবস্থা। সারাটা দিন ও বাড়ির গেটের সামনেই বসে রইলুম মহারাজ কোনো এক সময় নিশ্চয়ই বেরোবেন এ রাস্তা দিয়েই। তখন দেখতে পেলেই ওঁর পায়ে পড়ে নিজের সব কথা বলব ওঁকে। কিন্তু ও পথে কেউ গেল না। তারপর আর কি! আসর ভাঙবার পর লোকে যেমন হাঁটু ধরে উঠে পড়ে, তেমনি আমিও গা তুললুম। সন্ধেবেলায় আবার টাউন হলের রাস্তায় যখন ফিরে এসেছি ততক্ষণ আখ আর ছোলা হজম হয়ে জল হয়ে গেছে পেটের ভেতর। কাছাকাছি দুতিনটি কলাওয়ালা গাড়ি করে কলা বেচছিল। লোকে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা খাচ্ছে, আর গাড়ির গায়ে ঝোলানো একটা টিনে কলার খোসাগুলো ফেলে দিয়ে যাচ্ছিল। রাতে চারিদিক যখন চুপচাপ শান্ত হয়ে গেল তখন ঐ তিনটে কলাওয়ালা কলার খোসার টিনগুলো টাউন হলের লাগোয়া জঞ্জালের জায়গাটাতে ফেলে চলে গেল। এদিকে পেটে ক্ষিদেয় এমন চুঁই চুঁই করছে যে মন থেকে ঐ কলার খোসাও দূর করতে পারছি না। ভাবছি কি হবে ঐ খোসা খেলে? অনেক সময় পাকা আমের খোসাও তো খেয়েছি, কই? কিছু তো হয় নি। তাহলে কলার খোসা খেলে ক্ষতি কি? বেগুনের মতো অনেক তরকারির খোসাই তো খাই কলার খোসা তো নরম। ছাগল যদি তা খেয়ে হজম করতে পারে তাহলে মানুষ পারবে না কেন? বেছে বেছে তুলব তারপর কলের জলে ভাল করে ধুয়ে নেব। খেয়ে দেখি না কেমন লাগে। যেই কথা সেই কাজ। জঞ্জালের ওখানে গিয়ে হাতে যতটা ওঠে ততখানি কলার খোসা তুলে নিয়ে কলতলায় সেগুলো ধুলুম ভাল করে। তারপর একটা খোসা মুখে দিয়ে খেয়ে দেখি, বা রে! খারাপ নয় তো মোটেই।

খেতে ভালই তো লাগছে। তারপর আর কি, খিদেও পেয়েছিল খুব, বকাসুরের মতো সব ক'টা খোসাই গপ গপ করে গিলে ফেললুম। পেট যখন ভরে গেল তখন থামলুম। এভাবে কলার খোসা খেয়ে দিন সাতেক কাটালুম। দিনে আখ আর ছোলা, রাতে কলার খোসা। পেট বলে যে একটা জায়গা আছে শরীরে, তা বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছিলুম।

এদিকে গোটা কোলহাপুর শহর চষে ফেলা হয়েছে, কোনো সুরাহা হয় নি। কিন্তু তাই বলে কাগলে ফিরে যাবারও ইচ্ছে নেই। ঠিক করলুম পুণে যাব, বিনে টিকেটেই। সাত দিনের দিন বেলা এগারটা নাগাদ সোজা কোলহাপুর স্টেশনে হাজির হলুম। ভাবলুম দেখাই যাক না, কোলহাপুরে ভাল দরদী লোকের সন্ধান না পেলেও পুণেতে তো পেয়ে যেতেও পারি। হাঁটছি, এমন সময় কে যেন পেছন থেকে হাত ধরে টানলে। ফিরে দেখি গোপাতাত্যা আমার দিকে হেসে হেসে তাকাচ্ছে। আমার রাগও যেমন হল আবার চোখে জলও এসে গেল তেমনি। অভিমানে নাকের ডগা ফুলে উঠল, জোরে জোরে নিশ্বাস পড়তে লাগল। "ছাড়, আমার হাত ছেড়ে দাও, আমি বাবা মার মুখ দেখতে চাই না," হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে বললুম।

তাত্যা শান্তভাবে বললে, "চল, কোথাও গিয়ে বসি। তোকে সব বলি, এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেছে। তোর বাপ তোর জন্যে পাগলের মতো হয়ে গেছে আর তোর মা কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে খালি হেঁটে বেড়াচ্ছে আর তোকে খুঁজছে।"

"খুঁজুক, আমি ওদের মুখও দেখতে চাই না, আমাকে ছেড়ে দাও," আমি আবার হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলুম। চেষ্টা করলে হবে কি, হাতে কি আমার জোর আছে নাকি? গলায়ও জোর নেই। চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে। আমার এ হাল দেখে তাত্যা বললে, "সামনেই হোটেল আছে, চল, আমারও খিদে পেয়েছে দুজনে কিছু খেয়ে নিই। পাঁচ সাত দিন নিশ্চয়ই পেটে দানাপানি কিছুই পড়ে নি। খেতে খেতে সব কথা শুনবি। তারপর তোর চলে যেতে ইচ্ছে হলে যাবি।" হোটেলে খেতে খেতে তাত্যা আমায় সব বললে। মা আর বাবা সারা কাগলে খুঁজে বেরিয়েছে আমাকে। কোথাও আমাকে না পেয়ে ওদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। মা নাকি রোজ রাতে ঘরে বসে বসে আমার নাম ধরে কাঁদে। ভাইবোনেরা মাকে ঘিরে কাঁদতে লেগে যায়। এদিকে মাকে কাঁদতে দেখে গলির আর পাঁচজন এসে ভীড় জমাত। যারা বয়স্ক তারা নাকি বাবাকে যাচ্ছেতাই করে গালাগাল দিয়েছে। বলেছে, "আঠার উনিশ বছরের ছেলে, মাথায় তোর সমানই হয়ে গেছে, তোর পায়ের চটি যে নাকি পরতে পারে, কোনো আক্কেলে ওর গায়ে তুই হাত তুললি? এত বড়টা হয়েছে, আজ নয়ত কাল ও তো তোর সংসারের ভার কাঁধে তুলে নিতই। আজ তুই যা করেছিস তাতে তোর ছেলেতো সারাজীবনের মতো তোর শত্রুর হয়ে কোথাও চলে যাবে। তখন কি করবি? এতগুলো বছরই ওকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলি, বড়টি করলি, আর চার ছ'মাস খেতে দিলে কি তুই মরে যেতি? ও ছেলে ম্যাট্রিক পাশ দিলে তো তোর সব মুস্কিল আসানই হয়ে যাবে। এমন সময় এ অলক্ষুনে কাজ করতে গেলি কেন?"

চারদিক থেকে এসব কথা শুনতে শুনতে ক্রমে বাবা ওর নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনদিনের মাথায় মাকে নাকি বলেছে, "চল, ছেলেটা নিশ্চয়ই কোলহাপুরে চলে গেছে। যেখানেই যাক, ওকে আমরা খুঁজে বার করবই চল।" মা বললে, "যেখানেই থাকুক তোমার সামনে ও আর আসবে না, ওকে তুমি আর দেখতে পাবে না।"

বাবা বললে, "ঠিক আমার নজরে পড়বে। আমি স্বপ্নে দেখলুম কিনা ও কোলহাপুরে আমাদের পথ চেয়ে বসে আছে। ওকে গিয়ে বলব আমাদের ঘাট হয়েছে, তুই বাড়ি ফিরে চল। তোর কথাই থাকবে, ম্যাট্রিক অবধি তুই পড়তে পাবি। এসব বলে ওকে ফিরিয়ে আনব চল।"

কোলের বাচ্চাটাকে নিয়ে বাবা মা দুদিন এভাবে যাওয়া আসা করলে। রাতে ফিরলেই ভাইবোনেরা মাকে জিজ্ঞেস করে, "মা, দাদাকে পেলি?"

"না, বাবা," মাটিতে হতাশ হয়ে বসে পড়ে মা জবাব দেয়। তিনদিনের দিন সবাই আশা ছেড়ে বাড়িতে বসে পড়লে। দুদিনে দুজনের আসা যাওয়ার গাড়িভাড়া, কোলের ছেলেটারও ধকল যাচ্ছে আর চাষের কাজ সব পড়ে রয়েছে যেখানকার যা সেখানেই। মা আর সেদিন বেরোল না, বাড়িতেই আমার আসার আশায় চাতকের মতো বসে রইল। দিন গড়িয়ে সন্ধে হল তখনও আমি যখন ফিরে এলুম না, তখন সারাদিনের চাপা কান্না গলা ছেড়ে বেরিয়ে এল। আমার ভাইবোনেরাও মার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কাঁদতে লেগে গেল। বাড়িতে সব ওলট-পালট, আমি চলে যাবার পর পাঁচ দিন কেটে গেছে। বাবা বাইরের ঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে মুখ গুঁজে বসে রয়েছে। বাবা ভেবেছিল তিনদিনের মাথায় না হলে চারদিনের দিন আমি ফিরবই। পাঁচ দিন হয়ে গেল তখনও আমি যখন ফিরলুম না তখন বাবা ভেবেই নিলে আমি নিশ্চয়ই কোথাও চলেই গেছি। ছেলের ওপর মারধোর হয়েছে, ঠিক বিচার হয়নি, এ চিন্তা বাবাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। এদিকে আমার বাবা মা রোজই এভাবে কোলহাপুর আর কাগলে যাচ্ছে, ফিরে আসছে, এটা গোপাতাত্যা লক্ষ্য করেছে। বাড়িতে কিসের ঝামেলা, বাবা কেনই এভাবে আসছে যাচ্ছে এরই খোঁজ নিতে একবার গোপাতাত্যা আমাদের বাড়িতে আসে। সব শুনে টুনে জিজ্ঞেস করলে, "তা কোথায় কোথায় খুঁজে এলি?"

বাবা কোলহাপুরে যেখানে যেখানে আমাকে খুঁজেছে এক ধার থেকে বলে গেল। তাত্যা বাবাকে বললে যে বাবা মাকে ছুটোছুটি করার দরকার নেই, আমাকে ওই খুঁজে ফিরিয়ে আনবে। তবে বাবাকে একটা ব্যাপারে কথা দিতে হবে।

"কি, সেটা?" বাবা, জিজ্ঞেস করায়, তাত্যা বললে, "ম্যাট্রিক পরীক্ষা না হওয়া অবধি ছেলেকে দিয়ে কোনো কাজ করাবে না, ওর গায়ে হাত তুলবে না।"

রত্নাপ্পা রাজী হয়েছে।

পরের দিন সকালেই গোপাতাত্যা বেরিয়ে পড়ল আমার খোঁজে। কোলহাপুরে এসে দিনের বেলা সব ক'টা হাইস্কুলে খোঁজ খবর নিলে। না পেয়ে কোলহাপুরেই থেকে গেল আর রাতে যেসব জায়গায় আমার থাকা সম্ভব সে সব জায়গায় খোঁজ নিলে। দুদিন পর আজকে স্টেশনে আমাকে ও হঠাৎই দেখতে পেয়ে গেল। এসব শুনতে

শুনতে আমার চোখের সামনে যেন পরিষ্কার ভেসে উঠল বাবা মার চরকিবাজির মতো আমার খোঁজে বন বন করে ঘোরা আর ভাইবোনদের কাঁদো কাঁদো মুখ। আমার মনে হোল বাড়ি ফিরেই যাই। মার বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পারলে একটু যেন শান্তি পাই। ভাইবোনেরা আমার জন্য ভেবে ভেবে অস্থির হচ্ছে মন চাইছে ওদের জড়িয়ে ধরতে। তবে বাবার কথায় আমি ভরসাও খুব একটা যে করতে পারছিলুম তা নয়। তাই গোপাতাত্যাকে ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞেসই করে ফেললুম, "তারপর বাবা যদি না পড়ায়?"

"না পড়ালে আমি তোকে পড়াব। এই দেখ থাল্লার এই ভাখরি হাতে নিয়ে দিব্যি কাটছি। ম্যাট্রিক পাশ করে চাকরি ক'রে আমার টাকা না হয় আমায় ফিরিয়ে দিস।" আমি জানতুম গোপাতাত্যা খুব একরোখা লোক।

আমি কাগলে ফিরেই এলুম। তাত্যার বাড়িতে চা খেয়ে বাড়ি যখন গেলুম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। আমাকে দেখেই মা, "আন্দ্যা কোথায় ছিলি?" বলে কান্না জুড়ে দিলে। বাবা দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসেছিল চুপ করে, চোখে জল। মার ঐ হাউ হাউ কান্না শুনে পাড়াপড়শি ছুটে এল আমাদের বাড়ি। আমি মার সামনে চুপ করে বসে আছি। পাড়ার বয়স্ক মেয়েরা, কেউ মাসি, কেউ বৌদি, কেউ দিদি, এ কথা সে কথা কোথায় গিয়েছিলুম সব জিজ্ঞেস করতে লেগে গেল। "কোথাও যাই নি" ব'লে আমি আবার মুখ গুঁজে বসে থাকলুম। ওরা মাকে বললে, "তা ঘরের ছেলে যখন ঘরে ফিরেই এয়েচে, তখন আর কান্নাকাটি করা কেন বাপু? পাঁচ-সাত দিন ছেলেটার পেটে হয়তো কিছু পড়ে নি, উঠে গিয়ে ওকে কিছু খেতে দে না।"

বাবা এখন নিয়ম করে মাঠে পাহারা দিতে যায়। রাতে আমি বাড়িতেই থেকে যাই, পড়াশুনা যাতে করতে পারি। অবশ্য ভোর হতে না হতেই মাঠে জল ছাড়তে চলে যাই। জল ছাড়তে ছাড়তেই ভাখরি আর তরকারি খেয়ে নিতুম, ডাল থাকলে ভাল, থালাতেই ডালের সাথে ভাখরি ভেঙে ভাল করে মেখে খেয়ে নিতুম। এগারটা পর্যন্ত জল আমিই ছাড়তুম, তারপর দড়ি বাবার হাতে দিয়ে দিতুম। শিবা যেত জলের দিকটায় আমার জায়গাটায়। একটু দেরী হয়ে গেলে বাবা এগিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলত, "দেরী হয়ে যাচ্ছে, স্কুলে যা, নইলে মাস্টার আবার ছড়ি মারবে। সব ব্যাটা হারামজাদা। তুই যা, আমি দেখছি।"

আমাকে মারধোর করার পর একদিন বাবা আমার স্কুলে গিয়েছিল আর তখনই মানে মাস্টার মশাইকে ছড়ি দিয়ে ছেলেদের হাতে মারতে দেখেছে কিনা।

একদিন আমি আর শিবা মাঠে কাজ করছি, বাবা ছিল গাঁয়ে। এগারটা সাড়ে এগারটায় বাবা হন্তদন্ত হয়ে আমায় এসে বললে, "যা, যা, তাড়াতাড়ি স্কুলে যা, আর জল ছাড়তে হবে না। চাষবাস এ দু তিন মাস যেমন ইচ্ছে হোক। পরীক্ষাটা হয়ে যাক। তারপর জমিও থাকছে, জলও থাকবে তুই থাকবি, যা পালা।" স্পষ্টই বুঝলুম বাবা আমাকে ভয় পেতে শুরু করেছে পাছে আমি আবার রাগ করে বাড়ি থেকে পালাই।

বাবার কথা শুনে আমার কান্না পেয়ে গেল। বাবার অবস্থা এখন এমন হয়েছে

আমার স্কুলে যাওয়াতে বাবার আপত্তি তো নেইই, উল্টে আমাকেই সাধাসাধি করছে। আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই এমন বেখাপ্পা ঠেকছে। সারা জীবন যে বাবাকে সিংহের মতো গর্জন করতে দেখেছি, তাকে এখন বেড়ালের মতো নরম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে হবে এতো আমি চাইনি। শিং ভাঙা ষাঁড়ের মতো করুণ অবস্থা হয়েছে এখন বাবার। বাবার এরকম দুর্দশা আমি সইতে পারছিলুম না।

টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল এবার ফর্ম জমা দেবার পালা। যে আবাজী আমার জন্যে এত করলে, সে বেচারা টেস্ট পরীক্ষা পাশ করতে পারলে না, ফর্মও পেলে না। আমার খুবই কষ্ট হল। অনেক সাবজেক্টে টিউটর রেখেও ও পাশ করতে পারে নি। আবাজী বললে, "আমি ফর্ম পেলুম না বলে খারাপ লাগছে ঠিকই তবে তুই যখন ফর্ম পেয়েছিস তখন ধরে নে তুই ম্যাট্রিক পাশ করার দলেই চলে গেছিস। সত্যি কথা বলতে কি তোর ফর্ম পাওয়া খুবই দরকার ছিল। আমার আর কি বল? এ বছর হল না, ঠিক হ্যায়, সামনের বছর বসব।"

এরপর আমি আবাজীর বইগুলো নিয়ে পড়া আরম্ভ করে দিলুম। ফর্ম পেয়েছি বলে আমি তো খুশি এদিকে জমা দেবার শেষ দিন এসে গেল আমার হাতে ফিসের টাকা নেই। বাকি মাইনে আর পরীক্ষার ফি সব মিলিয়ে পঁয়ত্রিশ টাকা জমা দিতে হবে। তার মানে দেড়মাস একটানা কোথাও একদিনও কামাই না করে রোজগার করে যেতে হবে। আর পরীক্ষা না হওয়া অবধি আমি তা করব কি করে?

বাবা বললে, "আমার কাছে একটা পয়সাও নেই। সামনেই পূর্ণিমা আসছে, নরসোবার থানে আমাকে যেতেই হবে। আমার কাছে সেখানে যাবারই পয়সা নেই। তোকে কোথা থেকে দিই বল তো? তুই যা হোক করে চালিয়ে নে।"

বাবার ঠাকুর দেবতা নিয়ে বাবা পড়ে আছে। ছেলেব ভবিষ্যতের চেয়ে নিজের থানে যাওয়াটাই বাবার কাছে বড় হয়ে গেল। অবশ্য বাবার দিক থেকে দেখলে বাবা ঠিকই করছে। কিন্তু আমি এর জন্যে দেবতাদের ওপর ভীষণ রেগে আছি। মুখে যদিও কিছুই বলছি না। বাবা আমাকে পড়তে ছেড়ে দিয়েছে এই আমাব চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। যাক গে, এদিকে মার কাছেও একটা পয়সা নেই। ঘরের ছোট খাটো সোনার গয়না যা ছিল সব বাঁধা পড়ে আছে, হাতেও কিছু নেই।

শেষ পর্যন্ত আমি হেডমাস্টার মশায়ের পায়ে ধরলুম। উনি আমায় নিরাশ করলেন, বললেন, "এসব দিয়ে হবে না। স্কুলের টাকা হলেও বা কথা ছিল। টাকাটা পাঠাতে হবে এস. এস. সি. বোর্ডে। সে দায়িত্ব কে নেবে, বল? বোর্ড শুনবে না। তুই তো আগে থেকেই জানতিস, তাহলে তোরও তো সেরকম ব্যবস্থা করাই উচিত ছিল। আমি তোকে না হয় আরেকটা দিন সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে তুই টাকাটা জমা দিয়ে দে। প্রতিবারই দেখছি তোর একটা না একটা ঝামেলা থাকবেই।"

সেই একটা দিন মাতে আমাতে অনেক চেষ্টা চরিত্র করলুম, কিছুই হল না। "এতগুলো টাকা হঠাৎ করে কোথা থেকে পাব আন্দ্যা?" মা বলে। সত্যি তো, মা কোথা থেকে পাবে? শেষ পর্যন্ত রাতে মা আর আমি ধর্মাধিকারী মাস্টারমশায়ের বাড়ি গেলুম।

তিনিই ক্লাস টিচার। সংস্কৃত পড়ান। ঐ সাবজেক্টটায় আমার একটু টান ছিল, পড়া পারতুমও ভাল, সেজন্যে উনি আমায় একটু ভালবাসতেন। ভাবলুম, তাঁর কাছেই যাই, উনি যদি কোনো রাস্তা বাতলাতে পারেন। স্যারের কাছে আমাদের সব অসুবিধে খুলে বলা হ'লে রাস্তা তিনি ঠিকই বার করলেন, বললেন, "তারাবাঈ, তোমার ছেলের জন্যে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।"

মা বললে, "যা বলবেন, তাই করব।"

"আনন্দের পঁয়ত্রিশ টাকা আমি দিয়ে দিচ্ছি, তবে একটা শর্ত আছে। কাল থেকে তুমি রোজ একসের করে দুধ দিয়ে যাবে আমার বাড়িতে। ছ আনা সের দরে মাসে দুধের দাম হবে এগার টাকা। এভাবে তিন মাস দুধ নিলে তোমার টাকা শোধ হয়ে যাবে। তবে দুধটা যেন ভাল হয়, বুঝেছ?"

মা বললে, "তাই হবে, আমার মোষ খুব ভাল জাতের, মাঠের কাদার মতো ঘন দুধ দেয়। কাল থেকে যেমন করে হোক এক সের করে দুধ আপনাকে দিয়ে যাব, যতদিন না এ ধার শোধ হয়, তাতে আমার ছেলেপিলের ভাগে দুধ থাকুক বা নাই থাকুক। আমার ছেলেটা পরীক্ষায় বসতে চাইছে ওকে বাবা টাকাটা আপনি দিয়েই দিন, নইলে ছেলে আমার রাগের মাথায় বিবাগী হয়ে যাবে।"

বাজারে দুধ তখন সাড়ে সাত আনা সের, মা ছ আনাতেই চট করে রাজি হয়ে গিয়ে স্যারের পায়ে বার কয়েক মাথা ঠুকে বেরিয়ে এল। বাড়ি ফেরার পথে আমার এত আনন্দ হল বলার নয়।

ধনগর পাড়ায় ঢুকতেই মা বলে উঠল, "বুঝলি আন্দ্যা, মাসে তিন টাকা ক'রে নোকসান হচ্ছে। তা হোক বাপু, ধরে নেব পঁয়ত্রিশ টাকায় মাসে তিনটাকা করে সুদ নিচ্ছে। এ সময় তো এত সব ভেবে চিন্তে কাজ করা চলে না। তিন মাস দুধ দিয়ে পরে না হয় দুধ দেয়া বন্ধ করে দিলেই হবে, কি বলিস?" মার মাস হল বত্রিশ দিনের। সাড়ে সাত আনার জায়গায় ছ আনা পাচ্ছে। সেরে দেড় আনা কম, মাসে তিন টাকা কম। আমি মাকে বোঝালুম এসব লাভ লোকসান চিন্তা করবার সময় এটা নয়। মা বললে, "নারে বাপ, আমি কেন ভেবে মন খারাপ করতে যাব? এতদিন এত সইলুম, এ নোকসানও আমার সইবে। মাস্টারমশায় দরকারের সময় ঠাকুরের মতো বিপদ কাটিয়ে দিলেন, এটাই কি কম আন্দ্যা?" আমি মাকে চাঙা করবার জন্য বললুম, "ঠিকই তো। উনি টাকাটা না দিলে আমার গোটা বছরটাই বরবাদ হয়ে যেত। আমার পরীক্ষাটা হয়ে গেলে যেখানে হোক রোজগার করে আমি তোমাকে পয়সা এনে দেব।" ভাবছিলুম, মাস্টারমশাই কত সহজেই না আমার মনের দুশ্চিন্তার বোঝা ওঁর হাতের কড়ে আঙুল দিয়েই যেন তুলে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

তারপর আর আমাকে পায় কে। আমি নিশ্চিন্তে মনের সুখে পড়তে লেগে গেলুম। আট দিন পার বাবা নরসোবার থান হয়ে এল। সবে উঠেছে চিনেবাদামের তাজা ফালি আট বস্তাটাকে এসেছিল, বাবা পাইকিরি দরে সেটা বেচে দিয়ে থান সেবে এল। বদলে আমরা পেলুম ছোট্ট একটুকরো নারকেল আর একটা করে পেড়া। ঠাকুরকে

পুজো দেবার পর বাবার আনা প্রসাদ।

দু আড়াই মাস ধরে কেবল পড়লুমই, খুব করেই পড়লুম। গেল পাঁচ ছ'বছরের সব প্রশ্ন, শক্ত সোজা সবই ভাল করে তৈরি করে ফেললুম, যে সব মুখস্থ করার তা মুখস্থ করে ফেললুম। তাতেও দেখলুম আসল পরীক্ষায় অঙ্কের প্রশ্ন বেশ শক্ত ছিল। একটা অঙ্কও করা বা চেনা বলে মনে হল না। যাক গে, এ সত্ত্বেও তাড়াতাড়িই শেষ করলুম। ভিন্ন ভিন্ন প্রসেসে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর আসছে দেখলুম। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল বুঝব কি করে? অঙ্কের স্যাব একটা মন্ত্র আমার কানে বলে দিয়েছিলেন সেটাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চললুম। যে পদ্ধতিতেই করে থাকি না কেন, অঙ্কগুলো কেটে বাদ না দিয়ে খাতাতেই রেখে দিলুম।

অন্য সব সাবজেক্ট ভালই দিয়েছিলুম। ভাবনা ছিল অঙ্ক নিয়ে। কেবলি মনে হত অঙ্কের জন্যই বোধহয় পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছে। পবীক্ষার ফল বার না হওয়া অবধি ওই দু'তিন মাস বিছানায় শুলেই অঙ্কেব পরীক্ষাব কথা মনে পড়ে যেত আর বুকে ধুকপুকানি শুরু হয়ে যেত। রাতে ঘুমই আসতে চাইত না। কখনও বা স্বপ্ন দেখতুম অঙ্কে ফেল হয়ে গেছি। তাব মানে আবার পরীক্ষায় বসতে হবে। এ স্বপ্ন দেখে ভেবে ভেবে আমার হাত পায়েব জোব চলে যেত।

তারপব তিন মাস কাজে বেরোলুম, যেখানে যখন যা কাজ পাই। এভাবে মার হাতে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা তুলে দেয়া গেল। অবশ্য এতে আমার বিশেষ কোনো আনন্দ হল না, কারণ যতই পরীক্ষাব ফল বেরোবার দিন এগিয়ে আসছে আমি ততই ফল সম্বন্ধে নিবাশ হচ্ছি। হতাশ হয়ে খালি ভাবছি হায় রে এতদিনকার খাটুনি সবই সবই বুঝি জলে গেল।

এত কাণ্ড, এত চিন্তা-ভাবনাব পর ফল যখন বেরোল তখন কিন্তু পাশ করেই গেলুম। আমার নাম উঠেছে সেকেণ্ড ডিভিশনে। লিস্টটা বার বার পড়ে তবেই আমি স্কুলের দিকে গেলুম। দুদিন আগে বেজাল্ট আর মার্কসীট আনতে যে মাস্টারমশাই গিয়েছিলেন উনি কালই ফিবেছেন কাগলে।

দেখলুম আমাদের স্কুলেব ছাত্রদের ভেতর আমার স্থান হয়েছে থার্ড। দু নম্বরের জন্য ফার্স্ট ডিভিশন পাই নি। অঙ্কে ফার্স্ট ডিভিশনের মতোই নম্বর পেয়েছি। আমি যে আমি, চাষাভূষো, মারাঠী ভাষাই শুদ্ধ করে ভাল করে বলতে পারি না, সেই আমি সংস্কৃতে সবাব চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছি। আমার নিজেব চোখ, নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। যে সব মাস্টারমশায়দের ছেলে ভাইপোরা ফুল-ফ্রী স্টুডেন্টশিপ পেয়ে পড়েছে, আমার অনেক অনেক নীচে ওদের স্থান। গেলে তিন বছর ধরে এই স্কুলে আমায় চেপে রেখেছিল এবারে এস এস সির ফাইনাল পরীক্ষায় আমি তার শোধ নিয়েছি। যা অন্যায় হয়েছিল তার বদলা নেয়া হল ভাল করেই। এখন আমি ফ্রীশিপ নিয়ে করবটা কি? তিন-তিনটি বছর যে কষ্ট আমাকে সইতে হয়েছে তাতো আমারই রয়ে গেল।

টাকা জমা দিয়ে মার্কশীট কিনে স্কুলের মাঠ পেরিয়ে বাইরে এলুম। পিছনে পড়ে

রইল আমার পরিচিত হাইস্কুল, যেখানে আমার এমন কোনো সুখের স্মৃতি নেই যার জন্যে ফিরে তাকাতে সাধ জাগতে পারে।

ব্যাঙের মতো বড় বড় লাফ দিয়ে বাড়ির দিকে চলেছি। এবারে মনের কূপমণ্ডুকদের বাইরে বেরোবার পালা, ওরা বেরোচ্ছে। ওদের পৃথিবী অনেক বড়, ওদের আকাশে অনেক বিরাট। অভাব, অনশন, অশিক্ষা, অত্যাচার জুলুম, টানা হেঁচড়া এসব থেকে ওরা এখন লাফ দিতে দিতে অনেক দূরে যাবার জন্য প্রস্তুত।

এরপর কি করব কিছুই এখনও ভাবিনি। তবে গুমোট কাটিয়ে খোলা পৃথিবীর সন্ধান আমি পেয়ে গেলুম।